মরণবিজয়ী চীন

(তমসো মা জ্যোতির্গময়)

'তরুণ তুর্কী' প্রণেতা

ভূ-পর্য্যটক

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভট্টাচার্য্য সন্স্ লিমিটেড

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪১

মূল্য তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৪১

১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশি
[illegible] ৩, চিন্তামণি দাস লেন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রি

উৎসর্গ

মহাচীনের

নবযুগের পতাকাধারী

তরুণ-তরুণীর

ত্যাগ-ব্রতে গড়ে ওঠা

'মরণবিজয়ী চীন'

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক

যুব-সমাজের

হাতে দিলাম।

—রামনাথ

আমার কথা

মরণবিজয়ী চীন প্রকাশিত হ'ল পৃথিবীব্যাপী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সংঘাতের ভিতর। সাম্রাজ্য-লালসার রুদ্র তাণ্ডব জয়রথ চালিয়েছে আজ চীনের বুকে। সমর-সূচনায় ছ'মাসের বেশী যুদ্ধ পরিচালনা সাধ্যাতীত ব'লে মনে করলেও, তিন বৎসরের রণ-সম্ভার নিয়ন্ত্রণের পর কমিউনিষ্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জেনারেল চ্যাং কাইসেক বুক ফুলিয়ে বলছেন দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা চীনের জন্মেছে। বস্তুতঃ শতাব্দীর মানে চিন্তা করতে অভ্যস্ত সুপ্রাচীন চীন জাতির নিকট পাঁচ দশ বৎসরের সংঘাত বেশী কথা নয়।

পরিশেষে আমার চীনের অভিজ্ঞতা, চীনের স্বরূপ চিনতে আমায় যতটুকু সাহায্য করেছে, তা' থেকে বলতে পারি, সারা দুনিয়ায় যদি কোন জাতি ভারতের প্রকৃত দরদী থেকে থাকে, তবে সে চীন। তাই আজ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আমার অন্তর্ব্বেদ—মহাচীনের সুখ-দুঃখের কাহিনী—আমার দেশবাসীর সমুখে উপস্থিত করে মরমী চীনজাতির অপরিশোধ্য ঋণ পুনরায় স্বীকার করে নিচ্ছি।

ঘাত-সংঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, গোপন স্রোত আর অজানার টান আজ চীনের দিকে দিকে যে রং-বদলের সমারোহ পুঞ্জীভূত করেছে—অবচেতন অন্তরে মহাকালের ছায়াপাত অপসারিত করে চেতনার সঞ্চার করেছে—প্রতিষ্ঠা করেছে মহাচীনের মহাপ্রাণ—বহু শতাব্দীর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার পর তা' পুষ্পিত স্বর্গ রচনা করুক। চীনের সুখ-সরোবরে, পিকিনের পদ্ম-সরের মত, অম্লান কমল চির-প্রস্ফুটিত হয়ে চীন রিপাব্‌লিকের জয় ঘোষণা করুক।

বানিয়াচঙ্গ,
শ্রীহট্ট
চৈত্র, ১৩৪৭

গ্রন্থকার

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

মহাচীনের পথে

আমার জন্মলগ্নে কোন ভ্রাম্যমাণ উদ্ভট গ্রহের বক্রদৃষ্টি ছিল কি না জানি না। নতুবা শিশুকাল থেকে একটা ভবঘুরে বৃত্তি এমন ক'রে আমায় পেয়ে বসবে কেন ?

নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে জীবনটা যখন ছত্রিশের কোঠায় এসে ঠেকল তখন ভাবলাম, এবার বুঝি জীবনের সব দেনা চুকিয়ে ফিরে যাবার সময় হ'ল। কিন্তু ভিতর থেকে প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে কে যেন বলল এগিয়ে যেতে। সে আদেশ অবহেলা করার শক্তি আমার ছিল না। তাই অজানাকে জয় করার মোহ আবার আমায় প্রলুব্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিশ্বকবির কবিতাটীও মনে পড়ল ঃ

"আমার এ যাত্রা হ'ল স্বুরু
এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে জানাই নমস্কার
বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক,
ফিরব না'ক আর ॥"

শেষ পংক্তিটী বার বার আবৃত্তি ক'রে বললাম, যে কয়টা দিন বেঁচে থাকি আমার এ চলার যেন আর শেষ না হয়। চলার পথের আনন্দের মাঝখানেই যেন এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৩১ সনের জুলাই মাসের সাত তারিখ। কপর্দ্দকহীন নিঃসহায় আমি একখানি মাত্র সাইকেল ও কয়েকখানা জামাকাপড় নিয়ে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। এবারকার যাত্রা আদিযুগের মানবসভ্যতার প্রতীক মহাচীনের দিকে।

শ্যাম দেশের শ্যামল মাটি ছাড়িয়ে, মালয়ের ধূলা উড়িয়ে, ইন্দোচীনের বুক পেরিয়ে নবজাগ্রত মহাচীনের দ্বারে এসে যখন প্রণতি জানালাম. তখন

"সেলিশ্চিয়েল এম্পায়ার" বা স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রজাল আমার মনে অনেকখানি রঙ ধরিয়ে দিয়েছে।

তংকিন প্রদেশের সমুদ্র-বন্দর হাইফং হ'তে ইউনান ফোঁ হয়ে সাংহাই যাবার বাসনা ছিল, কিন্তু তা' হ'ল না। কারণ এই অঞ্চলে পাহাড়ে রাস্তা। তদুপরি এসব রাস্তা আবার দস্যু ও 'কমিউনিষ্টে' ছেয়ে গেছে। সেদিকে যে-ই যায় তা'কেই তা'রা নাকি হত্যা ক'রে ফেলে। অনেকে উপযাচক হয়ে বললেন, এমন খারাপ রাস্তায় যেন না যাই, গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আমার মনে কিন্তু তা'তে আঁচড়ও লাগে নাই। তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন ঐ পথে যাওয়ায় বাধা দিল তখন বাধ্য হয়েই ঐ পথ পরিত্যাগ করা স্থির করলাম। আমি পথিক, পথের নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। সাপ, বাঘ, ডাকাতের হাতে মরতে রাজি আছি, তবুও নিষ্ক্রিয়তার আওতায় প'চে মরতে কোন দিন চাই নাই। ঠিক করলাম হাইফং হ'তে জাহাজে হংকং যাব। সেখান থেকে ক্যান্টনে গিয়ে ভাগ্যের উপর সব চাপিয়ে এগিয়ে চলব।

সমস্যা হ'ল, এখন জাহাজ-ভাড়ার টাকা কোথায় পাই। এসব উপকূলবাহী জাহাজপথের ভাড়া খুবই বেশী। শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচীনে চীনা ধনীদের সাহায্য কম লই নাই। এদের ক্রমাগত জ্বালাতন করতে ইচ্ছা হ'ল না। তাই এক ফরাসী জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজারের শরণাপন্ন হলাম। সাহেব শুনেই উষ্মা প্রকাশ ক'রে বললেন, ভবঘুরেদের সাহায্য তিনি করবেন না। কাজেই তাঁ'র সময়ের অপব্যবহার না ঘটিয়ে আমায় সরাসরি পথ দেখতে ব'লে দিলেন। চ'লে এলাম, মনে একটুও দুঃখ হ'ল না। এক চীনা কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্বেও দেখা করতে গেলাম। তিনি আমার নিবেদন অল্প একটু শুনেই বেশী বাক্যব্যয় না ক'রে একখানা 'সেকেণ্ড ক্লাস' পাশ দিয়ে দিলেন।

ইন্দোচীনে আমার দিনগুলি কেটেছিল ভালই। তা'দের আতিথেয়তা, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আমায় কম আনন্দ দেয় নাই। শারীরিক ও মানসিক নিরানন্দ কোন প্রকারেই আমাকে স্পর্শ করবার সুবিধা পায় নাই। বন্ধুবান্ধব অনেকেই জুটেছিল। তা'রা আমাকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সুখে শান্তিতে রাখবারই প্রয়াস পেত। ১৯৩১এর ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে তা'দের কাছে

বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠলাম। ইন্দোচীনের ফরাসী সরকারের গোয়েন্দারা বরাবরই আমার চলাফেরার উপর লক্ষ্য রেখেছিল। তাই বোধ হয় বিদায়বেলায়ও আমার সঙ্গে সঙ্গে একজন জাহাজে এসেছিল এবং জাহাজ না ছাড়া অবধি উপস্থিত ছিল।

জাহাজের কর্ম্মচারী দেখলাম সবই ইংরেজ, শুধু বেতার বার্ত্তার চালকটী ছিল চীনা যুবক। তা'র সঙ্গে আলাপ-পরিচয় প্রথম সাক্ষাতেই সুরু হয়ে গেল। লোকটী বেশ সহৃদয়, হাসিখুসী ও আমোদী ছিল। ভারতের কথা জানবার আগ্রহ তা'র কম ছিল না। তা'র বিশেষ দুঃখ তা'দের কোম্পানীর কোন জাহাজ ভারতের দিকে যায় না। নতুবা সে নিজে ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে কসুর করত না। তা'র এক আত্মীয় "ক্যালকুতায়" (আমাদের ক'লকাতাকে চীনারা ক্যালকুতা বলে) কি এক কাজে কয়েক বৎসর হ'ল গিয়েছে। ফিরলেই তা'র কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল কথা জেনে নেবে। ধীরে ধীরে তা'কে বুঝিয়ে দিলাম যে ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ বিশেষ। তা'র একটা শহর দেখে কিছুই পূরাপূরি জানা সম্ভব হবে না। প্রথম দিন জাহাজে কাটল বেশ ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমার সমুদ্র-পীড়া দেখা দিল। যে 'বয়'টী আমায় খাবার দিত সে আমার অবস্থা দেখে খুবই হাসছিল। বোধ হয় একটু আমোদও পেয়েছিল। পরের দিন সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। আমিও শরিফ মেজাজে বহাল তবিয়ৎ হলাম।

জাহাজ ছোট একটা বন্দরে নোঙ্গর করল। বন্দরটার নাম শুনলাম 'পাখয়'। শাম্পানে চ'ড়ে বন্দরে গেলাম। কোন 'ডক' নাই, 'জেটী'রও বালাই নাই। জুতা না খুলে এক চীনা মাঝিকে তা'দের দেশীয় সাবজি লুই (পাঁচ আনা) কবুল ক'রে তা'রই পৃষ্ঠারোহণপূর্ব্বক ডাঙ্গায় উঠলাম। তীরের সামনে কয়েকখানা ভাঙ্গা ঘর, আর তা'র গা বেয়ে চলেছে এক ধূলিধূসরিত পথ। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ভাঙ্গা, আবার কোথাও ইঁট ও খোয়া সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে। একটু এগিয়ে যেতেই এক সেতুর আবির্ভাব। সেতুর মাঝখানে একটা ঝুড়ি এবং তা'র মধ্যে অনেক পয়সা ছিল। যে-ই পার হয় সে-ই একটা পয়সা ফেলে যায়। কিন্তু

কাছে লোক নাই। একটু আশ্চর্য্যই হলাম। একটা পয়সা ফেলে পার হ'য়ে গেলাম। খানিক এগিয়ে যেতেই সারি সারি বাড়ী আরম্ভ হ'ল। রাস্তার দু'ধারে দোকান। দোকান সাজাবার ধরণ ক'লকাতার চীনাপল্লীর দোকানের মতই। রাস্তার কাছেই বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের আফিস। বাইরে বড় একটা কালো বোর্ডে চীনা ভাষায় নানা রূপ নোটীশ লাগান রয়েছে। তা'র মধ্যে অর্দ্ধেক চীনা অর্দ্ধেক ইংরেজী ভাষায় লেখা একটা নোটীশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নোটীশ দিয়েছেন একজন ইংরেজ। তিনি এখানকার "হারবার মাষ্টার" এবং "কাষ্টমস্ অফিসার"। ইংরেজকে স্বাধীন চীনের বন্দরের কর্ত্তা দেখে মাথায় একটু গোল পাকিয়েই উঠেছিল। পরে জেনেছি চীনের অনেক বন্দরে ইংরেজেরা শুল্ক আদায় করে এবং সেই সব বন্দরকে "ট্রিটী পোর্ট"* বলা হয়। মহাচীনের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা কূটকৌশলে তা'র বিশাল ভূখণ্ডকে রুটির ছিলকার মত ভাগাভাগি ক'রে মনের সাধ মিটিয়ে ভোগ করছে। তা' দেখে বাস্তবিকই বড় দুঃখ হ'ল। এছাড়া চীনকে অবাধে শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা "অবারিত দ্বার" নীতিরও অনুসরণ করছে। তা'ও চীনের সর্ব্বনাশের জন্য কম দায়ী নয়। বর্ত্তমানে চীনাদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব জাগরণ এসেছে। তা'র ফলে বিদেশী স্বার্থের এই মারাত্মক নাগপাশ হ'তে তা'দের মুক্তি পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাজারে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, এক জায়গায় দুটী চীনা যুবতী থানের কাপড় বুনছে। তা'রা বেশ হাসিখুসী, কাজের আনন্দে উচ্ছল, কোথাও যেন ক্লান্তির লেশ নাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্যাণ্টনী ভাষায় পথের দু'চার জন লোকের সঙ্গে আলাপও করলাম। সব দোকানেই দেশী পণ্য। কেবল একটা দোকানে বিদেশী দ্রব্যসম্ভার দেখে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, স্থানীয় জনকয়েক বিদেশী খরিদ্দারের জন্য ঐ দোকানে উক্ত জিনিষগুলি

* বকসার যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ চীনাদের নিকট হ'তে সন্ধির সর্ত্ত স্বরূপ কতকগুলি বন্দরে অবাধে ব্যবসাবাণিজ্য করবার অধিকার পান। উক্ত বন্দরসমূহকে "ট্রিটী পোর্ট" ব'লে অভিহিত করা হয়। স্যামীন, সাংহাই, হাঙ্কো, তিয়েনসিন, পিকিন্ প্রভৃতি বন্দর এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রয়েছে। একটা ব্যাপার বিশেষভাবেই লক্ষ্য করলাম যে বাঙ্গলায়, সিঙ্গাপুরে কিম্বা মালয়, শ্যাম ও ইন্দোচীনে চীনাদের স্বাস্থ্য যেমন দেখেছি, এখানে তেমন নয়। সকলেই লম্বা, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ। শুনলাম চীনের আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য খুব ভাল ব'লেই অন্যান্য দেশের চীনা বাসিন্দাদের তুলনায় চীনের চীনারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান হয়।

হংকং

জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরা হাইনান দ্বীপটী ডাইনে রেখে চলতে লাগলাম। আরও আড়াই দিন চলার পরে হংকং বন্দরে এসে পৌঁছলাম। জাহাজ থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেলে রাস্তায় চলতে চলতে কোথায় প্রথম ওঠা যায় তা'ই ভাবছিলাম। পথে একজন শিখকে দেখতে পেয়ে তাঁ'কেই একটা হোটেল দেখিয়ে দিবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে একটা বড় হোটেলে নিয়ে গেলেন এবং হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার পরে আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে বিদায় নিলেন। আমার ঘরে সাইকেল ও কাপড়চোপড়ের ঝোলাটা রেখে হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করলাম। ঘরে আয়েস ও বিলাসের সমস্ত ব্যবস্থাই আছে—ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল, বিজলী বাতি ও পাখা, ঘর গরম করবার কল, গদি-আঁটা বিছানা, স্নানের কামরা, দালানের উপরতলায় ওঠবার কল (লিফট) ইত্যাদি। দিন প্রতি ভাড়া মাত্র এক টাকা দুই আনা। ভারতের হোটেলের তুলনায় কত সস্তা!

পরের দিন প্রাতে সাইকেল নিয়ে হংকং নগরী দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে সব পুলিশই পাঞ্জাবী, কেবল মাঝে মাঝে দু'একটী চীনা দারোগা টহল দিচ্ছে মাত্র। সমুদ্রের ধারের বাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট পথে এসেই দেখি একটী চীনা যুবতী পথে প'ড়ে আছে। তা'র নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, তা' ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে। চীনারা দূরে দাঁড়িয়ে তা' দেখছে, কেউ কাছে আসছে না। পাঞ্জাবী পুলিশ তখনও আসে নাই। ভাবলাম ডেকে নিয়ে আসি, কিন্তু এরই মধ্যে তিন জন পাঞ্জাবী পুলিশ এসে হাজির হ'ল এবং লাসটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করল।

একজন পাঞ্জাবী পুলিশকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, পাছে ঘাড়ে ভূত চাপে বা "স্থইয়া" অর্থাৎ দুর্ভাগ্য তা'দের পেয়ে বসে এই ভয়ে চীনারা মৃত বা মৃতপ্রায় লোকের বিশেষ আত্মীয় না হ'লে কাছে ঘেঁসে না। চীনা দোকানে চা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ মিলে না। অনেক খোঁজ ক'রে বোম্বায়ের একজন বোরা মুসলমানের দোকানে উঠলাম। দোকানী বড়ই অমায়িক লোক। তিনি চা, দুধ এবং তৎসহ কিছু পিঠা খাওয়ালেন, পয়সা কিন্তু নিলেন না। হংকংয়ের ভারতীয়দের কাছে আমার আসার সংবাদ প্রচারও তিনি ক'রে দিলেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। এখানে একটী গুরুদ্বার আছে। তথায় ভারতীয়দের বিনা পয়সায় খেতে ও থাকতে দেওয়া হয়। অনেকে কাজের সন্ধানে এখানে এসে অনেক দিন কাটিয়ে দেয়। আর একটী জিনিষ বিশেষরূপেই লক্ষ্য করবার আছে যে হংকংয়ে হিন্দু-মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে সত্যই এক অভূতপূর্ব্ব আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্দ্য বিরাজমান। সেখানে হিন্দুস্থানের লোকমাত্রেই "হিন্দু" নামে পরিচিত।

বিকাল বেলায় বাজার দেখতে গেলাম, স্থবিধা হ'লে কিছু ফল কিনবার ইচ্ছাটাও ছিল। সেখানে ঝুড়ি ঝুড়ি সাপ বিক্রয়ার্থ আমদানী হ'তে দেখলাম। চীনারা সাধারণতঃ বাজার থেকে সাপ কিনে বাড়ী নিয়ে যায়। প্রথমে তা'রা ফুটন্ত গরম জলে সাপটীকে ডুবিয়ে দেয়। তারপর তা'র মাথাটীর চারি দিক ধীরে ধীরে কেটে মাথা হ'তে লেজ পর্য্যন্ত সাপের বিষাক্ত শিরাটী অটুট অবস্থায় বের ক'রে ফেলে। শিরাটী কোন প্রকারে ফেটে বিষাক্ত রক্ত বেরিয়ে পড়লে সাপটী আর খাওয়া হয় না—ফেলেই দিতে হয়। অবশ্য ঢোঁড়া সাপের বেলায় একথা খাটে না, তা'র মাথাটা শুধু কেটে ফেলা হয়। সাপের মাংস এদের এক উপাদেয় খাদ্য। বাজার থেকে সিঙ্গাপুরী আনারস ও কলা কিনে হোটেলে ফিরলাম।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সাইকেলে চীন পরিভ্রমণের পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। পথঘাটের বিপদাপদের নানা প্রকার কাহিনী উল্লেখ ক'রে তিনি বারবার আমায় চীনভ্রমণে যেতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন দেখলেন আমার অগ্রসর হওয়ার বাসনা প্রবল, তখন 'শেষ খাওয়ার' মত তাঁ'র স্ত্রীর হাতের বাঙ্গালী

রান্না খাইয়ে দিলেন। আর জীবন্ত ফিরব না মনে ক'রে উদ্বেগও কম দেখালেন না।

হংকংয়ে অনেকগুলি সিনেমা আছে। তা'দের প্রেক্ষাগৃহ ক'লকাতার তুলনায় ভাল বলা যেতে পারে। কয়েকটী 'সিনেমা হাউসের' মালিক ছিল একই কোম্পানী। তা'র এক ইংরেজ ডিরেক্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তিনি চট্টগ্রামে অনেক দিন কাটিয়ে এসেছেন। বাঙ্গালীদের বেশ একটু ভালবাসেন ব'লে মনে হ'ল। তিনি পরিচয়ের সূচনায়ই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন,—"আপনি ভূ-পর্য্যটন প্রয়াসী? কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়ে এলেন, আর চীনেই বা কেন বেড়াতে চান?" চীন দেশ দেখবার ও তা'র সম্বন্ধে জানবার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণের কথা শুনে তিনি আমায় নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। চীনা মুল্লুকে ঢুকলে আর ফিরে আসতে পারব না এরূপ তিনি বললেন। এছাড়া পথেঘাটে অসম্ভব অত্যাচার ও নির্য্যাতনের দু'চারটা গল্পও যে না শুনালেন তা' নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁ'র সব সিনেমায় আমাকে একখানা "ফ্রি কার্ড" দিলেন।

এদিকে তিন দিনে হাতের সম্বল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আনুষঙ্গিক খরচের চিন্তায় একটু বিব্রতও হ'তে হ'ল। পরের দিন সকালে এক সিন্ধী রেশম ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করলাম। হংকংয়ে কতদিন কাটিয়ে তারপর অন্য দিকে বের হব তা' জেনে নিয়ে তিনি কি একটা হিসাব ক'ষে বললেন,—"দেখুন, চীন দেশে যখন যাচ্ছেন তখন ফিরে আসার উপায় নাই জেনে রাখুন, তাই আপনার বেশী টাকারও দরকার পড়বে না। কোয়াণ্টাং প্রদেশে অনেকটা শান্তি স্থাপন হয়েছে। সে দেশে যেতে আপনার অর্থাভাব না ঘটে তা'র ব্যবস্থা আমরা ক'রে দিব। আপনাকে এক মাসের পাথেয় দেওয়া হবে, তারপর সবই আপনার ভাগ্য। বোধ হয় বেশী দূর আর যেতে হবে না।" হংকংয়ে দিন পনের কাটিয়ে প্রাণের সুখ ও শান্তির একটা শেষ কিনারা ক'রে তবে তিনি যেতে উপদেশ দিলেন। হাতখরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে বাকী টাকা যথারীতি পাবার ব্যবস্থাও ক'রে ফেললেন।

তিন স্থানে চীনাদের তথাকথিত বীভৎসতার বিবরণ পেয়ে চীন দেশ দেখবার আগ্রহ বেড়েই উঠেছিল। তাই হংকংয়ে চীনা যুবকদের সঙ্গে একটু

মেলামেশার চেষ্টাও করলাম। কয়েকজন চীনা চীন পরিভ্রমণের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন, অথচ চীনা খৃষ্টানরা—এরা 'ক্যাথলিক' ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়—নিরাশার বাণী শুনাতে কসুর করে নাই। এক দিন হংকং শহরের অপর পাড়ে কাওলিনে বেড়াবার সময় একটী চীনা ধর্ম্মমন্দিরে যাই। মন্দিরে নানা মূর্ত্তি দেখলাম, সকলের সামনেই মোমবাতি জ্বালান, আর মাঝে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। চারি দিকে কোন বিগ্রহ অসি হস্তে যথার্থ উদ্যত, কোনটী নররক্তপানরত, আবার কোথাও বা ভগবানের সাহায্য প্রার্থনায় যোগাসনে ধ্যানরত. ভয়ার্ত্ত বিগ্রহগুলি ভাবদ্যোতক ও চিত্তাকর্ষক। মন্দির থেকে বের হবার সময় এক পুরোহিত মন্দির প্রবেশের দক্ষিণা পঞ্চাশ 'সেণ্ট' * চাইলেন। শুনলাম উক্ত দক্ষিণা আইনসম্মত। কাজেই পঞ্চাশ সেণ্ট দক্ষিণা দিয়ে ক্ষুদ্র কাওলিন শহরটী বেড়িয়ে দেখে নিলাম। সন্ধ্যায় হংকং প্রণালীর তীরে এসে হংকংয়ে ফিরবার জন্য মাঝির সন্ধান করতে গিয়ে বিজলী আলোয় পরিশোভিত হংকং শহরের রমণীয় রূপ দেখে বিমোহিত হলাম। সাগর বক্ষ ভেদ ক'রে ছোট ছোট পাহাড় সোজা দাঁড়িয়ে আছে, তা'দেরই বুকে বুকে আলোকরশ্মি প'ড়ে হংকং কতই না সুন্দর দেখাচ্ছে! সাঁঝের এ হংকংকে অনায়াসে একটী ছোটখাট নক্ষত্রলোক বলা যেতে পারে।

মাকাও

হংকংয়ের কাছেই মাকাও বন্দর। হংকং হ'তে প্রাতে সাতটায় জাহাজ ছেড়ে ১১টায় মাকাও পৌছে। আবার বেলা দুটায় মাকাও ছেড়ে সন্ধ্যার সময় হংকংয়ে ফিরে আসা যায়। মাকাও পর্ত্তুগীজদের দখলে একটী ছোট বন্দর।

* পঞ্চাশ সেণ্ট আমাদের আট আনার সমান। একশ' সেণ্টে এক ডলার হয়। চীন দেশে যে ডলারের প্রচলন আছে তা' আমেরিকার ডলারের মত নয়। চীনা ডলারের সঙ্গে পূর্ব্বে ষ্টারলিংয়ের সম্বন্ধ ছিল, এখনও আছে। তবে আমেরিকার ডলারের সঙ্গেও বর্ত্তমানে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছে। ১৯৩২ সনে আমি যখন চীনে ছিলাম তখন চীনের এক ডলারের মূল্য এক শিলিং পাঁচ পেনী হ'তে ছয় পেনী পর্য্যন্ত ছিল। আমাদের টাকার দাম তখন ছিল এক শিলিং ছয় পেনী। আজকাল চীনের এক ডলার চার পেনীর সমান, আর আমাদের টাকা এক শিলিং ছয় পেনীর কাছাকাছি।

এর খ্যাতি এক পুণ্যস্মৃতির জন্য। চীনের বিশ্ববিশ্রুত দেশপ্রেমিক সান্‌-সেনের জন্মভূমি এই মাকাওয়ের নিকটেই। যাত্রীবাহী ষ্টীমারের বৈশিষ্ট্য দেখলাম, প্রত্যেক যাত্রীর জন্য এক একখানা চেয়ার দেওয়া আছে এবং টিকিটে 'সিট' ও 'রো' নম্বরের উল্লেখ থাকে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গগামী ষ্টীমার-পথের মত গাদাগাদি ক'রে বসার বিড়ম্বনা মোটেই নাই। মাকাওয়ের ষ্টীমারে উঠে দেখি আমি একমাত্র ভারতীয়। সেজন্য সকলে আমাকে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করছিল। জাহাজ অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ ডাইনে ও বাঁয়ে রেখে চলেছিল এবং চারি দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেলেহাঁস বেশ নির্ব্বিকারে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আগাগোড়া পথটায়ই বেশ উপভোগ্য দৃশ্য। জাহাজে দেখলাম, চীনা ঔষধ বিক্রেতারা নানারূপ চীৎকার ক'রে তা'দের ঔষধের গুণাবলি ব'লে যাচ্ছিল। তা'দেরই একজন হিন্দুস্থানের প্রস্তুত বিশেষ একপ্রকার মলম খুব জাহির ক'রে বিক্রয় করছিল। এক চীনা হঠাৎ আমাকে আমি হিন্দু কি না জিজ্ঞাসা ক'রে উক্ত হিন্দুস্থানী মলমের যথার্থতা যাচাই করবার জন্য এক কৌটা মলম দেখাল। দেখে বুঝলাম, হিন্দুস্থানের ঔষধের সুনাম অত্যধিক পরিমাণে থাকায় অনেক চীনা হিন্দুস্থানী ঔষধকে তা'দের নিজেদের ঔষধ ব'লে চালিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেয়।

যথাসময়ে মাকাও বন্দরে পৌছন গেল। কাছে একখানি পর্তুগীজ 'গানবোট' বাঁধা ছিল। একজন চীনা ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে পর্তুগীজদের একটু প্রশংসা করলেন। পর্তুগীজরা এতাবৎ কোনপ্রকার গোলাগুলী ছুঁড়ে চীনাদের আদৌ নিপীড়ন করে নাই। তাঁ'র মতে 'সাদামুখো'দের মধ্যে এই জাতিটাই একটু ভাল। আমি পর্য্যটক শুনে কতদিন হয় হংকংয়ে এসেছি এবং দেশটা কেমন ঠেকছে তা'ও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। হংকংয়ে অনেক বাঙ্গালী থাকেন। সেখানে বাঙ্গালীদের এক মন্দির আছে—তা' দেখেছি কি না জানতে চাইলেন। আমি তো অবাক! ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে, চীনারা সকল ভারতীয়দের হিন্দু ব'লে জানে। শুধু যা'রা মাথায় পাগড়ী পরে, দাড়ি গোঁফ রাখে তা'দের তা'রা বাঙ্গালী ব'লে থাকে। তাই গুরুদ্বারকে বাঙ্গালী মন্দির ব'লেই এরা মনে করে। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে সুদূর প্রাচ্যে কতক কতক জায়গায় ভারতীয়রা দুটী বিশেষ নামে পরিচিত। একটী হ'ল বাঙ্গালী, অন্যটী

হ'ল হিন্দু। দক্ষিণ ভারতীয়রা হিন্দু নামে পরিচিত। সিঙ্গাপুরে তাই তিন রকমের বাঙ্গালী দেখতে পাওয়া যায়। শিখ বাঙ্গালী, পাঠান বাঙ্গালী ও বাবু বাঙ্গালী। বাবু বাঙ্গালীরা কিন্তু আদি ও অকৃত্রিম বাঙ্গালী নয়। যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বিহার প্রদেশের যে সব লোক সিঙ্গাপুরে দুধ বিক্রয় করে, ট্রামের কণ্ডাক্টরী বা ঐ প্রকারের অন্যান্য কাজ করে, তা'দের বাবু বাঙ্গালী বলা হয়। সেখানে আসল বাঙ্গলার লোককে হিন্দু তথা দক্ষিণ ভারতীয় ব'লেই অনেকে মনে করে।

মাকাও হ'ল হংকং ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের প্রমোদবিহার। আশপাশ থেকে বহু লোক আমোদপ্রমোদের জন্য এখানে বেড়াতে আসে। অলিতে-গলিতে, পথেঘাটে কেবল হোটেল ও নাচঘর—চারি দিকেই বিলাসের ছড়াছড়ি। শহরটীর অনেক স্থলই মদ্যালয় এবং চণ্ডুখানায় ভর্ত্তি। যুবক ও ধনীর দল নানা প্রকার বিলাসে ও 'মাজাং' খেলায় অকাতরে তা'দের অর্থ, সামর্থ্য ও সময়ের অপব্যয় ক'রে দেশপ্রেমিক সান ইয়াৎ সেনের জন্মস্থানের নিকটে কি ভীষণ নরককুণ্ড সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে! আর পর্ত্তুগীজ সরকার তা'দের রাজস্ব সানন্দে আদায় ক'রে অফুরন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা বিলিয়ে যাচ্ছে। শহরে বেড়িয়ে এসব দেখেশুনে মাথা ও মেজাজ দুই-ই বোধ হয় গরম হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারের এক কল খুলে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে খানিকটা জল পান করলাম। আর বেড়িয়ে দেখার প্রবৃত্তি হ'ল না। এক ডলার দক্ষিণা দিয়ে এক হোটেলে আশ্রয় নিলাম। হোটেলের পার্শ্ববর্ত্তী একজন ক্যাণ্টনী যুবকের মিঠায়ের দোকান থেকে কিছু ভারতীয় গজা কিনে বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেলাম। বিদেশে ব'সে দেশী খাদ্য খাওয়ায় কতই না আনন্দ!

প্রাতে ঘুম থেকে ওঠার পরে বুকে ও মাথায় বড়ই ব্যথা অনুভব হ'তে লাগল। নিশ্বাসপ্রশ্বাসেও একটু কষ্ট হচ্ছিল। খুবই সর্দ্দি হয়েছে দেখলাম। একটা 'য়্যাসপিরীন' বড়ি খেয়ে কাছের এক পর্ত্তুগীজ ডাক্তারকে হাত দেখালাম। তারপর এক শিশি ঔষধ কিনে হোটেলে ফিরলাম। পথে এক শিখ পুলিশের সঙ্গে দেখা। সে একজন দেশের লোক দেখে আমার সঙ্গে পরিচয় তো করলই, অধিকন্তু আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। রাত্রি ন'টার সময় আমার জন্য দু'খানা রুটি, একটু আলুর তরকারি ও এক গ্লাস দুধ

নিয়ে আবার আমাকে দেখতে এল। তখন সে ম্যানেজারকে ডেকে আমার তদারক করার কথাও ব'লে দিল। তা'র কাছেই মাকাওয়ের একজন পাঞ্জাবী সওদাগরের খোঁজ পেলাম।

পরের দিন সকালে শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম, যদিও দুর্ব্বলতা বেশ ছিল। আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে কিছু দূর যেতে না যেতেই এক ভদ্রলোক এসে হাত ধ'রে বললেন যে স্থানীয় শিখ পুলিশের কাছে তিনি শুনেছেন আমি ভূ-পর্য্যটনে বেরিয়ে মাকাওতে অসুস্থ অবস্থায় এক হোটেলে প'ড়ে আছি। তাই আমারই সন্ধানে তিনি এসেছেন। আমাকে অতি সমাদরে তাঁ'র বাড়ীতে নিয়ে তুললেন এবং যথেষ্ট যত্ন করলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হ'ল। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর দেশছাড়া। তবে আর বেশী দিন বিদেশে প'ড়ে থাকবেন না, এবার দেশে ফিরে যাবেন। সেদিনটা তাঁ'র কাছে কাটিয়ে পরের দিন সকালে ষ্টীমারে হংকংয়ে ফিরলাম। জাহাজে ওঠার সময় ভদ্রলোকটী কয়েকখানা নোটও হাতে গুঁজে দিলেন। ষ্টেশনের শিখ পুলিশটীও বিদায় দিতে এসেছিল। ভারতের বাইরে ভারতীয়দের কতই না আন্তরিকতা, কতই না ভ্রাতৃভাব!

ক্যাণ্টন

হংকংয়ে ফিরে এসে দু'দিন হোটেলে কেবল বিশ্রাম নিলাম। শরীরের দুর্ব্বলতা ও অবসাদ অনেকখানি কেটে গেল। তৃতীয় দিনে বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ক্যাণ্টন রওনা হলাম। হংকং হ'তে সাইকেলে ক্যাণ্টন যেতে হ'লে ফেরী পার হ'তে হয়। দশ সেণ্ট দিয়ে ফেরীতে কাওলিন গিয়ে ক্যাণ্টনাভিমুখী বড় রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটীর অনেক স্থানই পিচ ঢেলে তৈরী করা। বৃটিশ সীমানায় পঁচিশ মাইল পরিমাণ রাস্তা খুবই ভাল ভাবে রাখা হয়েছে। তারপরই রাস্তার অবস্থা একদম খারাপ। ক্রমাগত চড়াই ঠেলে উঠতে লাগলাম। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'ধারে চা ও খাবারের দোকান। পথে তিন রাত্রি কাটিয়ে দুপুরে ক্যাণ্টন পৌছলাম। ক্যাণ্টন পৌছে কিন্তু এক অদ্ভুত বিপদে পড়লাম। পথ জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাই না, হোটেলের খোঁজ করলে কেউ দেখিয়ে দেয় না; স্থানীয় পুলিশের কাছে গেলে সে কথা

বলে ।—ক'রও সঙ্গে আলাপ করতে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়ে দেখি অনেক হোটেল। সেখানে থাকবার ঘর চাইলাম। দরদামের কথা দূরে থাক কেউ কথাই বলতে চায় না, খুব বেশী হ'লে "খালি নাই" ব'লে বিদায় ক'রে দেয়। কমসে কম কুড়িটা হোটেল থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বৃটিশ কনসালের' কাছে চললাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, তাই পথে এক কাফির দোকানে ঢুকে এক পেয়ালা চা চাইলাম। সকলকেই চা দেওয়া হ'ল, কিন্তু আমার প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ দেওয়া হ'ল না।

তখন সন্ধ্যা। অনেক দূর থেকে সাইকেলে এসেছি, বিশ্রামের নিতান্তই দরকার। কনসালের সঙ্গে দেখা ক'রে আমার বিপত্তির কথা বললাম। তা' শুনে তিনি আমায় চীন পরিভ্রমণের অসুবিধার কথা বুঝিয়ে দিয়ে আবার হংকংয়ে ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন। তবে রাত্রিটা কাটাবার জন্য এক চীনা গুপ্তচরকে আমাকে একটা থাকার জায়গা ঠিক ক'রে দিবার জন্য সঙ্গে দিলেন। অনেক ঘোরাঘুরির পরে একটা হোটেলে মাটির নীচের তলার একটা কামরায় থাকার ব্যবস্থা ক'রে সে বিদায় নিল। কক্ষের কাছেই এক 'ড্রাম' ভর্ত্তি প্রস্রাব, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। যে খাদ্য মিলল তা' অখাদ্য। যা'ই হোক কোন প্রকারে তনুরক্ষা ক'রে শুয়ে পড়া গেল। অবশ্য দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ ক'রে দিলাম। রাত্রি প্রভাত হ'ল। জল চেয়েছিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে একটা জলের কলে হাতমুখ ধুলাম। তারপর হংকংয়ের সিন্ধী ভদ্রলোকটীর পরিচয়পত্রটা নিয়ে তাঁ'দের ক্যাণ্টন শাখার উদ্দেশ্যে চললাম। স্থানীয় ম্যানেজারের সঙ্গে যথারীতি সাক্ষাৎও হ'ল। তাঁ'র টাকা চুরি যাওয়ায় তিনি পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। বেশী ক্ষণ আলাপাদি করতে পারলেন না, তবুও আমাকে ভরপেট চা রুটি প্রভৃতি খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রে বেরিয়ে গেলেন। খাবার খেয়ে আবার রাস্তায় বের হলাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। আমার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল।

বেলা তখন প্রায় দশটা। সান ইয়াৎ সেন বাগিচার রেলিং ধ'রে আকাশ পাতাল ভাবছি এমন সময়ে পিছন থেকে এক চীনা গলায় "কিলিং কুই" অর্থাৎ কালো ভূত ব'লে কে ডাক দিল। পিছন ফিরেই দেখি সিঙ্গাপুরের এক চীনা

বন্ধু। তা'কে আমার বিপত্তির সব কথাই বললাম। সে কেবল হাসিল। বেশ খানিক হেসে নিয়ে সে বলল যে আমার পোষাকটাই যত বিপত্তির কারণ। যে পোষাক প'রে পথ চলছি সে পোষাকটা জাপানী চাষীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে। চীনারা তাই আমাকে 'জাঁপ্পুন কুই' অর্থাৎ জাপানী ভূত ব'লে মনে করেছিল। জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের জন্য চীনারা তা'দের বড় ঘৃণা করে ও যথাসম্ভব 'বয়কট' ক'রে চলে। কাজেই আমাকেও জাপানী মনে ক'রে এত অসুবিধায় ফেলেছিল। বন্ধুটী তখন আমাকে এক দর্জ্জির দোকানে নিয়ে গেল। তারপর একটা 'ব্যাজ' তৈরী করিয়ে তা'তে "হিন্দু ইয়াংসি সাই কাই" লিখিয়ে আমার বুকে এঁটে দিল। খরচ পড়ল ৪০ সেণ্ট। চীনা কথাগুলির অর্থ হ'ল, হিন্দু ভূ-পর্য্যটক।

আশ্চর্য্য এই, নূতন ব্যাজ বুকে প'রে রাস্তায় এসে দেখি একেবারে অন্য রকম অবস্থা। হঠাৎ আদর অভ্যর্থনা যেন প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই চারি দিক থেকে বর্ষণ সুরু হ'ল। হোটেলে ফিরতেই মালিক নমস্কার ক'রে বললেন, "আপনাকে 'জাঁপ্পুন কুই' ভেবেছিলাম। কতই না কষ্ট হ'ল" ইত্যাদি। তাঁ'র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভাল কক্ষটি আমার জন্য ঠিক করা হ'ল। জিনিষপত্রাদি সব তিনিই ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। আমাকে অতি সমাদরে স্নানাদির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এবং থাকা-খাওয়ার সকল রকম সেরা ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্যাণ্টনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হোটেল 'এসিয়া হোটেলে' গেলাম। মালিক আমার দুই বেলা খাওয়ার এবং চা পানাদির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তারপর পূর্ব্ব দিনের বিপত্তির কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। হাটে, মাঠে, পথেঘাটে, অলিতেগলিতে যেখানেই যাই সেখানেই চীনা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কত আপন জনের মত আলাপ আপ্যায়ন করলেন! এদের সকলেরই ভারতের জন্য বেশ সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে। হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য এদের বিশেষ প্রীতি দেখা যায়। কাজেই নূতন বন্ধু ও সঙ্গী অনেকই জুটে গেল। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁ'র বাবা পাশী, মা চীনা। ভদ্রলোকটী আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যাণ্টনের দ্রষ্টব্যগুলি দেখালেন।

ক্যাণ্টনে ট্রাম লাইন আছে, কিন্তু ট্রাম চলে না। রিকসাওয়ালা দেখল যদি ট্রাম চলে তবে তা'দের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাই তা'রা ধর্ম্মঘট

করল। হাজার হাজার লোক মিলে একদিন ট্রাম লাইন অনেকখানি তুলে ফেলে দিল। গুলী চলল, কতকগুলি লোক মরণকে বরণ ক'রে নিল, তবুও শহরে ট্রাম আর চলতে দিল না। যা'রা মরল, তা'রা তা'দের সহকর্ম্মীদের পথ সুগম ক'রে দিয়ে গেল। ধনীরা তা'দের কমিউনিষ্ট আখ্যা দিল। জগৎ জুড়ে তাঁদের কুৎসা র'টে গেল। তবুও তা'রা তা'দের ভাতের ব্যবস্থা বজায় রাখল। এমনি ক'রেই মহাচীনে কমিউনিষ্ট গজায়।

সাধারণতঃ রবিবার দিন সান ইয়াৎ সেনের মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখবার জন্য বহু লোক জড়ো হয়। আমিও সেদিন তা' দেখতে গেলাম। বহু জনসমাগম হয়েছিল, কিন্তু গোলমাল একটুও ছিল না। চারি দিকে একটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং পবিত্র আবহাওয়া বিরাজ করছিল। উপস্থিত চীনা যুবকযুবতীদের একে একে নব্য চীনের জন্মদাতার পদতলে তা'দের হৃদয়-নিংড়ান শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখলাম। নীরব শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে তা'দের পুণ্যাত্মা দেশ-নায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করার একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল।

সেখান থেকে সান ইয়াৎ সেন বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। ঘুরে ঘুরে দেখে ফিরবার সময় এক চীনা যুবক আমাকে একটা হলে নিয়ে গিয়ে তা'দের সকলের সামনে ভারতের কথা বলতে পীড়াপীড়ি করল। দেখলাম দশ মিনিটের মধ্যেই মস্তবড় হলটা ছাত্রছাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বলবার জন্য দাঁড়ালাম। একজন উৎসাহী যুবক আমাকে হিন্দু ভূ-পর্য্যটক ও কবি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক ব'লে পরিচয় করিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে যেন কিছু বলি এই অনুরোধও এল। ভারতের ব্যথা-বেদনার কত কথা আছে! তাই বলতে দাঁড়িয়ে দেখি, সবই যেন এক দুঃখের সুরে ভরপূর হয়ে উঠতে চাইল। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানমান দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যে কোন্ অতল তলে তলিয়ে যেতে বসেছে, আমাদের মানবাত্মা যে কিরূপে নিঃস্ব ও নিঃসহায় হয়ে পড়েছে তা'রই দু'চারটা নিবেদন করতে মাত্র প্রয়াস পেলাম। জাতীয় জীবনের অন্ধকারের মধ্যেও আমরা যে আশার রেখাটী ক্ষীণভাবে উদ্ভাসিত রাখার চেষ্টা করি, তা'ও একটু বলেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের প্রচেষ্টায় আমরা আবার

মানুষ হয়ে উঠব, দেশের ও দশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সম্যক ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারব এই কথাটা ব'লে নেমে এলাম। করতালি আধ ঘণ্টা চলল। তারপর এই ছাত্রছাত্রীরা আমাকে সাড়ম্বরে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তা'রা মার্কিণ, আইরিশ, জার্ম্মাণ ও রুশ অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সবাই কঞ্চির সাহায্যে খাচ্ছিল। আমি তা' পারি না দেখে একজন উৎসাহী ছাত্র আমাকে কঞ্চির দ্বারা খাওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিল। সে হেসে হেসে বলল, "এই হিন্দু বিদেশী, এখন সমগ্র চীনজাতির ছোট ভাইয়ের মত। এ'কে আমাদের সকলেরই যথাশক্তি সহায়তা করা প্রয়োজন।" সামান্য উক্তি হ'লেও এটী আমার মনের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছে তা' সহজে আর মুছে যেতে পারে না। খাওয়ার পর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরের দিন নদী পার হয়ে ওপাড়ের বিশ্ববিদ্যালয়টী দেখতে গেলাম। সেখানেও ছাত্রেরা আমাকে না খাইয়ে ছাড়ল না। খাওয়া হয়ে গেলে অনেক ছাত্র—কেউ টেবিলের চারি দিকে ব'সে, কেউ দাঁড়িয়ে—ভারতের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল। একজন ইংরেজ অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। তিনিই কতকটা সভাপতির কাজ করেছিলেন। সাধ্যমত চীনা ছাত্রদের ভারত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা মেটাবার চেষ্টা করলাম। সর্ব্বশেষে তা'রা প্রশ্ন করল হংকং থেকে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ ক'রে চীন সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পেরেছি। কৃষ্টি ও দৃষ্টির দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের কতখানি ঐক্য উপলব্ধি করতে পেরেছি তা' তা'দের বললাম। এশিয়ার দুটী প্রাচীন দেশের সুখ-সুবিধার এবং দুঃখ-অশান্তির ছবিও একটা এঁকে ধরলাম। তারতম্য কোথায় কিরূপ—অন্ততঃ আমি দেখতে পাই—সেটাও ব'লে দিলাম। সভা ভঙ্গ হ'ল। ইংরেজ অধ্যাপকটী আমাকে একটু এগিয়ে দিতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে আলোচনার ভিতরে রাজনীতি যেন যথাসাধ্য বাদ দিয়ে চলি এই পরামর্শ তিনি দিলেন। কারণ এতে পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে। আরও সাবধান ক'রে দিলেন যে জাপানীদের সম্বন্ধে যেন কোন প্রকার আলাপই না করি। চীনে জাপান-বিদ্বেষ বড়ই তীব্র। কোন প্রকারে সে সম্বন্ধে কথা ব'লে ফেললে বা জাপানীদের সম্বন্ধে

চীনাদের মনের মত কথা না বলতে পারলে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে। ফেরীতে উঠিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সাহেব বিদায় নিলেন।

এবার ক্যাণ্টন ছাড়ার পালা। ক্যাণ্টন হ'তে চাংসা যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সঙ্গে যে মানচিত্রটী এনেছিলাম তা'তে রাস্তার বিশেষ ছক কেটে উঠতে পারলাম না। স্থানীয় এক বইয়ের দোকানে গিয়ে কোয়াণ্টাং প্রদেশের একখানা চীনা মানচিত্র কিনে আনলাম। 'পলিটিক্যাল' আফিসে গিয়ে পথে কিরূপ পরিস্থিতি পাব তা'র খোঁজ নিলাম। শুনলাম কমিউনিষ্টদের ভয়ই প্রধান, ডাকাতদেরও কম ভয় নাই। তবে ক্যাণ্টন থেকে তের মাইল পর্য্যন্ত নিরাপদ, তারপর সবই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। চীন দেশে বন্য জীবজন্তুর কোন ভয়ই নাই। কারণ চীনারা সব খেয়ে শেষ করেছে। সাপই হোক, বাঘই হোক, তা'কে কেটে কড়াতে চড়াবেই। চীনারা খায় না এমন কোন মাংস নাই।

ক্যাণ্টনে এসে এক জোর গুজব শুনলাম। কমিউনিষ্টরা চাংসা দখল ক'রে বসেছে। তা'র জন্য অবশ্য তেমন চিন্তিত হই নাই। তবে স্থানীয় এক কাগজে দেখলাম, দু'জন পোল্যাণ্ডবাসী পর্য্যটক পথে না খেতে পেয়ে মারা পড়েছে। একজন ইংরেজ পর্য্যটককে চীনারা মাটির নীচে পুঁতে বধ করেছে। মনটা একটু দমে আসছিল, তাই বিকালে এক সিনেমায় চীনা ফিল্ম দেখতে গেলাম। তা'দের সামাজিক নাটকগুলি বেশ চিত্তাকর্ষকই হয়। এছাড়া কলাকৌশলও বোধ হয় ভারতের থেকে একটু উন্নত। সিনেমার চীনা ম্যানেজার খুবই আপ্যায়িত করলেন। প্রবেশমূল্য তো নিলেনই না, উপরন্তু চা ও এক টিন ভাল চীনা সিগারেট উপহার দিলেন। সেখানেই 'ক্যাণ্টন সান' নামে একখানা ইংরেজী দৈনিকের এক সংবাদ-দাতার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি আমাকে ঠিকানা দিয়ে তাঁ'দের আফিসে যেতে বললেন। নির্দ্ধারিত সময়ে আফিসে গেলাম। চীনা সম্পাদক মহাশয় নানা বিষয়েই আলাপ-আলোচনা করলেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, চীনে যে চোর ডাকাত নাই তা' নয়, তবে পর্য্যটকের তা'তে ভয় করা বিধেয় নয়। কমিউনিষ্টরা অন্য মতবাদীদের হয়তো নির্ম্মম হস্তে নিষ্পেষণ করতে পারে, কিন্তু পর্য্যটকদের আঘাত করার কোন হেতুই নাই। তাঁ'র সঙ্গে আলাপ ক'রে কমিউনিষ্ট

আতঙ্ক অনেকখানি দূর হয়ে গেল। হংকংয়ের এক চীনা কোম্পানী তাঁ'দের সব শাখা থেকেই রুটি, চিনি, দুধ, মাখন ও মধু বিনামূল্যে দেওযার পরওয়াণা দিয়েছিলেন। সেই আদেশপত্রের বলে তাঁ'দের ক্যান্টন শাখা হ'তে যতখানি খাদ্য বইতে পারি অর্থাৎ পাঁচটী রুটি, এক শিশি মধু, এক টিন মাখন, দু'পাউণ্ড চিনি এবং দুটী জমাট দুধের কৌটা সঙ্গে নিলাম।

চাংসা অভিমুখে

প্রাতে চারটের সময় ক্যান্টন ছেড়ে রেল লাইন ধ'রে লখচাংয়ের পথে অগ্রসর হলাম। লাইনের পাশে পাশে বেশ সুন্দর পায়ে হাঁটার রাস্তা। পঁচিশ মাইল পর্য্যন্ত জোরে সাইকেল চালাবার পর হঠাৎ সাইকেলটা ফুটা হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে থেমে মেরামতে মন দিলাম। কতকগুলি চীনা পল্লীবালক আমার কার্য্যে সহায়তা করার জন্য এসে জুটল। তা'রা ইসারা ক'রে আমায় স'রে বসতে বলল। যন্ত্রপাতি নিয়ে তা'রা কয়েকজন তাড়াতাড়ি সাইকেলটা মেরামত তো করলই, উপরন্তু খুব ভাল ভাবে পরিষ্কারও ক'রে দিল। একটা ছেলে কিছু খাব কি না তা' ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল। সম্মতি পেয়ে আমাকে সাড়ম্বরে তা'দের গ্রামে নিয়ে একটা বড় বাড়ীতে বসাল। এক বৃদ্ধ এসে নমস্কার ক'রে চা খেতে দিলেন। ইতিমধ্যে ছেলেরা অন্ততঃ পনের জন খেতে পারে এমন একটা লম্বা টেবিলে খাবার সাজাতে লাগল। খাদ্যসামগ্রীর ভিতরে ছিল রাই শাকের ঝোল, শূকর মাংসের তরকারি, ডিম ভাজা ও ফল। আমি হাত ধুয়ে একটা ডিশে রাই শাকের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে আরম্ভ করলাম। গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় জন দশ-বার বৃদ্ধও টেবিলে ব'সে খেতে লাগলেন। খবর পেয়ে গ্রামের সব লোক এক হিন্দুকে দেখবার জন্য ভেঙ্গে পড়ল। খাওয়া হ'লে আমাকে অতি সমাদরে এক বিছানায় বসিয়ে দুটী ছেলে উৎসাহভরে আমার জুতা-মোজা খুলে দিল। তারপর একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ করলে আমি শুয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে কাউকেও আর দেখলাম না। কাছেই একটা টবে জল দেওয়া ছিল। টবের জলে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। সন্ধ্যার পরেই আবার লোকসমাগম আরম্ভ হ'ল। এবার মালয়-জানা এক চীনাকে গ্রামের লোক সঙ্গে ক'রে এনেছে। চীনাটী অল্পবিস্তর ইংরেজীতেও কথা বলতে পারেন। তিনি আমার সব খবর নিয়ে তা'দের গুছিয়ে বলতে লাগলেন এবং তা'দের জিজ্ঞাস্য আমায় বুঝিয়ে দিলেন। বৃদ্ধরা ভগবান শাক্যমুনির সম্বন্ধেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বৌদ্ধ দর্শন আয়ত্ত না থাকায় তখন

একটু অনুশোচনাও হয়েছিল। যা' হোক তাঁ'দের কৌতূহল মেটাবার জন্য যথাসাধ্য জবাব দিয়ে গেলাম। রাত্রে অতি সমাদর ক'রে আমায় খাওয়ান হ'ল। পরের দিন প্রাতে রওনা হবার সময় বৃদ্ধরা দুই তোড়া চীনা ডলার এনে আমার হাতে দিলেন। তখন টাকার তেমন টান না থাকায় তাঁ'দের ধন্যবাদ দিয়ে তোড়া দুটী ফেরত দিলাম এবং সবাইকে নমস্কার ক'রে পথ ধরলাম।

আবার সেই রাস্তা, চলেছি তো চলেছি। প্রায় ১১টার সময় একবার থেমে খেয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হ'ল। রাস্তার পাশে এক গ্রামে ঢুকে সামনে একটা বাড়ী পেলাম। তা'র দরজায় সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে গৃহস্বামীকে চীনা ভাষায় লেখা একটা কার্ড দিলাম। লোকটী তা' প'ড়ে আমায় বসিয়ে ভাত ইত্যাদি খাওয়ালেন এবং তা'র একটী ছেলের হাতে কার্ডখানা দিয়ে তা'কে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই গ্রামশুদ্ধ লোক হিন্দু পর্য্যটককে দেখতে হাজির হ'ল। তারপর সকলের সঙ্গে ইঙ্গিতে ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্যাণ্টনী ভাষায় আলাপাদি ক'রে বিদায় নিলাম। এক বৃদ্ধ জোর ক'রেই কতকগুলি পানিফল আমার ঝোলায় পূ'রে দিলেন।

সারা দিন সাইকেলে চ'লে সন্ধ্যার সময় ক্যাণ্টন-সিউচো রেলপথের এক ছোট ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারের অতিথি হলাম। ভদ্রলোক ইংরেজী, জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় বেশ কথা বলতে পারেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ হ'ল। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠল, কেন এই পথে এসেছি। তা'র উত্তরে বললাম, সকলের নিষেধ অনুসারে কমিউনিষ্ট ও ডাকাতদের ভয়ে ফুকিন ও চিকিয়াং প্রদেশ দিয়ে অগ্রসর না হয়ে এই পথ ধরেছি। তখন তিনি অনুযোগ দিয়ে বললেন, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সংস্কারকামীদের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে কমিউনিষ্ট আখ্যা দিয়ে যে মিথ্যা প্রচার হয় তা'রই ফলে আমরা চীনা জাতির প্রকৃত সংস্কারকামীদের ভুল বুঝি। প্রায় ৮১ মাইলের উপরের পথ অতিক্রম করার পর আমার কমিউনিষ্ট আতঙ্ক কতখানি রয়ে গেছে তা' তিনি একটু শ্লেষ ক'রে জানতে চাইলেন। জবাব দেওয়ার মত আমার কিছুই ছিল না। শুধু বিদায় নিয়ে পরের দিন আবার পথ ধরলাম।

ক্যাণ্টন থেকে সিউচো পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল। আমার সিউচো পৌঁছতে প্রায় পনের দিন লাগল। পথে কখন কখন শ্রমজীবীদের আতিথ্য

গ্রহণ করতে হয়েছে। যেখানেই উঠেছি সেখানেই খাওয়া-শোওয়ার যথাসম্ভব ভাল ব্যবস্থা পেয়েছি। ক্যাণ্টন থেকে শিচিওয়াং পর্য্যন্ত অনেক গ্রামেই বড় বড় বাড়ীগুলি ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত দেখলাম। আগেই শুনেছিলাম দস্যুরা এই সব অঞ্চলে হানা দেয়। ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি কি তা'রই চিহ্ন? পথে এক গ্রাম্য স্কুল দেখলাম। শিক্ষকের সামনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—কেউ স্বর ক'রে, কেউ বা মনে মনে—মনোযোগ দিয়ে পাঠাভ্যাস করছে। বড় বড় ছাত্রছাত্রীদের আবার এদের পড়ায় খুবই সাহায্য করতে দেখলাম। এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে খৃষ্টান মিশনারীদের আড্ডা দেখে তা'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। প্রথমেই, তা'রা প্রশ্ন করল যে আমি এত দেশ থাকতে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে পরিভ্রমণ করার জন্য কেন বের হয়েছি। দেশটা নাকি খুবই খারাপ, তবে পাদ্রীরা এতদঞ্চলে 'আলোক' দান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। পথে কমিউনিষ্টদের খপ্পরে প'ড়ে কষ্ট পেয়েছি কি না তা'ও তাঁ'রা জানতে চাইলেন। তারপর হুনান প্রদেশের দিকে অগ্রসর হ'তে পুনঃপুনঃ নিষেধ করলেন। সেদিকটা নাকি কমিউনিষ্ট ও দস্যুতে ছেয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট ও দস্যুতে পার্থক্য কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাঁ'রা অভিমত দিলেন, কমিউনিষ্টদের বেশীর ভাগ দস্যুতা ক'রেই চলে। মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বললাম, "এত পথ এসেছি, দস্যু বা কমিউনিষ্টদের কোন নির্য্যাতনেরই সাক্ষাৎ পাই নাই, যদিও বরাবরই শুনছি এসব অঞ্চল বড়ই বিপজ্জনক।" একথা শুনে দুই একটী পাদ্রী একটু উষ্ণ হলেন। শুধু তা'ই নয়, তাঁ'রা আমাকেও ভারত হ'তে বিতাড়িত কমিউনিষ্ট ব'লে সন্দেহ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত সিউচো এলাম। ছোট একটা নদীর উপর সরু কাঠের পুল পার হয়ে সিউচো শহরে প্রবেশ করলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

সিউচো

শহরে ঢুকতেই একটা জাপানী-বিরোধী শোভাযাত্রা দেখলাম। মিছিলে ছিল সবই শিক্ষিত যুবক। হরেক রকমের 'প্ল্যাকার্ড' নিয়ে তা'রা 'শ্লোগ্যান্' দিতে দিতে চলছিল। একটা প্ল্যাকার্ডে দেখলাম, এক জাপানী

একটী চীনাকে মাটিতে ফেলে তা'র বুকের উপর ব'সে লম্বা দা দিয়ে তা'র গলা কাটছে। আর একটায় এক গাদা চীনা দরিদ্রের উপর একটা বড় কামান দেগে জাপানী পণ্য চাপিয়ে দিবার বিপুল প্রয়াস চলেছে। এই রকম অনেক চিত্রই তা'রা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং সবটাতেই চীনা হরফে চিত্রগুলির তাৎপর্য্য লেখা ছিল। শোভাযাত্রার পরে একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে এক সরু গলি দিয়ে একটা থানায় গেলাম। সিউচো শহরে সরু গলি, ছোট ছোট ঘর ও বাড়ী সবই ভেঙ্গে পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও বাড়ীগুলি ঝকঝকে তকতকে করার জন্য চেষ্টা হচ্ছিল। থানায় আমাকে একজন কি যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তা'র একটী কথাও বুঝলাম না। আমার মোটা স্বাক্ষরের বইখানা তা'র হাতে দিয়ে "হিন্দু ইয়াংসি সাই কাই" ব্যাজটী দেখালাম। সে আমাকে এক পুলিশ কর্ম্মচারীর কাছে নিয়ে হাজির করল। কর্ম্মচারীটী আমার ছাড়পত্র ও 'ভিসা' ভাল ক'রে দেখে একজন লোক দিয়ে আমাকে শহরের সব চেয়ে ভাল হোটেলটীতে পাঠিয়ে দিলেন। হোটেলের উপরতলার একটা মস্তবড় বারান্দা নদীর উপর যেন ঝুঁকে পড়েছিল। তা'রই সংলগ্ন একটী ভাল ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। ম্যানেজার বেশ পরিতোষসহকারে খাওয়ালেন এবং হাতমুখ মুছবার জন্য গরম জলে ভিজান তোয়ালে দিয়ে যথাসাধ্য আদর-আপ্যায়ন করলেন।

পরের দিন শহরে বেড়াতে বের হলাম। পথেঘাটে অনেক লোকের সঙ্গেই অল্পবিস্তর আলাপ হ'ল। স্থানীয় স্কুলে গেলাম। বহু ছাত্রছাত্রী মনোযোগ দিয়ে পড়ছে দেখলাম। চীন দেশে মেয়েদের পৃথক বিদ্যালয় তেমন নাই, ছেলেদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে তা'রা পড়াশুনা করে। বিকাল বেলায় চীনা নৌকায় নদীতে বেড়াতে গেলাম। এক চীনা যুবতী আমার মাঝি হ'ল। ঘণ্টা দুই বেড়িয়ে ফিরে এলাম, ভাড়া দিলাম অর্দ্ধ ডলার। হোটেলে যখন এক সরু গলি দিয়ে ফিরছি তখন একটী চীনা বালক আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইল। দশটা চীনা পয়সা তা'র হাতে দিয়ে চলে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ সে শক্ত ক'রে আমার হাত চেপে ধরল এবং একটা ছুরি বের ক'রে আমার টাকার ব্যাগ দাবী করল। অমনি তা'কে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়েই তা'র ঘাড়ে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম। ছুরিটা হাত থেকে

খ'সে পড়ল। সেও অমনি দৌড় দিয়ে অন্ধকার গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। ম্যানেজার শুনে বললেন, বড় গুণ্ডার হাতে পড়ি নাই ব'লে সশরীরে ফিরতে পেরেছি। আশ্চর্য্য এই যে পরে অনেক বিখ্যাত দস্যুর হাতে পড়েছি, কিন্তু কোথাও তো শারীরিক আঘাত পাই নাই! বরং হিন্দু পর্য্যটক শুনে তথাকথিত ডাকাত ও গুণ্ডা আমাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যই করেছে।

পরের দিন প্রাতে লখচাংয়ের পথে আরও অগ্রসর হ'তে লাগলাম। ক্যাণ্টন থেকে ২৫০ মাইল দূরে সিউচোতে এসেছি। এখনও লখচাং অনেক দূরে প'ড়ে আছে। দুপুরে একটা গ্রামে খেয়ে নিলাম। যে বৃদ্ধের বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন করলাম তিনি সযত্নে আমাকে তো খাওয়ালেনই, উপরন্তু স্নেহপরবশ হ'য়ে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁ'র ভাষা বুঝি নাই, কিন্তু স্নেহকণাটুকু আজও বুকের ভিতর দাগ কেটে ব'সে আছে। বিকালের দিকে বড় বড় পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী জনশূন্য পথে সাইকেলটা ফুটা হয়ে গেল। তা' মেরামত না ক'রে একটা ঝাঁকড়া গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পশ্চিমে যখন তপনদেব রক্তিমাভ রশ্মি ছড়িয়ে বিদায় নেওয়ার পালা সুরু করেছেন, তখন একটা ছেলের ধাক্কায় জেগে দেখি, এক যুবতী অতি মনোযোগসহকারে আমারই সাইকেল মেরামতের কাজে লেগে গেছে। অল্পক্ষণ মধ্যে সাইকেলটা কার্য্যক্ষম হয়ে গেল এবং তা'দের দুই জনের সঙ্গে তা'দের গ্রামে রাত্রিটা কাটাতে চললাম। গ্রামে পৌছতেই একটা সাড়া প'ড়ে গেল। সবাই দেখতে এল। বৃদ্ধের দল আশীর্ব্বাদ করলেন, বালকের দল আনন্দে হৈ-চৈ জু'ড়ে দিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা হ'ল, বিশ্রাম ক'রে নিলাম। সকলেরই মুখে "হিন্দু সাই কাই" অর্থাৎ হিন্দু দেশভ্রমণকারী। রাত্রে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হ'ল। গ্রামের গণ্যমান্য সকলেই একত্র এক টেবিলে ভোজে ব'সে গেল।

আহারাদির পর বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। হিন্দুস্থানের মর্ম্মকথা কি তা' তা'দের জানালাম এবং ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় যথাশক্তি বললাম। এক্জন দোভাষী সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আমার কথা বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটী

ইউরোপ-ফেরতা, অতি চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন। তিনি বললেন, "আমরা আমাদের দেশের উন্নতির একটা ব্যবস্থা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অনেক রীতি আমরা পরিবর্জ্জন ও পরিশোধন করতে চাই, তাই ভূতপূজা উঠিয়ে দিয়েছি। আমরা গ্রাম পরিষ্কার রাখা বাধ্যতামূলক করেছি। আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়তে বাধ্য করেছি। চক্রবৃদ্ধি হারে স্থদ নেওয়া নিষিদ্ধ, অলস জীবন যাপন শাস্তিমূলক করেছি, আমাদের সকলেই কাজ করতে বাধ্য। কাউকেও বেশী জমি চায করতে দেওয়া হয় না। সর্ব্বশেষে, কোন মিশনারীকে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করতে দেই না। তা'রা এসে আমাদের কয়েকজনকে খৃষ্টান ক'রে এমন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ফেলে যে আমাদেরই দেশের খৃষ্টানরা আর চীনা থাকে না বা থাকতে চায় না। তা'রা 'ক্যাথলিক' বা 'প্রটেষ্টাণ্ট' হয়ে যায়। আবার এই সব মিশনারীদের প্ররোচনায় মেরুদণ্ডহীন নান্‌কিন্ সরকার আমাদের কমিউনিষ্ট ব'লে ঘোষণা করে। এখানে কমিউনিষ্ট ব'লে সাব্যস্ত হওয়া আর যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে ঘাতকের অপেক্ষায় থাকা একই কথা।"

ভোর হয় হয় এমন সময় যাত্রা স্থরু করলাম। রাস্তাটা বেশ ভাল ছিল। খাওয়ার জন্য কোন গ্রামে ঢুকে সময় নষ্ট না ক'রে, পথেই এক স্থানে ঝোলা থেকে রুটি, মাখন, মধু প্রভৃতির সদ্ব্যবহার ক'রে নিলাম। সারা দিনটাই সমানে সাইকেল চালিয়ে সন্ধ্যায় এক গ্রামে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। পরের দিনও পথে কোথাও থেমে খেতে গেলাম না, ঝোলার সম্বলেই কাজ চালিয়ে নিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে লখচাং পৌঁছলাম। শহরে ঢুকতেই কয়েকটী নিষ্কর্ম্মা ছোকরার পাল্লায় প'ড়ে গেলাম। তা'দের মধ্যে একজন অল্পবিস্তর 'পিজিন ইংলিস্' * বলতে পারে। সে-ই আমাদের মধ্যে দোভাষী হ'ল। ছোকরাদের জেরায় গলদঘর্ম্ম হয়ে যখন নিতান্তই হাল ছেড়ে ব'সে পড়লাম, তখন তা'দের মধ্যে একজন দয়াপরবশ হয়ে একটু চা আনিয়ে সেই রাস্তার উপরেই খেতে দিল। তা'দের অনুসন্ধিৎসা কথঞ্চিৎ প্রশমিত

* চীনা ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কথোপকথনে ব্যবহৃত একপ্রকার অসাধু ইংরেজী ভাষা। এই ভাষাটী চীনের অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে।

হ'লে তা'রাই আমাকে থানায় নিয়ে পরিচয়াদি করিয়ে দিল। এছাড়া তা'দের সেরা হোটেলে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করল। এর জন্য সব খরচই তা'রা বহন করবে এই কথা ম্যানেজারকে বিশেষ ক'রে ব'লে রাত্রির মত তা'রা বিদায় নিল।

সকালে উঠে দেখি লোকে লোকারণ্য। ভীড়ের মধ্যে ২।৩ জন চীনা 'জেন্দারম' (সশস্ত্র পুলিশ) ছিল। তা'রা আমায় দেখেই সামরিক কায়দায় এগিয়ে এসে মালয় ভাষায় সম্ভাষণ জানাল। সিঙ্গাপুরে অনেক দিন থাকায় ঐ ভাষাটা একরকম ভালই আয়ত্ত হয়েছিল। কাজেই আমাদের আলাপ দ্রুতই জ'মে উঠল। দু'এক কথা আলোচনা হ'তেই জানা গেল লখচাং এখন "আসল" কমিউনিষ্টদের দখলে এসেছে। আমাকে তা'রা প্রথমে তা'দের 'কর্ণেলের' কাছে নিয়ে যেতে চাইল। পরে আমায় সবই দেখিয়ে দেবে এই আশ্বাস দিল। চা পানাদি সেরে তা'দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক পথঘাট মেরামত হচ্ছে, পুরাতন বাড়ী ভেঙ্গে নূতন বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে, সরু গলিগুলি আরও চওড়া ও বড় করা হচ্ছে। এই রকম অনেক উন্নতির প্রচেষ্টা প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়ল। পথে চলতে চলতে তা'দের কাছে শুনলাম, প্রত্যেক সিপাহী মাসে ১০ ডলার ক'রে পায়। তা'র থেকে খোরাকী খরচ বাবদ ৬ ডলার কাটা যায়, বাকী ৪ ডলার চা, সিগারেট প্রভৃতির জন্য খরচ হয়। মোটের উপর দক্ষিণ চীনে সিপাহীরা বিনা বেতনেই কাজ করে বুঝলাম। কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে লখচাং শহরটা দেখবার জন্য দোভাষী চাওয়াতে তিনি দোভাষীর কাজে উপযুক্ত সিপাহীদের ছুটি দিলেন। আমাকে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া এবং যতদিন লখচাংয়ে আছি ততদিন আমার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখাই তখন তা'দের কাজ হ'ল। তা'রা আমায় শহর দেখা হ'তে নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ পর্য্যন্ত দিল। এমন কি, কি ক'রে বিচার হয়, কেন শাস্তি হয় এসবও ব'লে দিতে লাগল।

শহরের উপকণ্ঠে পাদ্রীদের এক প্রতিষ্ঠান ছিল, সেখানেও গেলাম। সিপাহীদের মারফৎ প্রাথমিক পরিচয়াদি হ'লেই এক পাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ ক'রে জানতে চাইলেন, কি ক'রে আমি এই কমিউনিষ্টদের খপ্পরে এসে

পড়লাম। যখন শুনলেন, ভূপর্য্যটনে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি, তখনই তিনি আমাকে স্থান পরিত্যাগের পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, "বিপদাপদ এই সব স্থানে পদে প্রদে। কথায় কথায় কমিউনিষ্টরা গুপ্তচর ব'লে দেশী-বিদেশীদের কোতল করে, যে কোন সময়ে বিনা ওজরে খানাতল্লাসী ক'রে যথাসর্ব্বস্ব বেমালুম কেড়ে নেয় ইত্যাদি। তা'রা একেবারেই অভিশপ্ত জীব, ধর্ম্ম কোন প্রকারে মানতে রাজী নয় এবং বিদেশীদের সেবা মোটেই বরদাস্ত করতে চায় না। মিশনারীদের শুভ প্রচেষ্টায় তা'রা অনুক্ষণই বাধা দিতে উদ্যত এবং তাঁ'দের কেমন ক'রে তাড়াবে তা'রই চেষ্টা তা'রা করে।" বোধ হয় এই রকম প্রচারের ফলে আমরা বিদেশে চীনা কমিউনিষ্টদের একটা মারাত্মক জীববিশেষ ব'লে ঠাওর ক'রে নিই এবং এই সব চীনাদের সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা আতঙ্কজনক ধারণার সৃষ্টি করি।

ওখান থেকে ফিরে এলাম। আমার সঙ্গে মিশনারীদের তেমন আত্মীয়তা জমে নাই শুনে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট একটু খুসী হলেন। তাঁ'রা কিরূপ বিচার করেন তা' দেখবার জন্য নিমন্ত্রণও করলেন। শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখে নেওয়া গেল। স্থানীয় সৈন্যাবাসও দেখবার সুযোগ পেলাম। সিপাহীদের খাওয়া-থাকার বেশ ভাল বন্দোবস্তই দেখলাম। আমাদের দেশের গোরা সৈনিকের ব্যবস্থাদির সঙ্গে অনায়াসে তা'র তুলনা করা যেতে পারে। রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়া গেল। আমরা কেউ কা'রও কথা বুঝতে পারি নাই, তথাপি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। প্রাতে বিচারালয়ে গেলাম। দেখলাম, এক সৈনিক কোনরূপ আদেশ না পেয়েও একজন শহরবাসীর বাগান থেকে কিছু সুস্বাদু ফল পেড়ে খেয়েছে ব'লেই বিচার চলছে। বাড়ীর গিন্নী নিজেই হাত-পা নেড়ে তাঁ'র মোকদ্দমা পেশ করছিলেন। ভাবে বুঝলাম, খাওয়ার চেয়েও সৈনিকটী তাঁ'র জিনিষ নষ্ট করেছে বেশী। হাকিম সৈনিকটীর নিবেদন শুনে ভবিষ্যতের জন্য তা'কে সতর্ক ক'রে ছেড়ে দিতে চাইলেন। তারপর রমণীটী খুবই রেগে গিয়ে বক্তৃতা সুরু করল, "সিপাহীরা আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। তা' না ক'রে তা'রাই জোর-জবরদস্তি খাটিয়ে এর বাগানে ওর উঠানে হানা দিয়ে যা' পায় তা'ই খেয়ে ফেলছে। আজ ফল খাচ্ছে, কাল ডিম খাচ্ছে, এর পরে

মোরগ, শূকর সবই খাবে। তারপরে কি যে না করবে তা' কে জানে! এসব অব্যবস্থার যদি সুরাহা না করতে পারে, তবে গবর্ণমেণ্টের থেকেই বা লাভ কি?" ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট ,কাজেই জুরীদের মতামত নিয়ে সৈনিকটীকে দু'দিনের কারাবাসের হুকুম দিলেন।

ইয়েং-চি-সিয়েন

এবার আরও এগিয়ে যাওয়ার পালা। লখচাং হ'তে পিংসেক পর্য্যন্ত রাস্তা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে তৈরী করা হচ্ছে দেখলাম। পিংসেক থেকে ইচাং হয়ে চাংসা যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পরদিন প্রাতে পিংসেকের রাস্তা ধ'রে পথ চলা আরম্ভ করলাম। প্রায় সাড়ে বার মাইল যাওয়ার পর এক রাস্তার ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা। তাঁ'র সঙ্গে ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা হ'ল। তাঁ'র কাছেই শুনলাম, আর একটু এগিয়ে গেলে রাস্তার এত খারাপ অবস্থা যে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভবপর হবে না। কাজেই আবার লখচাংয়ে ফিরে এসে নৌকা ভাড়া করলাম। রফা হ'ল, পিংসেক পর্য্যন্ত চার ডলার ভাড়া দিতে হবে। পথের খোরাক মাঝিই দিবে। নৌকায় অনেক লবণ বোঝাই হ'ল। যাত্রীও ৫।৬ জন জুটল। বিকালে ছয়খানা নৌকা দল বেঁধে একসঙ্গে যাত্রা সুরু করল। আমাদের নৌকায় এক চীনা দম্পতি যাত্রী ছিল। তা'রা হংকং বেড়িয়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছিল। তা'দের কাছে শুনলাম, মাঝিরা পথে যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। তারপর বাধা দিলে টুকরা টুকরা ক'রে কেটে খরস্রোতা নদীতে ফেলেও দেয়। আমার কাছে বেশী অর্থাদি থাকলে যেন সঙ্গোপনে রাখি এই ব'লে তা'রা আমাকে সাবধান ক'রে দিল।

ইতিমধ্যে কাজ চলার মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা চীনা ভাষা শিখেছিলাম। মাঝিদের এক বাচ্চা সহকারীর সঙ্গে ভাব ক'রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কায়েম করার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু ভাব একটুও জমল না। শুনলাম, ছেলেটীও মাঝিদের চোরাই মাল, তখনও সে পোষ মানে নাই। একটু ভাব ক'রে কথা বলতে গেলেই সে কেবল কাঁদে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাব আর হ'ল না। সন্ধ্যা

হ'য়ে এল, নৌকা ছয়খানা একটা নির্জ্জন ঘাটে ভিড়ল। প্রত্যেক নৌকায় ৫ জন ক'রে বলিষ্ঠ মাঝি-মাল্লা ছিল। তা'দের মধ্যে বাছাই বাছাই ষণ্ডা গুণ্ডা গোছের ছয়জন মাঝি-মাল্লা বড় বড় কাটারী হাতে পাহারায় দাঁড়াল। ছয়টা নৌকার বাকি সব মাঝি ডাঙ্গায় উঠে রান্নার জোগাড় করতে লাগল। যাত্রীরা সকলেই পাড়ে এসে মাদুর পেতে ব'সে গেল। তারপর কেউ গল্পগুজবে, কেউ 'মাজাং' খেলায়, আর কেউ বা আমোদপ্রমোদে মেতে উঠল। রাত্রি একটু বাড়তেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ জন দশ বার মাঝি বড় বড় কাটারী হাতে আমাদের সব যাত্রীরই তল্লাসী করল। আমার কাছে এক দৈত্যসদৃশ মাঝি এগিয়ে আসতেই আমার টাকার ব্যাগটা তা'র হাতে দিয়ে দিলাম। ব্যাগে ৪ ডলার ৯০ সেণ্ট মাত্র ছিল। অন্যান্য চীনা যাত্রীদেরও তল্লাসী হ'ল, কিন্তু সামান্য টাকাই তা'রা পেল। যে টাকাটা পাওয়া গেল তা'তে ভাড়ার টাকাই ওঠে। এই ঘটনার পরই আবার সকলে মিলে এমন আমোদআহ্লাদ লাগিয়ে দিল যেন কিছুই ঘটে নাই। এই সব অঞ্চলে এইরূপ ঘটনা অতি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এইজন্য যাত্রীরা পূর্ব্বাহ্লেই টাকাপয়সা বেশ সামলে নিয়ে পথ চলে। মাঝিরা নাকি তা'দের এই মন্দ অভ্যাস সত্ত্বেও বেশী রোজগার করতে পারে না। এই ধরণের ঘটনা এতদঞ্চলে একপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। তাই এইরূপ ব্যাপারের পরও যাত্রী ও মাঝি সকলে মিলে বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতেই আমোদআহ্লাদ করে।

যথাসময়ে আহারাদি সমাপন করলাম। তারপর শোওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল। দু'দিন ক্রমাগত নৌকা চলার পর মাঝিরা এক দুপুরে এক বাজারের ঘাটে নৌকা লাগিয়ে বিশ্রাম নিল। আমি তীরে উঠে কাছেরই এক দোকানে গেলাম, কিন্তু কিছু না কিনে নৌকায় ফিরে এলাম। টাকা যে আমার কাছে ছিল না তা' নয়। প্যাণ্টের ভিতরে আমার ল্যাঙ্গট বরাবরই আঁটা থাকত। সেই ল্যাঙ্গটের ভাঁজে টাকা আর নোট সেলাই ক'রে রাখতাম। খালি হাতে ফিরতে দেখে আমাদের নৌকার মাঝি আমার কাছে এল। তারপর তা'র ভাড়া বাবদ ৪ ডলার রেখে বাকি সবই ব্যাগসমেত ফেরত দিল। অধিকন্তু বাজার থেকে এক প্যাকেট চীনা সিগারেট আনিয়ে উপহার দিল।

লুট ক'রে নিয়ে উপহারসমেত ফিরিয়ে দেওয়া, এটা আমার কাছে একেবারে নূতনই ঠেকেছিল। বিকালে আবার নৌকা ছাড়ল। এখানে মাঝিরা কেবল দিবাভাগেই নৌকা চালায়। আর তা'রা সন্ধ্যায় কিম্বা জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত্রির প্রথম প্রহরে ঘাটে অঘাটে যেখানেই হোক নৌকা ভিড়িয়ে থাকে। সকলেই তীরে নেমে রান্নাবান্না এবং খাওয়াদাওয়া সারে। তারপর খেলাধূলা ও গল্পগুজব ক'রে কেউ নৌকায়, কেউ বা তীরেই শুয়ে ঘুমায়। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দেয়।

সপ্তম দিন দুপুরে আমরা পিংসেক পৌঁছলাম। নৌকার যাত্রীদের অনেকের সঙ্গে যেন ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। একসঙ্গে থাকার জন্য কয়েকজন অনুরোধও করল। একটা সরু অন্ধকার গলি দিয়ে তিন তলা এক হোটেলে ওঠা গেল। দিনদুপুরে গলি যে এরূপ অন্ধকার হ'তে পারে, তা' কল্পনা করা অসম্ভব। বারাণসীর বিখ্যাত সরু গলিও খাস চীনের বহু অলিগলি অপেক্ষা অনেক ভাল। পিংসেক শহরটা বেশ ছোট। আমার হোটেলে ওঠার আধঘণ্টার মধ্যেই হিন্দুস্থানের এক হিন্দু পর্য্যটনে এসেছে এই খবরটা প্রচারিত হয়ে গেল। পুলিশের স্থানীয় কর্ত্তা, শহরের মেয়র, স্কুলের শিক্ষক এবং বহু লোকই দেখা করতে এলেন। সাইকেলে ইচাং হয়ে চাঁংসা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শুনলাম, পিংসেক থেকে চাঁংসায় দু'দিনে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। আরও জানলাম, হেঞ্চফোঁ গেলেই চাঁংসার ভাল রাস্তা পাওয়া যাবে, ইচাং পর্য্যন্ত আর যেতে হবে না। কিন্তু হেঞ্চফোঁ যাওয়ার পথে ইয়েং-চি-সিয়েন পর্য্যন্ত রাস্তাটুকু নাকি নিরাপদ নয়। তবে ইয়েং-চি-সিয়েন পৌঁছতে পারলেই আর বিপদের আশঙ্কা নাই এবং রাস্তাও ক্রমশঃ ভাল পাব।

শহরে দু'দিনই খুব আদরযত্ন পেলাম। আমার আপ্যায়নের বহর দেখে নৌকাযাত্রীদের চারিজন লোকও আমার সঙ্গী হ'বার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল, আমরা পাঁচ জন মিলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চীনা-দম্পতি, দুইজন চীনা পুরুষ ও আমি একত্র হেঞ্চফোঁ পর্য্যন্ত যাব। কিন্তু মুস্কিল এই যে "আমার জীবনের জন্য চীন সরকার দায়ী হবেন না" এই কথাটুকু আমি যতক্ষণ না লিখে দেই তদবধি উক্ত বিপজ্জনক রাস্তায়

স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা আমাকে অগ্রসর হ'তে দিবেন না। রাস্তায় দস্যুদের উপদ্রবের দরুণ চীন সরকার আমার জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গররাজি। থানায় গিয়ে একটা চীনা ভাষার ফর্ম্মে ইংরেজীতে লিখলাম —"আমার জীবনের জন্য চীন সরকার দায়ী নন। এই পথে কোন বিপদ ঘটলে ভারতের বৃটিশ সরকার চীন সরকারকে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। আমার প্রাণহানি হ'লে কোন আত্মীয়-স্বজন আমার জন্য বৃটিশ সরকারের মারফতে চীন সরকারের নিকট কোনরূপ খেসারত দাবী ক'রতে পারবেন না।" লেখার বিষয় তাঁ'রাই ব'লে দিলেন। তারপর নাম সই ক'রে, হাতের দশ আঙ্গুলের ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পাই। সাইকেলটা একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুইজন লোক ঠিক করলাম। ভাড়া হ'ল মোট ৫ ডলার। পিংসেক থেকে তৃতীয় দিন অতি প্রত্যুষে রওনা হলাম। আমাদের দলে লোক হ'ল সর্ব্বশুদ্ধ আট জন।

সর্পিল রাস্তাটী পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছড়ান। চারটা ছোট-বড় পাহাড় পার হয়ে গ্রামে ঢুকলাম। গ্রামটায় মাত্র কয়েক ঘর গৃহস্থের বাস। ঘরের চালে তখনও তুষার জ'মে আছে। এই গ্রামের বাসিন্দা সবই গরীব। কিন্তু গরীব হ'লে কি হয়, তা'দের উদ্দীপনা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। অনেকেই জীর্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত ক'রে আমাকে দেখবার জন্য এল। তা'দের দীন-দরিদ্র অবস্থা দেখে বড়ই দুঃখ হ'ল। হাঁস, মুরগী, ডিম অত্যধিক সস্তা। তাই দলের লোক মহানন্দে রান্নাবান্নায় লেগে গেল। আমি ইতিমধ্যে গ্রামে বেড়াতে বের হলাম। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা ছোট ঘরে জনকয়েক সিপাহীকে ধূমপানে ও গল্পে মশ্‌গুল দেখলাম। কিন্তু অন্যান্য স্থানে সিপাহীদের সঙ্গে সর্ব্বদাই যেমন বন্দুক দেখেছি এখানে তেমনি তা'র একান্তই অভাব লক্ষ্য করলাম। তা'দের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে গিয়ে সাড়াও তেমন পেলাম না। সবাই কিন্তু আমায় বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করছিল। ফিরে এসে সঙ্গীদের কাছে সিপাহীদের কথা বলতেই তা'দের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল। তা'রা খুব তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া সেরেই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছু দূর যেতেই একটু শিলাবৃষ্টির পরে সূতার মত তুষার পড়তে লাগল।

পাহাড়ের দুই পাশই সেগুনবনে ঢাকা—তা'র কোলে কোলে যে ঢালু পিছল পথ ছিল তা' দিয়ে আমরা অতি ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটা গ্রামে আমরা পৌছলাম। লোকজন বড় কেউ নাই। একটা স্থান পছন্দ ক'রে রান্না-খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে নিলাম। সঙ্গীরা রাত্রেই গ্রাম ছেড়ে অগ্রসর হ'তে চাইল। এই শীতের মধ্যে পিছল পথে অন্ধকারে আর না এগিয়ে আমি বিশ্রাম নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলাম। সঙ্গীরা বলল যে বনেজঙ্গলে প্রাণ বাঁচান বরং সম্ভব, কিন্তু এসব গ্রামে আদৌ সে আশাটুকু নাই। কাজেই রাত্রে আমরা কোথাও একটা জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার ভরসায় গ্রাম ত্যাগ করলাম।

রাত্রি প্রায় ১০॥টায় আমরা জঙ্গলের খুব একটা অন্ধকার ঘুপসি স্থানে জিনিষপত্রাদি রেখে স্যাঁৎসেতে জমিতেই শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ শুয়েছি ঠিক নাই। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে দেখি জন পঞ্চাশ লোক আমাদের ঘিরে ফেলেছে। টিপবাতির আলোকে স্থানটা একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোন রকম চেঁচামেচি না ক'রে তা'রা আমাদের সকলকে সারবন্দী ক'রে দাঁড় করাল। আমাদের সারির প্রথমে ছিল একটী স্ত্রীলোক, তা'র ছোট মেয়ে, তারপর তা'র স্বামী। স্ত্রীলোকটীকে কি বলতেই সে তা'র টাকার ব্যাগ এগিয়ে দিল। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটীও তা'র দেখাদেখি টাকাকড়ি দিয়ে রেহাই পেল। তারপর তা'রা আমার সাইকেল-বাহক দুইজনকে তল্লাস করল। ওরা কিছুই দিল না, কারণ ওদের কাছে কিছু ছিলও না। সকলেই কিন্তু মাথা নত ক'রে সারিতে দাঁড়িয়ে রইল। শুনলাম, চীনা দস্যুদের মুখের দিকে তাকালেই তা'রা নাকি গুলী চালায়। এবার আমার পালা। আমার টাকার ব্যাগটা তা'দের দিয়ে দিলাম। তা'তে বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর সকলকে একখানা ক'রে আমার চীনা ভাষায় ছাপান পরিচয়পত্রও দিলাম। সেই পত্রগুলি সকলেই পড়ল, এছাড়া নিজেদের মধ্যে অতি মৃদুস্বরে কি আলোচনাও করল। তারপর তা'দের দলপতি গোছের লোকটী ইঙ্গিতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যেতে আদেশ দিল। সবারই চোখ বেঁধে দেওয়া হ'ল, কেবল আমারটাই খোলা রইল।

খুব বেশী দূর আমাদের যেতে হয় নাই। গভীর জঙ্গলের ভিতর একটা পতিত বাড়ীর উঠানে আমাদের নিয়ে সারবন্দী ক'রে দাঁড় করান

হ'ল। বাড়ীটা পুরাতন, অনেক ইঁট খ'সে পড়েছে, দরজা জানালা বেশ জীর্ণ এবং বাড়ীর ভিতর খুবই অন্ধকার। দস্যুদের সর্দ্দারের কাছে খবর গেল। তিনি আমাদের দেখতে বাইরে এলেন, কিন্তু বন্দীদের মধ্যে আমাকে দেখে বেশ একটু দ্বিধা ও লজ্জায় পড়লেন মনে হ'ল। তাড়াতাড়ি কি জানি ব'লে ভিতরে চলে গেলেন। চোখ খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ঘরে অনেক লোকই দেখলাম। কেউ লিখছে, কেউ পড়ছে, আবার কেউ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে মাজাং খেলছে। বাইরে কয়েকজনকে বন্দুক নিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিতে দেখলাম, কিন্তু ভিতরে স্থানে স্থানে বড় বড় 'রামদা' (খাঁড়া) নিয়েও পাহারা দেওয়া হচ্ছিল। একটী অপ্রশস্ত ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। তথায় সর্দ্দার সাহেব একটা টেবিলের সামনে চেয়ারের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে একখানি টুল দেখিয়ে পরিষ্কার ইংরেজীতে বসতে নির্দ্দেশ দিলেন এবং অন্যান্য সকলকে সারবন্দী হয়ে মাটিতে বসতে বললেন। আমাদের খাওয়ার জন্য অনুচর চা ও কিছু পিঠা দিয়ে গেল।

আমরা যখন খাচ্ছি তখন একে একে অনেকেই আমাদের প্রত্যেককে ভাল ক'রে দেখতে লাগল। তা'দের মধ্যে একজন হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার একজন সাইকেল-বাহককে চেপে ধ'রে অতি দ্রুত কতকগুলি কথা ব'লে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারের হুকুমে সেই বেচারীর চোখ আবার বেঁধে দেওয়া হ'ল। তারপর তা'র একটা আঙ্গুলে দড়ি বেঁধে অনুচরেরা তা'কে খুব জোরে টান দিতে লাগল। যন্ত্রণায় বাহকটী যখন চীৎকার সুরু করল তখন তা'কে চীনা ভাষায় সর্দ্দার কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। কোন উত্তর না পাওয়ায় তা'র মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হ'ল। সর্দ্দার তখন আমাকে ইংরেজীতে বললেন, "আপনি পর্য্যটনে এসেছেন তা' আমরা সবাই জানি, আপনার কিছুই বলার দরকার নাই। আমার অনুচরেরা এই লোকগুলির সঙ্গে আপনাকেও ধ'রে এনেছে, এই জন্য সত্যই আমি দুঃখিত। কালই আপনারা আপনাদের গন্তব্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হ'তে পারবেন। তবে যে বাহকটীকে আমরা বাঁধলাম তা'কে আর ছাড়া হবে না। সে একজন গুপ্তচর। তা'রই জন্য আমাদের তিনটী লোক প্রাণ হারিয়েছে। এখনই তা'র প্রাণদণ্ড হবে। আপনার সাইকেলের জন্য তা'র বদলে আমরা আর একজন বাহক দিব।

সে আপনাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। তা'ছাড়া সে আপনাদের সঙ্গে থাকলে এই অঞ্চলে আর কোন উৎপাতই পোহাতে হবে না।"

ঘর থেকে আমাদের সকলকে এক বড় উঠানে আনা হ'ল। সেখানে তা'রা হস্তপদবদ্ধ বাহকটীকে এক দেওয়ালের কাছে হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ দিল। সর্দ্দারের ইঙ্গিতে একজন রামদা দিয়ে এক কোপ বসাতেই বেচারার মুণ্ডটী বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে প'ড়ে গেল। ধড়টা একটু ছটফট ক'রে ঠাণ্ডা হ'ল। এই বীভৎস দৃশ্য আমাকে এমনই বিপর্য্যস্ত ক'রে ফেলেছিল যে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হ'লে দেখি, ছাদের উপর এক নির্জ্জন ঘরে আমাকে ঘিরে সঙ্গীরা আমার নানা প্রকার শুশ্রূষা করছেন। কিছুক্ষণ পরে সর্দ্দার এসে ইংরেজীতে বললেন, "আপনি অনর্থক এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের এই কাজে এই রকম নির্ম্মম হস্তেই ব্যবস্থা করতে হয়। আপনাদের রাত্রিভোজনের বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা বড় গরীব, তাই ভূরিভোজন করাতে পারব না। কাল সকালেই আপনারা রওনা হ'তে পারবেন। এখন খেয়ে শুয়ে পড়ুন। নমস্কার।"

আমাদের প্রত্যেককে ভাত আর শুধু রাই শাকের চচ্চড়ি দেওয়া হ'ল এবং জলের পরিবর্ত্তে গরম চীনা চা পাওয়া গেল। সর্দ্দারের কথামত আমরা প্রাতেই বেরিয়ে পড়লাম। যে অনুচরটী বাহকের কাজ নিল সে আমাকে ছাড়া আর সকলেরই চোখ বেঁধে দিল এবং জঙ্গলের অন্য ধারে এনে তা'দের চোখ খুলল। সারা দিন পথ চ'লে সন্ধ্যায় বনের ভিতর এক অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত হ'ল। সঙ্গে চাউল ও রাই শাক ছিল, তা'ই রান্না ক'রে খেয়ে রাত্রিতে শুয়ে পড়লাম। প্রাতে আবাব রওনা হলাম। বেলা একটার সময় এক পাহাড়ে গ্রামে পৌঁছলাম। লোকজন তেমন বেশী দেখলাম না। খাওয়াদাওয়া সেরেই আবার পথ চলা সুরু করলাম।

সন্ধ্যায় একটী পুরাতন বাড়ীতে পৌঁছলাম। দেওয়ালের চারি দিকেই গুলীর দাগ। দেখেই বুঝলাম, কামান দেগে ছাদটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তা'রই একটা মন্দের ভাল কামরায় রাত্রির জন্য আশ্রয় নেওয়া গেল। পরদিন প্রাতেই আমরা আবার রওনা হলাম। বেলা ১০টার সময় এসে একটা ছোট গ্রামে উঠলাম। দস্যু বাহকটী এতক্ষণ আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে

সাইকেলটা অন্য বাহকের সঙ্গে বয়ে আনছিল। সে আমাদের কিছু না ব'লে বিদায় নিল। গ্রামের নাম শুনলাম চেনচো। আর কয়েক মাইল গেলেই ইয়েং-চি-সিয়েন পাব। সেখান থেকে হেঞ্চফোঁ পর্য্যন্ত বেশ সুন্দর মোটরের রাস্তা রয়েছে। তা' শুনে মনটা অনেকখানি হালকা হ'ল। সারা বিকালটা গ্রামেই কাটান গেল। রাত্রিতে গ্রামে আহারাদি সেরে নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে বিশ্রাম নিলাম। পরের দিন একটু যেতেই ইয়েং-চি-সিয়েনে এসে পড়লাম।

ইয়েং-চি-সিয়েনে বেশ সুন্দর মোটরের রাস্তা, 'গ্যারেজ', হোটেল, লোকলস্কর, বাজার—সবই আছে। শহরে প্রবেশ ক'রে একটা হোটেলে আস্তানা গাড়লাম। ল্যাঙ্গট থেকে দশ ডলারের নোট বের ক'রে ভাঙ্গালাম। সকলে মিলে আনন্দে একত্র আহারাদি করলাম। তারপর হেঞ্চফোঁ শহরে আবার দেখা হবে জানিয়ে সহযাত্রীদের নিকট হ'তে বিদায় নিলাম। বিপদাপদের সময়ে নিবিড়ভাবে একত্রে থাকার ফলে আমাদের মধ্যে যে অজ্ঞাতসারে এক অভূতপূর্ব্ব প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তা' বিদায়-বেলায় খুবই প্রতীয়মান হয়ে উঠল। সহযাত্রীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ লোকটী সস্নেহে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁ'র সহজ সরল ভাষায় বলেছিলেন—"হিন্দু, তোমায় আমরা খুবই ভালবাসি।" সেই সামান্য কথাকয়টী আমার হৃদয়ে এমন এক দাগ রেখে গেল যে বহু দূরে এসেও আজ সেই অকৃত্রিম ভাবের অভিব্যক্তি স্মরণ হচ্ছে।

বিকাল বেলায় ছোট একটা বৈঠকের বন্দোবস্ত হয়েছিল। জনকয়েক শিক্ষক, ছাত্র এবং ঔৎসুক্যপরায়ণ দুই একজনকে নিয়েই আসরটা জমান গেল। যথারীতি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধও করা হ'ল। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস না থাকায় অনেক সময়ই অত্যন্ত দুঃখ হ'ত যে যদি মনের কথা একটু ভাল ভাবে গুছিয়ে বলার শিক্ষা আয়ত্ত ক'রে পথে বের হতাম তবে হয়তো বক্তৃতা করতে এত সঙ্কোচ হ'ত না। দুরদৃষ্ট এই, যাঁ'দের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানমান আছে তাঁ'দের সঙ্গে পৃথিবীর দেশ দেশান্তরের দুর্গম নিভৃত পল্লীর দুর্ভাগা অধিবাসীদের মেলামেশার কোন সুযোগই হয় না। তা'রা তা'দের কথা কাউকে জানাতে পারে না, পরের কথাও তা'রা কারুর কাছে জানতে পারে না। জাহাজে

গাড়ীতে হাওয়ার বেগে ছুটাছুটি ক'রে দিকবিদিকের অনেক শহর, পৃথিবীর অনেক নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন দেশেরই প্রকৃত অধিবাসীদের মন ও প্রাণের সন্ধান তেমন ক'রে মিলে না।

এখান থেকে হেঞ্চফোঁ পর্য্যন্ত অতি সুন্দর রাস্তা। দু'দিকের গ্রামে পুলিশের বেশ তোড়জোড়। চুরি ডাকাতির নামগন্ধও নাই। পথের ধারের মন্দিরগুলিতে মোমবাতির চিকমিক আলোয়, আরতির পূতধ্বনিতে, ছোট ছেলেমেয়েদের হুল্লোড়ের শব্দে সারা পথটাই পূর্ব্বাপরের অবসাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল অধ্যায় অধিকার ক'রে আছে। হংকংয়ে সংবাদপত্রের মারফতে কমিউনিষ্ট আতঙ্ক প্রচারের দরুণ এই স্থানগুলি কতই না বিভীষিকাময় দেখেছিলাম! গ্রামের পর গ্রাম এল ও গেল, কোথাও কোন বেসুরা ভাঁজ পাওয়া গেল না। কর্ম্মতৎপর জীবনযাত্রার ছোটখাট সুখদুঃখের ভিতরে সকলকে প্রাণমন মধুময় ক'রে রাখতেই দেখলাম। ক্রমাগত সাইকেল চালিয়ে তৃতীয় দিনে একটা নদীর ধারে এলাম। নদীটা ঘুরে ফিরে ইয়াংসী নদে পড়েছে। ওপাড়েই হেঞ্চফোঁ।

হেঞ্চফোঁ

নদী পার হয়ে সাইকেলটা নিয়ে একটু এগুতে না এগুতেই কয়েকটা চীনা বালক আমার পিছু নিল। তারপর "আরে একটা কালো ভূত" ব'লে তারা সোরগোল তুলে দিল। ছেলেদের দল অতি দ্রুতই সংখ্যায় বেড়ে উঠল, এমন কি তা'রা রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ ক'রে ফেলল। পুলিশ এসে আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে একটা হোটেলে পৌঁছিয়ে দিল। সাইকেলটা রাখার বন্দোবস্ত ক'রে একটা কামরা দখল করলাম। গরম জলে স্নান ও চা পানাদির পর অনেকখানি আরাম বোধ হ'ল। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ছাড়পত্র পরীক্ষা ক'রে নম্বর ইত্যাদি টুকে নিলেন। এদিকে হোটেলের দরজায় নবাগতকে দেখবার জন্য অনেক লোকই জমায়েৎ হ'ল। বাধ্য হয়ে হোটেলের ম্যানেজারের অনুরোধে নিতান্ত ক্লান্তি সত্ত্বেও দরজায় উপস্থিত হয়ে সকলকেই হিন্দু পদ্ধতিতে নমস্কার দিলাম। ম্যানেজার আমার চীনা

ভাষায় ছাপান পরিচয়পত্র উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প'ড়ে শুনালেন। বড়ই ক্লান্তি বোধ করছিলাম, তাই আর এক সময় আমার বক্তব্য নিবেদন করব জানিয়ে তখনকার মত জনতার হাত থেকে রেহাই পেলাম। রাত্রে ম্যানেজার বিরাট ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করলেন। কামরায় এসে ঘুমাবার চেষ্টায় বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করেছি এমন সময় দরজায় করাঘাত হ'ল। উঠে দরজা খুলে দেখি, আমার সহযাত্রী কয়জন আমার হেঙ্কফোঁ পৌঁছার খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ইয়েং-চি-সিয়েনে পরস্পর বিদায় গ্রহণের পর হেঙ্কফোঁতে আবার দেখা হওয়ায় কতই না আনন্দ হ'ল! কত যেন আপন জন, কতই না নিবিড় বন্ধন! এই জন্যই বোধ করি কবীন্দ্র রবীন্দ্র গেয়েছেন,—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

প্রাতে উঠে শহরে বেড়াতে বের হলাম। সাইকেলের একটা নতুন 'নাটের' দরকার ছিল। একজন চীনা কর্ম্মকারের কাছে একথা বলতেই সে প্রয়োজনীয় 'নাট' তৈরী ক'রে আমার সাইকেলে লাগিয়ে দিল। দাম নিল ১০ সেণ্ট। সাইকেল সারিয়ে কর্ম্মকারের ছেলেকে পথপ্রদর্শক ক'রে নগর পরিভ্রমণে লেগে গেলাম। ছেলেটী অল্পবিস্তর ইংরেজী জানত, তাই আমাদের আলাপে কোন বেগ পেতে হয় নাই। সে প্রথমে আমাকে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানে 'ম্যাণ্ডারিন' * ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে দেখলাম। যদিও ক্যাণ্টনের ভাষা থেকে স্থানীয় ভাষার সামান্যই প্রভেদ, তথাপি ক্যাণ্টনী ভাষার পরিবর্ত্তে ম্যাণ্ডারিনই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। চীনে একটা ভাষার একীকরণ প্রচেষ্টা চলেছে। বালক পথপ্রদর্শকের কাছে আমার পরিচয় অবগত হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমায় খুবই সমাদর করলেন।

* পিকিনের আশেপাশের লোক যে ভাষা বলে তা'কে "ম্যাণ্ডারিন" ভাষা বলা হয়। চীনে যত রকম কথ্য ভাষা আছে তা'র সঙ্গে ম্যাণ্ডারিন ভাষার একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই ভাষাটীই চীনের সাধারণ ভাষারূপে পরিণত হয়েছে।

তাঁ'রা পাঠ্যপুস্তক হ'তে আরম্ভ ক'রে পড়ুয়াদের জামা খুলিয়ে তা'দের স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত আমাকে দেখালেন। বিদ্যালয়-সংলগ্ন বয়নাগারের এক দিকে সূতী কাপড় ও অন্য দিকে রেশমবস্ত্র বয়ন হচ্ছে দেখলাম। ছাত্র ও শিক্ষকে মিলে যে উৎসাহ ও উদ্যমে কাজ করতে দেখা গেল, তা'তে স্বতঃই মনে হয় এই জাতিকে পৃথিবীর কোন শক্তিই কোন দিন বিপর্য্যস্ত ক'রে ফেলতে পারবে না। তারপর এক সাধারণ স্নানাগার দেখতে গেলাম। কলকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগারগুলি যে কতখানি নিকৃষ্ট তা' সুদূর চীনের এই স্নানাগারগুলি দেখে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম। দেবমন্দির, আদালত, হাসপাতাল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান দেখে হোটেলে যখন ফিরলাম তখন বেলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন ক'রে বিশ্রামার্থ বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিবানিদ্রা বেশ হ'ল। বেলা চারটের সময় একজন ভদ্রলোক এসে পরিষ্কার ইংরেজীতে একটু রাসভারি চালে অনেক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন। নানা প্রকার জেরার পর কমিউনিজম সম্বন্ধে আমার অভিমত কি তা' জানতে চাইলেন। তা'র উত্তরে বললাম, আমি পর্য্যটক, ভ্রমণের নেশায় মশ্‌গুল, কোন বিশেষ মতবাদের তেমন ধার ধারি না। পথ চলাই যা'র লক্ষ্য, তা'র মত বেছে নেবার ফুরসৎ কোথায়। পথটাই তা'র বড়, মতটার খোঁজ সে বেশী রাখে না। পাহাড়পর্ব্বত, নদীনালা, শহর-পল্লী তা'কে এমন ভাবেই বিমোহিত ক'রে রাখে যে মতবাদের গবেষণা কোন দিনই তা'র মগজে ঠাঁই পায় না, আর তা'র মন ওসব চায়ও না। অল্প আলাপেই বুঝা গেল ভদ্রলোক হেঙ্কফোঁর নান্‌কিন্‌ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। আলোচনাদি সমাপন ক'রে তিনি বিদায় নিলেন, কিন্তু ধরণধারণে মনে হ'ল, তিনি আরও কিছুদিন আমার উপর তাঁ'র কৃপা-দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। রাত্রে আবার লোকের ভীড়। হোটেলের সম্মুখস্থ খালি স্থানটুকুতে একটা ছোট সভার ব্যবস্থা হ'ল। যথারীতি বক্তৃতাও করলাম। এই পর্য্যন্ত পথ চ'লে চীনের সম্বন্ধে কি ধারণা করতে পেরেছি এই প্রশ্ন হ'ল। সাধ্যমত তা'র জবাব দিলাম। হেঙ্কফোঁ আসতে পথিমধ্যে দস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত যে স্থান অতিক্রম করলাম, তা'র অভিজ্ঞতার বিবরণের জন্যও অনুরোধ এল। সহযাত্রীদের পুনঃপুনঃ নিষেধ থাকায় দস্যুর খপ্পরে প'ড়ে যা'

কিছু দেখবার ও জানবার অবকাশ হয়েছিল, তা' সবই চেপে গেলাম। দস্যুর প্রসঙ্গে বিশেষ কোন চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ না করায় অনেকেই কিন্তু বিস্মিত হলেন এবং আমাদের ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন একথাও তাঁ'রা বার বার জানিয়ে দিলেন।

পরদিন প্রাতে চাংসার দিকে রওনা হ'লাম। এখান থেকে পথে লোকের বেশ ভীড় দেখলাম। রাস্তার দু ধারেই চাষাবাদের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর। রাস্তা ভাল ব'লে সাইকেল চালাতে আর কোন কষ্ট হ'ল না। হেঙ্কফোঁ পিছনে ফেলে আসার পরে দেখি, একজন লোক অনুক্ষণই একটা সাইকেলে আমার সঙ্গে চলেছে। কখনও সে একটু এগিয়ে যায়, আবার কখনও বা পিছু পিছু আসে। পথের ধারে ছোট একটা পাহাড়ের কোলে একটা গ্রামে সাইকেলটা রেখে ঝরণায় জল খেতে গেলাম। এসে দেখি, তিনটী লোক আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কি যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে আলাপ করছে। তা'দের কাছে গিয়ে আমার চীনা ভাষায় ছাপান পরিচয়পত্র দিলাম। তা' একটু দেখে নিয়ে তা'রা আমাকে সহাস্যে 'তোমার মঙ্গল হোক' ব'লে স'রে গেল। আমিও আপন পথে অগ্রসর হলাম। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, সেই পূর্ব্বেকার লোকটী আমার সঙ্গ ছাড়া হয়নি। আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল! মনে মনে ঠিক করলাম, একটু সুযোগ পেলেই লোকটীর সঙ্গে নেহাৎ গায়ে প'ড়েও আলাপ ক'রে দেখব তা'র উদ্দেশ্য কি।

পথ বেয়ে এগিয়ে চললাম। বিকাল নাগাদ একটী ছোট গ্রামে রাত্রির মত আস্তানা গাড়বার ইচ্ছা হ'ল। ছোট একটা চীনা হোটেল দেখে তা'তেই রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করলাম। পনের হাত দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটী কামরায় রাত্রিযাপন এবং ভোজনসমেত অর্দ্ধ ডলার দক্ষিণায় থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। বাঁশের মাচার উপর একটা অপরিচ্ছন্ন বিছানা, একটা অপরিষ্কার রং-চটা টেবিল এবং বাঁশের তৈরী দুইখানা চীনা চেয়ার, আর কম্বল পাওয়া গেল। টেবিলের উপর একটা মোটা মোমবাতি ঘরের অন্ধকার দূর করছিল। সারা চীনা মুল্লুকে এত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হোটেলের অভিজ্ঞতা আমার সমগ্র চীনভ্রমণে আর কোথাও ঘটে নাই। দারুণ শীতেও নোংরা থাকার জন্য মাছি ভন্‌ভন্ করছিল এবং দুর্গন্ধ সমস্ত বাড়ীখানাকে যেন

পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছিল। স্থানটা জঘন্য হ'লেও সারা দিনের ক্লান্তির পর গ্রামান্তরে যাওয়ার আর মোটেই কোন আগ্রহ হ'ল না। গরম জলে হাত-পা-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রামের জন্য শয্যার আশ্রয় নিলাম। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চোখ খুলেই দেখি আমার সঙ্গ-নেওয়া চীনাটী দিব্য নিশ্চিন্তে টেবিলের পাশে চেয়ারে ব'সে ধূমপান করছে। লোকটা দেখছি নিতান্তই নাছোড়বান্দা হয়ে আমার পিছনে লেগেছে! উঠে ব'সে তা'র সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। দু'একটা অবান্তর কথার পরেই তা'কে আমার পিছনে এরূপ ধাওয়া করার কারণ খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলাম। এক গাল হেসে সে নিতান্ত নির্ব্বিবাদে বলল, আমার পশ্চাদনুসরণ করার ভার তা'র উপর পড়েছে, কাজেই তা'কে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়েছে। তা'র নাকি এইটুকু আসতেই দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে আমি অতি নির্লিপ্ত একজন পর্য্যটক। তবুও সরকারী আদেশ ব'লেই আমার জন্য তা'কে হয়রান হ'তে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার উপর যখন এতই আস্থা তখন আমার পিছনে ছুটাছুটি না ক'রে হেঙ্কৌতে ফিরে একটা এতেলা দিলেই তো হয়। তা'র উত্তরে সে বলল, পরবর্ত্তী নগরে না পৌছন পর্য্যন্ত তা'র আর কোন প্রকারে ছুটি নাই। পরীক্ষা করার জন্য তা'কে বললাম, আমার কাছে বড় ও ধারাল একটা বিলাতী ছুরি আছে। পথের মাঝে নির্জ্জন স্থানে যদি তা'কে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে বসি, তবে তা'কে বেশ একটু বিপদেই হয়তো পড়তে হবে। এতে একটুও না দ'মে সে দুই পকেট থেকে টোটাভরা দুটা পিস্তল বের ক'রে বলল, অস্ত্র তা'র সঙ্গে পূরাদস্তরই আছে, তবে কি না কাজে লাগাবার প্রয়োজন হবে ব'লে সে মনে করে না। আমাকে সে এতই নিরীহ প্রাণী ভেবেছিল যে আমাকে দেখাবার জন্য আমার হাতে একটা পিস্তল তুলে দিল। নেড়েচেড়ে দেখি, পিস্তলটায় টোটা ভরাই আছে। বুঝলাম, আমার উপর লোকটার প্রগাঢ় না হ'লেও যথেষ্ট বিশ্বাস হয়েছে। সে পিস্তলটা ফেরত নিতে চাইল। অমনি তা'কে তা' ফিরিয়ে দিলাম। কারণ পর্য্যটকের কোন অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয় না। আত্মনির্ভরতাই তা'র পরম অস্ত্র।

রাত্রি যাপন ক'রে আবার পথ চলা সুরু করলাম। পথিমধ্যে প্রায় দ্বিপ্রহরে সামনের চাকার টায়ারটা ফেঁসে গেল। একটা গাছতলায় গিয়ে সাইকেলটা মেরামত ক'রে নিলাম এবং ঝোলা থেকে খাবার খাওয়ার পরে শরীরটা বেশ কার্য্যক্ষম হয়ে উঠল। সামনেই একটা বড় পাহাড়, আর তা'রই বুক চি'রে পথটা চ'লে গেছে। চড়াই থাকার দরুণ খানিকটা অগ্রসর হ'তেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তাই পথের ধারে একটা জায়গায় বিশ্রাম করবার জন্য যেমন বসেছি অমনিই কয়েকজন চীনা হঠাৎ কোথা থেকে আমার উপর লাফিয়ে পড়ল। কোন রকম বাধা দেওয়ার পূর্ব্বেই চক্ষের নিমেষে তা'রা আমার হাতমুখ বেঁধে ফেলল। হায়, এখন যদি উপরোক্ত চীনা চরটী কাছে থাকত, তবে হয়তো এই সময়ে কতই না উপকার হ'ত! কিন্তু ভেবে আর কি-ই বা হবে। ঐ চীনা গুণ্ডারা ইতিমধ্যেই আমার যাবতীয় জিনিষপত্র তন্ন তন্ন ক'রে দেখল। তারপর আমাকে পথের পার্শ্ববর্ত্তী টিলার পিছনে একটা বাড়ীর আঙ্গিনায় নিয়ে হাজির করল। আমাকে একটা ঘরের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় রেখেই গুণ্ডার দল যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল তা'র কোন হদিস পেলাম না।

হাতের ঘড়িটা তা'রা খুলে নিয়ে গেছে, কাজেই বেলা যে কত হ'ল তা'ও জানবার উপায় নাই। ঘরটায় বোধ হয় অনেকদিন জনসমাগম হয় নাই, তাই ইঁদুর, আরসোলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পোকায় ভর্ত্তি ছিল। তা'দের রাজ্যে এক নবাগতের গন্ধ পেয়ে তা'র সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য তা'রা ছুটে এল। যা'রা উপস্থিত হ'ল তা'দের মধ্যে অসমসাহসিক গোছের যে দু-চারটে ইঁদুর ও চামচিকা ছিল, তা'রা আমার গায়ের উপর নির্ভীক অভিযান সুরু করল। আমার হাতমুখ বাঁধা, কাজেই পায়ের সাহায্যেই তা'দের এই আক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ইঁদুর ও চামচিকাদের বিদায় দিয়েও আরসোলার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলাম না। বীর সৈনিকের মত কাতারে কাতারে তা'রা আমার উপর চড়াও হ'ল। ঘাড় নেড়ে, শরীর দুলিয়ে, কিম্বা পা নাচিয়ে রেহাই পাওয়ার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। তখন সত্যই চীনাদের আরসোলা ভোজনের সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম। সম্পূর্ণরূপে হতাশ হওয়ার আগে একবার শেষ চেষ্টার আশায় ঘরটার ভিতরে দাপাদাপি জুড়ে

দিলাম। ফলে আরসোলার আক্রমণ বিফল তো করলামই, উপরন্তু পিছন দিকের দেওয়ালে একটা দরজাও আবিষ্কার ক'রে ফেললাম। পিঠ দিয়ে সামান্য একটু ঠেলতেই দরাজাটা ফাঁক হয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ছোট একটা আঁধার কুঠরীর মধ্যে ছিটকে পড়লাম।

কিন্তু এ কি! দরজাটা যে আপনিই স'রে আবার কলের মত যথাস্থানে একেবারে ঠিকঠাক লেগে গেল। হায়, এমনই ভাগ্য বিড়ম্বনা! কতক্ষণ কুঠরীর ভিতরে অসাড়ভাবে প'ড়ে ছিলাম তা' ঠিক নাই, কিন্তু তারপর রাজ্যের সব চিন্তা যেন মাথার মধ্যে ভীড় পাকিয়ে উঠল। কেন যে এই চিন্তা আমায় এমন ক'রে পেয়ে বসল তা' কে জানে! ঘর নাই, পরিবার নাই, কোন রকম পিছুটানের লেশ নাই, অথচ চিন্তার হাত থেকেও রেহাই নেই। এক এক বার সঙ্কল্প করি কি হবে ভেবে ভেবে, যা' হবার তা' হোক না। না হয় বিদেশে-বিভূঁয়ে অপমৃত্যুই হ'ল। কেউ কাঁদবার নাই, দেখবার নাই, সংবাদ দেওয়ারও তো কেউ নাই। আমি মরলেই তো আমার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে ল্যাঠা চুকে যাবে। তবে কেন আর মিছে ভাবনায় পড়া? কিন্তু চিন্তা যেন আর ছাড়তেই চায় না। খুব জর হওয়ার পরে তা' ছেড়ে গেলে যেমন অঢেল অবসাদে তনুমন এলিয়ে পড়ে, আমার শরীরের অবস্থাও তেমনি হ'ল। দুঃসাহসের উপর ভর ক'রে মরণের মুখে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ার যে আনন্দটুকু তা' এই মানসিক দুশ্চিন্তা ও শারীরিক ক্লেশের মধ্যেও কম পরিস্ফুট হয়ে উঠল না। অনিশ্চয়তার কাল্পনিক ভীষণতা চিত্তকে বেশ পীড়িত ক'রে তুলল। কতক্ষণ এইরূপ মানসিক টানা-হেঁচড়ার পরে অবসাদে আপনিই ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্নে দেখলাম, একেবারে স্বগ্রামে বাল্য জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে আনন্দে উচ্ছল হয়ে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছি। দৌড়াদৌড়ির মধ্যে একটা পরিচিত খালে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম থেকে জেগে দেখি, কুঠরীর কঠিন অবরোধের মধ্যেই প'ড়ে আছি। চালের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের সহস্র কিরণধারা আমার দুর্দৈব-দুর্দ্দশা দেখার জন্যই যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সারাটা রাত্রি বদ্ধাবস্থায় থাকায় শরীরেও কম ব্যথা হয়নি। সারাটা দিনও প্রায় কেটে গেল। মুক্তির আশাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। ক্ষুধাতৃষ্ণায়,

নিরাশায় সর্ব্বক্ষণ মনে হচ্ছিল যে কি ঝকমারিই না করেছি—বার বার নিষেধ সত্ত্বেও এই পথে অগ্রসর হলুম, তাই তো এই নাজেহাল অবস্থা!

হঠাৎ বাইরে লোকের আওয়াজ পেলাম। তারপর পিঠ দিয়ে দরজা ঠেলতেই আস্তে আস্তে তা' খুলে গেল। বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হাওয়ায় এসে দেখি, পূর্ব্বপরিচিত চীনা গুপ্তচর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার বন্ধন যথাসম্ভব দ্রুত খুলে দিয়ে প্রথম সূচনায়ই সে ব'লে উঠল, "বন্ধু, তা' হ'লেই দেখছ, সরকার আমাকে তোমার সঙ্গ নেওয়ার আদেশ না দিলে আজ আমার এই অভাবিতরূপে তোমার কাজে লাগার সুযোগই হ'ত না।" পাশেই দেখি, এক সিপাহীর জিম্মায় গুণ্ডাদের একজন অতি শান্তশিষ্ট ছেলেটীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। চরটী শত্রুবেশেও অতি মিত্রের কাজ করায় তা'কেই প্রথম আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে তা'তে বাধা দিয়ে এ পর্য্যন্ত কি কি ঘটেছে তা' তা'র সঙ্গের পুলিশ কর্ম্মচারীকে লিখিয়ে দিবার জন্যই পীড়াপীড়ি করল।

আমার বিবৃতি দেওয়ার পর চর-বন্ধুটীর কাছে শুনলাম, সে আমার আগেই চলছিল এবং মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পথের মোড়ে আমায় দেখে নিয়ে আবার এগিয়ে যাচ্ছিল। টিলাটা পেরিয়ে যে গ্রামটা পাওয়া যায়, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে সে ক্রমাগত আমাকেও হাজির দেখবার আশা করছিল। সন্ধ্যায়ও আমি যখন পৌছলাম না, তখন হয়তো রাস্তায় কোন দুর্ঘটনায় পড়েই আমার দেরী হচ্ছে ব'লে সে মনে করল। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ার পরও আমাকে না দেখে সে একটু শঙ্কিত হয়েছিল। পরের দিন প্রত্যূষে পার্শ্বের গ্রামস্থ থানায় গিয়ে সে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও দুইজন সিপাহী নিয়ে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অনেক অনুসন্ধানের পর তা'রা এক স্থানে দুইটী লোককে সন্দেহজনকরূপে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে তাড়া করল। একজন ধরা পড়ল, অপর জনকে আর ধরা গেল না। ধৃত ব্যক্তির নিকটেই আমার সন্ধান পেয়ে তা'কে নিয়ে তা'রা বরাবর এখানে এসে পড়েছে। তাই আমার উদ্ধার ও মুক্তি সম্ভব হয়েছে।

সাময়িক বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গল পেরিয়ে সড়কে আবার যখন উঠলাম, সন্ধ্যাদেবী তখন আঁধার ঘনিমায় পৃথিবীকে ছেয়ে

ফেলেছেন। সেই অন্ধকারের মধ্যে বন-উপবন, ছোট-বড় টিলা, দূরে দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর এক চলচ্চিত্রের দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। অতি কষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তায় এসে আমার চলচ্ছক্তি যেন হারিয়ে বসলাম। বন্ধুবর দুটো বাঁশে একটা চাটাই বেঁধে সাময়িক 'ষ্ট্রেচার' তৈরী করল এবং তা'তেই আমাকে শুইয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একটা বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গেল। তারপর আমার ঝোলাঝুলিসমেত সাইকেলটাও হাজির হ'ল। গ্রামের অনেক লোকই আমার বিপত্তির কথা শুনতে এল। বন্ধুবরই তা'দের বিশদ বিবরণ দিবার কাজ সমাপন করলেন। গা-হাতের ব্যথার জন্য একজন চীনা আমাকে একরকম চৈনিক মলম মালিশ ক'রে দিল। তারপর আমার শরীরের গ্লানি দূর হ'লে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

চীন দেশে নানা রূপ মলমের প্রচলন আছে। রোগবিশেষে সেগুলি ব্যবহার করলে এত শীঘ্র রোগের উপশম হয় যে বাস্তবিকই তা' আশ্চর্য্যজনক। আমাদের ভারতের মত চীন দেশেও নানাবিধ বনজ ঔষধ পাওয়া যায়। কিন্তু চীনে এমন কতকগুলি বনজ ঔষধ আছে যা' অন্যত্র একেবারেই পাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষয়রোগ আরোগ্যের জন্য চীনে একপ্রকার মূলা ব্যবহার করা হয়। এরূপ দেখা গিয়েছে যে বেশীর ভাগ যক্ষারোগীই এই বনজ ঔষধে আরোগ্য লাভ করে। কোরিয়ার একমাত্র কাইজো নামক স্থানেই এই মূলা জন্মে এবং জাপানীরাই শুধু তা' চাষ করে। এই মূলাবিক্রয়ের ব্যবসা জাপানীদেরই একচেটিয়া।

সিয়াংটাং

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। বিছানা থেকে উঠে দেখি, পূর্ব্ব দিনের বাঁ হাতের ব্যথা একরকম নাই বললেই হয়। চৈনিক মলমের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা দেখে ঔষধটা এক কৌটা সঙ্গে নেওয়ারও ব্যবস্থা করলাম। সকালটা গ্রামেই কাটালাম। আহারাদি সমাপন ক'রে আবার পথ ধরলাম। সরকারী চরটী এবার সঙ্গেই চলল। কতখানি এগিয়ে একটা বেশ চওড়া খাল পাওয়া গেল। ঘাটে ঘাটে অনেক নৌকা ভাড়ার

আশায় যাত্রীর প্রতীক্ষা করছিল। আমাদের দুইজনকে সিয়াংটাং পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন মাঝির সঙ্গে ৫৷৷ ডলার ভাড়া চুক্তি ক'রে নৌকায় উঠলাম। যাত্রার প্রাক্কালে মাঝি আমাদের চীনা সবুজ চা ও কিছু পিঠা খেতে দিয়ে আপ্যায়ন করল। খালের জলে ছোট নৌকায় চলতে চলতে আশেপাশের ছোট ছোট চীনা বালকবালিকাদের দৌড়ঝাঁপ, তরুণতরুণীদের গতিবিধি চোখে পড়তে লাগল। চীনাদের চেহারা, চালচলন অনেকটা চোখ-সওয়া হয়েছে। তাই ওদের চেপ্টা নাক আর চোখকে পীড়া দেয় না, ওদের অতি সাধারণ খাওয়া আর অখাদ্য মনে হয় না, এমন কি ওদের কঞ্চি ব্যবহার করাও অভ্যাস হয়ে গেছে। ওদের ভাষাটাও আর তত দুর্ব্বোধ্য লাগে না। ধীরে ধীরে চীনের সুখদুঃখ যেন আমায় ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে ধরছিল। পথে আরও কয়েকটা সহযাত্রী নৌকা দলে ভিড়ল।

রাত্রে একটা গ্রামের পার্শ্বে নৌকা নোঙ্গর করা গেল। অনেক নৌকা হ'তে মাঝির দল আহারান্তে চীনা বেহালায় গান ধ'রে বসল। নীচে জল কল কল ক'রে বয়ে চলেছে, উপরে নীলাকাশে আধকাটা চাঁদের সভায় শুভ্র মেঘের টুকরাগুলি ভেসে ভেসে যাচ্ছে। গ্রাম হ'তে করুণ সুরে তরুণদলের চীনা সঙ্গীত আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত ক'রে তুলছে। অদূরে নদীতটে পট্‌কা ফুটিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে জনকয়েক চীনা নারী ও পুরুষ নদীদেবীকে পূজা নিবেদন করছে। পূজার শেষে তা'রা পূজার্থেই প্রস্তুত কতকগুলি চীনা কাগজে আগুন ধরাল। তারপর জ্বলন্ত কাগজের উপর ছোট ছোট পেয়ালায় ভর্ত্তি সুরা অল্প অল্প ঢেলে হোমের মতই অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হ'ল। পূজার প্রসাদ সিদ্ধ মুরগী, ফল ও পেয়ালাস্থ সুরা উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করতেও দেখলাম।

শেষ রাত্রের দিকে ভয়ানক একটা গণ্ডগোলের শব্দে জেগে উঠতেই দেখি, চীনা জলদস্যুর দল আমাদের আক্রমণ করেছে। জনকয়েক মাঝি বড় বড় রামদা নিয়ে বাধা দিবার বৃথা চেষ্টা ক'রে গুলীর ঘায়ে প্রাণ দিল। চারি দিকেই কিছুক্ষণ কেবল গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজের পরে আমাদের যাত্রীদের মধ্যে বেছে বেছে কয়েকজনকে পিস্তলের নল পিঠে ঠেকিয়ে জলদস্যুরা একটা সরু লম্বা নৌকায় তুলল। আমার সব জিনিষপত্র আমাকেই বহন

ক'রে নিতে হ'ল। চীনে জলদস্যু দুই রকম দেখা যায়—নদীদস্যু ও সাগরদস্যু। নদীদস্যুদের বেশীর ভাগই খুব দ্রুতগতিশীল 'ডিজেল' ইঞ্জিনের সরু সরু লম্বা লম্বা নৌকা ব্যবহার করে। সেই রকম একটা নৌকায় আমরা ভট ভট, ফট ফট শব্দে দস্যুসর্দ্দারের আস্তানার দিকে চললাম। অনেক এঁকেবেঁকে খাল, বিল, নদ, নদী ঘুরে পরের দিন বেলা প্রায় দশটার সময় একটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে নৌকা ঢুকল। সুড়ঙ্গ পার হয়ে একটু গিয়েই চারি দিকে পাহাড় ও বন পরিবেষ্টিত ছোট একটা খাড়ির ভিতরে নৌকাগুলি ভিড়ল। তারপর একটা আটচালা ঘরে সপারিষদ সর্দ্দার সাহেবের কাছে আমাদের হাজির করা হ'ল।

ছোট সর্দ্দার আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য যা' কিছু পাওয়া গিয়েছিল তা' সবই সর্দ্দার সাহেবের সামনে ভেট দিল। সর্দ্দার সাহেব তা'র অভিযানের সব বিবরণ শুনে আমাদের সকলকে ভাল ক'রে একবার দেখে নিলেন। তারপর আমাকে বেশ পরিষ্কার ইংরেজীতে আমিই "মিঃ লিমনাথ বিশোয়াস্" কি না তা' জিজ্ঞাসা করলেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে চীনারা 'র' কে 'ল' উচ্চারণ করে। আমিই যে আদি ও অকৃত্রিম "মিঃ বিশোয়াস্" সেই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি বললেন, পূর্ব্ববর্ণিত দস্যুসর্দ্দারের নিকট হ'তে তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে আমি একজন হিন্দু ভূ-পর্য্যটক। এতদঞ্চলে আমি যতদিন কাটাব ততদিন পথে স্থলদস্যু বা জলদস্যুর হাতে আমার কোথাও যা'তে কোন অসুবিধা না হয় এইরূপ বন্দোবস্ত তাঁ'রা নিজেদের মধ্যে ক'রে রেখেছেন।

অধিকন্তু তিনি আরও একটু অভিনব সংবাদ দিলেন। হেঙ্কফোঁ হ'তে নাকি তিন চার জন সরকারী গুপ্তচর আমার জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আমার সঙ্গ নিয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি চোখের ইঙ্গিত করতেই তাঁ'র অনুচরেরা আমাদের সঙ্গের সরকারী চরটীকে ও আরও দুইটী লোককে বন্দুকের কুঁদা দ্বারা ঠেলতে ঠেলতে আমাদের সামনে হাজির করল। সর্দ্দার সাহেব বললেন, "আপনাকে পথে টিলার ভিতরে যে দুটী গুণ্ডা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল এখানে সেই লোক দুটীকে চিনতে পারেন কি না দেখুন তো?" তাকিয়ে দেখি, সত্যই সেই দু'জন আমাদের সঙ্গে এখানে বন্দী হয়েছে। তখন শুনলাম, সহযাত্রী সরকারী চরটী আমার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যই

এই অভিনয়ের অবতারণা করেছিল। পথিমধ্যে ঝরণার ধারে আমার পিছনে যে লোকদের ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে আলাপ করতে দেখেছিলাম এবং যা'দের সঙ্গে আলাপের ছলে খুব সহানুভূতিদ্যোতক 'তোমার মঙ্গল হোক' শুভেচ্ছা পেয়েছিলাম, এরা তা'রাই। আমাকে বনের ভিতরে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় এক নির্জ্জন কুটীরে বন্দী ক'রে রাখা থেকে আরম্ভ ক'রে এক রাত্রি ও একদিন অশেষ প্রকার কষ্ট দেওয়া এবং পুলিশের সাহায্যে সরকারী চরের দ্বারা আমার উদ্ধার পর্য্যন্ত সব পর্ব্বটাই একটা নিছক সাজান ব্যাপার। গুণ্ডা ও চরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সব সময়েই যোগাযোগ ছিল। এই সব দেখেশুনে আমি একেবারে অবাক হলাম। চৈনিক রীতি অনুসারে সরকারী চর ও তা'র দুইজন অনুচর-গুণ্ডার গর্দ্দান গেল। চলচ্চিত্রের মত ঘটনাগুলির এত তাড়াতাড়ি পট পরিবর্ত্তন হ'তে লাগল যে আমি বড়ই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

এতদিন চীনে যে যে স্থানে ঘুরেছি তা'র মধ্যে বহু স্থানেই ডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু তা'রা কি প্রকৃতির ডাকাত সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা না বললে হয়তো অনেকেরই ভুল ধারণা হবে। এই ডাকাতরা হলেন কমিউনিষ্টদের সমর্থক, চিয়াং-কাই-সেকের বিরোধী এবং বিদেশ হ'তে প্রত্যাগত শিক্ষিত লোক। তা'রা ডাকাতির দ্বারা অর্থসংগ্রহ ক'রে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে গোপনে শিক্ষা বিস্তার ক'রে বেড়াচ্ছেন। চিয়াংয়ের সমর্থকগণ এবং মিশনারীরা জনসমাজে এই শ্রেণীর লোকদের ডাকাত ব'লে প্রচার ক'রে এদের সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি করছেন।

পরের দিন এক দস্যুর নৌকা আমাকে সিয়াংটাং শহরটীর উপকণ্ঠে নামিয়ে দিয়ে গেল। ক্ষুদ্র শহরে প্রবেশ ক'রে একটা ছোট হোটেলে আশ্রয় নিলাম। পূর্ব্ব রাত্রের অভিজ্ঞতায় এতখানি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে স্নান-খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে উঠে নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেই ম্যানেজার এসে জানালেন যে ইতিমধ্যে কয়েকজন লোক আমার অনুসন্ধান ক'রে গেছে। সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবার পরই জনকয়েক দেখা করতে এলেন। কতক ভাঙ্গা চীনা ভাষায় ও কতক ইংরেজীতে আলাপাদি চলল। তারপর একজন চীনা ভদ্রলোক এলেন এবং আমরা উভয়ে ইংরেজীতে আলাপ

করতে লাগলাম। ভদ্রলোকটী আমার কথা অন্যান্য সকলকে বুঝিয়েও দিতে লাগলেন। কথাচ্ছলে জানতে পারলাম, হোটেলের ম্যানেজার প্রত্যেক আগন্তুকের কাছে দর্শনী বাবদ অর্দ্ধ ডলার আদায় করেছেন। ম্যানেজারকে এজন্য সকলেই যারপরনাই ভৎ'সনা করলেন। ব্যবস্থা হ'ল, আর কা'রও কাছে তিনি দর্শনী আদায় করতে পারবেন না এবং এই পর্য্যন্ত যত আদায় হয়েছে আমার হোটেলের খরচ তা'র থেকেই মেটান হবে এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে আমাকে নগদ দিয়ে দিতে হবে। ব্যবস্থাটা স্থানীয় ভদ্রলোকেরাই ক'রে দিলেন। নানা প্রকার আলাপে শুনলাম, এই সিয়াংটাং থেকে চাংসা মাত্র ৫২ লী অর্থাৎ প্রায় ১৭ মাইল। চাংসা নাকি খুব প্রগতিশীল ও উন্নত নগর। তথায় কয়েকজন নামকরা সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষা-প্রচারক আছেন। একজন 'হিন্দু ডাক্তার'ও আছেন জানতে পারা গেল।

চাংসা

সিয়াংটাংয়ে দুই দিন কাটিয়ে একদিন সকালে চাংসা রওনা হলাম। পাক্কা ৮ ঘণ্টা সাইকেলে চড়াই উৎরাই ঠেলে রাত্রি ৮টায় চাংসায় পৌছলাম। ছোট পাহাড়ের কোলে জনবিরল, উঁচু-নীচু, আঁকাবাঁকা পথ। রাস্তায় চলতে চলতে কখনও দূরে, কখনও বা কাছে ছোট ছোট বস্তী চোখে পড়ল। অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপরে চীনা কুঁড়ে ঘর এবং মাঝে মাঝে উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজির শোভা দূর হ'তে মনকে বড়ই মুগ্ধ করেছিল। অনবরত সাইকেল চালানর ফলে পায়ের মাংসপেশী ব্যথায় টন্‌টন্ করতে লাগল এবং হাঁটু ও গোড়ালি অসাড় হ'য়ে আসছে মনে হ'ল। ব্রেক ক'ষে ক'ষে হাতের কব্জিও ধ'রে গিয়েছিল। সিয়াংটাংয়ে ২।৩ দিন বিশ্রাম ক'রে শরীরে যে তাকৎটুকু সঞ্চিত হয়েছিল তা' এই একদিনেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

চাংসা একটী বড় শহর, প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী। লোকসংখ্যাও বোধ হয় দশ লক্ষের কম নয়। সামরিক কর্ম্মচারী এবং পল্টনের লোকও তথায় খুব বেশী দেখলাম। এখানে একটী বিলাতী পেট্রল কোম্পানীর বড় আড্ডা আছে, তা'তে অনেক ইউরোপীয় কাজ করে। মিশনারীদেরও

একটা ছোট রকমের আস্তানা আছে। নদীতীরে যে হোটেলে থাকতাম তা'র কাছে ইউরোপীয়দের একটা ক্লাবও ছিল। রাত্রি ৮টায় পৌছে শ্রান্ত দেহে খাওয়া ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি সেরে যে একটু সুস্থিরমত ঘুমাব তা'ও ভাগ্যে ঘটল না। রাত্রি ২৷২॥টা পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলায় আমার ঘুমও রাত্রির মত অবসর নিল। পরের দিন প্রাতে হিন্দু ডাক্তারের খোঁজে বের হলাম।

শহরের মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু ডাক্তার। সকলেই তাঁ'কে চেনে। তাই বের করতে মোটেই আর বেগ পেতে হ'ল না। দেখলাম, দুটী বড় রাস্তার মোড়ের উপর একটা বড় হলঘরের দরজায় "হিন্দু চক্ষু-বিশেষজ্ঞ" সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নানাবিধ অভিজ্ঞতার পরিচয় লিখিত আছে। তা'রই ভিতরে এক সহকারিণী চীনা যুবতী আগন্তুকদের রোগের প্রাথমিক বিবরণাদি গ্রহণ করছেন এবং ভিতরের কামরায় ডাক্তার চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আমি একজন হিন্দু "সাই কাই" এই পরিচয় দেওয়ায় সহকারিণীটী আমাকে পাশের একটী কামরায় প্রবেশ করিয়ে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার সাহেব এলেন। হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে দেখলাম, তিনি ইসলামি কায়দায় 'আদাব' দিলেন এবং খাঁটি পোস্তু ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন। ভারতীয়ের মুখে পোস্তু শুনে তিনি হিন্দী জানেন কি না এবং তাঁ'র আসল নিবাসটা কোথায় তা' জিজ্ঞাসা করলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে জবাব দিলেন যে তিনি সীমান্তপ্রদেশবাসী এবং পদব্রজে চীনা তুর্কীস্থান দিয়ে সাংহাইতে এসে বর্ত্তমানে চাঁংসায় ডাক্তারী করেন। সামান্য আলাপাদির পর দ্বিপ্রহরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ডাক্তার সাহেবের নিকট হ'তে স্থানীয় কলেজ ও হাসপাতাল দেখবার জন্য বিদায় নিলাম।

একটা কলেজে ঢুকে তা'র ইমারত দেখে বেশ একটু মনে মনে তারিফ করছি এমন সময় কোথা থেকে একেবারে গুজরৎ খোদ মার্কিণ অধ্যক্ষ এসে আমি কে এবং কেন এদিক ওদিক তাকাচ্ছি তা' জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় দেওয়ায় তিনি একেবারে এক গাল হেসে কতকগুলি চীনা ছাত্রকে ডেকে আমাকে সব দেখাবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। তারপর রাসভারি চালে জলযোগ করবার জন্য বিদায় হলেন। কিন্তু এবার আচ্ছা বিপদেই পড়লাম!

আমি মনে করেছিলাম যে নিরিবিলি সব দেখেশুনে নিজের পথে বের হব। তা' তো হ'লই না, অধিকন্তু আমি একেবারে ভীমরুলের চাকে প'ড়ে গেলাম। তখন প্রশ্নবাণের হাত থেকে কেমন ক'রে রেহাই পাই সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে উঠল। হংকং ও ক্যাণ্টনের মত আমার অনভ্যাস সত্বেও এদের কাছে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করতে হল। বক্তৃতার পর যে প্রশ্নবাণ বর্ষণ হ'ল তা' আরও ভীষণ। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, কায়িক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ এমন কোন ষ্ণিক প্রত্যয়ান্ত শব্দ ছিল না যা'র সম্বন্ধে প্রশ্ন করা না হয়েছিল। বিদ্যাহীনের বিড়ম্বনা যে কতখানি তা' এই পথ চলার মাঝে বিশেষরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কলেজ পর্ব্ব শেষ ক'রে হাসপাতাল দেখতে গেলাম। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, ছাত্রীদের সেবা এবং রোগীর নির্ব্বিকার ভাব বিশেষ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বেশীর ভাগই মার্কিণ। সারা হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে একজন অল্পবয়স্ক চীনা ছোট ডাক্তার আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। হাসপাতালের বৈশিষ্ট্য এই যে কোথাও একটু টুঁ-শব্দ নাই।

চাংসার হিন্দু ডাক্তার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের একজন পর্ব্বতবাসী মুসলমান। সুদূর চীনে থেকে থেকে আমাদের ভারতের মুসলমান নেতাদের সাম্প্রদায়িকতা বা "জিন্নার চৌদ্দ দফার" ছোঁয়াচ হ'তে এই ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সংখ্যালঘিষ্ঠতা বা বিশ্বমুসলিম ঐক্যের বালাই এঁর আদৌ নাই। ভারতের মুসলমানেরা যদি প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের স্বাদেশিকতা এবং ধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে সহৃদয়তা একবারও দেখে আসেন তা' হ'লে হয়তো প্রভূত পরিমাণে এই সাম্প্রদায়িক কামড়াকামড়ির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ী ফিরে যেতেই তিনি নিকটস্থ এক চীনা মুসলমান মসজিদে আমাকে নিয়ে গেলেন। মসজিদের ইমামের সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় তিনি আমাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। চীন পরিভ্রমণে কোন কষ্ট হয়েছে কি না তা' তিনি জানতে চাইলেন। ভবিষ্যতে পথে যা'তে থাকা-খাওয়ার কোনরূপ অসুবিধায় না পড়তে হয়, তা'র জন্য তিনি চীনা ভাষায় একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "এই পত্রবলে আপনার ভ্রমণপথে আপনি চীনের সর্ব্বত্র চীনা মুসলমানের বাড়ীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন

এবং সকল রকম সহায়তা ও সাহায্য পাবেন।” ইমামের এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ডাক্তার সাহেবের সহিত ফিরে এলাম। পরিপাটী আহারের উপরে ডাক্তারের সহৃদয়তাই বেশী ভাল লেগেছিল। ভারতের দুই প্রান্তের দুইজন অধিবাসী, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কতই না নিবিড়! তাঁ'র সৌজন্যে মুগ্ধ হ'তে হয়। উভয়ের শুভ-পরিচয় ক্ষণিকের হ'লেও বিদায়বেলায় তাঁ'র গাঢ় আলিঙ্গন মনে পড়লে আজও প্রেম-প্রীতির নির্ঝরে অন্তর আপ্লুত হয়ে ওঠে।

পরের দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় এক সভাগৃহে ডাক্তার সাহেবের চেষ্টায় এক জনসভার বন্দোবস্ত হয়। ডাক্তার সাহেবের সহিত নির্দ্ধারিত সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেখি, বৃহৎ হলটী পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জন ১৫।২০ ইউরোপীয় উপস্থিত হয়েছেন। সভায় ডাক্তার সাহেবই সভাপতিত্ব করলেন। চাংসার জনসাধারণের সমক্ষে ভারতের ব্যথার কথা সাধ্যানুসারেই নিবেদন করলাম। ইতিমধ্যে ভারত সম্বন্ধে এত বেশী বলা হয়েছে যে একপ্রকার কণ্ঠস্থ বলার মতই ব'লে গেলাম। অহিংসা ও অসহযোগ সম্বন্ধে তরুণ চীনের জানবার আগ্রহ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি।

আমার বক্তৃতার পর একজন মার্কিণ অধ্যাপক বক্তৃতা করলেন। অহিংসা ও অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী'র বিশেষ প্রশংসা ক'রে অধ্যাপক বললেন যে ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের ন্যায়শাস্ত্র পৃথিবীকে এক সময় আলোকিত করেছিল। এখন গান্ধীর এই অহিংসা ও অসহযোগ জগতের ভাবধারায় আবার যুগান্তর আনয়ন করবে ইত্যাদি। দেশের সর্ব্বজনপূজিত মহাত্মা গান্ধীর সুনাম বিদেশীর মুখে শুনে অত্যধিক আনন্দই হ'ল। একজন জার্ম্মাণ অধ্যাপকও বক্তৃতা করতে উঠলেন। তাঁ'র নাকি চাংসা নগরে চিন্তাশীল পণ্ডিত ব'লে খুবই সুখ্যাতি আছে। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “আমি ভারত সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি। ভারতের বেদ, বেদান্ত, গীতা, সংহিতা, উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদি প'ড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ভারতীয়েরা তর্কশাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত। কিন্তু বাস্তবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তা'রা এতই পিছিয়ে পড়েছে যে নিজের দেশের শাস্ত্রের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করার শক্তি তা'রা হারিয়ে ফেলেছে। তা'রা গীতা পড়ে ভক্তি নিয়ে, কিন্তু বাস্তবজীবনে তা' প্রয়োগ

করার কৌশল তা'রা বিস্মৃত হয়েছে। ক্রমাগত এবং অনুক্ষণ পারত্রিক ছায়ার পিছনে ছুটাছুটি করতে করতে তা'রা জাতীয় জীবনের পরম খেয়া প্রাণ-উন্মাদিনী শক্তি খুইয়ে বসেছে।" গান্ধী কর্ত্তৃক অনুসৃত অহিংসা নীতিকে তিনি কঠোররূপেই আক্রমণ করলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে বললেন, "পৃথিবীতে যত স্বাধীন জাতি আছে তা'রা সবাই মাংসাশী। সব্জী-ভোজী হাতীর পিঠে মানুষ চড়ে, শক্তিশালী মহিষের গলায় জোয়াল ওঠে, কিন্তু মাংসাশী জীব শৃগালও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।"

সকালে ইউরোপীয় কায়দায় সাজান একটা স্থানীয় হোটেলে চায়ের নিমন্ত্রণে ইউরোপীয়দের সঙ্গে বৈঠক হ'ল। একজন ইউরোপীয় উপদেশ দিলেন যে পরিভ্রমণের সময় রাজনীতি চর্চ্চা যেন কখনও না করি। কারণ এতে অনেক সময়ে ফ্যাসাদে পড়তে হ'তে পারে। তথাস্তু, আমারও রাজনীতি চর্চ্চা করার অভ্যাস মোটেই নাই। পথ চলাই আমার একমাত্র নেশা। এখানে একজন সিনেমার ম্যানেজারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। চায়ের বৈঠক থেকে উঠে প্রাদেশিক লাটসাহেব 'জেনারেল হো'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁ'র ইংরেজী-জানা একজন কেরাণী আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে জেনারেল সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। জেনারেল সাহেবের ইংরেজী জ্ঞান একেবারে নাই বললেই হয়। কাজেই উক্ত কেরাণীর মারফতেই আমাদের সামান্য আলাপাদি হ'ল। বিদায়ের সময় জেনারেল হো জানালেন যে হাঙ্কোতে সাইকেলে গেলে বড়ই নাকি বেগ পেতে হবে, কারণ প্রবল বন্যায় হাঙ্কোর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল ভেসে গেছে এবং বন্যাত্রাণ কার্য্য আরম্ভ করতে হয়েছে। সেই জন্য হাঙ্কো পর্য্যন্ত ট্রেণের ভাড়া বাবদ ৫০ (চীনা) ডলার তিনি আমাকে একরূপ পীড়াপীড়ি ক'রেই দিয়ে দিলেন। হোটেলে ফিরে দেখি, এক চীনা সওদাগর আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন। প্রাথমিক আলাপাদির পর সওদাগর ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে রেশম হয় তা' আমার থেকে টুকে নিলেন। ভারতের বাজারে চীনা রেশম কতখানি চলতে পারে এবং চীনা রেশমের বেশ চাহিদা আছে কি না তা' তিনি জানতে চাইলেন। ব্যবসায় ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকায় আমি ভদ্রলোকটীকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর বিশেষ কিছু দিতে

পারলাম না। তিনি আমাকে তাঁ'দের প্রস্তুত রেশমের এজেন্সী দিতে চাইলেন কিম্বা ক'লকাতা'র কোন ভাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম সুপারিশ করতে অনুরোধ করলেন। আমি অনভিজ্ঞ, কাজেই ব্যবসা সম্বন্ধে কি বলব ?

* এই অধ্যায়ে চিয়াং কাইসেকের কমিউনিষ্ট দলনের ইঙ্গিত ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচারের কথা স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সময় জেনারেল চিয়াং কাইসেক জাপানীদের হাতের পুতুল হয়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, সে সময়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে ওরূপ করতে হয়েছে। সবাই জানেন আজ জাপানীদের অভিভাবকত্ব বর্জ্জন করে জেনারেল চিয়াং কাইসেক জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্টগণের সহযোগে জাপানের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। সুতরাং মনেপ্রাণে তিনি বরাবরই জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিষ্টদিগের বন্ধু। কাজেই পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হতে কেউ যেন দেশপ্রেমিক এই চীনা বীরকে ভুল না বোঝেন।

হাঙ্কোর পথে

আজ চাংসা হ'তে বিদায়ের পালা। ঘুম থেকে উঠেই দেখি, পরিচিত অপরিচিত অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। হোটেলওয়ালা খাবার নিয়ে এল। খাবার যা' দিয়েছিল, তা'র অর্দ্ধেকটাও খেতে পারলাম না। যাবার বেলা পেট ভ'রে খেয়ে নেওয়া বড়ই মুস্কিল। অনেক দিন চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠিনি। পরিচিত বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সাইকেলে উঠে পড়লাম। স্নেহ, দয়া, মায়া, সব পিছনে প'ড়ে রইল। এবার হাঙ্কো আমার গন্তব্য স্থান। কাজেই শুধু হাঙ্কোর কথাই মনে পড়তে লাগল। এত ক'রে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম তা' নিমেষে ছিন্ন হ'য়ে গেল। শহর ছেড়ে একটু দূরে এসেই জেনারেল হোর কথা মনে ক'রে একটু ভাবনায় পড়লাম। কারণ তিনি বলেছিলেন যে হাঙ্কোর পথ জলে ভেসে গেছে, আর সে পথে বন্যাগ্রস্ত ব্যক্তিরা একটু অত্যাচারও করতে পারে। যদি চলতে হয়, তবে মনের মধ্যে এসব ভাবনার মোটেই স্থান দিতে নাই। তাই পরমুহূর্ত্তেই ভাবনা দূর ক'রে দিলাম।

মাইল পাঁচেক দূরে এসেই দেখি, পথটা তিন ভাগ হয়ে তিন দিক হতে হাতছানি দিচ্ছে। ভাবতে লাগলাম কোন্ দিকে যাই। চীনের সাধারণ লোককে কখনও কোন স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করলে তা'র কোন হদিস পাওয়া মুস্কিল। কারণ একই স্থানের নাম নানাভাবে উচ্চারিত হয়। যা'কে মুকডেন বলা হয় তা'কে কেউ কেউ ফেন্‌টিংও বলে। এই ক্ষেত্রে মানচিত্র দেখে গন্তব্য স্থানের পথ বের করতে হয়। চীনা মানচিত্রে পূর্ব্ব হ'তেই বড় বড় স্থানগুলি চিহ্নিত ক'রে নিয়েছিলাম। এক গোবেচারী চীনা মজুর পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তা'কেই পথের সন্ধান ব'লে দিবার জন্য মানচিত্র দেখাতে লাগলাম। মানচিত্রে হাঙ্কো শহরটী দাগ দেওয়া ছিল। আঙ্গুল দিয়ে স্থানটী দেখাতেই সে পথ ব'লে দিল। পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমি ভারতের কথা মনে পড়ল। আমাদের দেশে মানচিত্র দেখে ক'জন এরূপ অনায়াসে পথ ব'লে দিতে সক্ষম হয়?

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যেতে লাগলাম। কিছুই নূতন ঠেকছিল না। একদিন গেল, দু'দিন গেল, তারপরই মনে হ'ল যেন নূতন কিছু দেখতে পাচ্ছি। জেনারেল হো যা' বলেছিলেন তা'র কতকটা যেন মিলে যাচ্ছিল। ছিন্ন মলিন বস্ত্র প'রে ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা অলসভাবে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করছে। যা'কে পাচ্ছে তা'কেই তা'রা কিছু সাহায্য করবার জন্য বলছে। এই হ'ল এক গোছের ভিখারী। অন্য ধরণের ভিখারীগুলি 'লেফট রাইট, কুইক মার্চ্চ' ক'রে গ্রামগুলির বুকের উপর দাঁড়িয়ে গৃহস্থকে চাঁদা দিতে বাধ্য করছিল, এভাবে তা'রা চাঁদা আদায়ও করছে দেখতে পেলাম। এতেও গ্রামের লোকজন ত্যক্তবিরক্ত হচ্ছে না, যা'র যা' সাধ্যে কুলায় সে তা'ই হাসিমুখে এগিয়ে দিচ্ছে। সেই দানের ভিতরে কতই না আন্তরিকতা! দেখলে বেশ আনন্দ হয়। আমার কাছে কয়েকটী ছেলে মাথা হ'তে টুপী খুলে ইউরোপীয় কায়দায় ভিক্ষা চাইল। টাকার ব্যাগে যা' ছিল তা'ই উজাড় ক'রে দিয়ে দিলাম। ছেলেগুলি এতে তৃপ্ত হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হ'ল।

এখন আমি স্থির করলাম, উঁচো নামক স্থানে যদি পৌঁছতে পারি তবেই গাড়ী ধরব। পথঘাট তত ভাল নয়। স্থানীয় লোককে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বড় একটা জবাব দেয় না। গ্রাম্য হোটেলগুলিতেও থাকবার স্থান পাওয়া যায় না। এখানে এসে অন্যান্য স্থানের থেকে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো এরা আমাকে অন্য কিছু মনে করে, কিম্বা জাপানীও ভাবতে পারে। কা'র মনে কি আছে তা' জানি না, কিন্তু এদের এই নিষ্ক্রিয় অসহযোগ ভাল লাগছিল না। ধৈর্য্যের তো একটা সীমা আছে। এক্ষেত্রে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। এখন আর হোটেল ছাড়া খাওয়া মিলে না, যা' মিলে তা'ও অনেকটা অখাদ্য। তারপর ভিখারীর দলেই সব জায়গা ছেয়ে গেছে। আমার মত সখের ভিখারীর কে তোয়াক্কা রাখে? এখনও উঁচো পৌঁছতে অনেক দিন লাগবে। প্রতিদিন আমার হিসাবমত পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে চলছিলাম।

পা দু'খানা প্রায় প্রত্যেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। শরীরটা তো প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল। তারপর আজ মনটাও যেন বেঁকে বসল। বিকাল বেলায়

একটী ছোট গ্রামে কোনও রকমে পৌঁছলাম। কিন্তু হঠাৎ ক'টা ছোকরা এসে আমার পিছন নিল। তা'রা কখনও সাইকেলের আগে, কখনও বা পিছনে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু'একটা ঢিল যে ছুঁড়ছিল না তা'ও নয়, কিন্তু সবই সহ্য ক'রে নিচ্ছিলাম। অনেক বার হাসতে চেষ্টা করেছি, পেরে উঠি নাই। হাসির উৎস যেন শুকিয়ে গিয়েছে। ছেলেরা দলে ক্রমেই ভারী হচ্ছিল। আমার ইচ্ছা হ'ল, ওদের পিছনে রেখে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে এই বিশ্রী কাণ্ড হ'তে রেহাই পাই, কিন্তু পা যে চলছিল না। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এক বৃদ্ধ ঘর হ'তে বেরিয়ে এলেন। আমাকে নাকাল করছে দেখে বৃদ্ধ ছেলেদের বেশ একটা ধমক দিলেন। ছেলেগুলি এদিক সেদিক পালিয়ে গেল।

আমি বৃদ্ধের ঘরে গিয়ে দেখি, সেটা একটা চায়ের দোকান। এক পেয়ালা চীনা চা এবং একটা তিলের পিঠা তাঁ'কে দিতে বললাম। বৃদ্ধ সানন্দে আমাকে সেগুলি দিলেন। তারপর বৃদ্ধকে আমার স্বাক্ষরের বইটা পড়তে দিলাম। তিনি বেশ মন দিয়ে তা' পড়লেন। তারপর বইটা ফেরত দিয়ে একখানি রেকাবীতে আমাকে ভাত এবং সামান্য তরকারি খেতে দিলেন। এরূপ রেকাবীতে খাবার দেওয়া চীন দেশে এই প্রথম দেখলাম। খেয়েই কাছের একটা বেঞ্চে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন উঠলাম তখন গ্রামের লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। দোকানে কয়েকজন লোক ব'সে মৃদুস্বরে গল্পগুজব করছে, আর মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আমার ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা কোথা হ'তে একটা লম্বা টেবিল এনে তা'তে নানা রূপ খাদ্য সাজিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ এসে আমাকে গরম জল এবং একখানা পরিষ্কার গামছা দিয়ে গেলেন। আমি হাতমুখ ধুয়ে শরীর ও মনটাকে চাঙ্গা ক'রে খাবার টেবিলে বসলাম। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সবই ছিল। ভূরিভোজনের কসুর হয় নাই। ভাবলাম, হয়তো বিছানা দেবে না, তাই নিজের বিছানা খুলে ঘরের এক কোণে তা' বিছাতে লাগলাম। বৃদ্ধ এসে ইঙ্গিতে জানালেন যে বিছানার বন্দোবস্ত হয়েছে। কাজেই আমার বিছানা আমি গুটিয়ে রাখলাম। যা'রা আমার সঙ্গে ব'সে খেয়েছিল তা'রা কোথায় উধাও হয়ে গেল তা' বুঝতে পারলাম না।

বৃদ্ধ ঘরের ভিতর কি জানি খোঁজাখুঁজি করছিলেন। তিনি একখানা লম্বা দা এবং একটা মোমবাতি বের করলেন। মোমবাতিটা বোধ হয় আমার হাতের দেড় হাত লম্বা হবে। বৃদ্ধের হাতে দুই টিন সিগারেট, দুটী দেশলাই, এক কেটলী চা—আরও কত কি ছিল এখন আর তা' মনে নাই। তবে ধারণা হ'ল, হয়তো পরদিন কোনও পর্ব্ব হবে, নতুবা এরূপ ভাবে তিনি ছোট ছোট জিনিষ খুঁজে বের করছেন কেন? যা'রা আমার সঙ্গে খেয়েছিল তা'রা অনুমান এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসেই বৃদ্ধের কাছে কি বলল। বৃদ্ধ আমাকে শুতে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তিনি যে সব সরঞ্জাম একত্র করেছিলেন, লোকগুলি তা' সবই হাতে ক'রে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ ঘরের দরজায় তালা দিলেন। আমরা অন্ধকার পথে এসে দাঁড়ালাম। কি ভীষণ সে অন্ধকার! হয় মেঘ অন্ধকারকে ঘনীভূত করেছিল, নয় আমার চোখের জ্যোতিই ক'মে গিয়েছিল। বৃদ্ধ আমারই কাছ দিয়ে চলছিল। বৃদ্ধের হাতে দা-টী দেখে আমার বড়ই ভয় হচ্ছিল। এ কি নরবলির ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? আমাকে এত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন? মনে মনে স্থির করলাম, বৃদ্ধের শরীরে যে শক্তি আছে, তা'তে যদি আমি তাঁ'কে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে দা-টা কেড়ে নেই, তবে বৃদ্ধ কিছুই করতে পারবেন না। তারপর যে দা দিয়ে আমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হচ্ছে তা' দিয়ে অন্ততঃ দু'একজনের মুণ্ডপাত না ক'রে আমি নিহত হব না।

পথ চলার বিরাম ছিল না। আমার মনে হয় গ্রাম ছেড়ে অন্ততঃ অর্দ্ধ মাইল দূরে চ'লে এসেছি। একে অন্ধকার, তা'র উপর একটা গভীর নিস্তব্ধতা। আমার শরীরটা যেন ছমছম করতে লাগল। আর কিছু দূর এগিয়েই একটা আলো দেখে ভয় অনেকটা চ'লে গেল। কাছে গিয়ে একটা পরিত্যক্ত বাড়ী দেখলাম, কিন্তু তা' পরিত্যক্ত হ'লেও বেশ সাজানগুছান ছিল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। এরূপ দুর্গন্ধ শুধু চীন দেশে নয়, ফরাসী দেশের প্যারী নগরের বুকের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে বয়ে যায়। এ নিয়ে চীনাদের গালি দেওয়া কিম্বা নাক সিঁটকান ভাল মনে করি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা ঘর জুড়ে মাচা ক'রে তা'র উপর বিছানা পাতা হয়েছে। এই বিছানায় ইচ্ছা করলে পঁচিশ

জন লোকও আরামে শুতে পারে। হয়তো আমরা সবাই শোব, তাই এ ব্যবস্থা।

বিছানার পারিপাট্য দেখে বেশ আনন্দ হ'ল। এরূপ বিছানায় অনেক দিন শুইনি। তা'র ঠিক মাঝখানে একটী মাত্র মশারি টাঙ্গান রয়েছে। এছাড়া এই মশারিটার ভিতরে একটা মোমবাতিও মিট মিট ক'রে জ্বলছে। বৃদ্ধের সঙ্গে আনীত কেটলী, দুটী দেশলাই, সিগারেট সবই মশারির ভিতরে বালিশের কাছে রাখা হ'ল। তারপর বড় মোমবাতিটীও জ্বালান অবস্থায় রইল। ঘরখানি আরও আলোকিত হ'লে বৃদ্ধ আমাকে শুতে ইঙ্গিত করলেন এবং সবাই মিলে আমাকে চীনা ধরণের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। বিদায়ের বেলায় দেখলাম, বৃদ্ধ তাঁ'র বড় দা-খানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সন্দেহ করার কিছুই ছিল না। আমাকে এগিয়ে দিবার জন্যই যে এ 'রণসজ্জা' হয়েছিল তা' ভেবে মনে মনে একটু হাসলাম। যে ঘরে শুলাম তা'র সামনের ও পিছনের দরজা দুটী ঠিক মুখোমুখি ছিল, কিন্তু তা'তে কোন পাট ছিল না। পাট থাক আর না-ই থাক আমার তা'তে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ চীনের ডাকাত, চোর, জলদস্যু সব বেটাকেই দেখে নিয়েছি। কেউই তো প্রাণে মারে না। তবে আর ভয় কি? বিছানাতে ব'সে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা'র খেয়াল ছিল না।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখি স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আটটা বোধ হয় বেজে গেছে; আমাকে যে অনেক দূর যেতে হবে। তাই এক লাফে বিছানা হ'তে উঠে যেমনই মাটিতে নামব, অমনি সাজান মাচার এক পাশে অসাবধানতা বশতঃ আমার পা পড়তেই বিছানাসমেত তা' আমার গায়ের উপর পড়ল। শরীরটা কেঁপে উঠল। একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য করতেই ব্যাপারখানা কি বুঝলাম। এক দুই ক'রে গ'ণে দেখলাম, আটটী মৃতদেহপূর্ণ কফিনের উপর আমার বিছানা পাতা হয়েছিল। এই ঘরটা হ'ল চীনাদের কবরস্থানের সদর দরজা মাত্র। অষ্টমী এবং পূর্ণিমা ছাড়া চীনারা কখনও কবর দেয় না। এর মধ্যে যা'রা মরে তা'দের এই দুই তিথির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই

আটটী কফিনে আটটা মৃতদেহ অষ্টমীর অপেক্ষায় আছে। তা'রই উপর পাতা জমকাল বিছানায় আমাকে শুতে হ'য়েছিল।

টাকার ব্যাগটা পকেটে পূ'রে যেমনই ঘর হ'তে বের হয়েছি, অমনি বৃদ্ধের উপর আমার চোখ পড়ল। তাঁ'কে একরূপ টেনে নিয়েই তাঁ'র বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম। বৃদ্ধের বাড়ীতে গিয়ে আমার গচ্ছিত বইখানা আদায় ক'রে এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বেঁধে সাইকেলে চাপলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এখন থেকে কোন গ্রামে গিয়ে আর স্বাক্ষরের বই দেখাব না। কারণ তা'র পাতায় পাতায় চীনা ভাষায় "লিমনাথ বিশোয়াসী বড়ই সাহসী এবং শক্তিশালী" এই কথা কয়টী লেখা ছিল ব'লেই যে এরা আমার শক্তি ও সাহস পরীক্ষার জন্য আমাকে এত ঘটা ক'রে আটটী কফিনের উপর শুতে দিয়েছিল তা' আর বুঝতে বাকি রইল না।

উঁচো

বৃদ্ধ চীনা দোকানদারের বাড়ী থেকে বের হ'তেই, কি জানি এক অদম্য শক্তি জেগে উঠল। পূরা দমে সাইকেলটা চালিয়ে গ্রামের বাইরে ফাঁকা মাঠে এসে পড়লাম। মুক্ত বায়ু ও গ্রামের চারি দিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলল। গুন্ গুন্ ক'রে গান ধরলাম। যদিও পথঘাট ভাল নয় তথাপি বিজয়ী বীরের মত চলতে লাগলাম। গত রাত্রের জয় মনে এমন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করেছিল যে গন্তব্য স্থানে কখন পৌছব সে কথা মনেও হচ্ছিল না। কিন্তু পথ পথই। চললে পরেই তা' শেষ হবে। আমার প্রার্থনায় কিম্বা ক্রন্দনে পথ ছোট হয়ে যাবে না।

হিন্দু ডাক্তারের বন্ধু ইমাম সাহেবের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে মুসলমান চীনাদের নামে একখানি চিঠিও দিয়েছিলেন। তাই আজ একটী মুসলমান চীনার বাড়ী অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। কথাটা বেশ ক'রে মাথায় পেকে উঠল। গ্রাম এসে গেল, কিন্তু বিকাল না হ'লে রাত্রি কাটাবার স্থান কেন খুঁজব? আমার চলতি প্রথামত একটা বাড়ীতে খাবার খেয়ে নিলাম। আজকার দিনটা ভালই যাবে ব'লে মনে হ'ল।

চারটের পূর্ব্বেই একটা ছোট গ্রামে এলাম। গ্রামখানা পরিষ্কার বললে দোষ হয় না। একটা ঘরের বারান্দায় একখানি বেঞ্চ প'ড়ে রয়েছিল, তা'তেই ব'সে পড়লাম। গ্রামের লোকের দৃষ্টি এড়াতে পারি নাই। অনেকেই এসে আমাকে এক পলক দেখে গেল, অনেকে কথাবার্ত্তা বলল, আবার অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যেতে চাইল। আমি ক্রমাগত 'মুসলমান চীনা' শব্দটী আওড়াতে লাগলাম। যে-ই শব্দটী শুনছিল সে-ই আমার প্রতি যেন একটু ঔদাসীন্যের ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু তা'রা এমন করছে কেন? এখানেও কি তবে ভারতের মত হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব? যা' হবার হবে। একটা বেঞ্চি তো পাওয়া গেছে। শোবার ভাবনা নাই। দুপুরে খেয়েছি। রাত্রে দু'মুঠা ভাত জুটে যাবেই, তবে আর এত ভাবনা কিসের? কিন্তু সত্য বলতে কি, গ্রামে এসে বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে মন চাইল না। ইচ্ছা হ'ল, কা'রও বাড়ীতে, নয় একটা হোটেলে গিয়ে জন্মগত অভ্যাসমত সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সময় কাটাই। ঠিক করলাম, হয় আজ মুসলমান বাড়ী যাব, নয় এই বেঞ্চিতেই রাত্রি কাটাব।

সন্ধ্যা হবার একটু পূর্ব্বে একটী যুবক এল। তা'র মুখ দেখলেই মনে হয়, কি যেন এক মনোকষ্ট তা'কে নিতান্ত পীড়া দিচ্ছে—অথচ সে মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করছে। তা'কে 'মুসলমান চীনা' বলতেই সে উত্তর দিল 'হাঁ'। পকেট হ'তে তা'কে ইমামের পত্রখানা দিলাম। সেটা বেশ ভাল ভাবে পাঠ ক'রে সে আমাকে "লাইলা" (আসুন) বলল। তারপর সে আমার সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। বেশী দূর যেতে হ'ল না। দূর হ'তেই গ্রামের পিছনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা গেল। আমার ধারণা ছিল না যে চীনা মুসলমানের এত বড় বাড়ী থাকতে পারে। সদর দরজা পার হ'য়ে আমরা একটা ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তা'রই পাশে একখানি ঘর। বাতি জ্বালান, বিছানা পাতা ও দরকারী জিনিষ সাজান, দেখলেই মনে পড়ে বাঙ্গলা দেশের ভদ্রলোকের বৈঠকখানার দৃশ্য। যুবক আমাকে ঘরে বসিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে স্নান করব কি না জিজ্ঞাসা করল। আমি সানন্দে জানালাম—হাঁ, স্নান করব।

আমি পথিক, পথের দুঃখকষ্ট এবং ক্লান্তির অপনোদন হয় স্নানে। স্নান

এনে দেয় মনের মধ্যে একটা অপরিসীম পবিত্রতা। তাই কাপড় ছেড়ে অন্দরমহলে স্নান করতে গেলাম। বহু ছোট-বড় কোঠা, প্রায় ঘরেই লোকজন চলাফেরা করছে। আমাকে তা'দেরই পাশ কাটিয়ে স্নানের ঘরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কেউ ফিরেও তা' দেখল না। এ কি আভিজাত্য-পূর্ণ ভাবের অভিব্যক্তি! যা' হোক আমার তা'তে বয়ে গেল। রাত্রিটা শুধু কাটাতে হবে, এর বেশী তো আর নয়? স্নান হ'লে যুবক আমাকে এক প্রস্থ চীনা পোষাক পরতে দিল। আমি কোনও রূপ দ্বিধা না ক'রে সেগুলি প'রে ঘরে এলাম। চীনা চায়ের পরিবর্ত্তে দুধ-চিনি-দেওয়া চা এবং একখানা ছোট পাঁউরুটি পাওয়া গেল। পাঁউরুটি দেখেই মনটা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেচে উঠল। সেটা একরকম গিলেই খেয়ে ফেললাম। তারপর চা-পান। যুবকটী আগাগোড়া আমার কাছে সুবোধ ছেলেটীর মত দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম, সে আমার খাবার পদ্ধতি ভাল ক'রেই লক্ষ্য করছে। যুবক চ'লে গেল। তারপর এক অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ ঘরে ঢুকেই আমাকে 'সেলাম আলিকম' বললেন। আমি হাতজোড় ক'রে তাঁ'কে নমস্কার করলাম। যে পত্র আমি ইমামের কাছ থেকে এনেছিলাম তা'তে পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে আমি 'কাফের হিন্দু'।

বৃদ্ধ হিন্দুস্থানে অনেক দিন ছিলেন। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই এবং ক'লকাতা তিনি দেখে গেছেন, এছাড়া মক্কাও গিয়েছিলেন। তিনি বেশ ভাল হিন্দুস্থানীতে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তা'র একটী কথাও ভুলবার মত ছিল না। এখনও ভুলি নাই। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের মুসলিম হিন্দুদের মত এখানকার কাফের চীনারাও গোমাংস খায়। গোমাংস খায় ব'লে কাফের চীনাদের উপর তাঁ'র কোনও রাগ নাই, তবে গাভী হত্যা এবং বিশেষ ক'রে গর্ভবতী গাভী হত্যা তাঁ'র মোটেই ভাল লাগে না। কাফের চীনারা কিন্তু গর্ভবতী গাভী হত্যা করতে বড়ই ওস্তাদ। প্রথমতঃ, তা'রা পেট চিরে একটী কচি বৎস পায়, তা'র নখ হ'তে মুণ্ড পর্য্যন্ত সবই সুখাদ্য। দ্বিতীয়তঃ, তা'রা পায় গাভীর স্তনের জমান দুধ, তা' ভেজে সুস্বাদু তরকারী করা হয়। তারপর গর্ভবতী গাভীর মাংসও এক উপাদেয় খাদ্য। ভদ্রলোক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'চীন দেশ হ'তে কাফের চীনারা গোজাতি এমন ভাবে ধ্বংস

করতে আরম্ভ করেছে যে, যে দু'একটা গরু তাঁ'রা পালছেন, তা'র উপরও কাফেরগুলির সর্ব্বদা লোলুপ দৃষ্টি। এসব গোধন চুরি করতে কাফেরগুলি এত ওস্তাদ যে পকেট কাটা হ'তেও গরু চুরি তা'রা তাড়াতাড়ি করতে পারে। তারপর বধের নিয়মও একটু বীভৎস রকমের। প্রথমতঃ, তা'রা জীবটীর ঠ্যাং বেঁধে ফেলে। তারপর গলার নীচ দিয়ে দু'হাত লম্বা একখানা ধারাল ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। এক বিন্দু রক্তও মাটিতে পড়তে পারে না। সব রক্ত একটা পাত্রে রাখা হয়। ঐ রক্ত জমিয়ে তা'রা ছোট ছোট টুকরা ক'রে কাটে। পরে তা' ভেজে তা'র ঝোল রান্না করা হয়।" বৃদ্ধের কথাগুলি শুনছিলাম, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম বের হচ্ছিল।

বৃদ্ধ আরও বলতে লাগলেন, "সেদিন আমারই বাড়ী হ'তে একটী যুবতী গাভীকে চুরি ক'রে নিয়ে কাফেরগুলি হত্যা করেছে। এই গাভীটীর দাম অন্ততঃপক্ষে দু'শত মেক্স (চীনা ডলারকে মেক্স বলা হয়)। কাফেরগুলির অত্যাচার এখন চরমে উঠেছে। টাকা কর্জ্জ নেবে, কিন্তু ফেরত দিবার কথাটী ওঠালেই তা'রা তেড়ে আসে। তা'দের সংখ্যাধিক্য তো আছেই, তা'র উপর রাজশক্তিও যেন টলটলায়মান। কে কা'র দিকে চায়? এরূপ ক'রেই আমাদের দিন কাটছে।" তারপর বৃদ্ধ খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেলেন।

চীনা ধরণেই খাওয়ার বন্দোবস্ত হ'ল। স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে খেলাম। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল যে খাদ্যে কোনও রূপ আমিষ ছিল না। তারপর ঘি, মাখন, দই, দুধ এবং ভারতীয় ধরণের তরকারিও ছিল। খাওয়া শেষ ক'রে আবার বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। এবার বৃদ্ধকে কথা বলতে না দিয়ে আমার কথার জবাব চাইলাম। প্রশ্নগুলির জবাব পেয়ে ধারণা হ'ল যে চীন দেশে যত চীনা মুসলমান আছে তা'রা সবাই হয় ধনী, নয় মধ্যবিত্ত গোছের। গরীব তা'দের মধ্যে নাই। সাধারণতঃ তা'রা ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং কাফের চীনাদেরই চাষাবাদের কাজে লাগায়। কাফের চীনাদের বাড়ীতে তা'রা খায় না, এমন কি তা'দের সঙ্গে মেলামেশা করতেও ভালবাসে না। যত বড় পদবীধারীই হোক না কেন কাফের চীনারা মুসলমানদের সঙ্গে একত্র বসতে পারে না। তা'রা কখনও কাফের চীনাদের অভিবাদন করে না। কাফেররাই আগে অভিবাদন ক'রে আসছে এবং এখনও করে।

বৃদ্ধের দুটী নাম—একটী হ'ল মহম্মদ ইব্রাহিম, আর একটী হ'ল মা চেন। এই মা চেন নামেই তিনি লোকসমাজে পরিচিত।

মহম্মদ ইব্রাহিম নাম লোকসমাজে মোটেই না চলবার একটী কারণ হ'ল, কাফের চীনারা আরবী মোটেই উচ্চারণ করতে পারে না। উচ্চারণের চেষ্টা করা তো দূরের কথা, আরবীকে বরং তা'রা ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে। বৃদ্ধের কাছ থেকে এতগুলি সংবাদ সংগ্রহ ক'রে হাঁপিয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার ইচ্ছা হ'ল। তাই বৃদ্ধকে মুখ ফুটেই বলতে হ'ল যে আমি এখন শুতে চাই। বৃদ্ধ সে রাত্রের মত আমাকে ছেড়ে দিলেন। এই ক্রমাগত কথা বলার বালাই হ'তে বৃদ্ধ যেন থামতে চান না। তিনি শুধু নিজেই বলতে চান, অপরের কথা শুনতে যেন তাঁ'র মোটেই ভাল লাগে না।

প্রাতে যদিও চ'লে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবু হাবভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম যে আমি চ'লে যেতে চাই। বৃদ্ধ আজকের দিনটাও থেকে যাওয়ার জন্য বার বার বলতে লাগলেন। তারপর অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে স্বেচ্ছায় থেকে গেলাম। প্রাতরাশ সমাপন ক'রে ক্ষুদ্র চীনা মুসলমান পল্লীতে বেড়াতে বের হ'লাম। কয়েকটা বড় বড় বাড়ী, আর তা'র সঙ্গে বাগান; কিন্তু বাড়ীই আছে, লোকজন বড় নাই। চারি দিকে যেন প্রেতপুরীর মত একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যুবকযুবতী, বালকবালিকা কা'রও মুখে কথা নাই, মনে আনন্দ নাই। একটা নীরব নিথর নিস্পন্দ ভাব। এদের দেখে হঠাৎ আপনা হ'তেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? চিন্তা করতেই পরক্ষণে জবাব মিলল। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার অহমিকাই এই সর্ব্বনাশা পথে এদের টেনে নিয়ে গেছে। যদিও খাওয়ার লোভে রয়ে গেছি, তবুও মনটা এহেন স্থানে আর যেন তিষ্টিতে চাইল না। মুসলমান পল্লী পার হয়েই অন্য চীনা পল্লীতে পড়লাম। অভাব-অভিযোগ এদের লেগেই আছে। ভিখারীরা দল বেঁধে চলেছে। তারপর চলেছে স্বেচ্ছাসেবকের দল। চাঁদা আদায় নিয়ে এরা ব্যস্ত। এদিকে এসে যেন দেহে প্রাণ এল। হোক এরা গরীব, তবুও এদের প্রাণ আছে। কারণ তা'রা কথা কইছে, হাসছে, কাঁদছে। অনেকক্ষণ বেড়াতে ভাল লাগল না। কোন্ পল্লীতে আড্ডা নিয়েছি তা' এ পাড়ার

চীনারা জানে, তাই কেউ আর কথা কইছে না দেখে আমি ফিরে এলাম।

বৃদ্ধ আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আসামাত্রই নানা কথা উত্থাপনের পরে কোয়াণ্টাং প্রদেশের অনেক সংবাদ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁ'র কথার যথাযথ উত্তর দিয়ে আমি তাঁ'র নিকট জানতে চাইলাম যে তাঁ'রা অন্য চীনাদের সঙ্গে তেমন ভাবে মেলামেশা করেন না কেন, আর তাঁ'দের পাড়ার লোকদের এরূপ নির্জ্জীবতারই বা কারণ কি? বৃদ্ধ তা'র সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আমিও আর জবাব পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করি নাই।

পরদিন প্রাতে গ্রাম ছেড়ে উঁচো নামক শহরে পৌছলাম। শহরে পৌছেই ছোট একটা হোটেলে গেলাম। ঠিক হ'ল, খাওয়া-শোওয়া নিয়ে সত্তর সেণ্ট দিতে হবে। ঘরখানা ভালই। একটু বিশ্রাম ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম। অলিগলি ঘুরে এলাম। এখানে বাস্তবিকই ইয়াংসী নদের প্লাবনের ধাক্কা লেগেছে। মানুষ যে প্লাবনের দ্বারা এত বিপর্য্যস্ত হয় তা' আমার ধারণা ছিল না। তবে এটা চীন দেশ ব'লেই গরীবের দল এখনও বেঁচে আছে। যা'র যা' সাধ্য তা' সে দান করছে। তা'তেও হচ্ছে না। গরীবের ক্ষুধা ভয়ানক। অত্যাচারও যে হয়নি তা' বলা যায় না। ভিখারীর দল যা'কে পাচ্ছে তা'কেই কিছু পাবার আশায় আক্রমণ করছে। কিন্তু এই ভিখারীরা স্বভাবভিখারী নয়, এরা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। এদের জুলুম দেখলেই মনে হয় যে পেটের ক্ষুধায় অস্থির হয়েই এরা এই দৌরাত্ম্য করছে।

হোটেলের দরজা সাড়ে সাতটার সময় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় ব'লেই আর বাইরে থাকতে পারলাম না। শুয়ে আছি এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। দরজা খুলে দেখি এক দল পতিতা দাঁড়িয়ে আছে। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা গান গাইল। গানের পুরস্কার দিলাম দশ সেণ্ট। কিন্তু আমি ওদের দুর্দ্দশার কথাই ভাবছিলাম। এবার সত্যকার আক্রমণ হ'ল। পাঁচ ছয় জন পতিতা একসঙ্গে আমার ঘরে এসে পড়ল। তা'রা কিছুতেই বের হবে না। 'বয়' এসে ম্যানেজারকে ডেকে আনল। ম্যানেজার ওদের

বুঝিয়ে কত বললেন। শেষটায় আমার হয়ে দুটী ডলার দিয়ে তা'দের বিদায় করলেন। রাত্রিটা কাটিয়ে প্রাতে আবার বেড়াতে বের হলাম।

একটা পথের মোড়ে কয়েকটী ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ওদের পরণে ছেঁড়া কাপড়, মুখ শুকনা। দেখলেই মনে হয় যে গত রাত্রে ওরা কিছুই খায় নাই। অনুমান হ'ল, ওদের কা'রও বয়স আটের উর্দ্ধে যায় নাই, এর মধ্যে যেটী বড় সে-ই হ'ল দলের সর্দ্দার। পায়ে তা'র ঘাসের জুতা। সকলের হয়ে সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইল। ইচ্ছা হ'ল, পেট ভ'রে খাইয়ে দিই। ছেলে-গুলিকে সঙ্গে ক'রে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্রত্যেককে ভাত এবং তরকারি পেট ভ'রে খেতে দিতে বললাম। রেস্তোরাঁর মালিক ওদের খাবার দিতে লাগলেন। আমিও তা'দের সঙ্গে খেতে ব'সে গেলাম। একটী ছেলে বোধ হয় ব'লে দিয়েছিল যে আমি খাওয়াচ্ছি। তা' শুনেই আরো কতকগুলি ছেলে আমার কাছে খাওয়ার পয়সা চাইতে লাগল। আটটী ছেলের খোরাকী বাবদ আটটী ডলার বড় ছেলেটীর হাতে দিয়েই সাইকেলটাতে এক লাফে উঠে সোজা হোটেলে চ'লে এলাম।

হোটেলের সদর দরজা বন্ধই থাকে। তবুও কতকগুলি ছোকরা কি ক'রে হোটেলে ঢুকে গোলমাল করতে লাগল তা' বুঝলাম না। ম্যানেজার এসে তা'দের অতি কষ্টে তাড়িয়ে দিলেন। অনেক চিন্তা ক'রে এই বুভুক্ষুদের হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য বেলা একটার সময় ষ্টেশনে গিয়ে একখানা হাঙ্কোর টিকিট কিনলাম। গাড়ীর বড় দেরী ছিল না। বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী এসে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াল। টিকিট আদায়কারী, ষ্টেশন-মাষ্টার সবাই আমাকে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার টিকিট ছিল তৃতীয় শ্রেণীর। গাড়ীতে যে গার্ড ছিলেন তিনিই আমায় নিরাপদে হাঙ্কো পৌছানর ভার নিলেন। গাড়ী ছাড়ল। ক্ষণিকের পরিচিত ভদ্রলোকেরা এত অমায়িক ভাব দেখালেন যে তাঁ'দের কথা অনেক দিন আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী অল্পই ছিলেন। তাঁ'রা প্রায় সকলেই এসে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে গেলেন। এছাড়া তিন জন ইউরোপীয় যাত্রীও ছিলেন। তাঁ'রা তাঁ'দের বৈশিষ্ট্য এবং আভিজাত্য বজায় রেখে আমার 'শ্রীমুখ' যে ভাল

ক'রে দেখেন নাই তা' নয়, তবে অন্যান্যদের মত তাঁ'রা এসে কথাবার্ত্তা ব'লে আপ্যায়িত করেন নাই। একটা 'বয়' পনের মিনিট পর পর গরম তোয়ালে এনে হাজির করছিল। চীনা ভদ্রলোকদের মত আমিও তা' দিয়ে হাতমুখ মুছে নিচ্ছিলাম। এতে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল। গরম তোয়ালে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বয়' সবুজ চা-ও এনে দিচ্ছিল। এই সবুজ চা চলন্ত গাড়ীতে বড় উপকারী।

গাড়ীতে অনেক টিকিট-চেকার দেখে তাক লেগে গেল। এতগুলি টিকিট-চেকার কি করে তা' ভেবে পাই নাই। তবে কি চীনের গাড়ীতে অনেকে বিনা পয়সায় ভ্রমণ করে? গাড়ী ছাড়ার কতক্ষণ পরেই চেকারগণ টিকিট চেক করা শেষ ক'রেই প্রত্যেকে এক একখানা ঝাঁটা নিয়ে কামরা-গুলি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন। আমি দ্বিতীয় শ্রেণী ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে বসলাম। সেখানে কোন অত্যাচার হয় কি না তা'ই দেখবার ইচ্ছা। চেকারগণ কামরাগুলি পরিষ্কার ক'রে যাত্রীদের কা'রও কাপড় ধ'রে, কা'রও অপরিষ্কার দাঁত বের ক'রে, কা'রও মুখের কালো দাগগুলি দেখিয়ে কি বলতে লাগলেন। তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে চেকারগণ শুধু টিকিট দেখেই সন্তুষ্ট নন, সর্ব্বরকমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিও তাঁ'রা দৃষ্টি রাখেন।

আমাদের গাড়ী বেশ বেগেই চলছিল। এখানকার ইঞ্জিনগুলি ট্রানস্-সাইবেরিয়ান রেলপথের ধরণের। মাঝে মাঝে ষ্টেশনগুলিতে গাড়ী থামছে, যাত্রী উঠছে আর নামছে। কিন্তু গোলমাল মোটেই নাই। ফেরিওয়ালা বেশ মিহিস্বরে পদ্য আওড়ে আপন সওদার তারিফ্ গাইছে। যেন সে শুধু সওদা বিক্রী করে না, একটু আধটু আনন্দও দিতে চায়। সব ফেরিওয়ালাই সুপুরুষ। তা'দের পোষাক বেশ জমকালো। এক ভদ্র-লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, যে সব লোক ষ্টেশনে ফেরি করে তা'দের যেমন স্বাস্থ্য লক্ষ্য করা হয় তেমনি পোষাকের দিকটাও দেখা হয়। তিনি দুঃখ ক'রে বললেন, "একেই আমাদের সামান্য মাত্র রেলপথ আছে, তা'তে যদি এইটুকুও না করা হয়, তবে ভাল দেখায় কি? যদিও আমাদের সঙ্গে জাপানীদের বেশ রেষারেষি রয়েছে তবুও ওদের কাছে আমাদের শিখবার

অনেক আছে। আমরা জাপানী প্রথায়ই রেলগাড়ী চালাচ্ছি। যদি আপনি জাপানে যান তবে দেখবেন জাপানীরা কত সুন্দর ক'রে রেলগাড়ীর হেপাজত করছে। এখনও আমরা জাপানীদের মত উন্নতি করতে পারি নাই ব'লে দুঃখিত।"

বন, প্রান্তর, পাহাড়, নদী—আমাদের গাড়ীখানি একের পর এক পার হ'তে লাগল। কেউ দৃশ্য দেখছে, কেউ সংবাদপত্র পাঠ করছে, কেউ বা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। যখন যা'র ক্ষুধা পাচ্ছে তখনই চলন্ত গাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট কামরায় গিয়ে খেয়ে আসছে। রাত্রিটা আমার এক ঘুমেই ফুরিয়ে গেল। প্রাতে উঠে দেখি, আমরা সেই জলপ্লাবিত বিভীষিকাপূর্ণ হাঙ্কো নগরীর প্রায় কাছাকাছি এসেছি। সামনেই উঁচো নগরী। গাড়ীখানা প্লাটফরমে এসে দাঁড়াল। পরিচিত ভদ্রলোকদের নমস্কার ক'রে বিদায় নিয়ে প্লাটফরম হ'তে বেরিয়ে দেখলাম, ইয়াংসী নদের উপর কোন পুল নাই। কাজেই ফেরীতে পার হ'তে হবে। ওপাড়েই হাঙ্কো নগরী। জেটি হ'তে একটু দূরে নদীরই পাড়ে দাঁড়িয়েই সে মুখর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এর সঙ্গে হাওড়া এবং ক'লকাতার বেশ সাদৃশ্য আছে। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আর কোথাকার ভাবনা ভাবছি!

হাঙ্কোর মুখোমুখি

হাঙ্কো যাওয়া হ'ল না। ইয়াংসী নদের তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা নদীর দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। ইচ্ছা হ'ল উঁচোতে গিয়ে তা'র রূপের সঙ্গে হাওড়ার স্বপ্ন-শ্রীর তুলনা করি। আমার তল্পিতল্পা সাইকেলের সঙ্গে বেঁধে আঁকাবাঁকা গলি পথে চলতে লাগলাম। সে গলিগুলি কাদায় ভর্ত্তি, তা'রই মাঝে মাঝে বুভুক্ষুর দল বসেছিল। কা'রও শরীর আবৃত করবার বস্ত্র নাই। যে সামান্য ছিন্ন বস্ত্র আছে তা'ও এত ময়লা যে দুর্গন্ধের জন্য তা'দের পাশ দিয়ে চলা কষ্টকর। দেখলে মনে হয়, স্নান না করাই তা'র একমাত্র কারণ। এমন লোকও দেখেছি, যা'র গাত্র-চর্ম্ম "চাম উকুনে"র কামড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। এই বুভুক্ষু দলকে সাহায্য করবার জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল স্থান হ'তেই টাকা পাঠান হয়েছে, এমন কি চীনের শত্রু জাপানও তা'তে বাদ পড়ে নাই। তবে এ দুর্দ্দশা কেন?

ঘুরে ঘুরে একটা সেবাশ্রমে গেলাম। সেখানে সেবক-সেবিকা সবাই মিশনারী। তাঁ'রা প্রাণপণে লোকের সেবা তো করছেনই, অধিকন্তু চীনা বৌদ্ধদের খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিতও ক'রে তুলছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাঁ'দের কাজ দেখলাম। একজন মহিলা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই?" জবাব দিবার মত আমার কিছু ছিল না, তবুও বললাম—সেবাকার্য্য কিরূপ চলেছে তা' দেখতে এসেছি। বিদেশী দেখে তিনি আমাকে বসতে বললেন। ব'সে রইলাম। দলে দলে লোক আসতে লাগল। ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র বিতরিত হচ্ছে। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁরা ভিখারীদের স্নানের কোন বন্দোবস্ত করতে পারেন কি না? মহিলা বললেন যে আগে স্নান করাবার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু এখন তা' বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। শূকরকে হাজার বার স্নান করালেও, সে কাদায় যাবেই। জবাবটা শুনে আর সেখানে বেশীক্ষণ ব'সে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না।

কিন্তু কোন্ পথে ওখানে গিয়েছি এবং কোন্ পথে ওখান থেকে বেরিয়ে আসব তা' কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না। কাজেই যে দিকে চোখ যায় সে দিকেই চলছিলাম। একে তো ছোট গলি, তা'তে আবার তা' দিয়ে লোক চলছে, রিকসা চলছে, আর মাঝে মাঝে দু'একটা সিপাহীও চলছে। গলিতে কাদা ভর্ত্তি থাকার দরুণ সাইকেলটা নিয়ে মহামুস্কিলেই পড়লাম। অগত্যা সাইকেল হ'তে নেমে কাদা মাড়িয়েই হাঁটতে লাগলাম। কতদূর গিয়ে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তা'র কাছে পথ জিজ্ঞাসা ক'রে তা'র নির্দ্দেশমত আমি জেটির দিকে অগ্রসর হলাম। তারপর একটু যেতেই দেখি একটা বড়দরের হোটেল, আর অনেক লোক তা'তে ব'সে খাচ্ছে। আমিও সাইকেলটা বাইরে রেখে একটা চেয়ারে ব'সে ভাত এবং সব্জীর ফরমাশ দিলাম। 'বয়' ভাত এবং সব্জী এনে হাজির করল। ভাত খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম, একজন ইউরোপীয় পোষাক-পরা চীনা খেতে খেতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুণ একটু ধীরে-সুস্থে খেয়ে বিশ্রাম করছিলাম।

ইউরোপীয় পোষাক-পরা চীনা লোকটী আমার কাছে এসে ফরাসী ভাষায় নমস্কার জানালেন। তখন ফরাসী ভাষা আমার মোটেই বোধগম্য হয় নাই।

কাজেই তাঁ'কে ইংরেজীতে বললাম, ফরাসী ভাষা বুঝতে পারি না, দয়া ক'রে ইংরেজীতে কথা বলুন। ভদ্রলোক ইংরেজীতেই আমার পরিচয় নিয়ে বললেন, "চীন দেশ দেখতে এসেছেন, এটা খুবই সুখের বিষয়। যদি ভাল ক'রে দেখতে চান বা আপনার দোভাষীর দরকার হয়, তবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি।" ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, আমি একটু পরেই হাঙ্কো যেতে চাই, বোধ হয় এপাড়ে বেশীক্ষণ আর থাকব না। তিনি তা'র উত্তরে বললেন, "যত পর্য্যটক দেখলাম, তা'রা সবাই শহরে যেতে চায়। কেউ উঁচো দেখতে চায় না। হাঙ্কোতে দেখবার কি আছে তা' জানি না। তবে একটা কথা শুনুন—যদি দেখবার, জানবার কিছু থাকে তবে এপাড়েই আছে, ওপাড়ে নয়। আজ এখানে থাকুন, দেখে বুঝবেন চীন কেমন দেশ।" একথা শুনে একখানা ঘর ঠিক করলাম। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বেড়াতে চললাম।

শহরের অংশ ছেড়ে পাড়াগাঁয়ের মত একটা স্থান দেখলাম। তা'তে দু'খানা চাটাই দিয়ে একটা চালা করা হয়েছে, তা'র নীচে ছেলেপিলে নিয়ে একটী পরিবার স্যাঁৎসেতে ভূঁইতে বাস করছে। এক দুই ক'রে এরূপ অনেক ডেরা দেখলাম। এখানে বন্যার দরুণ জ্বর, আমাশয়, উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোক ম'রে রয়েছে—তা'কে কবর দেওয়ার মানুষ নাই। রোগী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে—তা'কে ঔষধ দেওয়ার কেউ নাই। কেউ ক্ষুধায় কাতর হয়ে শুয়ে আছে—তা'র মুখে পথ্য তুলে দেওয়ার লোক নাই। ভদ্রলোক বললেন, "দেখে নিন, চীন দেশে দেশ-বিদেশ হ'তে কত অর্থ আসছে, আর দেশদ্রোহী চিয়াং-কাই-সেক তা' দু'হাতে তথাকথিত কমিউনিষ্টদের দমন করতে উড়িয়ে দিচ্ছে। যদি আজ ইংরেজ ও মার্কিণ সেবাশ্রম না থাকত তবে হয়তো এসব গ্রামে একটা লোকও থাকত না। চীনা কমিউনিষ্ট বলতে কি বুঝায় তা' কেউ জানে না। চীনারা শুধু জানে "জাপ্পুন কুই" বা জাপানী ভূতদের, যা'রা চীনের বুকের উপর দাঁড়িয়ে চীনাদের শোষণ করছে।" এতদিন আমার ভ্রমণের ভিতরে এরূপ করুণ দৃশ্য আর দেখি নাই। এর পরে যে দৃশ্য দেখলাম তা' অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ। একটী পুরুষ

উলঙ্গ অবস্থায় প'ড়ে ছিল। তা'র প্রায় সর্ব্বাঙ্গ প'চে গেছে, অথচ সে মরে নাই। লোকটীর শরীরের পচনটা ভাল ক'রে বুঝাতে পারলাম না। কারণ তা'র বর্ণনা দিতে আমার শরীর এখনও শিউরে উঠছে।

পরদিন প্রাতে দশটার সময়ে ফেরী পার হয়ে হাঙ্কো নগরীতে উপস্থিত হলাম। অজানা দেশ—যে দিকে চোখ যায় সে দিকেই চলতে লাগলাম। প্রথমেই বৃটিশ কন্সালের বাড়ীতে উঠবার ইচ্ছা হ'ল। তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেই কোথায় থাকতে হবে তা' ঠিক করব। তারপর অন্যান্য কারণও ছিল। নদীর পাড় দিয়ে একটা বড় পথ চ'লে গেছে, তা'কে বাঁধ বলে। আমি তা' ধ'রে চলতে লাগলাম। পথটা আগাগোড়া শেষ করলাম, কিন্তু বৃটিশ কন্সালের বাড়ীর নামগন্ধও মিল্‌লনা। শেষটায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে একজন রুশদেশবাসীর একটা মিঠায়ের দোকানে মিঠাই কিনে তা'কে বৃটিশ কন্সালের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর তা'র প্রদর্শিত পথ ধ'রে কন্সালের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। একখানা ছোট বাড়ী, তা'রই সামনে জীর্ণ 'ইউনিয়ন জ্যাক'টী মৃদুমন্দ বাতাসে নড়ছে। পতাকা'র থামটী এত নীচু যে সামান্য দূর হ'তেও তা' দেখা যায় না, যেন আওরঙ্গজেবের সময়ের কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ধ্বজা। আমার তখন কন্সালকে বলতে ইচ্ছা হ'ল, "বেশ বাপু, এমন ক'রে ধ্বজাটাকে রেখেছ কেন, এর দ্বিগুণ উঁচু ক'রে রাখলেই তো আমার এত কষ্ট পেতে হ'ত না।" কিন্তু সে কথা বললাম না। কার্ড পাঠাতেই কন্সাল ডেকে পাঠালেন। অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। তিনি থাকবার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিতে নারাজ হওয়ায় কোনও হিন্দু এই শহরে বাস করে কি না তা' জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "তা'রা রাজদ্রোহী, তা'দের সঙ্গে মিশবেন না।" আমি বললাম, বেশ ভাল কথা। আপনার কথাতেই বুঝলাম এই শহরে হিন্দুর অস্তিত্ব আছে এবং তা'দের সঙ্গেই আমার থাকতে হবে। কারণ আপনি তো কোন হদিসই দিচ্ছেন না। কন্সাল তৎক্ষণাৎ আমাকে একটী লোক দিয়ে হোটেলে পাঠালেন এবং সেখানে তিন দিন থাকার খরচও দিলেন। কিন্তু যে হিন্দুদের সঙ্গে তিনি মিশতে নিষেধ করেছিলেন আমি তা'দের সঙ্গে তো মিশলামই, উপরন্তু তা'দের সঙ্গে খাবার বন্দোবস্তও করলাম। ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে কথা না বলালেও

চলত, কিন্তু ভারতীয় খাওয়া এবং ভারতীয় ভাষা হিন্দী একমাত্র ভারতীয়দের কাছেই পাওয়া যায়।

হাঙ্কোতে একটী শিখ গুরুদ্বার আছে। যখন অনেক ভারতীয় হাঙ্কোতে বাস করত তখন তা'রা এই গুরুদ্বার তৈরী করেছিল। এখানকার বৃটিশ কন্‌সেশন * উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখ ও পাঠানদের অনেকেরই চাকুরী যায়। যা'দের চাকুরী গেল তা'রা ইচ্ছা করলেই বৃটিশ সরকারের খরচে দেশে ফিরতে পারত, কিন্তু তা' না ক'রে অনেকে হাঙ্কোতেই থেকে গেল। আবার শুনেছি কেউ কেউ গদর দলেও যোগ দিয়েছিল। এরূপ গদর দলের লোক নান্‌কিন্ এবং সাংহাইতেও দেখেছি। এই গদর দলের বিশেষ কোনও ইতিহাস নাই, তবে ওরা নাকি হাঙ্কোতে চীনা রিকসাওয়ালাদের ধর্ম্মঘটের সময় তা'দের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল। এতে বৃটিশ কন্‌সেশনের অনেক ক্ষতি হয় এবং ইংরেজরা স্বেচ্ছায় চীনাদের হাতে কন্‌সেশন তুলে দেয়। গদর দলের তা'তে বেশ সুবিধা হয়ে গেল, কারণ যে গুরুদ্বার শিখরা তৈরী করেছিল তা' তখনকার বৃটিশ কন্‌সেশনের এলাকাভুক্ত ছিল। বৃটিশ এলাকায় গদরদের চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। এখন গদর দলের আড্ডা হয়েছে এই গুরুদ্বার। যা'রা অন্যান্য চাকুরী করে অথচ অল্প আয়ের দরুণ নিজস্ব ডেরাডাণ্ডার ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারে না, তা'রাও অনেকে এই গুরুদ্বারেই রাত্রি যাপন করে। শিখ এবং পাঠানরা এখানে বেশ মিলেমিশে আছে, এমন কি হাঁড়িটাও পৃথক নয়। যা'দের স্বার্থ এক সূত্রে গাঁথা, তা'দের আচারব্যবহার বিপরীত হ'লেও স্বার্থের ঐক্য তা'দের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সাম্য ঘটায়। তা'র প্রমাণ হ'ল হাঙ্কোর গদর দল।

কি ক'রে তা'দের মিলন হ'ল তা' বলছি। 'সেলাম আলিকম' এবং 'সৎশ্রীআকাল' উঠে গিয়ে হয়েছে 'বন্দেমাতরম'—হিন্দু মুসলমান উঠে গিয়ে হয়েছে 'বাঙ্গালী'। আমাকে সেজন্য বড়ই বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ

* চীনে বৃটিশ, ফরাসী, রুশ, জাপানী, ইতালীয় প্রভৃতি বিদেশীদের—সাংহাই, পিকিন্, সোয়াতো, আময়, শ্যামীন, টিয়েনসিন, উহু প্রভৃতি স্থানের নির্দ্দিষ্ট এলাকায় বসবাস ও বাণিজ্য করার জন্য পিকিন্ সরকার হ'তে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঐ স্থানগুলির শাসনভার বিদেশীদের হাতেই ন্যস্ত এবং এগুলিকে কন্‌সেশন বলা হয়।

আমার নমস্কার করার অভ্যাস ছিল। কিন্তু ওরা বলত—"ওসব এখানে চলবে না ভাই, তোমাকে বন্দেমাতরম্ বলতেই হবে। আমরা হিন্দু মুসলমান নিয়ে ঘরকন্না করছি। এখানে শূকর এবং গোমাংস নিষিদ্ধ। ছুৎমার্গ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মদ্যপান করতে কোনও বাধা নাই, কিন্তু মদ্যপান ক'রে গুরুদ্বারের সীমানার ভিতর আসা নিষিদ্ধ। এখানে কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা নির্দ্দিষ্ট কোন সামাজিক নিয়মকে ভাল ব'লে প্রতিপন্ন করা রীতিবিরুদ্ধ। এখানে কোনও ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র পাঠ করা চলে না। দু'খানা ইংরেজী সংবাদপত্র গুরুদ্বারের সভ্যদিগকে পাঠ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু তা'তে যদি কোনও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ থাকে তবে তা'রা তা' কেটে ফেলে।" এছাড়া তা'দের মধ্যে আরও যে কত ঘরোয়া নিয়ম আছে তা'র ইয়ত্তা নাই।

এই গদর দলের সঙ্গে মেলামেশার কথা আমি কন্সালের কাছে মোটেই গোপন করি নাই। কন্সাল হেসে বলেছিলেন, "আপনি পথিক, সকলেরই সঙ্গে আপনার মেলামেশা করতে হবে। তবে বোধ হয় এই মেলামেশার মূলে ছিল ভারতীয় খাদ্যের লোভ? শরীরে শক্তি হয়েছে তো?" আমি তা'র উত্তরে তাঁ'কে বলেছিলাম, "যদি ক্রমাগত সাত দিন ভারতীয় খাদ্য খেতাম তবে একদমে সাতশ' মাইল পার হ'তে পারতাম, তবুও তিনশ' মাইল যাওয়ার পক্ষে তিন দিনের খাদ্যই যথেষ্ট।"

হাঙ্কো নগরী পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে কন্‌সেশন বলা হয়। জাপানী, ফরাসী, ইংরেজ, রুশ এবং চীনা এই পাঁচটী কন্‌সেশন। চীনা অংশকেও অন্যান্য কন্‌সেশনের মত চীনা কন্‌সেশন বলা হয় এবং চীনারাই এই শব্দটী ব্যবহার করে। নিজ দেশে পরবাসী হবার ইচ্ছাও যেন ওদের মধ্যে আছে। প্রকৃতপক্ষে এই চীনা শহরেই পুরাতন হাঙ্কো নগরী ছিল। বৃটিশ এবং রুশ কন্‌সেশন এখন আর নাই। নানা কারণে তা' চীন সরকারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। জাপানী এবং ফরাসী কন্‌সেশন এখনও রয়ে গেছে। বিদেশীরা প্রায়ই ফরাসী কন্‌সেশনে বাস করে। জাপানী কন্‌সেশনে জাপানীরা এবং নামমাত্র কয়েকজন চীনা বাস করে। মাঞ্চুরিয়ার দুর্ঘটনার জন্যই জাপানী কন্‌সেশনে চীনাদের বাস একেবারে

উঠে গেছে। যা'রা আছে তা'রা হয় জাপানীদের ভাড়াটে ও দেশদ্রোহী, নয় বিশ্বপ্রেমিক, যা'রা বশিষ্ঠের মত নিজের সন্তান হারিয়েও বিশ্বামিত্রের আশ্রমে 'হবি' ভিক্ষা করার জন্য নিজের স্ত্রীকে পাঠাতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

শহরটীর সামনেই ইয়াংসী নদ আপন বিশাল বক্ষ বিস্তার ক'রে মন্থর গতিতে সাগরের দিকে চলেছে। তা'র বুকের উপর জাপানী, মার্কিণ, ফরাসী এবং ইতালীয় রণতরীগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন ছিলাম তখন কোনও বৃটিশ রণতরী দেখতে পাইনি। বৈদেশিক বাণিজ্য-তরী আপন মনে আপন কাজে ব্যস্ত। একখানাও চীনা বাণিজ্য-পোত দেখতে না পেয়ে হতাশ হ'তে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম, এ অঞ্চলে নাকি তখনও চীনা বাণিজ্য-তরণী তৈরী হয় নাই। বিদেশী জাহাজের মাঝি-মাল্লারা সবাই চীনা, কিন্তু বিদেশীরাই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করছেন। চীনা মাঝিরা কতকগুলি বড় বড় পুরাতন ধরণের নৌকা পাল খাটিয়ে চালাচ্ছে। এই তরীগুলি যখন নরশক্তির সাহায্যে উজান বেয়ে যায়, তখন মনে হয় চীনাদের মত শক্তিশালী জাতি এই দুনিয়ায় আর নাই। নদী যত খরস্রোতাই হোক তা'রা এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত দশ ঘণ্টা এরূপ ভাবে গতর খাটাতে দেখে অনেকের তাক লাগে। ছোট ছোট ডিঙ্গিগুলি আবার পাল তুলে নদীর এপার ওপার হচ্ছে। তা'ও দেখবার মতই। অনেক ডিঙ্গিতে পুরুষ মোটেই নাই, স্ত্রীলোকই চালিয়ে যাচ্ছে। সন্তান যখন কাঁদছে তখন তা'রা আবার মাইও খাওয়াচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ছোট ছেলেপিলেরাও নৌকা হ'তে প'ড়ে যাওয়ার ভয়ে নৌকার ছইয়ের বাইরে যেতে চায় না।

এক ভদ্রলোক কোনও বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকে লিখেছিলেন, "চীনে যা'রা সারা জীবন নৌকায় কাটায় তা'রা নাকি তা'দের ছেলেপিলের জীবন রক্ষার্থে দু'খানা পাতলা তক্তা দু'হাতে বেঁধে দেয় এবং যদি কোন সময়ে তা'রা এই বাঁধা কাঠশুদ্ধ জলে প'ড়ে যায় তবে এই দু'খানা কাঠের সাহায্যেই তা'রা বাঁচতে পারে।" চীন দেশে প্রায় বৎসর খানেক ছিলাম। নদীতে, খালে, বিলে, সমুদ্রতীরে, এমন কি সাগরেও বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন ব্যবস্থা দেখি নাই। এই চীন দেশ সম্বন্ধে কত আজগুবি গল্প শুনেছি, কিন্তু যখনই চীনে থাকার সময় সেই সব গল্পের কথা মনে হ'ত তখনই আমার হাসি পেত।

আমাদের দেশের মত চীনেও বেদে আছে। মনে রাখা উচিত বেদে বেদেরূপেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই নগণ্য বেদেদের দেখে যদি বলা হয় যে চীনের এক-তৃতীয়াংশ লোক জলে বাস করে তবে ভুল হবে। ক্যান্টন, হংকং প্রভৃতি স্থান হ'তে আরম্ভ ক'রে উত্তর চীনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখেছি, কিন্তু কোথাও এক বেদে ছাড়া অন্য কাউকে সারা দিন বিনা কারণে নৌকায় কাটাতে দেখি নাই।

হাঙ্কোর যতগুলি খণ্ড শহর দেখলাম, তা'র মধ্যে সব চেয়ে জাঁকালো শহর হ'ল ফরাসী কন্‌সেশন। দুর্ভিক্ষের কাল ছায়া হাঙ্কো নগরীর আশেপাশে থাকলেও ফরাসী কন্‌সেশনে এলে মনে হয় এটা একটা আনন্দের লীলাভূমি। নৃত্যগীত, মাজাং খেলা, গুলিখোরের আড্ডা, বারবনিতার উচ্ছলতা, জুয়ার আড্ডা—কোন কিছুরই অভাব নাই। রুশদের মিঠায়ের দোকান ও ফরাসীদের মদের দোকানে লোকের ভীড় লেগেই আছে। বিনা পয়সায় সিনেমা হলে ঢুকে দেখি, চারি দিকে তিল ধরবার স্থান নাই। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখছে। চারি দিকে চীনা, ইংরেজী এবং মার্কিণ চলচ্চিত্রগুলির বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সংবাদপত্রের মারফতে বা এখানকার অধিবাসীদের বাহ্যিক চালচলনে কোথাও যে কোন দুর্ভিক্ষ হয়েছে তা'র বিন্দুমাত্র আভাষও পাওয়া গেল না। আনন্দ-লহরী অনবরত চলছে। ব্যথিত হৃদয়ে সে দৃশ্য দেখে নিলাম।

চীনা শহর তত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। তবে যা'রা পরিব্রাজক, তা'রা এই চীনা শহরেই বেশীর ভাগ সময় কাটায়। পুরাতন ঘরবাড়ী, পুরাতন হালচাল, পুরাতন আশ্চর্য্য জিনিষ সবেই পুরাতনের ছোঁয়া এ শহরে। সে পুরাতনকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমিও বাদ পড়ি নাই। শহরটীতে প্রবেশ ক'রেই সর্ব্বপ্রথম যে একতলা ছোট ঘর দেখা যায় তা'তে একটী শীর্ণ, চিন্তান্বিত চীনা যুবক ব'সে ছিল। তা'রই কাছে ব'সে একটা সিগারেট তা'কে দিয়ে ইংরেজীতে কথা বলতে লাগলাম। যুবক আমাকে সিগারেট ফেরত দিয়ে চ'লে যেতে ইঙ্গিত করল। কাজেই যুবককে ছেড়ে দিয়ে কতটুকু দূরে একটা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। নানারূপ মূর্ত্তিতে মন্দিরটী ভর্ত্তি। প্রত্যেকের পূজার্চ্চনা হচ্ছে। মূর্ত্তিগুলির গড়ন দেখে মনে হল যেন দুনিয়ার

ধ্বংসলীলার একখানা সত্যকার ছবি আঁকা হয়েছে। এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে প্রেমিক, জ্ঞানী, মহান শাক্যমুনি ধ্যানমগ্ন হয়ে ব'সে আছেন। এ দুনিয়ার ধ্বংসলীলার যন্ত্রগুলি দেখে যেন তিনি থ' মেরে গেছেন, আর চোখ মেলে তাকাতে পারছেন না।

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবকে নমস্কার ক'রে একটা ছোট থানার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে দু'জন পুলিশ প্রহরী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। ওদের যেন দেহে প্রাণ ছিল না। তা'রা আমার দিকে একটু তাকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু জড়তা এসে বাধা দেওয়াতেই বোধ হয় চোখ ফিরিয়ে নিল। ঘোরাঘুরি করতে করতে বেশ ক্ষুধা পেয়েছিল, তাই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করলাম। রেস্তোরাঁর এত শোচনীয় অবস্থা যে গ্রাহকের অভাবে গণেশ ডিগবাজি খা'চ্ছে। প্লেট আছে তো চামচ নাই, ভাত আছে তো তরকারি 'বাড়ন্ত'। আমাকে পেয়ে রেস্তোরার মালিকের যেন একটু উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। তা'র তৎপরতা ও সৌজন্যের দরুণ তা'কে বকৃশিস দিতে ভুলি নাই। ইংলণ্ডের 'টিপ' প্রথার মত এখানেও বকৃশিস প্রথা আছে। হোটেলের চাকর নামমাত্র মাইনে পায়। কাজেই টিপ বা বকৃশিস যা' পায় তা'তেই তা'দের পোষায়। এই রেস্তোরাঁর মালিকই সব কাজকর্ম্ম গুছিয়ে নেয়। তাই 'বয়', বাবুর্চ্চির বালাই না থাকায় বকৃশিসটা তা'র ভাগেই পড়ল। তারপর বড় একটা টাওয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। তা'তে অনেক লেখা ছিল, কিন্তু একটুও পড়তে পারলাম না। সবই চীনা ভাষায় লেখা। চীনা ভাষায় অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য নাই, গাছের ডালপাতার মত দশে মিলে দঙ্গল পাকিয়ে তুল্‌লে তবে খেতাব পায় এক একটী শব্দ ব'লে। কত পুরাতন সে টাওয়ারটী, কত যুগ যুগান্তের সাক্ষ্য দিবার জন্য তা' দাঁড়িয়ে আছে। কত হতভাগা হয়তো এই টাওয়ারের কাজ করতে করতেই মরেছে, হয়তো অনেকে পারিশ্রমিক পায় নাই, আবার যা' পেয়েছে তা' হয়তো সামান্যই। তা'দেরই দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত আছে এই বিজয়স্তম্ভ, হয়তো কোনও রাজারাজড়ার খামখেয়ালের নিদর্শন।

হাঙ্কোর বুকে

সারা দিন ঘুরে ঘুরে শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছিল। হোটেলে এসে স্নান করতেই বেশ ভাল লাগল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভাবলাম যদি এখন গুরুদ্বারে যাই তবে হয়তো খাবার পাব। সেই আশায় গুরুদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক বিরাট জনতা দেখলাম। কেউ কা'রও কথা শুনছে না। শুধু 'মার মার' রব। আমি যেতেই সবাই একদম চুপ। একজন বলল, "এই আমাদের বাবু এসেছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর কি করতে হবে। হোক না ভবঘুরে, তবুও তো সে আমাদের গুরুদেবের এক জাতীয়। কিছুটা কিনারা ক'রে দিতে পারবেনই।" আর একজন বলল, "বাবু, ঐ দেখ, একজন মদ খেয়ে গুরুদ্বারে এসেছে, আমাদের এই নিয়ম নাই। কেউ বলছে পুলিশে দাও, কেউ বলছে খুব ক'রে মার। তারপর হল্লা তো হচ্ছেই। আজ আমাদের রায় সাহেব নাই, আমাদের চালক নাই, তাই আমরা মরতে বসেছি। বাবু, বল, তুমি বল কি করতে হবে।" কে-ই বা সেই রায় সাহেব, আর কে-ই বা মদ খেল তা' কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনটা বেশ একটু আলোড়িত হ'ল। যাক, এখন ওসব কথা। দেখতে হবে মাতালকে নিয়ে কি করা যায়। হঠাৎ মনে হ'ল, যদি মাতালটাকে আমার ঘরে নিয়ে যাই তবে সব বালাই চুকে যায়। তাই মাতালটাকে ধ'রে বললাম, "চল ভাই আমার ঘরে, এখানে ব'সে কি হবে? আমার ঘরে অন্ততঃ ভাল একটা বিছানা পাবে।" মাতাল রাজী হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরে চলল। যতগুলি শিখ আর পাঠান উপস্থিত ছিল তা'রা সবাই বলতে লাগল, "দেখ আসলী বাঙ্গালী কেমন হয়।" এছাড়া অনেকে আমাকে শুনিয়ে বলল, "আমাদের রায় সাহেব কিন্তু এত কালো ছিল না, এই লোকটা "মাদ্রাজী কালো"। কালো হোক, সাদা হোক, বাঙ্গালী তো, কিছু বুদ্ধি রাখেই রাখে।"

মাতালকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। বেচারী বেশীক্ষণ শুতে পারল না,

তা'কে বমি করতে হ'ল। বমি করার পর যেন সে অনেকটা সুস্থ হয়েছিল। তারপরই নাক ডাকিয়ে বেশ ঘুমাচ্ছিল। কিন্তু এ রায় সাহেব কে? বাঙ্গালী নিশ্চয়ই। তবে লোকটা এই শহরে এদের উপর কি ক'রে এত আধিপত্য বিস্তার করল? ইচ্ছা হচ্ছিল তৎক্ষণাৎ গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রি যে সেই রায় কে? কিন্তু সঙ্কোচ হ'ল ব'লে তা' করি নাই। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ ব'সে রইলাম। তারপর গুরুদ্বার হ'তে একজন খাবার নিয়ে এল। খাবার দিয়ে লোকটী বলল, "বাবু, তোমার মতই এক বাঙ্গালী বাবু এখানে ছিলেন। শিখ এবং পাঠানরা তাঁ'কে আপন ভাবত, তাঁ'র কথামত উঠত বসত। সে যতদিন এই শহরে ছিল ততদিন শিখ এবং পাঠানদের কোনও কষ্ট হয় নাই। আজ যদি তুমি এখানে না থাকতে তবে এই মাতাল নিয়ে কত কি হ'ত তা' বলতে পারি না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই রায় সাহেব বরোদিন* ব'লে একজন রুশের সঙ্গে রুশ মুল্লুকে চলে গেছেন। তুমিও এসেছ, কিন্তু তুমি তো থাকবে না। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য।" শিখটীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"রায় বাবু এখানে কি করতেন?" শিখটী দম্ভ ক'রে বলতে লাগল—"কি করতেন তা'ও বুঝি শোননি? তিনি কেরাণী ছিলেন না, দোকানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজা। এখানে ইংরেজ এবং রুশদের রাজত্ব ছিল, তাঁ'রই পাকেচক্রে ওদের রাজ্য যায়। রাজা হবার কথা ছিল রায় সাহেবেরই, কিন্তু বরোদিন তা' হ'তে দেয় নাই। চীনের দেশ চীনের কাছে ছেড়ে দেয়। তারপর চিয়াং-কাই-সেকের সঙ্গে রায় সাহেবের ঝগড়া হয়। ঝগড়া হবার পরই রায় সাহেব বরোদিনকে নিয়ে রুশ মুল্লুকে চ'লে যান। যদি তিনি আজ এখানে থাকতেন তবে আমাদের আর এই দুর্দ্দশা হ'ত না, আমরা থাকতাম রাজার হালে। বাবু, তুমি থাক না এখানে। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।"

লোকটীকে বিদায় দিয়ে ভাবতে লাগলাম—এই বরোদিনই বা কে?

---

* এখানে উল্লিখিত রায় সাহেব হচ্ছেন আমাদের মানবেন্দ্রনাথ রায়। বরোদিন হাঙ্কোতে রুশ দেশের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি "মস্কো নিউজ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ইংরেজী সংস্করণের প্রধান সম্পাদক। রায় সাহেব তাঁ'রই সঙ্গে হাঙ্কোতে অবস্থান করেছিলেন।

বোধ হয় বদরউদ্দিন হবে, এরা ভুল ক'রে বরোদিন বলছে। রায় সাহেবই বা কে, যে রাজ্য নিয়েও রাজা হ'তে পারল না। য়া' হোক, সাত পাঁচ ভেবে, মাতালটার পাশেই শরীরটা ঢেলে দিলাম।

প্রাতে উঠে দেখি, মাতাল আমার ওঠার পূর্ব্বেই আমার জন্য গরম জল এবং চা এনে রেখে দিয়েছে। ঘুম ভাঙ্গতেই সে 'বন্দেমাতরমজী' সম্ভাষণ জানিয়ে বলল 'লিজিয়ে গরম পানি'। প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে দু'জনে মিলে চা খেতে লাগলাম। লোকটী নিজেই বলতে লাগল—"বাবু, তুমি জান বাঁচিয়েছ, নতুবা ওরা আমার হাড় ভেঙ্গে ফেলত।" চা খেতে খেতে ভাবছিলাম—কে সে রায়? কেন এদেশে এসেছিল? আর যদি রাজত্ব পেয়েছিল তবে ছেড়ে গেল কেন? বিদেশে বাঙ্গালীর রাজ্য দেখে কত আনন্দ হ'ত। মাতালকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"বল তো হে, রায় বাবু এখানে কে ছিলেন।" মাতাল একটু দুঃখ ক'রে বলল—"সে অতি পুরাতন কথা। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন রায় সাহেব ছিলেন আমাদের রাজা, গরীব চীনাদের রাজা। সকলে তাঁ'র কথা শুনত, শুনত না কেবল ধনীরা। তাই তিনিও ধনীদের দেখতে পারতেন না। ধনী এবং গরীবদের মধ্যে বেশ গোল বেধে উঠল। ধর্ম্মঘট স্বরু হল, চীনা রিকসাওয়ালা হ'তে কলের মজুর পর্য্যন্ত সকলেই একজোট ছিল। পুলিশ কয়েক দিন সরকার ভক্ত ছিল, কিন্তু রায় সাহেব এমন চাল চেলেছিলেন যে এক চালে বাজিমাৎ। সব পুলিশই তাঁ'র দলে যোগ দিল। আমরাও পুলিশ ছিলাম। তাই তাঁ'র দলে যোগ দিলাম। ফলও হয়েছিল ভাল, কিন্তু শেষটায় চিয়াং-কাই-সেকের সঙ্গে রায় সাহেবের ঝগড়া হওয়াতে তিনি চলে গেলেন রুশ মুল্লুকে, আর প'ড়ে রইলাম আমরা। রিকসাওয়ালাদের বিদ্রোহের ফলে এখান থেকে ইংরেজ কন্‌সেশন তো আগেই চ'লে গিয়েছিল, এবার গেল রুশের। চীনা বেটারা বেশ ফাঁকতালে ভাল ভাল দুটা কন্‌সেশন মেরে নিয়েছে। তা'তে কোন দুঃখ নাই, কিন্তু দুঃখ হয় যে বেটা চিয়াং-কাই-সেক জাপানীদের হ'য়ে চীনাদের কষ্ট তো দিচ্ছেই, এমন কি আমাদের 'গদর ভাতা'ও পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছে।"

মাতালের কথা মন দিয়ে শুনলাম, কোনও মন্তব্য করলাম না। তা'কে

বিদায় দিয়ে চীনা শহরে গেলাম। ভাবছিলাম, কোন পদবীধারী রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু ভুল ক'রে বসেছি। রুশ কন্‌সেশনেই এখন বড় বড় কর্ম্মচারীরা আড্ডা পেতেছেন। ফিরে এসে রুশ কন্‌সেশনের একটা বড় বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। উদ্দেশ্য দুটী—প্রথমতঃ, কিছু টাকা চাওয়া; দ্বিতীয়তঃ, শহরের সম্বন্ধে কিছু জানা। আমার মধ্যে কোন্ দেবতা বিরাজমান তা' বাজিয়ে না দেখে আমার মত ভিখারীকে তা'রা অমনি টাকা দেবে না। চীন দেশের বড় বড় শহরে ইংরেজী-জানা লোকের মোটেই অভাব নাই। কাজেই আমাকে চিনতে তা'দের কোন অসুবিধা হবে না। আমার ইচ্ছা, যখন তা'রা আমাকে বাজিয়ে দেখবে তখন বরোদিন এবং রায় এই শহরে কি করেছেন তা' জেনে নেব। অনেকক্ষণ ব'সে রইলাম। তারপর যিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন তিনি স্বাক্ষরের বইটা নিয়ে উধাও হ'য়ে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন বইটার মধ্যেই একখানা দশ ডলারের নোট গোঁজা ছিল দেখলাম। ঐ বইটা আমার হাতে দিয়েই তিনি চ'লে গেলেন। আমার একটী বাসনা পূর্ণ হ'ল। কিন্তু বরোদিন এবং রায় সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

হাঙ্কোতে থাকা আর ভাল লাগছিল না। দেখার মত যা' ছিল, যতটা সম্ভব মোটামুটি তা' দেখে নিয়েছি। শোনার মত যা' ছিল তা' সবই তো লোকে এসে ব'লে গেছে। পাবার মত যা' ছিল তা'ও একরকম মিলেছে। পথিক এর বেশী আর চায় কি? বিকাল বেলাটা খুব ক'রে ঘুমিয়ে অলসভাবে ঘরের মধ্যেই একখানা ইংরেজী দৈনিকের পাতা উল্টাচ্ছিলাম। তা'তে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—সাংহাইতে হয়তো জাপানীরা একটু গোলমাল করতেও পারে। জাপানীদের খিটিমিটির জের চীনে তো লেগেই আছে, তা'তে আর ভাবনার কি আছে! পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দরজাতে ঘা পড়ল। ইংরেজীতে বললাম—আসুন। যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি একজন পরিচিত লোক। তিনি মালয় দেশে অনেক দিন ছিলেন। ভারতে যেমন সাব এসিসটেণ্ট সারজেন আছে, মালয়তে তেমনি ড্রেসার রয়েছে। এই ভদ্রলোক ড্রেসারী পাশ করতে না পেরে চীনে যখন চ'লে' এলেন তখন আমি সিঙ্গাপুরেই ছিলাম। তাঁ'র সঙ্গে বেশ

ভাবও ছিল। তিনি আমাকে পেয়ে যে কত আনন্দিত হলেন তা' বলবার নয়। কখন এসেছি, কখন যাব ইত্যাদি অনেক কথা হ'ল। তারপর তাঁ'রই সঙ্গে শহরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি দুঃখ ক'রে বললেন, "চীন যা'রা না দেখে তা'দের চীনের সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা থাকে, কিন্তু যেই তা'রা চীন দেশে আসে অমনি চীনাদের সম্বন্ধে তা'দের মত বদলে যায়।" এই সত্য কথা শুনে আমার মনটা দমে গেল।

পরিচিত ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলাম—হাঙ্কোতে নাকি কমিউনিষ্ট আছে, ওরা থাকে কোথায়? ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ওসব বৈদেশিক সংবাদপত্রের প্রচার বই কিছু নয়। আমি শহরের বাসিন্দা, এই শহরের সংবাদ ভাল ক'রে রাখি। কমিউনিষ্ট ব'লে এখানে কিছু নাই এবং সাধারণ লোক এসম্বন্ধে কিছু বোঝে না। তবে সবাই চায় দেশের উন্নতি, আর যা'রা দেশের উন্নতি চায় তা'দেরই বিদেশী সংবাদপত্র কমিউনিষ্ট ব'লে প্রচার ক'রে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেয়। আর তা'তে সাহায্যকারী হন দেশদ্রোহী চিয়াং-কাই-সেক। লোকে বলে যে নিজের দেশের প্রগতিশীল লোকদের উপর অত্যাচার করার জন্য চিয়াং বিদেশী ধনীদের কাছ থেকে বহু টাকা পেয়েছেন।"

তিনি এসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাইলেন না। তা'কে ভীত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, মুখ বন্ধ হয়ে গেল যে? তিনি বললেন, "এই চীনের গুপ্ত পুলিশের তিলকে তাল ক'রে ফেলতে বহুক্ষণ লাগে না, যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবেন ততক্ষণ এসব কথা আর হবে না। আপনি হয়তো বুঝবেন না কে গুপ্ত পুলিশ, কিন্তু আমরা ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি। এখন জাপানী কন্‌সেশনে চলুন, দেখবেন কেমন মজার সে কন্‌সেশন।" তাঁ'র সঙ্গে সেই নির্জ্জন স্থান দেখতে চললাম। বাঁধের কাছে এসে দেখি, একখানা নূতন ফরাসী গানবোট নোঙ্গর করছে। পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, "হয়তো জাপানের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধবে, নতুবা নূতন আমদানী কেন?" আমি বললাম, "তা' হ'তে পারে।"

জাপানী কন্‌সেশনের ভিতরে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম যে দৃশ্যটী দেখলাম তা'তে মনটা দমে গেল। একটী যুবতী স্ত্রীলোক তা'র ছেলেকে একটা কঞ্চির সাহায্যে কোমর হ'তে পা পর্য্যন্ত বেদম প্রহার করছে। ছেলেটার উরুদেশের পিছন দিকটা আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় দর দর ক'রে রক্ত পড়ছে, তবুও

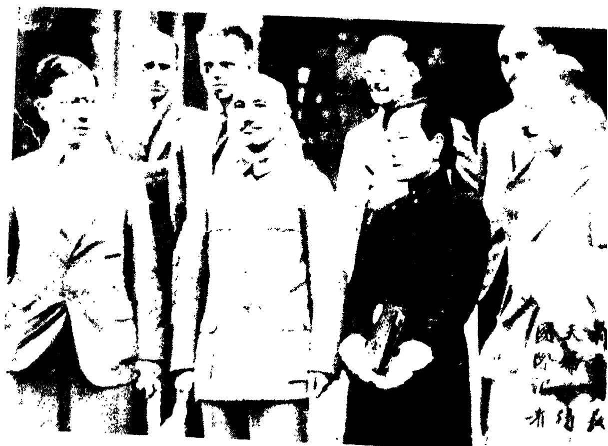
সে মারছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে ভাল লাগল না। নিজে গিয়ে যুবতী স্ত্রীলোকটীকে একটা ধমক দিতেই সে আঘাত করা বন্ধ ক'রে দিল, কিন্তু সে চোখ লাল ক'রে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটা হ'তে যেন আগুন বের হচ্ছিল। পরিচিত লোকটীকে বললাম—স্ত্রীলোকটীকে ব'লে, দেন যে এরূপ ক'রে যেন ছেলেপিলেকে আর না মারে। পরিচিত লোকটী তা' বলেছিলেন বটে, কিন্তু ফল যা' হয়েছিল তা' বোধ হয় বিপরীত। চীনা স্ত্রীলোকের ছেলেমেয়েকে পিটানর রোখ খুব বেশী। এমন অনেক দেবার্চ্চনা আছে যা'তে মেয়েদের পিটিয়ে কাঁদতে বাধ্য করা হয়। সেরূপ একটী পূজা স্বচক্ষে দেখেছি। এই ছেলে মারা দেখে মনে হ'ল যে এদের বাহাদুরি আছে। যে ভাবে আঘাত করা হয় তা'তে শরীরের কোনও গুরুতর অনিষ্ট হয় না। আমাদের দেশে কিম্বা অন্যান্য দেশে যে ভাবে চড়, কিল, লাথি মারা হয়, তা'তে অনেক সময় স্থায়ী রকমের গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হয়।

পরিচিত ভদ্রলোকটী একটী নির্জ্জন স্থানে এসে আমাকে বললেন, "শুধু বিদেশী সরকারগুলিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাদের দেশের নেতা একবার এই শহরের অনেক লোককে হত্যা করেন। চীনারা মরতে ভয় করে না সত্য, কিন্তু এরূপ ভাবে বিনা দোষে প্রতারক চিয়াং-কাই-সেকের হাতে মরা উচিত হয় নাই। এখন লোকে হুঁশিয়ার হয়েছে। বৈদেশিক সংবাদপত্রের মারফতে অন্যান্য দেশের সভা-সমিতির সঙ্গেও তা'রা সম্বন্ধ রাখে। কিছু হ'লেই তা'রা সেই সব সভা-সমিতির লোককে ডেকে পাঠায়।" চিয়াং-কাই-সেক কেন বৈদেশিক সরকারগুলির সন্তুষ্টির জন্য নিজের দেশবাসীকে হত্যা করেছিলেন তা' জিজ্ঞাসা করতে ভুলি নাই। ভদ্রলোক মুখ বিকৃত ক'রে চীনা ধরণে হাত নেড়ে ধীর এবং কঠোর স্বরে বলেছিলেন, "কতকগুলি যুবক একদিন এক খৃষ্টান মিশনারী দলের একটী ষড়যন্ত্র ধ'রে ফেলে। এই যুবকেরা অনেকেই খৃষ্ট-ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল। কিন্তু যা'দের প্ররোচনায় তা'রা দেশের এবং দশের ক্ষতি ক'রেও ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, সেই খৃষ্টান প্রচারকগণ যখন ধর্ম্মের আবরণে গোয়েন্দাগিরি করতে লাগল তখন আর এই যুবকগণ স্থির থাকতে পারে নাই। তা'রা একেবারে মিশনারীদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ ক'রে ফেলল। তা'রই ফলে বিদেশী সরকারের হুমকিতে ঐ

যুবকদের কমিউনিষ্ট আখ্যা দিয়ে পশুর মত হত্যা করা হয়। শুধু যে হাঙ্কো নগরীতে এই বর্ব্বরোচিত কার্য্যটী হয়েছিল তা' নয়, চাঁংসা পর্য্যন্তও সে ঢেউ লেগেছিল।" চুপ ক'রে শুনলাম সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম না। কারণ জগত জুড়ে দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার আবহমান কাল থেকে চলে আসছে।

চীনের কথা আরও কত কি শুনেছিলাম। তা' ব'লে এখন আর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, ফিল্ম ছিল চীন দেশেরই। মন দিয়ে তা' দেখতে লাগলাম। সবাক্ চিত্র নয়, নির্ব্বাক। বিষয়গুলি চীনা ভাষা এবং ইংরেজীতে লেখা থাকায় আরও ভাল লাগছিল। বিষয় ছিল রূপক, দেবতায় দেবতায় লড়াই। জলদেবতা রাগান্বিত হয়ে চীন দেশে বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেন। জলদেবতার শত্রু অগ্নি স্থযোগ বুঝে চীন দেশকে দাহ করতে স্থরু করেন। একটী চীনা যুবককে জলদেবতা এসে বললেন, "যদি আমাকে পূজা দাও তবে তোমার দেশ রক্ষা করব।" চীনা যুবক জলদেবতার বিদ্রোহী ছিল, কিন্তু দেশকে রক্ষা করার জন্য জলদেবতার পূজা দিতে রাজি হ'ল এবং তাঁ'কে পূজা দিলও। দেশ রক্ষা হ'লে যখন সে দেখল যে নিজের আদর্শ-নিষ্ঠা নষ্ট হ'য়েছে তখন সে আত্মহত্যা করল।

সিনেমা দেখে এসে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম হ'ল না। ঠোঁট দু'খানা ফেটে চৌচির হ'য়ে গিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে একটা ঔষধের ব্যবস্থা করতে বললাম। তিনি আমাকে একটু তেল দিয়ে বললেন, "এই তেলটুকু ঠোঁটে ঘ'ষে ফেলুন, এতেই আপনার এরোগ সেরে যাবে।" তেলটুকু ঘ'ষে দিলাম, কিন্তু তা'তে আরসোলার গন্ধ ছিল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে চীনের কবিরাজগণ আরসোলা নারিকেল তেলে সিদ্ধ ক'রে একপ্রকার তেল তৈরী করেন। শীতের সময় ছেলেপিলে হ'তে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সবাই তা' ব্যবহার করেন এবং তা'তে ঠোঁট ফাটে না। যা'দের পা ফাটার রোগ আছে তা'রাও ঐ তেল ব্যবহার করলে আর পা ফাটে না। চীনাদের আরসোলা খাওয়ার যে গুজব জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা'র গোড়ার কথা হ'ল আরসোলার তেল ব্যবহার। চীনের লোক কখনও আরসোলা খায় না। একথা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি।



জেনারেল চাং কাইশেক এবং



এখানে স্বাধীন চীনের সমবায়-বদ্ধ কৃষক গৃহ। পরিবেশ দেখলেই বোঝা যায় এরা কত দরিদ্র, কিন্তু এরা জাপানী-ভয়ে ভীত নয়

ফাটা ঠোঁটে আরসোলার তেল ব্যবহার ক'রে বেশ আরাম পাওয়া গেল এবং ঘুমাতে আর বিঘ্ন ঘট্‌ল না।

হাঙ্কোতে দেখবার এবং জানবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমাকে হাঙ্কো পিছনে রেখে এগিয়ে চলতে হ'ল। মাঞ্চুরিয়াতে চীন-জাপানে বেশ ঠোকাঠুকি চলছিল। তারপর সাংহাইতেও কিছু সংঘর্ষ হবে ব'লে সবাই অনুমান করছিল। মাঞ্চুরিয়াতে পৌছতে অনেক দিন লাগবে। যদি কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি সাংহাই পৌছতে পারি তবে হয়তো দু'দলের লড়াই দেখতে পাব। কারণ হাঙ্কো হ'তে দলের পর দল ফৌজ যাচ্ছিল। তবে তা'রা পথে হয়তো বাধাবিঘ্ন জন্মাতে পারে এই অনুমান ক'রে আমি বড় রাস্তা ছেড়ে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথে চলতে মনস্থ করলাম। তা'তে আমার আদপেই ক্ষতি হয় নাই। কারণ গ্রাম্য পথে সাইকেল চালান অসুবিধাজনক হ'লেও এই পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি তা' যদি বলি তবে চীনের অনেক রহস্য প্রকাশ হ'য়ে পড়বে।

চীনে এসেছি আজ ঢের দিন। প্রকৃতই রয়েছি নির্লিপ্ত—নিছক ভ্রমণকারী। মনের দেওয়ালে অনেক ঘটনা রেখাপাত কর্‌লেও, স্থায়ী আসন জুড়ে বসতে কোন কিছুকেই দেই নাই। চিয়াং-কাই-সেকের অপযশ শুনেছি রকমারি নরনারীর মুখে, নিমেষের আঘাতটা মিলিয়ে গেছে শূন্যতায় কথার রেশের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মালয়ের পরিচিত ভদ্রলোকের মুখে চিয়াং-কাই-সেকের কমিউনিষ্ট দলনের অপকীর্ত্তিতে বিদেশীদের কারসাজি—বিদেশী অর্থের প্রলোভনের গুজব শুনে মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল। যা' ছিল নিভাঁজ সাদা কথা, রহস্যের মায়া যেন তাকে তলিয়ে দিল কোন্ অতলে। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ অনুসরণ করবার মত অধ্যবসায় ও মনোবৃত্তি থেকে বঞ্চিত আমি, এ রহস্য উদ্ধারের কোনও আকর্ষণই আমার নাই। তবু হাঙ্কোর সদাগুঞ্জরিত কলরোলের পর নিরালা পল্লীপথের বাক্‌হত আকুতি যেন রয়ে রয়ে স্পন্দন জাগাচ্ছিল—যে-দেশের সব রঙেই রহস্যের তুলির ছোপ, সে-দেশের নেতার মগজেও তার একটু পরশ লাগা আশ্চর্য্য নয়। তা হলেও রহস্যের স্বরূপটি কিন্তু আমার কাছে ধরা দেয় নাই বহুকাল পর্য্যন্ত, যেমন বাইরের জগতের কাছেও নয়।

নানকিনের পথে

গ্রাম্য সঙ্কীর্ণ পথ। অনেক স্থানে ভাঙ্গা পথের মাঝে মাঝে জল জমে কাদা হয়েছে। পথ মেরামতের জন্য কোথাও গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকের নেতৃত্বে যুবকের দল সাবল, কোদাল নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। কারণ ঐ পথে যাবে ১৯নং পদাতিক বাহিনী। ১৯নং কি বড় পথ দিয়ে যেতে পারত না? গাড়ী, মোটরগাড়ী কি তা'দের ছিল না? এতে অনেক রহস্য রয়ে গেছে। যা' শুনেছি তা'ই বলছি। অন্য কারণও হয়তো থাকতে পারে। লোকে বলছিল যে জেনারেল চিয়াং-কাই-সেক সাংহাইতে জাপানের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সৈন্য পাঠাতে নারাজ। এদিকে চীনের জনসাধারণ চায় জাপানের সঙ্গে প্রকাশ্য লড়াই। তা'রা চায় "হয় চীন জাতি চীন হ'তে মুছে যাক, নয় বাঁচার মত বেঁচে থাক"। কাজেই তা'রা তা'দের মধ্য থেকে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসৈনিকের ১৯নং পদাতিক বাহিনী একে একে সাংহাইয়ের রণক্ষেত্রে পাঠাচ্ছিল। বর্ত্তমান বাহিনী তা'দেরই সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে গ্রামের ভিতর দিয়ে সাংহাইয়ের দিকে যাত্রা সুরু করেছে। কিন্তু তা'র প্রতিবাদী হলেন চীনের নায়ক, জনসাধারণের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা চিয়াং-কাই-সেক। অনেকে বলে যে তিনি জাপানের ভক্ত, জাপানকে চীনের যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও সুখী রাখতে চান। তাঁ'র যত জমা টাকা সবই ইয়াকোহামা স্পেসিফিক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত, তাঁ'রই সাহায্যে চীনের বুকের উপর অনেক জাপানী উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে ইত্যাদি।

আমি পথিক, পথের সন্ধান রাখা আমার কাজ। তবে এসব কথা আমি কেন বলছি এই প্রশ্ন হ'তে পারে? যখন আমি পথে চলি, তখন নিপীড়িত লোকগুলি আমার পথ আগলে আমাকে তা'দের বাড়ী নিয়ে যায় এবং বড় দুঃখ ক'রে বলে, "হে পৃথিবীর পরিব্রাজক! আমাদের দুঃখের কাহিনী শোন। যখন সময় হবে তখন আমাদের হয়ে দু'কথা পৃথিবীর লোককে জানাবে।" এখনও ঐ চীন দেশে পর্য্যটকের কদর আছে। তবে ওরা বোঝে—কে দেশ

ভ্রমণ করতে এসেছে, আর কে পর্য্যটকের পোষাক প'রে গোয়েন্দার কাজ করতে আসে। ওরা জানে আমার দেশ হিন্দুস্থান, ধর্ম্মচর্চ্চাই আমাদের কাজ; আমরা ওদের দেশে গোয়েন্দাগিরি করতে যাব কেন, আবার যদিও বা যাই, তবে গূঢ় কারণটাই বা হবে কি? এজন্যই চীনের জনসাধারণ আমার প্রতি এত দয়ালু ছিল। আমার হিন্দুত্বের আরও বিকাশ হয়েছিল আমার আচার-ব্যবহারে। কেল্লা, বন্দর, অস্ত্রাগার এসব দেখতে আমি বরাবরই অনিচ্ছুক ছিলাম। রেলপথ কোন্ দিক দিয়ে গিয়েছে, কোন্ পুলটা কোন্ দেশী ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা তৈরী হয়েছে, কোন্ কোন্ মালমসলা তা'তে দেওয়া হয়েছে, জলাধার কোথায়, কোথা হ'তে জল আসছে, কোথায় জল পরিষ্কৃত হচ্ছে, এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাইনি। তারপর আমার কাছে ক্যামেরা নাই, কোনও নিষিদ্ধ স্থানের খবরও আমি নেই না। এমন কি দরকারী স্থানগুলিরও ফটো তোলবার সামর্থ্য আমার নাই। বাজারে যত বাজে এবং সস্তা ছবি বিক্রয় হয় তা'ই আমি পারলে কিনি। যখন সামর্থ্যে কুলায় না তখন চেয়ে নিই। এতে আমার প্রতি কা'র কি আক্রোশ থাকতে পারে? তারপর আমি 'বাঙ্গালী' নই, যা'দের দেখলেই অনেক সময় অনেক চীনার মাথা বিগড়ে যায়। আমি একজন হিন্দু। আমি যে এদেশে পরিব্রাজক হিসাবে এসেছি তা' দেখেই অনেক চীনা আশ্চর্য্যান্বিত। হিন্দুরা জানে শুধু সেবা করতে, কি ক'রে হিংসা করতে হয় তা' তা'রা জানে না। আমার মত লোককে নিয়ে নাড়াচাড়া করাটাও মূর্খামি, তবে যা'রা করে তা'রা নেহাৎ না জেনেই বা ভুল বুঝে করে।

চীনের কাছে বাঙ্গালী হ'ল আমাদের দেশের শিখ এবং পাঠান। ওরা বক্সার যুদ্ধে সাংহাই নগরীতে নাকি খুব অত্যাচার করেছিল, তাই ওদের উপর চীনারা এখনও খাপ্পা। চীনারা বোঝে, যা'রা পাগড়ী বাঁধে, দাড়ি গোঁফ রাখে অথবা শুধু গোঁফ রাখে এবং দাড়ির কতকটা কাটে, কতকটা রাখে, তা'রা হ'ল বাঙ্গালী। যা'রা দাড়ি গোঁফ রাখে না, কিন্তু টুপী পরে, তা'রাই হ'ল হিন্দু। চীনারা বাঙ্গালীদের এত ঘৃণা করে যে, বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনেকে 'বাঙ্গালী' ভেবে সাংহাই হ'তে তা'কে 'ফিরে যাও' বলবার জন্য কৃষ্ণ পতাকা নিয়ে গিয়েছিল।

বাঙ্গালীরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তা'ও চীনারা অবগত নয়। তা'দের ধারণা, যা'রা এত নির্দ্দয় তা'দের আর ধর্ম্ম কি হ'তে পারে! এই ধারণা সাধারণ লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক এখনও মনে করেন যে বাঙ্গালীরা মানুষ নয়, রাক্ষস জাতীয় একটা জীব— ওরা নররক্তপিপাসু, ওদের হিতাহিত জ্ঞান মোটেই নাই। বর্ত্তমানে কিন্তু বন্দরগুলিতে সেই ধারণা অনেকটা কমে আসছে। হিন্দুরা দুই ভাগে বিভক্ত— মুসলিম হিন্দু এবং বৌদ্ধ হিন্দু। চীনা মুসলমানদের মতে কাফের হিন্দু এবং মুসলিম হিন্দু। হিন্দুরা চীন দেশের মধ্যে নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে পারে, যদি তা'র পরিচয় একটী ব্যাজে ভাল ক'রে চীনা ভাষায় লেখা থাকে।

পথের দু'দিকে গ্রামের পর গ্রাম রেখে এগিয়ে যেতে লাগলাম। নূতন লোক দেখে অনেকে পথ আগলে পরিচয় নিচ্ছিল, এমন কি নানা কথা জিজ্ঞাসাও করতে লাগল। কিন্তু প্রায় সব স্থান হ'তে অপ্রত্যাশিত সম্বর্দ্ধনা পেয়েও ভাষার অভাবে কাউকে আনন্দ না দিতে পেরে বড়ই অনুতাপ হচ্ছিল। আমার প্রচলিত প্রথামত অনেক গ্রামেরই কোন বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে ক্ষুধার তৃপ্তি ক'রে চলছিলাম। খেও না একথা কেউ বলে নাই। আমি অনুভব করছিলাম যে এদের একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তা'তে একদিকে রাজশক্তি এবং জাপান, অন্য দিকে লোকমত জড়িয়ে পড়বে। যদিও বিপদ আসন্ন, এমন কি অনেকের মাথার উপর খড়্গও ঝুলছে, তবুও আমার মত পথিককে তা'রা তাড়িয়ে দেয় নাই। অন্য দেশে অতিথি দ্বারে এলেই দুই বৎসর পূর্ব্বে ছেলে মরেছে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে এসব কথাও অনেকের মনে হয়। এমন কি সেই দুঃখের অজুহাতে কত স্থান হ'তে আমাকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই চীন দেশে এরূপ ব্যবহার পাই নাই। অতিথি দ্বারে এলে তা'র জন্য তা'দের যতটুকু সাধ্য ততটুকুই তা'রা করবে। কিছু করতে না পারলে কোন প্রকার দুঃখ ক'রে বা বাজে কথা ব'লে তা'রা অতিথির সময় নষ্ট করবে না বা নিজেদেরও অযথা কালক্ষেপণ করবে না।

দুই দিন কেটে গেল, কোনরূপ বিপদাপদের সম্মুখীন হ'তে হ'ল না। তৃতীয় দিন প্রাতে এক কৃষকের বাড়ী হ'তে রওনা হলাম। দু'বল

তখন প্রায় ন'টা হবে। এক দল সৈন্য আমারই সামনে দিয়ে মার্চ্চ ক'রে যাচ্ছিল। এগিয়ে গিয়ে সেনাধ্যক্ষকে আমার পরিচয়পত্র দিলাম। তিনি বেশ সুন্দর একটা ঘোড়ার উপরে ছিলেন। পরিচয়পত্রখানা প'ড়েই তিনি খুব খুসী হলেন এবং তাঁ'র মানচিত্র খুলে আমার নোটবইতে একটা গ্রামের নাম লিখে দিলেন। তারপর তাঁ'র জন্য আমাকে ঐ গ্রামে অপেক্ষা করতেও বললেন। গ্রাম ছিল মাত্র পনের মাইল দূরে। তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রামে গিয়ে কতকগুলি তাঁবু দেখতে পাই। তা'রই একটীতে সাইকেল দাঁড় করিয়ে একটা ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ শুয়েছিলাম তা' ঠিক নাই। হঠাৎ একজন চীনা সৈন্য আমাকে জাগিয়ে আমার শরীরটা ভাল ক'রে দেখে নিল। তারপর অন্য দু'জন সৈন্যের সাহায্যে আমার ঝোলা তল্লাসী করল। স্বাক্ষরের বইটা তা'রা ভাল ক'রে পড়ল। তা'দের রক্তচক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তা'রা আমাকে বসতে ইঙ্গিত করল। কিন্তু আমার বসা হ'ল না, আবার শরীরটা ক্যাম্প খাটে এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সূর্য্যাস্তের একটু পূর্ব্বে ঘুম থেকে উঠে দেখি, তখনও পল্টনের লোক আসে নাই। হাতমুখ ধুয়ে নিকটস্থ গ্রামের এক বাড়ী হ'তে পানিফল চেয়ে আরাম ক'রে খেলাম। সৈন্যদের জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছিল। তাই আমার খাওয়ার ভাবনা মোটেই ছিল না। গ্রামের পাশে একটা খাল ছিল। গ্রামের মেয়েরা অনেকেই এই খালের নির্ম্মল জলে রান্নার শাকসব্জী এবং চাউল ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমার বাঙ্গলা মায়ের ছোট ছোট গ্রামের দৃশ্য মনে হয়েছিল। যত দূরে যাই, ততই দেশের কথা বিশেষ ভাবে মনে হয়। কিন্তু আমি তা' ভুলতে চেষ্টা করতাম। বেশীক্ষণ গ্রামের সৌন্দর্য্যে মত্ত হয়ে থাকতে পারলাম না। পল্টন এসে পড়ল। সেনাধ্যক্ষ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁ'র নাম চেংনাম। তিনি হংকং বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে কোনও ডিগ্রী পান নাই বটে, কিন্তু তা' পাওয়ার জন্য চেষ্টার কসুর করেন নাই।

এসব কথা তিনিই আমার কাছে বললেন। তিনি আমাকে পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশের কথা ব'লে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন তিনি পায়ে হেঁটে সাংহাই রওনা

হয়েছেন একথা যখনই আমি তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'রেছি, তখনই তিনি সে কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথার উত্থাপন করতেন। তাঁ'র সঙ্গে ক্রমাগত আট দিন আমি মার্চ্চ করেছিলাম। প্রত্যেক দিনই কোথায় গিয়ে থামব তা' তিনি ব'লে দিতেন। তারপর তিনি সেখানে উপস্থিত হতেন। একদিন তিনি একখানা ছবি খুলে আমাকে দেখান। ছবিখানি একটী জাপানী যুবতীর। ছবিখানি দেখাতে দেখাতে বিড়্ বিড়্ ক'রে চীনা ভাষায় তিনি কত কি বললেন। তারপর তাঁ'র দুটা চোখ জলে ভর্ত্তি হয়ে গেল। সেই যুবতী সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "যুবতী আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু আমার জাতিকে এবং আমার দেশকে ভালবাসে না। যুবতী চায় আমার জাতি ও আমার দেশ জাপানের অনুগত হয়ে থাকে, আর আমি তা' চাই না। হাঙ্কোর জাপানী কন্‌সেশনে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়, কিন্তু যেদিন আমি তা'র মনের ভাব বুঝতে পারি সেদিনই আমি তা'র সঙ্গ ছেড়ে ১৯নং পল্টনে যোগ দেই এবং স্বেচ্ছায় এবার নিজকে এই মহাযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য টেনে নিয়ে যাচ্ছি। যদি জাপান যান তবে দেখবেন জাপানীরা কিরূপ জীব। ওরা আপনার হিতার্থে সব করতে রাজি, কিন্তু যেই মাত্র বুঝবে যে আপনার দ্বারা তা'দের জাতির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, অমনি ওরা আপনার জীবন নাশ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। এই হ'ল জাপানীদের বিশেষত্ব, ভুল ক'রে যেন জাপানী রমণীর সঙ্গে প্রেমে না পড়েন।"

সেনাধ্যক্ষ যে ভাবে মনের দুঃখে কথাগুলি আমাকে বলতে লাগলেন তা'তে বুঝলাম যে, তাঁ'র হৃদয়রাজ্যে ব্যর্থ প্রেমের এমন এক ধাক্কা লেগেছে যা'র ফলে তিনি তাঁ'র জীবন বেশী দিন টিঁকিয়ে রাখাও সঙ্গত মনে করছেন না। ব্যর্থ প্রণয়ের ষোল আনা প্রতিশোধই তিনি আদায় করবেন। তাঁ'র সঙ্গের প্রত্যেক সৈন্য যেন মরণকে বরণ করবার জন্য সেই প্রেতপুরীর খোঁজেই অগ্রসর হচ্ছে। তা'দের মুখ দেখলে মনে হয় যেন আপন ভাইবোনদের ভুলে তা'রা চলেছে "সমরে আনিতে বিজয় গর্ব্ব জিনি"। কিন্তু সমরে হয় বিজয়গর্ব্ব, নয় মরণগর্ব্ব—দুটার একটা তো পাবেই। তা'দের মৃত্যুপণ দেখে আমারও সেই নরমেধযজ্ঞ দেখতে

ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু যজ্ঞ দেখা আমার হয় নাই, যজ্ঞের আহুতির শেষ চিহ্ন, ভস্মই শুধু দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

আমাদের পঞ্চম দিনের ভ্রমণ সমাপ্তির পর সৈন্যদের ছাউনীতে ব'সে বিশ্রাম করছিলাম। কথা বলবার, গল্প করবার যা' ছিল তা' অনেকটা ফুরিয়ে গিয়েছিল। গ্রামের পাশেই আমাদের ছাউনী। সেনাধ্যক্ষের সামনে দু'জন গ্রাম্য চীনা এসে কি সংবাদ দিল। তা' শুনে তাঁ'র মুখখানা একদম লাল হ'ল, চোখ দুটা দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছিল। লোক দুটা চ'লে যাবার পর তিনি বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারী করতে লাগলেন। কতক্ষণ পর একজন গ্রাম্য পঞ্চায়েত আর পাঁচ জন কনেষ্টবল একটী লোককে ধ'রে তাঁ'র কাছে হাজির করল। সবাই সেনাধ্যক্ষকে চীনা ধরণে নমস্কার জানাল, কিন্তু সেই বন্দী শুধু জানাল না। বন্দীর শরীর পূর্ব্বেই পরীক্ষা করা হয়েছিল। যা' পাওয়া গেল, তা' একে একে সেনাধ্যক্ষের কাছে হাজির করা হ'ল। তা'তে ছিল একতাড়া নোট, একখানা চিঠি, একটা পিস্তল, দু'খানা জাপানী রুমাল, একখানা চীনা পাখা, আর দু'খানা জাপানী দেওয়ালপঞ্জি। চিঠিখানা ভাল ক'রে প'ড়ে সেনাধ্যক্ষ পঞ্চায়েতের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা ব'লেই কি একটা আদেশ করলেন। অমনি তিনজন সৈন্য এল। তা'দের ইঙ্গিত করা মাত্র বন্দীকে একটু দূরে নিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ক'ষে বেঁধে ফেলা হ'ল। তারপর তিনজন সৈন্য বন্দী লোকটার উপর একসঙ্গে গুলী ছুঁড়তে লাগল। কতক্ষণ পরে লাস এনে কাছেই কবর দেওয়া হ'ল। আগাগোড়া ব্যাপারটা চুপ ক'রে দেখছিলাম। কিন্তু কেন এমন হ'ল তা' জানবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল।

রাত্রি তখন অনেক হয়ে গেছে। চিন্তায় ঘুম আসছিল না। সেনাধ্যক্ষ যেমন তাঁ'র ছোট ক্যাম্প খাটে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, আমিও তেমনি এপাশ ওপাশ করছিলাম। শেষটায় তিনি নিজেই আমাকে বলতে লাগলেন—"এই লোকটী মাঞ্চুরিয়া হ'তে জাপানীদের জন্য গুপ্তচরের কাজ করছিল। সেই জন্যই তা'কে হত্যা করা হয়েছে। জাতিতে চীনা হ'লেও সে জাপানীদের হয়ে তা'র নিজের জাতির সর্ব্বনাশ করতে এসেছিল। চীনে জাপানের এরূপ কত চীনা গুপ্তচর আছে তা' কে জানে! জাতির

যখন পতন ঘনিয়ে আসে তখন এই শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হয় এবং সামান্য টাকার বিনিময়ে তা'রা দেশের স্বার্থকে বিদেশীর কাছে বিকিয়ে দেয়। এসব লোকের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এই লোকটী এখানে একজন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক হয়ে এসেছিল। ধর্ম্মের নাম শুনলেই এখন চীনের লোক ভাবে যে এই তথাকথিত ধর্ম্মের পিছনে একটা বড় মতলব আছে এবং সে মতলব আর কিছুই নয়, চীনের যে সামান্য স্বাধীনতা আছে তা' অপহরণ করা। তাই যত ধর্ম্মপ্রচারক এদেশে আছে তা'দের চীনের লোক সন্দেহের চক্ষে দেখে। প্রমাণ স্বরূপ এই একজন প্রতারক ধর্ম্মপ্রচারককে দেখলেন। এই লোকটার উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে কোথাও একটা জাপানী উপনিবেশ স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থান বের ক'রে নেওয়া। জাপানী উপনিবেশের অর্থ হ'ল জাপানের একটী পল্টনকে চীনাদের পয়সায় চীন দেশে রাখা এবং যখনই দরকার হবে তখনই এই পল্টন চীনের বুকের উপর দাঁড়িয়ে অস্ত্র হানতে থাকবে। যে লোকটা এই কাজের জন্য এসেছিল সে চীনা। সে কি করতে যাচ্ছে তা' বুঝবার মত জ্ঞান তা'র ছিল না। টাকা মানুষকে কত নীচে নামিয়ে দেয় তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ চোখে দেখলেন। তাই আমি টাকাকে আর বিশ্বাস করি না। বেঁচে থাকলে এই টাকার লোভ চীন হ'তে একেবারে মুছে ফেলতে পারি কিনা দেখব। যদি না বাঁচি, তবে সকলকে ব'লে যাব যেন টাকাকে স্বাধীনভাবে এই চীন দেশে বিচরণ করতে দেওয়া না হয়।" সেনাধ্যক্ষ অনবরত ব'লে যাচ্ছিলেন, আর আমি শুনছিলাম। যখন তিনি তাঁ'র গুরুগম্ভীর স্বরে ইংরেজী শব্দগুলি উচ্চারণ করছিলেন, তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন ইংরেজী ভাষা আজ ধন্য হ'ল। ভাবের প্রভাবে যে ভাষাই হোক না কেন, সে ভাষাই জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। কথাগুলি ব'লে তিনি যেন তৃপ্তি পেলেন। আমারও জানবার বাসনা পূর্ণ হ'ল।

রাত্রি প্রভাত হ'ল। সেনাধ্যক্ষের আদেশ আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। ওখানে গিয়ে থামুন, অমুক স্থান দেখুন, এদিকে যাবেন না—এসব মেনে চলে খাঁচার পাখী। আমি তখন তাঁ'র হুকুম তামিল করার দায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তাই তাঁ'কে ব'লে আমি একটা অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রাম্য পথ ধরলাম। আমি চললাম অচেনা পথে,

অজানা দেশে। নান্‌কিনে চলেছি জানি, কিন্তু জানা পথ ছেড়ে দিয়ে অজানা পথ গ্রহণ করলাম। প্রথম দিনটা বেশ কাটল। খাবার এবং থাকবার স্থানও পাওয়া গেল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে যেন একটু অন্য রকম ঠেকল। কারণ গ্রামের লোক বোধ হয় আমাকে 'জাপানী' ভেবেছিল। ব্যাজটা ঝোলাতে রেখে দিয়েছিলাম। তা' খুলে আবার প'রে নিলাম। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যেতে লাগলাম। কোথাও সাইকেলে চ'ড়ে গেলাম, আবার কোথাও বা সাইকেলকে ঠেলেই নিয়ে যেতে হ'ল। যেমন দিন কাটে তেমনি কাটতে লাগল, শুধু মনে হচ্ছিল কবে নান্‌কিন্ গিয়ে পৌঁছব। যা'কেই নান্‌কিনের পথের খবর জিজ্ঞাসা করলাম সে-ই আমার প্রতি বেশ একটু তাকিয়ে নিয়ে তারপর পথ ব'লে দিতে লাগল। রোজ কত মাইল চলেছি তা'র হুঁস্ ছিল না। ঘড়ি নাই, সাঙ্কেতিক যন্ত্রও নাই, কাঁহাতক আর আন্দাজ চালান যায়। গ্রামগুলি দেখে দেখে এমন একঘেয়ে লাগছে যে নূতন ব'লে কিছুই মনে হয় না। পুরাতন মন্দিরগুলিতে গিয়ে দেখতাম যে ভারতীয় দেবদেবীর গড়নের কোনও দেবদেবী আছে কি না। যদি দেখতে পাই, তবে দেশে গিয়ে বলব যে আমাদের সঙ্গে চীনের অনেক মিল আছে, তা'রাও আমাদের অমুক দেবতাকে মানে এবং পূজা করে, কিন্তু সেরূপ দেবদেবীর নামগন্ধও নাই।

যে পথে যাচ্ছি তা' থেকে অনতিদূরেই নদী। এই নদী দিয়ে নৌকা-যোগেও নান্‌কিন্ যাওয়ার সুবিধা ছিল। কিন্তু সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে চলাই আমার উদ্দেশ্য, তাই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'তে আমার মন কিছুতেই সায় দেয় নাই। কোন কোন স্থানে রেলে, ষ্টীমারে বা নৌকায় গিয়েছি। তা' শুধু বাধ্য হয়ে বা অবশ্যম্ভাবী বিপদের হাত এড়াতেই আমাকে করতে হয়েছে। দিনগুলি নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিচ্ছিলাম, এমন কি কোন্ বার, কোন্ তারিখ তা'ও মনে ছিল না। বেশ ভবঘুরে ভাব এসেছিল, কিন্তু যেই লোকালয়ে গিয়ে উপস্থিত হতাম অমনি আমি যে ওদেরই মত একটা সামাজিক জীব তা' মনে হ'ত। আমি দেখতাম যে সবাই পূর্ব্বপুরুষের নির্দ্ধারিত পুরাতন প্রথামত একঘেয়ে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, যেন কোনও পরিবর্ত্তন চায় না; যা' একবার অভ্যাস ক'রে বসেছে তা' ছাড়তে চায় না। কিন্তু অভ্যাসের

দাস হওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কাজেই আমি পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি।

হাঙ্কোর দিক হ'তে পদাতিক বাহিনী নান্‌কিনে চলেছে। কত স্থানে বোধ হয় সাজ সাজ রব উঠেছে, কিন্তু এই গ্রামগুলিতে লোকগুলি কেন নীরব নিস্তব্ধ তা'র কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদেরই বাড়ীর কাছ দিয়ে চীনা জাপানী কত রণতরী আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু এরা দেখেও দেখছে না, শুধু আপন কাজ ক'রে যাচ্ছে। লোকগুলি সংবাদপত্র পাঠ করছে, অথচ কোন উদ্বেগ প্রকাশ করছে না, এর কারণ কি? আকারে ইঙ্গিতে অনেকের সঙ্গে লড়ায়ের কথাও হচ্ছে, কিন্তু কেউ বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। একদিন একটা গ্রামে ঠিক দুপুর বেলায় উপস্থিত হলাম। একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তাঁ'র বাড়ীতে আমাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। বাড়ীর মালিক নিজের খরচেই একটা হোটেলে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে বিদায় নিলেন। আজ পর্য্যন্ত চীনা মুসলমান ছাড়া চীন দেশে কেউই আপন বাড়ীতে আমাকে শোবার স্থান দেন নাই। তাঁ'রা আমাকে শুধু খেতে দিয়েছেন, কিন্তু শোবার বন্দোবস্ত হয়েছে হোটেলে, নয় গ্রামের ধর্ম্মশালায়। আজও তা'রই ব্যবস্থা হ'ল। আমার কিছুই নূতন ঠেকল না। কিন্তু এই গ্রামসমূহের লোকগুলি তা'দের ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে এত নির্ব্বিকার কেন তা' হোটেলে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর পথ চলতে চলতে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজী-জানা লোক না পাওয়ায় একথার জবাব মিলে নাই।

বিকাল বেলায় গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। কেউ আমার কথায় সাড়া দিল না, সবাই যেন আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। রাত্রে একটা নৈশ বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে চীনা ভাষায় সামান্য আলাপের পরে গ্রামে কোন ইংরেজী-জানা লোক আছে কি না তা' জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "একটু দূরে আছে।" কিন্তু রাত্রি হয়ে গিয়েছে, মনের বাসনা মনেই রইল। অজানা দেশে অজানা লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি নাই ব'লে আমার মনে একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। অনেকে এড়াবার চেষ্টা করেছে

সত্য, কিন্তু যা'কে ধরেছি সে-ই আমার সঙ্গে আপন জনের মত ব্যবহার করেছে।

পরদিন প্রাতে গ্রাম ছেড়ে পথে এলাম, কিন্তু কতক্ষণ চলার পরই সাইকেলটার পিছনের চাকা ফুটা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে সাইকেলটা মেরামত করবার জন্য সরঞ্জামের ব্যাগটা নিয়ে কাজে লাগব এমন সময় একটী যুবক এসে তা'রই ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, যদি আমি সাইকেল ছেড়ে এখন না পালাই তবে মহাবিপদে পড়ব—হয়তো আমার ধড় হ'তে মাথাও চ'লে যেতে পারে। তা'র ভাবভঙ্গীতে আমার মোটেই ভয় হয় নাই, বরং বিপদের সম্মুখীন হ'তেই আমার ইচ্ছা হচ্ছিল। যুবককে ইঙ্গিতে চ'লে যেতে বললাম। যদি বিপদ আসে তবে আসুক, আমি বিপদকে ভয় করি না। যুবক প্রবল বেগে এক দিকে ছুটে পালাল। আমি বিপদের কথা না ভেবে যুবকটী যে কি ক'রে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে তা' দেখতে লাগলাম।

তাণ্ডবের পশ্চাতে

এ জীবনে প্রাণ নিয়ে পলায়ন অনেক দেখেছি। প্রাণের মমতার চেয়ে বড় মমতা আর নাই। আজ তা'র একটী চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। আমার কি প্রাণের মমতা নাই? আমি পালাচ্ছি না কেন? পালাবার যা'র অভ্যাস নাই, সে কি ক'রে পালায়! ভয়কে যে ভয় ব'লে গ্রাহ্য করে না তা'র আবার পালাবার প্রয়োজন কোথায়? তাই আপন মনে সাইকেলটা মেরামত করতে লেগে গেলাম। সাইকেল মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় দূরে পল্টনী কায়দায় ব্যাণ্ডের বাজনা শুনতে পেলাম। ক্রমশঃ সে শব্দ স্পষ্টতর হচ্ছিল, শেষটায় একেবারেই যেন নিকটে শোনা গেল। এ আর অন্য কিছু নয়, এক দল সৈন্য নান্‌কিনের দিকে চলেছে। পুরোভাগে যে সেনাপতি অশ্বারোহণে চলেছিলেন তিনি আমার কাছে আসামাত্রই তাঁ'কে আমার পরিচয়পত্র দিলাম। তিনি বেশ ভাল ক'রেই তা' পড়লেন। তারপর আমার জিনিষপত্র পরীক্ষা ক'রে নেওয়ার আদেশ দিলেন। ছাড়পত্রখানা সব সময়েই আমার বুকের পকেটে

থাকত। পকেট হ'তে খুলে তা' সেনাপতির হাতে দিলাম। বৃটিশ ছাড়পত্র দেখে তিনি একটু আশ্বস্ত হ'লেন। আমি যে তাঁ'র শাসনের বহির্ভূত তা' আমার ছাড়পত্র দেখেই তিনি বুঝে নিলেন এবং ঘোড়া হ'তে নেমে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। তারপর তাঁ'র ঝোলা হ'তে দু'খানা বিস্কুট আমায় খেতে দিলেন। স্বাক্ষরের বইতে তিনি নাম লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিনা পয়সায় এতে কা'রও স্বাক্ষর নেই না জেনে তিনি একটু দুঃখিত হ'লেন। কারণ তাঁ'র কাছে বোধ হয় টাকা ছিল না।

লোকটার হাবভাব দেখে আমার মোটেই ভাল লাগেনি। সেনাদল এগিয়ে চলল এবং আমি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম যে সৈন্যেরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। এরা যেন বেশ বড় একটা যুদ্ধ জয় ক'রে এসেছে, কিন্তু এদের শরীরে যে কোন ক্ষতের চিহ্ন নাই; অথচ অস্ত্রগুলি বেশ ভাল ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ভাবলাম, তবে কি ওরা শিকারী? যাক গে এদের কথা, এদের সম্বন্ধে আমার আর ভাববার সময় নাই। আমি এগিয়ে চললাম। মাইল চার পাঁচ গিয়েই একটা গ্রাম পেলাম। গ্রামখানা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে এবং তিনটা যুবতীর মৃতদেহ উলঙ্গ অবস্থায় প'ড়ে আছে। বিজয়ী সৈন্যদলই যে এই কর্ম্মটী করেছে তা' আর বুঝতে বাকি রইল না। সেনাপতির দেওয়া বিস্কুট ফেলে দিলাম দূরে। হত্যাকারীর রক্ত-রাঙা হস্তের স্পর্শ তাতে।

আর একটু এগিয়ে দেখলাম, কয়েকটী যুবকের মৃতদেহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প'ড়ে আছে। যুবকগুলির পরণে চীনা পোষাক এবং তা'দের মাথায় ইংলণ্ডের কুলিরা যে টুপী ব্যবহার করে সেরূপ টুপী ছিল। মৃতদেহগুলির কাছেই কতকগুলি কাগজ ছড়ান রয়েছে, বোধ হয় তা'দের পকেট হ'তে সেগুলি বের ক'রে দেখা হয়েছিল। দুই একখানা কুড়িয়ে নেব কি? না তা' হবে না, কি জানি তা'তে কি লেখা আছে! আর তা'তে যদি চীন সরকারের বিপক্ষে কিছু লেখা থাকে তবে বিপদে পড়তে হবে, এরূপ বিপদ ডেকে আনবার দরকার নাই। ইচ্ছা হ'ল গ্রামটা বেড়িয়ে দেখি, কিন্তু গ্রামে যে লোক নাই, কা'র সঙ্গেই বা কথা বলব! কিছুদূর এগিয়ে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি ক'রে আবার পথ ধরলাম।

বিকালে আর একটা গ্রামে পৌঁছে দেখি, তা'র বহু বাড়ীতে তখনও আগুন জলছে। অনেক স্ত্রীলোক একটা রক্তাক্ত স্থানের কাছে ব'সে কাঁদছিল। বাড়ীঘর পুড়ে ছারখার হচ্ছে, সর্ব্বত্র রক্ত ছড়িয়ে আছে। এদের কি আবার আমার যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? হয়তো তা'রা জাপানী ভেবে তেড়ে এসে এই অপরিচিত পথিকের উপর প্রতিশোধও নিতে পারে। কে এই রমণীদের পথে বসিয়েছে তা' জানতে দেরী হ'ল না। চীনাদের ভাষা শিখবার পূর্ব্বে তা'দের গালি শিখেছিলাম। চিয়াং-কাই-সেককে ওরা গালি দিচ্ছিল। বিজয়ী সৈন্যদল বোধ হয় কমিউনিষ্ট দলন করছিল, কিন্তু মানুষের উপর মানুষ যে এত অত্যাচার করতে পারে তা' আর আমার জানা ছিল না। এই পৃথিবী ছোট নয়, ন্যায় ও ধর্ম্মের নাম ক'রে কত অত্যাচারী এই পৃথিবীর মানবসমাজের বুকের উপর নৃশংস ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে তা'র হিসাব কে রাখে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন সংবাদপত্রে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের নামগন্ধও পাই নাই।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, রাত্রি কাটাতে হবে। তাই রাত্রি কাটাবার ইচ্ছায় কবরখানার দিকে চললাম। রাত্রে ভূতের ভয় সামলান যাবে, কিন্তু কেউ যদি তেড়ে আসে তবে বাঁচবার উপায় থাকবে না। কবরখানা খুঁজে বের করতে বহুক্ষণ লাগল না, কারণ গ্রামের অল্প দূরেই ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, অনেক মৃতদেহ জমা ক'রে রাখা হয়েছে, কফিনে পর্য্যন্ত রাখা হয় নাই। এই এলোমেলোভাবে ছড়ান সদ্য মৃতদেহগুলিকে কাছে নিয়ে কি ক'রে রাত্রি কাটান যায় তা' ভাবতে লাগলাম। আর ভাবাভাবি না ক'রে শেষটায় সঙ্গের কম্বলটা মুড়ি দিয়ে কবরখানার একটু দূরে শুয়ে পড়লাম। মৃতদেহের কথা বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না। কারণ কখন যে ঘুম এসে সকল চিন্তার অবসান করল তা' আর বুঝতে পারি নাই। কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন প্রভাত হয়েছে, গ্রামের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে স্ত্রীলোকগণ করুণ সুরে কাঁদছে। আমার আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে ইচ্ছা হ'ল না।

এই পথ ছেড়ে অন্য একটা পথ ধরলাম। কারণ চিয়াং-কাই-সেকের সৈন্য এই পথ দিয়েই কমিউনিষ্টদের কচুকাটা ক'রে অগ্রসর হচ্ছে, যত এগিয়ে যাব ততই রক্তাক্ত স্মৃতি হবে সঙ্গী। যে পথ ধরলাম সে পথে তখনও শান্তি

বিরাজ করছিল। চীনারা চায় শান্তি। যা'র হাতেই শাসনভার থাক এবং যে কোন ভাবেই খাজনা আদায় করা হোক না কেন, চীনের লোক শুধু ক'দিন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আপন কাজে মন দিতে চায়। তা'রা চায় না বিদেশীর আগমন, তা'রা চায় না পুলিশ ফৌজ, তা'রা চায় মুক্তি। এই অঞ্চলে চুরি-ডাকাতি তো নাই-ই, এমন কি লোকে একে-অন্যের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলতে চায় না। নূতন আগন্তুক দেখে অনেকের গা ভয়ে শিউরে উঠল। আমি তা'দের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি একজন হিন্দু পথিক মাত্র, শুধু আহারাদি করা এবং রাত্রি কাটানই আমার ইচ্ছা। এতেও অনেকের শঙ্কা দূর হ'ল না। তারপর আমার স্বাক্ষরের বইখানা এবং আমার সম্বন্ধে সংবাদপত্রের লেখা তা'দের দেখিয়ে দিলাম। তা'তে ওরা বুঝে নিল আমি হিন্দু, ওদের শত্রু নই। তারপর তা'রা খাবার আনল এবং শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিল। কিন্তু প্রাতে বিদায়ের বেলায় তা'রা আমাকে নান্‌কিনের পথে যেতে নিষেধ করল।

ওদের ভাষা আমি বুঝি না, আমারও ভাষা ওরা বোঝে না। তাই তা'রা হাতের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, কোন জাপানী-বিদ্বেষী চীনা যুবক হয়তো আমাকে জাপানী ভেবে খুন করতেও পারে। এই কথা শুনে আমি একটু চিন্তায়ই প'ড়ে গেলাম। কারণ চীনে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদীরা তো সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে ব'সেই আছে। এমন ঘটনাও শোনা গিয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের লোককে নিজেরাই খুন ক'রে তা'র জন্য নিরীহ চীনাদের উপর দোষ চাপিয়ে অনর্থক একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে। তা'রা হয়তো আমার মৃত্যুকে লক্ষ্য ক'রেও অরাজকতা দমন করার অছিলায় চীন-বাসীদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে তা'দের পররাজ্যলালসাকে চরিতার্থ করবে। চীনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে চীনাদের অযথা উৎপীড়নের নিমিত্তের ভাগী হ'তে আমার ইচ্ছা হ'ল না। কাজেই আমি পথ পরিবর্ত্তন করলাম। এন্‌কিন নামক একটা ছোট শহরে গিয়ে জাহাজে নান্‌কিনের দিকে রওনা হলাম।

বোধ হয় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনেছিলাম, কিন্তু আমার বসবার স্থান হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আমার দ্বিতীয় শ্রেণী ভাল লাগল না, তাই তৃতীয়

শ্রেণীতে ফিরে এলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে কতকগুলি 'সাদা-রুশ' ছিল, তা'দের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী বলতে পারত। তা'দের সঙ্গ পেয়ে মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নানা বিষয় নিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। অনেকে আমার কথার প্রবল প্রবাহে ভেসে গেল, অনেকে আমাকে বাচাল ভাবল। কিন্তু এরা জানে না যে, পথ চলার সময় কথা বলতে পাবার সুযোগের অভাবই আমার জিহ্বায় এ প্রতিক্রিয়া এনেছে। একটী যুবক মাত্র আমার কথায় সাড়া দিতে লাগল। তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন সে আমার কথা কান পেতে শুনছে এবং নানারূপে আমার সাহায্য করছে! তা'র উত্তরে সে বলল যে তা'র পিতা একবার রুশ দেশ হ'তে এই চীন দেশে পালিয়ে আসেন। তারপর তা'র মা দেশ থেকে তা'কে নিয়ে চীনে এসে তা'র পিতার সঙ্গে দেখা করেন। বহুদিন পরে তা'দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ব'লে তা'র পিতা আমারই মত কয়েক দিন ক্রমাগত শুধু কথাই বলেছিলেন। যা'রা অনেক দিন কা'রও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, তা'রা এরূপ ভাবেই বাড়াবাড়ি করে। এই রুশ যুবক জাহাজে আমার প্রতি যে সৌজন্য দেখিয়েছিল তা' এখনও ভুলতে পারি নাই।

এই যুবকের মারফতে রুশের অনেক কথা শুনতে পেয়েছিলাম। তা'র কথায় বুঝলাম সে 'লাল রুশ', নিজের ইচ্ছায় দেশ ছাড়ে নাই, মাতৃস্নেহই তা'কে এই চীন দেশে বেঁধে নিয়ে এসেছে। শ্লাভদের মাতাপিতার প্রতি ভক্তি অনেকটা আমাদেরই মত। তা'রা আমাদের মত এক বাড়ীতে একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করতে চায়। তারপর ওদের সাদাসিধে ভাব অনেকটা ভারতের গরীব পরিবারের সঙ্গে মিলে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কোনও মিল নাই। কারণ এই দুই শ্রেণীর লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা'দের জীবনযাত্রার মধ্যে আপনা হ'তেই আভিজাত্য এসে পড়ে, কিন্তু শ্লাভদের মধ্যে এটা একেবারেই দেখা যায় না। যুবকের ব্যবহারে এমন কিছু পাই নাই যা'তে সে আমাকে ঘৃণা করে একথা বলতে পারি। বরং আমারই বলবার পূর্ব্বে সে আমার জন্য সিগারেট, চা, এমন কি খাবারও এনে হাজির করল। পরিবর্ত্তে আমি কি কিছু দিয়েছি? কিছুই দেই নাই, শুধু দিয়েছি তা'কে আমার অক্ষমতার করুণ চাহনি।

আমি নান্‌কিন্‌ যাব, আর সে বোধ হয় যাবে সাংহাই, কিন্তু এই সামান্য সময়ের ভিতরে তা'র ও আমার মধ্যে প্রীতির যে দৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তা' জীবনে ভুলবার নয়। সে হয়তো ভুলে গেছে, কিন্তু আমি ভুলি নাই। এই 'লাল রুশ' যুবক আমাকে তা'র দেশের সংবাদ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। রুশ ভাষায় কি ক'রে এক দুই বলতে হয় তা'ও সে আমাকে শিখিয়ে দিল। আমি তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এক দুই শিখে আমার কি লাভ হবে?" তা'র উত্তরে যুবক অনর্গলভাবে ব'লে যেতে লাগল, "শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়াই আমাদের দেশের যুবকযুবতীর প্রধান কর্ত্তব্য। নিজে শিক্ষা লাভ ক'রে অপরকে শিক্ষা না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষার কোন মূল্যই হ'ল না। আজ যে শিক্ষার অধিকারী হয়ে আমরা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছি তা'র জন্য আমাদের কোন অভিমান নাই। আমরা চাই যে আমাদের পরে যা'রা আমাদের বংশধর হয়ে আসবে তা'রা যেন এই পৃথিবীতে শিক্ষার অভাবে মূর্খ হ'য়ে জীবন না কাটায়। তা'দের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন তা'দের ভাঙ্গিয়ে নিজেদের সুবিধা ক'রে না নেয়। এই দেখুন না, চীনের দরিদ্র, মূর্খ ভিখারী প্রভৃতি মনে করে যে তা'দের দৈন্য ও দুর্দ্দশার জন্য তা'রা দায়ী নয়, দায়ী হ'ল তা'দের অদৃষ্ট। যখন তা'দের উপর কেউ অত্যাচার করে, তা'দের ন্যায্য প্রাপ্তি কেড়ে নেয়, তখন তা'রা তা'দের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে এসবকে ভগবানের বিধান ব'লেই মেনে নেয়। এগুলি কি শিক্ষার অভাবে হচ্ছে না? যদি এরা সত্যকার শিক্ষা পেত, তা'দের পক্ষে কোন্‌ পথ শ্রেয় ও প্রেয় তা' স্বাধীনভাবে বুঝে নিতে পারত, তবে তা'রা সুখী হ'ত, তা'রা ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে অকালে চুল পাকাত না।"

তারপর যুবক তা'র চীন দেশে আগমনের কথা পাড়ল। "রুশ বিপ্লবের সময় এডমিরাল কোলচাক নিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর'ই সাহায্যে রুশ দেশ দখল করতে চায়, তখন তাঁ'র ভুল ভাঙ্গল। লোকে বলে যে ভগ্নহৃদয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তাঁ'র মৃত্যুর পর বিদেশী সৈন্যদল এক মহাসমস্যায় প'ড়ে গেল। কারণ

যা'কে উপলক্ষ ক'রে তা'রা রুশ দেশে এসেছিল তিনিই মরে গেলেন। এদিকে লেনিন নারী-বাহিনীর সাহায্যে বিদেশী সৈন্যদের মধ্যে নানারূপ পুস্তিকা ছড়াতে লাগলেন। মার্কিন সেনানায়ক সর্ব্বপ্রথম এই নারী-বাহিনীর কথায় মুগ্ধ হলেন। তারপর তাঁ'রই পরামর্শে বোধ হয় বিদেশী বাহিনী সাইবেরিয়া ছেড়ে চ'লে গেল। রুশরা বুঝল যে বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টির কথা বর্ত্তমানে স্থগিত রেখে নিজের ঘর সামলান দরকার। তাই তা'রা নানারূপ কর্ম্মপন্থা নিয়ে নিজের দেশকে সুদৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করল। আমিও তা'তে প্রাণমন ঢেলে কাজ করছিলাম। কিন্তু পলাতক সাদা-রুশ পিতার নিকট হ'তে হঠাৎ চীন দেশে ডাক পড়ল। তাই পিতৃদর্শনের জন্য মাকে নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে চীনে আসতে হ'ল।" যুবক যেন ভাবে বিভোর হ'য়ে তা'র মনের কথা ব'লে তৃপ্তি পাচ্ছিল। আমি শুধু তন্ময় হ'য়ে তা'র কথা শুনে যাচ্ছিলাম।

জাহাজ প্রবল বেগে চলতে লাগল। ইয়াংসী চীন দেশেরই নদ বটে, কিন্তু বিদেশী কোম্পানীর জাহাজই তা'র বুকের উপর অবাধে চলাফেরা করছে। চীনের দরিয়ায় চীনা জাহাজ চলতে না দেখে আমাদের হতভাগ্য ভারতের কথাই মনে পড়ল। চীনে ভ্রমণ করতে করতে আমি একজন পূরাদস্তর চীনা-ই যেন বনে গিয়েছিলাম। কবে চীনের লোক আত্মস্থ হবে, কিসে চীনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে তা'ই তখন আমার চিন্তার বিষয় ছিল। যেখানে ত্যাগ নাই, স্বার্থই যেখানে সর্ব্বস্ব সেখানে কি ক'রে মুক্তি আসতে পারে? একটী চীনা যুবক বেশ সাজগোজ ক'রে আমারই কাছে বিছানা পেতেছিল। চীন দেশের বৃহত্তম নদীর উপর জাপানী জাহাজ কেমন মদগর্ব্বে মত্ত হয়ে চলেছে একথা ব'লে তা'কে চীনের সত্যকার অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিলাম। যুবক কিছু বলল না, শুধু মুখ ফিরিয়ে রইল। তা'র যে দুঃখ হচ্ছিল না তা' নয়, আমার কথাটী তা'র প্রাণে খুব লেগেছিল। কিন্তু উপায় কি?

সেই যুবকের মুখখানি এখনও আমার মনোদর্পণে ভাসে। কত পবিত্র সে মুখ, কত শক্তি তা'র শরীরে, কত গাম্ভীর্য্য তা'র অন্তরে। কথায় কথায় সে বলেছিল যে, চীন দেশে থাকতে তা'র আর মোটেই মন বসে না, কারণ এই দেশটায় কেউ কা'রও কথা শোনে না। সবাই আপন আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

শীঘ্রই বোধ হয় চীনাদের সঙ্গে জাপানের একটা কিছু খিটিমিটি বাধবে, কিন্তু যুবকের দল কি সেদিকে মাথা ঘামায়? মোটেই না। কোথায় নাচ হবে, কোথায় কোন্ প্রেক্ষাগৃহে ভাল সিনেমা দেখা যাবে, তা' নিয়েই তা'রা ব্যস্ত। যা'র দুটা পয়সা আছে সে শুধু আমোদপ্রমোদের কথাই ভাবছে। যা'র কিছু নাই সে তো পেটের জ্বালায়ই অস্থির, আর যা'রা দেশের কথা ভাবছে শোষকদের মতে তা'রাই কমিউনিষ্ট, তা'রাই দেশের শত্রু। যা'রা দেশ শাসন করছে, তা'রা এসব লোককে নির্ম্মমভাবে হত্যা করছে, কিন্তু সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন চীনের লোক দেখবে যে চীনের বৈশিষ্ট্য যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা'ও লোপ পেয়ে গেছে। যে চিয়াং-কাই-সেক আজ দেশের লোকের অনিষ্ট করছেন, হয়তো তাঁ'কেই মাথা গুঁজবার স্থান খুঁজতে বিদেশে যেতে হবে। যুবকের কথা শুনে মনে হ'ল আমি চীন দেখি নাই, যা' দেখেছি তা' ঠিক দেখার মত নয়। আমাকে আরও দেখতে হবে, কিন্তু এই যে পরিশ্রম ক'রে দেখছি, লোকের কথা শুনছি, সে সম্বন্ধে ক'ার কাছে গিয়ে বলব, শুনবেই বা কে? যেখানে ব্যাকরণের মারামারি, পদ্য নিয়ে আড়াআড়ি, সেখানে কে আমার কথা শুনবে?

আগামী কল্য প্রাতে নান্‌কিন্ পৌঁছব। এরই মধ্যে জাহাজে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গিয়েছিল—চীনা, সাদা-রুশ, আর্ম্মানী, ইউরোপীয়, মিশ্র চীনা। কিন্তু জাহাজে জাপানী ছিল না। জাপানীরা এসব দিকে নিজের দেশের জাহাজ ছাড়া বিদেশী জাহাজে চড়ে না। না চড়বার কারণ দুটী—ডেক ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ইউরোপীয় কোম্পানীর জাহাজে অনেকটা চাঁদপুর-গোয়ালন্দ ষ্টীমারপথের মতই স্থান পায়, আর জাপানী জাহাজে ডেক বলতে কিছু নাই, সবই কেবিন। তা'ও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যে কোন দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে তা'র তুলনা করা যেতে পারে। চীনারা যদিও জাপানী জাহাজে সুবিধা পায়, তবু সেদিকে তা'রা মোটেই ঝোঁকে না। জাপানী জাহাজগুলিকে তা'রা বেশ ভাল ভাবেই বয়কট করেছে। এই চীন দেশে কোন কোম্পানীকে যদি চীনারা বয়কট করে তবে তা'র জাহাজ চালান বড়ই কষ্টকর।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দু'জন চীনা মুসলমান যাত্রী এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে

লাগলেন। তাঁ'রা আমাকে ইউনান ফোঁ না যাওয়ার জন্য অনুযোগ দিলেন। আমার না যাওয়ার কারণ শুনে তাঁ'রা হেসেই সারা। দু' ভদ্রলোকই আমাকে বললেন, তাঁ'দের দেশ সম্বন্ধে বিদেশীরা যেমন মিথ্যা প্রচার করছে, তেমন আর কোন দেশ সম্বন্ধেই দেখা যায় না। এই মিথ্যা প্রচারের মূলে রয়েছেন ফরাসী ক্যাথলিক মিশনারীরা। ঐ অঞ্চলে ওঁদের ধর্ম্মকথা কেউ শুনতে রাজি হয় না ব'লেই ওঁ'রা এই মিথ্যা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন। তাঁ'রা কথায় কথায় বললেন, তাঁ'রা সাধারণভাবে ভারতের সভ্যতা বিশেষ ক'রে মুসলিম হিন্দুদের দেখতে ভারতে যাবেন। তাঁ'দের নিকট আমার পরিচয় দেওয়ার সময় আমি বলেছিলাম, আমি তথাকথিত কোন ধর্ম্মের ফাঁদে নাই, তবে বৌদ্ধ হিন্দু ব'লে তাঁ'রা আমাকে গণ্য করতে পারেন। আমি বৌদ্ধ হিন্দু শুনেই আমার সমাজের লোক গরু শূকর খায় কি না সে সংবাদটি আমার কাছ থেকে তাঁ'রা বিশেষভাবে জেনে নিলেন। কারণ প্রয়োজন হ'লে তাঁ'রা বৌদ্ধ এবং কমিউনিষ্ট চীনাদের বলতে পারবেন—"দেখহে তোমাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী একটী ভারতীয় বলছেন যে তাঁ'রা গরু এবং শূকর খান না।"

চীনের মুসলমানরা অন্য চীনাদের গরু খাওয়া যত খারাপ মনে করে শূকর খাওয়াটা তত খারাপ মনে করে না। কারণ চীনা মুসলমান গরু পোষে এবং কাফের চীনাদের গোমাংস খাওয়ার দরুণ ক্রমে ক্রমে চীন থেকে গোবংশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভারতের হিন্দুরা মাংস খায় না বললেই চলে। যদি তা'রা গোমাংস খেতে আরম্ভ করে, তবে ভারতের অবস্থা চীন হ'তে আরও খারাপ হবে; কারণ গোবংশ একেবারে লোপ পেতেও পারে। চীন দেশে আমার প্রায় দু'হাজার মাইল ভ্রমণ হয়ে গেছে, কিন্তু দু'হাজার গরু তো দূরের কথা দু'শতও আমার চোখে পড়ে নাই। তা'র একমাত্র কারণ চীনারা গোমাংস খুব পছন্দ করে। তারপর একটা গরুতে যে পরিমাণ মাংস হয়, দশটা শূকরেও তত হয় না, অথচ মাংসই হ'ল চীনাদের বিশেষ খাদ্য।

ইউরোপের দু'জন ভদ্রলোক আমার একটা কথা শুনে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন। সে কথাটী এই যে, একমাত্র ভারতের জৈনদের সঙ্গে চীনা মুসলমানদের তুলনা চলে। ভারতের জৈন এবং চীনের মুসলমান এক শ্রেণীর লোক। তা'দের অহিংসা জীবজন্তুর প্রতি, মানুষের প্রতি নয়। জৈনরা

পিপীলিকাকে চিনি দেয়, কিন্তু সেই চিনি মানুষকে দিতে তা'দের ভাল লাগে না। চীনের মুসলমানও গোরক্ষায় ব্যস্ত, কিন্তু দ্বারে যে ভিখারী চীনা তিন দিন না খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা'কে এক মুঠা চাউল দিবার নাম নাই। এদিকে একটী রুশ যুবক এবং কয়েকটী শিক্ষিত চীনা আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল। আমি খাওয়ার জন্য উঠে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভদ্রলোক দু'জন আমাকে ছাড়তে চান না। সুখের বিষয়, আমাকে এখনই এই তৃতীয় শ্রেণীর চীনা এবং রুশদের সঙ্গে খেতে হবে। অতি কষ্টে তাঁ'দের হাত থেকে রেহাই পেয়ে খেতে বসলাম। চীনা যুবকরা আমাকে বললেন,—"এই জাতীয় লোকের সঙ্গে আর মিশবেন না, এরা শুধু বাজে কথা ব'লে সময় ক্ষেপণ করে। ভগবান আর ভগবান—যেন ভগবান ওদের দরজার দারওয়ান। ভগবান যদি থাকেন তো আছেন, তা' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।" যুবকদের কথায় আমার 'না' বলবার মত কিছু ছিল না।

আমার রুশ যুবকবন্ধু একেবারে নীরব। তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের দেশে ভগবান আছেন কি? যুবক হেসে বললেন—"তাঁ'কে কখনও দেখি নাই, কেউ এখন পর্য্যন্ত তাঁকে আবিষ্কারও করতে পারেন নাই।" আমি বললাম, "ভগবান একটা দেশ নয় যে কলম্বাস তা' আবিষ্কার করতে যাবেন। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁ'র কথাই আমি বলছি।" যুবক মুখ বাঁকিয়ে বলল, "এসব বাজে কথায় আমি নাই। এখন খেতে বসেছি, কাজেই খাওয়ার কথা বলা যাক। এই দেখুন, আলুগুলি চীনারা ভাল ক'রে সিদ্ধ করতে পারে না, যে ঝোল রান্না করেছে তা' এত কদর্য্য যে মুখে দেওয়া যায় না। যে প্লেটগুলিতে খেতে দিয়েছে, তা'তে অনেক ময়লা আছে। তারপর যে খাদ্য আমাদের খেতে দেওয়া হয়েছে, তা' শরীররক্ষার পক্ষে প্রচুর নয়। এর কি কোন সুবন্দোবস্ত করা যায় না? এই জন্যই এসব অকর্ম্মাদের দেশে আমার আসতে ইচ্ছা হয় নাই। পিতা টেনে এনেছেন, তাই আসতে বাধ্য হয়েছি। যদি পারি তবে পিতাকে নিয়ে দেশে যাব। সেখানে কাজ করব, আর সুখে থাকব।"

খাওয়ার পরে খেলাধূলার কথা হ'তে লাগল। চীনা যুবকরা বিদেশী খেলোয়াড়দের বেশ বাহবা দিতে লাগল, এমন কি ভারতের হকি খেলার

বাহাদুরীও বাদ পড়ল না.। সাইবেরিয়ার শীতের সময় বরফের উপর কেমন শরীরচর্চ্চা করা হয় রুশ যুবক তা' ধীরে ধীরে অথচ সংক্ষেপে আমাকে বলতে লাগল। কিন্তু হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি কোন খেলাধূলার উল্লেখ না করায় তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, তখনও রুশ দেশে ওসবের কোনও বন্দোবস্ত করা হয় নাই। কারণ দেশকে নূতন ক'রে ঢেলে সাজবার কাজে যা'রা অনুক্ষণ ব্যস্ত তা'দের খেলাধূলায় মত্ত থাকবার সময় কোথায়? যা'র বাড়ীঘর আছে, যা'র অন্নের চিন্তা নাই, সে-ই খেলাধূলার কথা ভাবতে পারে। তা'দের বাড়ীঘর, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে এমন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে যে তা' দেখলে নাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে জগতের বরেণ্য জাপানীদেরও তাক লেগে যাবে। আরও বাজে কথা অনেক হয়েছিল, তাই এই খানেই ইতি দিলাম।

রাত্রি প্রভাত হয়েছে। নদীর বুকের উপর তরুণ ঊষার আলো পড়ে রঙিন্ আল্পনায় নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই অদূরে একটা জাপানী যুদ্ধজাহাজ দেখলাম। নাবিকের দল যে সকাল বেলা কসরৎ করছে তা'ও লক্ষ্য করলাম। নির্দ্দোষ চীনের ইয়াংসী নদের বুকে দুষ্ট ব্রণের মত জাহাজটি নঙ্গর করেছে। তাই তা'দের আর পাহারা দিবার দরকার নাই। যে নির্দ্দোষ তা'কে আবার ভয় কি! কাজেই কাপ্তেন হ'তে আরম্ভ ক'রে পাচক পর্য্যন্ত সকলেই কসরতে লেগে গেছে। সে কসরৎ বাস্তবিকই দর্শনীয়। যুবকের দল বুক ফুলিয়ে কখনও হাত উপরে ওঠাচ্ছে, আবার কখনও নীচে নামাচ্ছে। তা'দের শরীরের গঠন, তা'দের মুখের কোমলভাব, তা'দের মরণে নির্ভয়তা ইয়াংসী নদের তরঙ্গের উপরও চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি যেমন একবার যুদ্ধজাহাজের দিকে তাকাচ্ছিলাম, তেমনি এই দৃশ্যকে কে কি ভাবে নেয়, তা'ও দর্শকদের মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। আমি নিরপেক্ষ দর্শক বই তো নয়, দেখে নেই না জগৎ কোন্ দিকে চলেছে। সর্ব্বপ্রথম দেখলাম সাদা-রুশ বন্ধুদের মুখ। তা'দের মুখে আনন্দের উচ্ছলতা ফুটে উঠেছে। সাদা-রুশরা যেন বলতে চায়—ভাই জাপানী, শক্তি সঞ্চয় কর। একদিন তোমাদেরই সাহায্যে জারের লুপ্ত রাজ্য, যিশুর প্রেম এবং মহম্মদের ভ্রাতৃত্ব লাল রুশদের কবল হ'তে উদ্ধার করব। যেখানে আজ টাকার মূল্য নাই,

আছে কর্ম্মের মূল্য, সেখানে নিয়ে বসাব টাকার রাজত্ব, কাফে, নাচঘর, মদের দোকান। চীনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—সবাই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। যে কয়জন মুসলমান চীনা নামাজ পড়ছিল তা'রা নামাজ বন্ধ ক'রে কেবিনে গিয়ে নামাজ পড়তে লাগল। জাহাজে এমন অনেক চীনা ছিল যা'রা কখনও বোধ হয় নামাজ পড়া দেখে নাই। তাই তা'রা নামাজ পড়া দেখবার জন্য কেবিনের কাছে দাঁড়িয়েছিল। লাল রুশটীর নজর ছিল প্রভাতের নূতন সূর্য্যের উপর। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "শুনেছি ভারতের লোকে নাকি সূর্য্যকে নমস্কার করে। এটা কি সত্য?" আমি তাকে বললাম "হাঁ, সত্য কথা, এমন কি আমিও করি।" লাল রুশ যুবক একটু চমকে উঠে বলল, "তবে ভগবান ব'লে যে একটা শক্তি আছে—যা'কে আমরা "অতমেতোঁ" বলি—তা'কেও নমস্কার করেন?" আমি সম্মতি জানাবার পর রুশ যুবক যেন একটু হতাশ হয়ে গেল। আমার মত পর্য্যটকের কাছ থেকে একথা সে আশা করে নাই। কাজেই সে আমার নিকট হ'তে স'রে দাঁড়াল।

বেলা দশটার সময় জাহাজ এসে নঙ্গর করল। আমরা নামার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার পিঠ-ঝোলা বাঁধা হয়ে গেছে। সাইকেলটার তালা খুলে বেশ ক'রে পাম্প করলাম। নামবার পূর্ব্বে যা'দের সঙ্গে একটু ভাব হয়েছে, তা'দের কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য চলে গেলাম। একে একে সবাই বিদায় দিলেন। লাল রুশ যুবক তা'র ঠিকানা দিতে চাইল। কিন্তু আমি তা' গ্রহণ করলাম না। কারণ আমার কা'রও নিকট চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস নাই। বিদায়ের বেলা যুবক আমাকে বলল, "ভেবে দেখবেন "অতমেতোঁ"কে নমস্কার করা যায় কি না, এটা আমার অনুরোধ।" আমার মন তার কাছছাড়া হ'তে চাইছিল না, কিন্তু কর্ত্তব্য আমাকে জোর ক'রে তা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল।

জাহাজ হ'তে নামবার পথে কতকগুলি ছবি বিক্রেতা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। তা'দের মধ্যে কেউ বলল, তা'র কাছে "প্যারী পিকচার" আছে, আর কেউ বলল, তা'র কাছে যে ছবি আছে তা' পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তারপর আমি ঐসব ছবি নেব কি না বা তা'রা আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে কি না তা'ও তা'রা জানতে চাইল। জাহাজ

থেকেই নান্‌কিনের নদীতীরের নোংরা অবস্থা দেখতে পেয়েছিলাম। দূর থেকে চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্র নান্‌কিনের যথেষ্ট সুনাম শুনেছি। কিন্তু নান্‌কিনের বাইরের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এই শহর সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারেই উল্টে গেল। কারণ একদিকে নান্‌কিন্‌ যেমন বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মোটেই নিরাপদ নয়, অন্যদিকে তেমনি আবার নোংরার জন্য বাসোপযোগী ব'লেও আমার মনে হ'ল না। বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পিকিন্‌ থেকে অধিকতর নিরাপদ স্থান নানকিনে চিয়াং-কাই সেক রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছিলেন। নদীর বুকের উপর দুটা জাপানী এবং একটা ফরাসী গানবোট দাঁড়িয়েছিল। এই তিনখানা গানবোট মিলে যদি কামান দাগতে আরম্ভ করে তবে নান্‌কিন্‌কে বিধ্বস্ত করতে ক'ঘণ্টাই বা লাগে? আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে বিদেশী গানবোট অবাধে বিচরণ করছে সে স্থানটা কি ক'রে নিরাপদ হ'ল তা' আমি বুঝতে পারলাম না। নরনারীর দল নদীর তীরে এলোমেলো ভাবে চলেছে। ওদের না আছে জাপান-বিদ্বেষ, না আছে চীন-ভক্তি। ওরা যেন এক টুক্‌রা রুটির জন্যই কাতর! সাইকেলটা নিয়ে নেমে পড়লাম। কেউ আমার দিকে তাকাল না। যা'রা জাপানী গানবোটকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না, তা'রা আবার আমার কালো মুখের দিকে তাকাবে? একটু দূরে গিয়েই একটা বিদেশী পণ্যের দোকান পেলাম। তা'র মধ্যে অনেক খাদ্যসামগ্রী ছিল। এক ডলার দশ সেণ্ট দিয়ে একটা আমের টিন কিনলাম। তারপর দোকানীকে তা' কেটে খুলে দিতে বললাম। এক ডলার দশ সেণ্ট তখন প্রায় এক টাকার সমান ছিল। টিনটা খুলে একখানা আম মুখে দিলাম। আমের গন্ধ ও স্বাদ আমার মনে দেশের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। টিনের আমে পেট ভরল না, কিন্তু এক টাকা দিয়েও যে দেশমাতৃকার সেবা করতে পারলাম সেজন্য মনে বেশ আনন্দ হ'ল। দোকানী আমের কথা ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। তারপর কথাচ্ছলে দোকানীর কাছ থেকে নান্‌কিনে হিন্দুদের আড্ডার স্থান জেনে সে দিকেই রওনা হলাম।

নদীর পাড়ের অলিগলি ঘুরে হঠাৎ একটা বড় পথে এলাম। পথটার দু'দিকে যেমন বড় বড় ইমারত আছে তেমনি পুরাতন ধরণেরও অনেকগুলি কুঁড়েঘর দেখতে পাওয়া গেল। একটা ছোট খাবারের দোকানে গিয়ে

বসলাম। দোকানী ধর্ম্মে মুসলমান, জাতিতে চীনা। তা'র দোকানে বড় বড় পুঁটী মাছ ভাজা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে একখানা দিতে বললাম। দোকানী তা'র দাম নিল পাঁচ আনা। খেতে খেতে দেখলাম একটী যুবক আমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ উৎসুক। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কি না তা' জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু যুবক আমার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিলেন। দোকানী আমাকে ইঙ্গিতে জানাল লোকটি কানে শোনেন না। কাজেই যুবককে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বললাম। যুবক আমাকে সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি জাপানী কি না? তাঁ'কে জানিয়ে দিলাম আমি জাপানী নই, হিন্দু। যুবক যেন আকাশের চাঁদ পেলেন। তিনি আমাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা হোটেলের দিকে রওনা হলেন। হোটেলে যাবার পর যুবক হোটেলের মালিককে আমার ছাড়পত্র দেখালেন। হোটেলের মালিকের তা'তেও মন উঠল না। অগত্যা আমি অন্য চেষ্টা করতে বাধ্য হলাম। হোটেলের বাইরে এসে যুবককে বললাম "এখানে আমার দেশী লোক আছে, থাকবার চিন্তা নাই। ওরা কোন্ দিকে থাকে তা' বলতে পারেন?" যুবক সাইকেলের দোকান হ'তে একখানা সাইকেল নিয়ে আমাকে পথ দেখাতে বের হলেন। আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অলিগলি ঘুরে আমরা একটা পুরাতন একতলা বাড়ীর সামনে এলাম। বাড়ীটার সামনেই এক কোণে অন্ততঃ পক্ষে একশত গজ লম্বা খুঁটীতে একখানা ভারতীয় জাতীয় পতাকা নান্‌কিনের বুকের উপর উড়ছিল। সাইকেল হতে নেমেই পলটনী কায়দায় সেই পতাকাকে নমস্কার করলাম। সঙ্গের যুবক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলেন। সংবাদপত্রে ভারতের জাতীয় পতাকার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু আজ এই সর্ব্বপ্রথম নান্‌কিন্ নগরীতে ভারতের জাতীয় পতাকা দেখে কতই না আনন্দ হ'ল! আমার আসার পূর্ব্বেই চীনের সংবাদপত্রের মারফতে নান্‌কিনের চীনা জনসাধারণ, ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রভৃতির মধ্যে আমার আসার সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। কাচের দরজা খুলে একজন শিখ বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন "ভারতের জাতীয় পতাকাকে ইংরেজী ধরণে নমস্কার করা উচিত নয়।" তারপর কি ক'রে নমস্কার করতে হয় তা'ও দেখিয়ে দিলেন। আমি নূতন প্রথামত আবার পতাকা নমস্কার করলাম। তারপর পথপ্রদর্শককে নিয়ে

ঘরে গিয়ে বসলাম। আমাদের দুজনাকে চীনা চা খেতে দেওয়া হ'ল। ভারতের যে যে সংবাদপত্র চীনে যায় তা' দেখলাম। সর্দ্দারজী বললেন, যে সব ভারতীয় সংবাদপত্র তাঁ'রা পান, তা' বরাবর তাঁ'দের কাছে আসে না। কোনটা আসে জাপান হয়ে, আবার কোনটা সাংহাই হয়েও আসে। একজন চীনা কেরানী বড়ই মন দিয়ে কাজ করছিলেন। পরস্পর নমস্কার জানাবার পর তিনি বললেন যে তিনি এখানকারই এক সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা। মাঝে মাঝে এসে এই এসোসিয়েশনের সংবাদ নিয়ে যান। তাঁ'র কাছে আমার পথের সমাচার অনেক বলতে হ'ল, কারণ নান্‌কিনে আসার পর পর্য্যন্ত কোনও সংবাদ-দাতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার ভ্রমণকথা শুনে যেন তাঁ'র তাক লেগে গেল। উত্তর চীন এবং দক্ষিণ চীনের সংবাদ তিনি যেন মোটেই জানেন না বলে মনে হ'ল। আমার পথপ্রদর্শক এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন, বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললেন "আপনার দেশী লোককে একটী হোটেল ঠিক ক'রে দিতে বলুন।" সর্দ্দারজী আমাদের কথা বুঝে বললেন, "কেন আপনাকে কি হোটেলে থাকতে দেয় না?" তা'র উত্তরে আমি তাঁ'কে জানালাম যে অনেক স্থানেই আমাকে জাপানী বলে ভাবে, তাই বিপদে পড়তে হয়। সর্দ্দারজী বললেন, "তা' কখনও হ'তে পারে না, চলুন আপনাকে হোটেলে নিয়ে যাই।" তিন জন মিলে একটা হোটেলে গেলাম। হোটেলওয়ালা আমাকে দেখিয়ে বলল "এ কখনও হিন্দু হ'তে পারে না। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কথা বলুক তো?" আমি আর সর্দ্দারজী হিন্দিতে কথা বলতে লাগলাম। তারপর লোকটার ধারণা হ'ল আমি জাপানী নই, হিন্দু। তখন আমার গায়ে ব্যাজও আঁটা ছিল। বিকালবেলা সর্দ্দারজী আমাকে তাঁ'র বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং আমি তাঁ'র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। পথপ্রদর্শক একজন ডাক্তার। তিনি বিদেশে না গিয়েই ইংরেজী শিখেছেন এবং এলোপ্যাথিতে ডাক্তারী উপাধি পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের কথা যে তিনি কানে বড়ই কম শোনেন। তিনি এবং সর্দ্দারজী বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে সর্দ্দারজী আমাকে জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনাদের কাছে কোনও কথা বলতে নিষেধ ক'রলেন। কারণ জাপানী অর্থে অনেক চীনা গোয়েন্দা চীনের বুকের উপর ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা শুনেই আমি অবাক হলাম।

তবে কি চীনের এই দুর্দ্দিনেও চীনের লোক চীনেরই সর্ব্বনাশ করতে রাজি হয়! যদি একথাই সত্য হয় তবে ঐ সব চীনাদের দেশপ্রেমিক আখ্যায়ই ভূষিত করব, না দেশদ্রোহী বলব তা' ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

হোটেলটী একতলা। তা'তে অনেক ঘর। প্রত্যেক ঘরেই এক একটী সিট। আমি একটী সিট নিলাম। রাত্রিবাসের ভাড়া হ'ল এক টাকা দুই আনা। ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে একখানা খাটিয়া, একখানা সাদা ধবধবে বিছানা, লেপ, মশারি, একটী ছোট টেবিল, তা'র উপর চায়ের পাত্র, ছোট ছোট তিনটা কাপ ইত্যাদি ছিল। ঘর ভাড়া করামাত্রই চা এনে হাজির করা হয়। বিছানারই কাছে দু'খানা সাদা ধবধবে ছোট তোয়ালে। যাত্রী ইচ্ছা করলেই তা'কে গরম জল দেওয়া হয় এবং সেই গরম জল দিয়ে তোয়ালের সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গ মুছে ফেলা যায়। আমিও তাই করলাম। জাহাজে সারা দিন সারা রাত্রি ঘুমিয়েছি বললেও দোষ হয় না। তারপর আবার ঘুম। ঘুমে যেন চোখ বুজে আসে। আমার ভয় হ'ল—স্কটল্যাণ্ডের ঘুমান-রোগ হ'ল নাকি? সন্ধ্যার পূর্ব্বে সর্দ্দারজী এসে আমাকে ডেকে তুললেন। আমি তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করলাম—'আমার এত ঘুম হয় কেন, আমার কি ঘুমের রোগ হয়েছে?' সর্দ্দারজী বললেন, "বাবু ঘাবড়ে যেওনা, তোমার কোন রোগ হয় নাই। তোমার শরীর দুর্ব্বল হয়েছে ব'লেই ঘুম পায়। এখানে কয়দিন খাও-দাও, তবেই শরীর সেরে যাবে। কা'রও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করো না। জান কোথায় এসেছ? এটা হ'ল একটা রাজনীতির আড্ডা। তোমার মত পথিকের এই সব বিদেশী জুয়াচোরদের সঙ্গে মিশে ভবিষ্যৎ খারাপ করা ঠিক হবে না। দেখবে কাল কত লোক তোমাকে দেখতে আসবে। বোধ হয় এখানকার সংবাদ-দাতা তোমার আমার সংবাদ এতক্ষণে অনেক সংবাদপত্রে পৌঁছিয়েছেন। অনেকে তোমার মুখ দিয়ে অনেক কথা বের করে তা'দের মতলব হাসিল করতে চেষ্টা করবে। তারপর যখন বিপদে পড়বে, তখন কেউ তোমার সহায় হবে না। আমরা সহায় হয়েও কিছু করতে পারব না।"

সর্দ্দারজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের সঙ্গেই একটা দোকান। দোকানী সর্দ্দারজীকে চিনত। তাই তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—"আমি কে?" সর্দ্দারজী আমার পরিচয় দিলেন। তারপর লোকটী নিজে এসেই

ইংরেজীতে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ক্যাণ্টনে চীনারা লড়াইয়ের কিরূপ সরঞ্জাম তৈরী করেছে তাই তা'র জানবার বিষয় ছিল। উত্তর-চীনের লোক দক্ষিণ-চীনের সঙ্গে যেন সম্বন্ধরহিত, নতুবা আমার কাছ থেকে তা'র এসব সংবাদ জানবার কি দরকার ছিল? তা'র সঙ্গে আলাপ শেষ হ'লে আমরা সর্দ্দারজীর বাড়ী গেলাম। তিনি এই নান্‌কিনেই ডাক্তারী ক'রে বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। তিনি দুঃখ ক'রে বললেন, "আমার মত অশিক্ষিতরাই বিদেশে এসে টাকা রোজগার করছে। যদি এই চীন দেশেই আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক এসে চীন সরকারেরই কাজ করত, তবে তা'দের টাকা রোজগার হ'ত, আর এই চীনাদের সঙ্গে বেশ একটা ভাবের আদানপ্রদানও হ'ত। চীন ভারতের প্রতিবেশী এবং এই দুই জাতির মধ্যে পরস্পরের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, অথচ কোন দেশই কা'রও ধার ধারে না। ভারতের লোক বাজে কাজে যত শক্তি ব্যয় করে, তা'র অর্দ্ধেকও যদি বিদেশে যাবার জন্য ব্যয় করত, তবে ভারতের বহু লোক বিদেশে এসে অনেক বিষয় শিখে যেতে পারত।" সর্দ্দারজী দাড়ি, গোঁফ এবং চুল কামিয়েছেন। এছাড়া তাঁ'র মাথায় টুপি এবং পরণে পরিষ্কার ইউরোপীয় পোষাক। তাঁ'র বাড়ীতে এক চাকরাণী এবং একটী পাচক কাজ করে। আমাকে দেখে তা'রা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমার পরিচয় শুনে এবং চীন দেশে সাইকেলে ভ্রমণ করছি ব'লে তা'রা বড়ই আনন্দিত হ'ল। খাওয়ার বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই হয়েছিল। খেয়ে-দেয়ে আমরা চীন দেশ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলাম। সর্দ্দারজী বলেছিলেন এখানে একটা দল আছে। তা'র নাম ভারতীয় গদর দল। আমি যেন তা'দের সঙ্গে না মিশি। হাঙ্কোতে তা'দের নমুনা দেখে এসেছি, আর না মিশলেও চল্‌বে। নূতনত্ব যা' ছিল তা' জেনে নিয়েছি। সর্দ্দারজীকে বললাম, ইচ্ছা ক'রে কা'রও সঙ্গে মিশব না, তবে যদি গায়ে প'ড়ে কেউ কথা বলে তবে কথা বল্‌তেই হবে। আমি পথিক। কে কোন্ প্রকৃতির লোক তা' আমি কি ক'রে জানব? সর্দ্দারজীর সঙ্গে অনেক রাত্রি কাটিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

রক্ষণশীল শব্দটা আমরা শৈশব থেকেই শুনে আস্‌ছি। অনেক সময় আবেগভরে মনে মনে রক্ষণশীলদের কত আঘাত করেছি তা'র ঠিক নাই।

কিন্তু এই চীনের রক্ষণশীলতা অন্য রকমের। আমাদের সর্দ্দারজী দাড়ি, গোঁফ এবং চুল কেটেছেন। তা'র গোড়ায় রয়েছে একটী চীনা মেয়ের পাণিগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এখনও পাণিগ্রহণ হয়ে ওঠে নাই, কখন যে হবে তা'ও কেউ বলতে পারে না। চীনাদের সাধারণ নিয়ম হ'ল বরের পিতা ক'নের পিতাকে পণ দেয়। আমরা যেমন বরপণ বলি তা'রা তেমনি ক'নের পণ বলে। যা'রা এই ক'নের পণ দিয়ে বিয়ে করে তা'দের কম পক্ষে তিনশত ডলার 'ক'নে-পণ' দিতে হয়। তারপর যদি কোন বিদেশী চীনা মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে চান, তবে তাঁ'র জন্য বিশেষ ক'নে-পণের ব্যবস্থা হয়। প্রথমতঃ চীনা মেয়ের সঙ্গে কোন বিদেশী লোকের বিয়ে হ'তে পারে না, এমন কি মুসলমান চীনারা যখন তা'দের কোনও মেয়েকে কোনও বিদেশীর কাছে বিয়ে দিতে চায় তখন বড়ই বেগ পেতে হয়। অন্য চীনারা চীনা মুসলমানের নিজ ধর্ম্মাচরণে কোন সময় কোন বাধা দেয় না, কিন্তু এই বিদেশীর সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দেওয়াতেই তা'দের ঘোর আপত্তি। অনেক সময় চীনা মুসলমানের মেয়ের বিয়ে পণ্ড তো হয়ই, অধিকন্তু বিদেশী বরের মাথা গাছে ঝুলতে বা কোন নদীনালায় ভাস্‌তেও দেখা যায়। সেজন্য পাত্রের অভাবে অনেক চীনা মুসলমানের মেয়ের বিয়ে মোটেই হয় না। আমাদের সর্দ্দারজী একটী চীনা মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঐ কারণেই সম্ভবতঃ হয় নাই। চীনারা যেমন আমাদের "কালো ভূত" বলে, তেমনি ইংরেজদেরও বলে "সাদা ভূত"। চীনের কাছে হিন্দু এবং ইংরেজ সমভাবে অসভ্য বলে গণ্য হয়। হিন্দুরা যেমন চীনা মেয়ে বিয়ে করতে বেগ পান, ইউরোপীয়রাও ঠিক তেমনি বেগ পান। চীনা মহিলা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবে, প্রকাশ্যে গির্জ্জায় যাবে, কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে বিয়ের নামটী করলে সে বাইবেলকে পর্য্যন্ত ছুড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা বোধ করে না। বিদেশীর বাড়ীতে সে আয়া হ'য়ে খাটতে রাজি, পাচিকা হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে রাজি, কিন্তু ঐ বিয়ের নাম করলেই বিদেশীর সঙ্গে তা'র সমুদয় সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়। এরই দু'একটা নমুনা হোটেলে আসবার সময় দেখে এসেছিলাম।

শুতে দেরী হলেও বেশ একটু সুনিদ্রাই হয়েছিল। দরজায় আঘাতের শব্দ

শুনে ঘুম থেকে উঠেই দরজা খুলে দিলাম। নবাগতকে দেখবার জন্য অনেকেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তা'র মধ্যে ছিলেন রয়টারের একজন সংবাদ-দাতা। ওঁদের দেখেই মনে হ'ল সর্দ্দারজীর কথা। সবাইকে বসতে দিয়ে মুখটা একটু ধুয়েই কথা বলতে স্থরু করলাম। ভ্রমণের প্রাথমিক কথা বলার পরে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—"চীনদেশের অনেক স্থানে তো বেড়িয়েছেন, দেখে কেমন মনে হ'ল ?" আমি বললাম, বেশ ভালই। তারপর চীনের চোর-ডাকাতের কথা, কমিউনিষ্টদের কথা, বর্ত্তমান সরকারের কথা প্রভৃতি অনেক প্রশ্নই করা হয়েছিল। আমার মনে হ'ল সংবাদ-দাতারা "ডাকাতের দলই কমিউনিষ্ট এবং এরাই চীনের শত্রু" এই কথা আমাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন। আর একদল বলাতে ইচ্ছা করেছিলেন যে শিক্ষিত সমাজই হ'ল প্রকৃত কমিউনিষ্ট। আমার জবাব ছিল চোর চোরই, ডাকাত ডাকাতই, তা'র সঙ্গে কোন মতবাদের সম্পর্ক নাই। তারপর এই যে শিক্ষিত সমাজ, তা'র আমি কিছুই জানি না। তদুত্তরে তাঁ'রা বললেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজই সকল অসৎ কাজের গোড়ায় রয়েছে, তা'তে আপনার মত কি ?" আমি হেসে বললাম, "যদি তাই হয় তবে যাঁ'রা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাঁ'রাও বাদ পড়েন না।" এদের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হয়ে শরীরটা শিউরে উঠল। এরাও ত চীনা, কি ক'রে এরা পরদেশী একটা সামান্য লোকের কথার উপর নির্ভর ক'রে লিখবে নিজের ভাইদের মিথ্যা কুৎসা ? আলাপ আর বেশী দূর অগ্রসর হ'ল না। কারণ ইতিমধ্যে সর্দ্দারজী এসেই বললেন, "ইনি একজন পর্য্যটক, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না। যদি দরকার হয় তবে ওঁর কাছ থেকে আপনারা ভৌগোলিক সংবাদ নিতে পারেন।" এই সংবাদপত্রসেবীরা ভৌগোলিক বিষয়ের বড় ধার ধারেন নাই। তাঁ'রা নিজ নিজ ইচ্ছামত কথা টুকে নিতে লাগলেন। তারপর ভারতের কথা উঠল। ধর্ম্ম এবং সমাজ নিয়েই অনেক কথা বললাম। অনেকে সে সব কথা শুনলেন, কিন্তু একজন মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "কথাগুলা মন্দ নয়, তবে যেন লবণবিহীন তরকারী।" সমাজ এবং ধর্ম্ম এক মিনিটে ঠিক হয়ে যায় যদি শক্তি থাকে, ভারতের কি সেই শক্তি আছে ? কথাটা আমার অন্তরে খুবই আঘাত দিয়েছিল, কিন্তু আমি পথিক, সারা পৃথিবী আমাকে

ঘুরে বেড়াতে হবে। তাই আমার পথে কাঁটা পড়তে পারে এই ভয়ে একথার কোনই জবাব দিই নাই। বেলা এগারটার সময় তাঁদের বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ তখনও আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে পারিনি।

খাওয়ার জন্য হোটেলে যাব এমন সময় পররাষ্ট্র সচিবের পত্রবাহক এসে একখানি পত্র আমার হাতে দিল। তা'তে লেখা ছিল, আমি যেন বিকালে তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পত্রখানা পেয়ে মন খারাপ হ'য়ে গেল। ভাবছিলাম, হয়তো এর মধ্যে কোন কারসাজি আছে। চীনভ্রমণের সময় আমার এরূপ দু'একখানা চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং সেজন্য অনেক কষ্টও পেতে হয়েছে। আবার কি নূতন বিপদ আসে তা' কে জানে! ভাবতে ভাবতে পথে চলেছি এমন সময় একজন শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে তাঁ'দের আফিসে যেতে বললেন। কোথায় তাঁ'দের আফিস, তিনিই বা কে তা' কিছু না ব'লে তিনি হন হন ক'রে চ'লে গেলেন। একে তো চিন্তা, তারপর আবার পেটের ক্ষুধা। তাই ভদ্রলোকের কথা আমার মনের মধ্যে কোন স্থানই পেল না। খেয়ে দেখি দু'জন চীনা ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। উভয়েই তাঁ'দের নামের কার্ড দিলেন, একজন হলেন "একজিকিউটিভ ইউয়ান" (চীনের রাষ্ট্র পরিষদের) সদস্যের সহকারী ও সেন্সর (অবেক্ষক)। অন্য ভদ্রলোক তাঁ'রই আফিসে কাজ করেন। চীনভ্রমণের পরে ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে যখন লণ্ডনে গিয়েছিলাম তখন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয় এবং তিনি তখন একজিকিউটিভ ইউয়ানের সদস্য হয়েছেন একথা আমাকে বলেছিলেন। এই ভদ্রলোককে পররাষ্ট্র সচিবের নিকট হ'তে প্রাপ্ত পত্রখানি দেখাতেই তিনি বললেন, এ তাঁ'রই আফিসের এক বিভাগ হ'তে এসেছে এবং তিনিই তাঁ'দের আফিসে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। চললাম তাঁ'র আফিসে। বড় রাস্তার উপর একটী বড় বাড়ী। এইটীই তাঁ'দের আফিস। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। পরিচিত ভদ্রলোকগণ আমার কাছে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং তা'র যথাযথ জবাব যা'তে আমি দেই সেজন্য যেন একটু ভয়ও দেখাতে লাগলেন। ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে বাজে কথা আদায় করা একপ্রকার অসম্ভব বললেও চলে। পথে যে ডাকাতদের সঙ্গে দেখা

হয়েছিল তা'দের কার্য্যকলাপ দেখে আমার কি মনে হয় এই ছিল প্রথম প্রশ্ন। ডাকাত ডাকাতই, ডাকাতি যা'রা করে তা'রা কি ভাল লোক হ'তে পারে? তবে রাজনৈতিক কারণে ডাকাতি করা ওদের উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা' আমি কি ক'রে জান্‌ব? চীনের চোরও আমাকে দয়াপরবশ হ'য়ে উল্টে পকেটে কিছু গুঁজে দিয়েছে। যদি ডাকাতরা কিছু কিছু আমাকে দিয়ে থাকে তবে তা' চীনের ডাকাতের বাহাদুরী। পথে কোনও কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, প্রথমতঃ কমিউনিষ্ট কা'রা, তা'রা কি কাজ করে তা' আমাকে জানতে হবে। এতদিন চীনের অনেক স্থানে ঘুরে এলাম, কিন্তু একটা কমিউনিষ্টও দেখতে পেলাম না। কমিউনিষ্ট কে তা'ই যখন কেউ আমাকে বুঝাতে পারলেন না, তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম—জানি না আপনাদের দেশে কা'কে কমিউনিষ্ট বলে, তা'দের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু না দেখতে পেয়ে দুঃখিত হয়েছি। এখনও আমার সম্মুখে চলার পথ ঢের রয়েছে, যদি তাদের কা'রও সঙ্গে সে পথে দেখা হয়, তবে সে কি রকম জীব তা' মালুম করে নিয়ে না হয় আপনাদের জানাব। আমি এইটুকুই মাত্র বল্‌তে পারি।

নান্‌কিনের বুকে

১

আমার কাছ থেকে উপযুক্ত সংবাদ না পেয়েও মিঃ মা চান্ দুঃখিত হলেন না। তিনি রাত্রে তাঁ'র বাড়ীতে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন এবং যে সব ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কাগজ পেন্সিল নিয়ে কথা বলতে বসেছিলেন, তাঁ'দের বিদায় দিলেন। একজিকিউটিভ ইউয়ানের বাড়ীটা ভাল ক'রে দেখে নিলাম। আমাদের ক'লকাতার ধরণের বাড়ী, তা'তে চীনা কারুকার্য্যের নামগন্ধও নাই। মিঃ মা চান্ তাঁ'দের আফিসের বাইরে পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাতে এসেছিলেন। মিঃ মা চান্‌কে বললাম—"এই বাড়ীখানা দেখে মনে হয় যেন কমিউনিষ্ট এই বাড়ীটা তৈরী করেছে। চমকে উঠবেন না। যা'দের আপনারা কমিউনিষ্ট বলেন তা'রা বোধ হয় সেই জাতীয় লোক যা'রা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়—তা' নয় কি?" দু'একটা কমিউনিষ্ট দলন দেখেছি কিনা তাই বললাম। মিঃ মা চান্ আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নত করলেন। কথার জবাব দিলেন না। কারণ চীনের বাড়ীর প্রাচীরেরও কান আছে। থাকবার কথাই; আমার মত বোকাও বুঝতে পেরেছে যে, লোকে চিয়াং-কাই-সেকের উপর সন্তুষ্ট নয়। আমার ভাগ্য ভাল, তিনি এখন লাইয়ং আছেন। যদি দেখা হ'ত, তবে হয়তো তাঁ'র মুখের উপর ব'লে দিতাম যে তাঁ'র উপর তাঁ'র দেশের লোক সন্তুষ্ট নয়।

যদিও আমি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা মাড়াই নাই, তবু বিদেশে এসে বিদেশের যুবকযুবতীরা কি ক'রে শিক্ষা পায় তা' জানবার জন্য বড়ই ইচ্ছ্ হ'ত। তাই এ জীবনে অনেক চান্সেলার এবং ভাইস-চান্সেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং যখনই সুযোগ পেয়েছি তখনই একবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রে অন্ততঃ বাড়ীটা কোন পাথরে গড়া তা' দেখতে চেষ্টা করেছি। একাই হাঁটতে হাঁটতে শিক্ষা-বিভাগের বাড়ীর কাছে গিয়ে

উপস্থিত হলাম। তখনও অনেক কেরাণী সারাদিনের খাটুনী খেটে বের হন নাই। কয়েকজন ভদ্রলোক বাড়ীটার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার কালো মুখ দেখে বোধ হয় আমার সঙ্গে তাঁ'দের কথা বলতে ইচ্ছা হয়েছিল। একজন এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় শুনেই এক ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন, "আমার ধারণা ছিল পর্য্যটকরা চীনের বদনাম গেয়ে বেড়াবার জন্যই এদেশে আসেন। তাঁ'রা কোনদিন চীনের শিক্ষাবিভাগের সংস্পর্শে আসেন না। যা' হোক একজন ভারতীয় নান্‌কিনে এসেই যে আমাদের দর্শন দিতে এসেছেন, সেজন্য ভারতীয় পর্য্যটককে আমরা ধন্যবাদ এবং সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।" ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁ'দের অফিসে গেলাম এবং তাঁ'রা দয়া ক'রে নানা কথা বলতে লাগলেন। সর্ব্বপ্রথমই চীনের ভাষা সম্বন্ধে আমার ধারণা কি তা' তাঁ'রা জানতে চাইলেন। আমি তাঁ'দের বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, তা'র সবটাতেই একাধিক অক্ষর-যোগে শব্দ তৈরী হয়, আর চীনে শুধু এক একটী অক্ষরেই এক একটী শব্দ প্রকাশ করা হয়। আমি আরও বলেছিলাম, শব্দই প্রথম সৃষ্ট হয়েছে, অক্ষর হয়েছে পরে। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কা'রও কাছ থেকে শিখি নাই। অক্ষর হয়েছে শব্দকে সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মাঝে এনে তা' প্রকাশ করার একটা সাঙ্কেতিক উপায়। চীনা ভাষা বাস্তবকে বাস্তবেই রেখেছে, সাঙ্কেতিক করে নাই। তা'র ফলও হয়েছে ভাল। একমাত্র চীনা ভাষার সাহায্যেই পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারে এবং লেখাপড়া শিখে।

নিজের দেশের ভাষার প্রশংসা শুনে শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের মুখ আনন্দে রক্তিমাভ হয়ে উঠল। তারপর ভারতের সাহিত্য এবং দর্শনের কথা উঠল। চীনের সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের সাহিত্যের কোথায় কতটুকু ঐক্য আছে, তা' তাঁ'রা বলে যাচ্ছিলেন। আমি কান পেতে শুনছিলাম। তারপর দর্শনের আলোচনাও বেশ জমে গিয়েছিল। আমিও বলছিলাম, তাঁ'রাও বলছিলেন। ওদের কথায় এবং আমার কথায় বেশ খাপ খেয়েছিল। একটী যুবক জানতে চেয়েছিলেন—ভারতের এবং চীনের দর্শনগুলি ভারতের এবং

চীনের কি কি ক্ষতি করেছে। আমার যা' বলার ছিল তা' বলেছিলাম, কিন্তু চীনের শিক্ষিত যুবকের কথাটা আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। যুবক বলেছিলেন,—"চীনের দর্শন ভারতের দর্শনের অনুরূপ। এই চীনের দর্শন চীনের যত ক্ষতি করেছে, জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া নিয়েও তত ক্ষতি করতে পারে নাই।"

এই আলাপের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটু যেন আত্মীয়তা ঘটল। তাঁরা আমাকে তাঁ'দের বাড়ী নিয়ে পরিতোষ সহকারে খাওয়ালেন। পেট ভরে খেয়ে যত আনন্দ পেয়েছিলাম তা'র চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম তাঁ'দের বাক্যালাপে। প্রাণ ভরে তাঁ'দের সঙ্গে কথা ব'লে গভীর রাতে বিদায় নেই। তাঁ'দের আলোচনা থেকে আলো পেয়ে আমার মন পুলকিত হয়েছিল। কিন্তু আমার মধ্যে তেলের অভাব থাকায় সে আলো প্রায় নিবেই গিয়েছে। তাঁ'রা বলেছিলেন, "যখন দেশে গিয়ে বই লিখবেন তখন অন্যের লেখা বই দেখে নকল করবেন না। যা' দেখে গেছেন তাই লিখবেন। দেখবেন তা'র অন্য রকম ফল হবে।" তাঁ'দের কথার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের স্মৃতিতে যা' আজও জাগরূক আছে তা'র সাহায্যেই লিখে চলেছি। দেখি তাঁ'দের কথা কতটুকু রাখতে পারি।

পরদিন প্রাতে একদল শিখ এসে আমার ঘুম ভাঙ্গালেন। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তাঁ'দের কথা শুনতে বসলাম। শিখদের মুখে শুনলাম তাঁ'দের দেশে ফিরে যাওয়ার মতলব থাকলেও তাঁ'রা দেশে ফিরে যেতে পারেন না। কিন্তু কেন যেতে পারেন না জিজ্ঞাসা করায় তাঁ'রা তেমন সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারলেন না। তাঁ'দের মধ্যে কেউ নিজেদের 'গদর' বলে পরিচয় দিলেন। 'গদর' অর্থ কি তা' আমি হাঙ্কোতে জেনেছিলাম। যাঁ'রা গদর ব'লে পরিচয় দিলেন না, তাঁ'দের উপর খাস গদর দলের লোকরা খাপ্পা হয়ে উঠলেন। এদের কে গদর এবং কে গদর নয় তা' নিয়ে বেশ ঝগড়া আরম্ভ হ'ল। এমনি সময় সর্দ্দারজী এসে উপস্থিত। তাঁ'কে দেখে সবাই চুপ করলেন। সর্দ্দারজী এদের সঙ্গে আমাকে মিশতে, এমন কি কথা বলতে পর্য্যন্ত নিষেধ করলেন, এতে আমার অনিষ্টও হ'তে পারে ব'লে। সর্দ্দারজীকে বললাম, আমার অনিষ্ট যদি আমি নিজে না করি তবে এই দুনিয়ার আর কেউ সহজে তা' করতে

পারবে না। দশচক্রে ভগবানও ভূত হয় একথা জানি। তবুও আপনার জানা উচিত যে শুধু মজা লুটতে চীন দেশে আসি নাই। এখানে ঘুরব, দেখব, শুনব; তা'তে যদি বিপদ আসে তবে আসুক, কিন্তু জেনেশুনে কা'রও অনিষ্ট করব না এই হ'ল আমার কথা। শুনে সর্দ্দারজী আমাকে তাঁ'দের সঙ্গে কথা বলতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁ'দের বললাম, দেখুন ভাইগণ! আমার মনে হচ্ছে আপনাদের দেশে ফিরে যাবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। আপনারা হয়তো বৃটিশ সরকারের বিপক্ষে অনেক কাজ করেছেন, তা'র ফলে দেশে গেলেই আপনাদের ধ'রে সরকার জেলে পূরবে। যদি জেলের ভয় থাকে তবে কনসালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি যদি দয়া না করেন তবে আপনাদের আরও একটা পথ খোলা আছে। সেটি হ'ল দেশে গিয়ে কারাবরণ করা। তা'তে যদি রাজি হন তবে বেরিয়ে পড়ুন। যদি জাহাজে যেতে না পারেন, তবে পায়ের পথ খোলা আছে। আমার কথা শুনে সবাই চুপ ক'রে রইলেন। তাঁ'দের চুপ ক'রে থাকার অর্থ আমি ভাল ক'রেই বুঝলাম। ভারতীয় সামরিক জাতি ব'লে যাঁরা পরিচিত, তাঁ'দের এমন জ্ঞান নাই যে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন কাজ করতে পারেন। তাঁ'রা জাহাজে এসেছেন এবং জাহাজেই ফিরে যেতে চান। তাঁ'রা দোষ করেছেন, সে দোষ নিজেরা সাক্ষ্য দিয়ে লুকাতে চান। যেন পণ্টনী বড়কর্ত্তাদের বাজে কথায় ভোলাবার উদ্যম। সর্দ্দারজী এতক্ষণ কিছুই বলছিলেন না। এখন তিনি চোখ লাল ক'রে একেবারে সিংহবিক্রমে ওদের বললেন, "বল, কে কে দেশে যেতে চাও, এখনই কন্‌সালের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।" কেউ তা'তে রাজী হ'লেন না দেখে সর্দ্দারজী রেগে বললেন, "তবে এই পথিকের উপর অত্যাচার কেন?" এদের দুর্দ্দশা দেখে আমার দুঃখ হ'ল। বিদেশে গিয়ে রাজদ্রোহী হওয়া যে কত কষ্টকর কাজ তা' ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। তাঁরা একে একে মাথা নত ক'রে চলে গেলেন। দু'একজন তারপরও এসেছিলেন, কিন্তু কেউ আর দেশে যাবার কথা মুখ ফুটে বলেন নাই। ওঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পাঠান, তাঁ'র অবস্থা বড়ই কাহিল ছিল। কিন্তু তাঁ'র কথা শুনে আমার একটুও দরদ হ'ল না। তিনি বারবারই শিখদের দোষ দিচ্ছিলেন। এও শুনেছি যে একমাত্র এই

পাঠানকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য শিখরা বিসমিল্লা ব'লে মুরগী জবাই করেছেন। তবুও তাঁ'র মন ওঠে নাই, তিনি কি ক'রে দেশে ফিরবেন কেবল সে চেষ্টায়ই ছিলেন। তিনি অনেক স্থানে গিয়ে শিখদের সামনেই শিখদের বদনাম করেছেন। শিখরা তা'ও সহ্য করেছেন। যদি এই লোকটী তাঁ'দের উপর বদনাম চাপিয়েও দেশে ফিরে যেতে পারেন তবুও ভাল। তিনি তাঁ'র নাম বলছিলেন "আল্লা দিত্যা"। বাড়ী তাঁ'র হুসিয়ারপুর জেলায়।

ওঁদের কথা এখানেই আমি সমাপ্ত করতে বাধ্য হলাম, কারণ আজই আমাকে চিয়াং-কাই-সেকের বাড়ী, সান ইয়াৎ সেনের কবর এবং শহরের বাইরে দু'একটা ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যেতে হবে। সাইকেলটা বের ক'রে তা'তে চড়ব এমন সময় আমার পূর্ব্বপরিচিত বধির ডাক্তার এসে হাজির। তাঁ'কে নিয়েই চিয়াং-কাই-সেকের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। চিয়াং-কাই-সেক সাধারণতঃ সরকারী অফিসগুলির কাছেই একটা বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীটার তেমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। একটা নূতন ধরণের অট্টালিকা মাত্র। আজ এখানে থাকেন ব'লেই এই বাড়ীটার কদর বেড়েছে, কিন্তু এছাড়া আর তা'র অন্য কোন আকর্ষণ নাই। এই বাড়ীটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সময়ের অপব্যবহার করা মোটেই ভাল লাগছিল না। তারপর আমার মত এক বিদেশীকে দেখতে পেয়ে লোকেরও ভিড় হয়েছিল। সেখান থেকে চলে আসবার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু ডাক্তার তা'তে বাধা দিয়ে বললেন—"এই বাড়ীতে চিয়াং-কাই-সেকের আঠারটা মডেল আছে। তাঁ'র বিপক্ষের অনেক লোক তাঁ'কেই দাঁড়ান কিম্বা বসা ভেবে সেই মডেল-গুলিতে গুলী ছুড়েছে। তা'দের কাজ হাসিল হয় নাই, অথচ প্রাণদণ্ড হয়েছে। কলানৈপুণ্যের নিদর্শন হিসাবে এমন মডেল দেখে যাওয়া উচিত। তা' দেখবার জন্য আমার মোটেই আগ্রহ হ'ল না। আমি সেই মডেলগুলি দেখব না ব'লে ডাক্তারকে জানালাম। ডাক্তার সে কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বেশীক্ষণ সেদিকে না দাঁড়িয়ে সান ইয়াৎ সেনের কবর দেখবার জন্য শহরের বাইরে চললাম। কবরটা নান্‌কিন শহরের বাইরে একটা ছোট টিলার উপর অবস্থিত। দূর থেকেই তা' দেখতে পাওয়া যায়।

সান্‌ ইয়াৎ সেনের কবর

একটা ছোট পথ শহর হ'তে বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার সান ইয়াৎ সেনের কবরের দরজায় মিলেছে। দু'জনে যখন শহরের ফটকের কাছে এসেছি তখন শান্ত্রী আমাদের হাঁক দিল। শান্ত্রী ডাক্তারকে পরীক্ষা ক'রল তাঁ'র পকেটে কিছু আছে কিনা, কিন্তু আমাকে ছুঁলও না। শহর থেকে বাইরে এসেই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাকে তো ছুঁলও না, তার কারণ কি? জবাব, 'বৃটিশ প্রজা কিনা তাই ছোঁয় নাই। আমাদের শরীর আছে, মাথা নাই। চলতে পারি, কথা বলতে পারি না। Capitulation নাই।' ছেলে মরলে ছেলের মা যেমন কাঁদে, ঠিক সেরূপ চীনের শিক্ষিত সমাজ Capitulation-এর জন্য কাঁদছে, কিন্তু কে শুনবে সে কান্না? ডাক্তারের চোখ দিয়ে সত্যসত্যই টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছিল। চীনের যুবক বড় কাঁদে না। আজ দেখলাম চীনা যুবকের কান্না। আজ আমার ভ্রমণ সার্থক হ'ল। এরূপ কান্না কয়জন পর্য্যটক দেখেছেন? যদি লোকের সঙ্গে না মিশা যায় তবে আর এরকম দৃশ্য দেখবার সুযোগ হয় না। পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা কবরের দরজার কাছে এলাম। একটা ছোট গাছের কাছেই একটী রেস্তোরাঁয় ব'সে কয়েকটী যুবক কথাবার্ত্তা বলছিল। দোকানীও তা'দের কথায় মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিল। আমাদের পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তা'দের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। রেস্তোরাঁয় আমরা কিছু জলযোগ করলাম। দোকানী আমার পরিচয় পেয়ে জলযোগের দাম নিল না। বরং ফিরে আসবার সময় যেন আবার কিছু খেয়ে যাই তা'র জন্য অনুরোধ করল। যে কয়টী যুবক রেস্তোরাঁয় বসে ছিল, তা'রাও আমাদের সঙ্গে চলল। আশ্চর্য্যের বিষয় এদের মধ্যে একটী যুবক ভাল ইংরেজী জানত, আর একটীরও ইংরেজী এবং জার্ম্মান্ জানা ছিল। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"স্প্রিকিং দি দছ"। তা'দের বয়সের অনুপাতে তা'রা বিদেশী ভাষাতে যেরূপ কথা বলছিল তা'তে আমি একটু অবাকই হলাম।

কয়েকখানা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই একটা চত্বর পাওয়া যায়। চত্বরটা বেশ প্রশস্ত। অনেকটা মসজিদের আঙ্গিনার মতই। তারপর আরও

কয়েকধাপ সিঁড়ি, তা' বেয়ে উঠলে আর একটা চত্বর। প্রবেশদ্বারে প্রহরী ছিল। তা'রা শিক্ষিত, দেশী-বিদেশী নানা ভাষা বলতে পারে। আমাকে পেয়ে তা'দের বড় আনন্দ হ'ল। একজন বলল, "আপনাদের দেশের গান্ধী জীবিত, আর আমাদের দেশের সান মৃত।" তা'রা আরও কত কথাই বলল, তা' কেবল আমি শুনে যাচ্ছিলাম। এখন কথা হ'ল ওরা এরূপ ক'রে কথা বলে কেন? আমি কি তা'দের পরিচিত, আমি তা'দের এসব কথা বলতে বলেছি? তা' কিছুই নয়, তবে তা'রা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল যে আমার সাদা মনে কাদা ছিল না, আমি চীনের কোন অনিষ্ট করার জন্য চীন দেশে যাই নাই। চীনারা যখন আমার সঙ্গে মিশেছে তখন প্রাণ দিয়েই মিশেছে। বনের পশুও প্রাণের কথা বুঝতে পারে, মানুষ তো দূরের কথা। উদাহরণচ্ছলে একটা ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্যামদেশের জঙ্গলে দ্বিপ্রহরে পরিশ্রান্ত হয়ে বসেছিলাম, একটা বড় বানর ধীরে ধীরে এসে আমার কাছে বসল। তারপর সে আমার মাথার চুল হ'তে বেছে কি খেতে লাগল। বানরটা আমার সমস্ত শরীরটার চামড়া খুঁটে খুঁটে আমায় বেশ আরাম দিয়েছিল। যখন চ'লে যাওয়ার সময় হ'ল তখন বানরটাকে ছেড়ে যেতেও দুঃখ হয়েছিল। আমার পথ সে আগলায় নাই। কিন্তু আমি যখন এগিয়ে চলেছিলাম তখন সে আমার দিকে তাকিয়েই ছিল। কাজেই যা'রা ভালবাসতে জানে এই জগতে তা'দের শত্রু থাকতে পারে না।

একটু এগিয়েই দেখতে পেলাম একটা বড় লোহার দরজা। দরজাটা বন্ধ আছে। এই দরজাই হ'ল সান ইয়াৎ সেনের কফিনের দরজা। এই দরজা সব সময় সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা হয় না, কোনও বিশিষ্ট দর্শক এলে খুলে দেওয়া হয়। একথা শুনে আমার দুঃখ হ'ল যে, সাম্যবাদী সান ইয়াৎ সেনের কফিনও বিশিষ্ট লোকের দেখার জন্য খোলা হয়, সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। ভগবানের মন্দিরেও অনেক বড় বড় তালা দেখেছি। সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবানকে দরজা বন্ধ ক'রে লোকসমাজ হ'তে দূরে রাখা, আর সান ইয়াৎ সেনের মত সাম্যবাদীর কবর শুধু বিশিষ্ট দর্শকের জন্য খোলা প্রায় একই গোছের। প্রাচ্য দেশগুলি এই রোগে অনেক দিন হ'তে ভুগছে, কবে সে রোগ দূর হবে, তা' ভাবতেও মন সব সময় সক্ষম হয় না। রুদ্ধ দ্বার ব'লে

ইমারতটাই ভাল ক'রে দেখে নিলাম। ইমারতটী বড় বটে, এই রকম ইমারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অট্টালিকা বলা চলে না। তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাদাসিধে। ঘুরে ঘুরে দেখে আবার সেই রেস্তোরাঁয় ফিরলাম। এবারও দোকানী বিনা পয়সায় খেতে দিল। আমি ডাক্তারের মারফতে দোকানীকে বললাম "যাঁ'রা এই ইমারত তৈরী করেছেন, তাঁ'দের তো ধন্যবাদ দিতেই হবে। কিন্তু তা'র চেয়ে বেশী ধন্যবাদ দিতে হবে আপনাকে। কারণ আপনি সান ইয়াৎ সেনের হয়ে, চীনের হয়ে, বিদেশীকে বিনয় নম্রভাবে সাদর আপ্যায়ন করছেন। বিদেশী যদি মানুষ হয়, তবে সান ইয়াৎ সেনকে এবং তাঁ'র জন্মভূমি চীনকে ভুলবে না।" দোকানী যখন দোভাষীর মুখে আমার কথা শুনল, তখন এক লাফে এসে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করল। কিন্তু তা'র সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না ব'লে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হ'ল। আবার বিদায় নেবার পালা। সান ইয়াৎ সেনের কবর ভুলতে পারি, কিন্তু সেই দোকানীকে ভুলতে পারব না। সাইকেলে চড়ে যখন রওনা হলাম, তখন পিছন দিকে চেয়ে দেখলাম যে দোকানী এবং তা'র যুবক ক্রেতারা আমারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ধর্ম্ম-মণ্ডলী

সন্ধ্যা হয় হয়। ইউরোপীয় পোষাক-পরা একজন চীনা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "বোধ হয় আপনিই লিমনাথ বিশোয়াসী?" তিনি যেই হন না কেন আমার নামটা যে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পেরেছেন সেজন্য মনে মনে তাঁ'কে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, হাঁ মহাশয়, আমিই সেই, আদেশ করুন কি করতে হবে। তিনি বললেন, মিঃ মা বলেছেন আপনি নাকি এক চীনা সাধুকে দেখে এসেছেন? সে নাকি আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে? সম্মতি জানিয়ে বললাম, এ তো বড় কথা কিছু নয়, যে কোন লোক বৎসরখানেক চেষ্টা করলেই পরের ভাষা আয়ত্ত করতে পারে, এতে তো আমি কোন বাহাদুরী দেখছি না। ভদ্রলোক আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বললেন, তবে এর চেয়েও বিশিষ্ট কোন সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে আপনার নিশ্চয় দেখা হয়েছে?

আমি তা'র উত্তরে বললাম, নিশ্চয়ই, এ তো সামান্য লোকের কথা শুনেছেন, তা'র চেয়ে ঢের বড় শক্তিমানকেও দেখেছি। তাঁ'রা অবশ্য নিজেরা বলেন তাঁ'রা কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁ'রা অসামান্য শক্তিসম্পন্ন এক একটী দিক্‌পাল। তবে একটী কথা জানবেন, আমি কা'রও পায়ে লুটিয়ে পড়ি না, সে যত বড় লোকই হোক না কেন। তারপর, মহাশয়, আপনি তো আমার নামধাম সব জেনে নিয়েছেন। আপনার পরিচয়টী জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনাকে বলতে এসেছি যে আমি পঞ্চানন লামার চেলা, বোধ হয় এই চীন দেশেই তাঁ'র সঙ্গে আপনার কোথাও দেখা হবে, তারপর অন্যান্য লামার সঙ্গেও দেখা হতে পারে। তবে যাঁ'র সঙ্গে আপনার ক্যা'টনের পাহাড়ে দেখা হয়েছিল, তিনিও একজন লামাই জানবেন। আমি ভদ্রলোককে বললাম, তিনি লামাই হন আর স্বর্গ থেকে এসেই থাকুন, আমি ওসব আধ্যাত্মিক বাজে কথায় নাই। আমাকে বাঁচতে হবে, ঘুরে ঘুরে এ দুনিয়া দেখতে হবে, আমার শক্তির দরকার, ভগবান আছেন কিনা সে কথায় আমার দরকার নাই। এই সব লামা, সন্ন্যাসী, পরমহংসরা নিজেকে বাঁচাবার জন্যই বোধ হয় সংসার ছেড়ে দেয়। তা'রা হয়তো উন্নতিও করে, কিন্তু তা'র ফল ভোগ করে তা'রা একা। আমি এমন স্বর্গে যেতে চাই না যেখানে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী লোকই মাত্র যায় বা যেতে সক্ষম হয়। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে আমাকে নমস্কার ক'রে বিদায় নিলেন। মনে মনে বললাম, বালাই চুকে গেল। কোথায় পথের খবর নেব, পেটের ব্যবস্থা করব, কয়েকটা স্থান বেড়িয়ে দেখব, তা' না করে, কোথাকার পঞ্চানন লামা, আর কোন সাধু আমার সঙ্গে আমার ভাষায় কথা বলেছে, তা' নিয়ে শুধু শুধু আমার মাথা ঘামাবার কি দরকার!

চুপ ক'রে বসে আছি এমন সময় সর্দ্দারজী এসে বললেন, পঞ্চানন লামার চেলা নাকি এখানে এসেছিলেন, কি কথা হয়েছিল? একে তো আমার মন ভাল ছিল না, তা'তে সর্দ্দারজী আবার সেই কথাটার উপরই প্রশ্ন করাতে আমার গা জ্বলে উঠল। আমি বললাম, হ্যাঁ এসেছিলেন, তিনি কি দলাই লামার পুত্র, না অন্য কিছু? সর্দ্দারজী বললেন, আপনার ভাগ্য ভাল, তাই এত বড় লোক আপনাকে দেখতে আসেন। আজ পর্য্যন্ত অনেক জেনারেলও

এই ভদ্রলোককে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন নাই, এমন কি দর্শনও পান নাই। আপনি এত চটলেন কেন? সর্দ্দারজীকে বললাম, যদি আমার টাকাকড়ি থাকত, তবে আমি জেনারেলের বাড়ী কেন, রাজবাড়ীতেও যেতাম না। তা'তে আর তা'র বাহাদুরী কোথায়? তিনি যিনিই হউন না কেন, আমি এসব লোকের ধার ধারি না। এখন এসব কথা রেখে দিন। আমাকে দয়া ক'রে একটা ইংরেজী সংবাদপত্র দিতে পারেন? শুনছি সাংহাই নাকি জাপানীরা শীঘ্রই আক্রমণ করবে। তা' সত্যমিথ্যা জেনে নিয়ে পথ বেছে নিতে হবে। সর্দ্দারজী আগামী কল্য ইংরেজী সংবাদপত্র এনে দিবেন আশ্বাস দিয়ে জানালেন, সাংহাই বোধ হয় চট্‌পটই জাপানীরা কেড়ে নিবে। সর্দ্দারজীকে বললাম, দলাই লামাকে পাঠান না কেন, মন্ত্রবলে জাপানীদের পাথর ক'রে দিবেন। পারবেন কি? তিনি বাহাদুর কম নন শুনেছি! সর্দ্দারজী বললেন, সাধুদের কাছে চীনা যেমন জাপানীও তেমনি। আমি বললাম, এসব বাজে কথা। সাধু-সন্ন্যাসী দিয়ে কিছু হবে না। ছেড়ে দিন এদের কথা। এখন কোন্ পথে সাংহাই যাই তা' আমাকে বলুন। এক আছে নদীপথ, যে পথে এখনও বৃটিশ জাহাজ চলছে। শুনেছি রেলগাড়ী নাকি বন্ধ হয়েছে। তারপর রইল সাইকেলের পথ, কোন্‌টা সুবিধা হবে তা' ঠিক ক'রে আমাকে বলবেন। আমি এখান থেকে অতি সত্বর চ'লে যেতে চাই। আমার শরীর মোটেই দুর্ব্বল নয়। সর্দ্দারজী আমার কথার জবাব না দিয়ে দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে চলে গেলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম রাজপথে।

অনেকক্ষণ বেড়িয়ে একটা দোকান হ'তে কতকগুলি শুক্‌না কুল কিন্‌লাম। চীন দেশে প্রচুর কুল জন্মে। চীনারা তা' বেশ আদর ক'রে খায়। এসব কুল আমাদের নারকেলী কুলের মতই মিষ্টি। কুল খেলে নাকি শরীরও ভাল থাকে। তা'তে নিশ্চয়ই ভিটামিন আছে। নান্‌কিনের ভিতরের পথগুলি বেশ প্রশস্ত করা হয়েছে। অনেক বাড়ী এবং মন্দির ভেঙ্গে তবে এতটুকু প্রশস্ত পথ করা সম্ভব হয়েছে। কুলের দোকানীকে পয়সা দিয়ে সিগারেট কিনতে অন্য একটা দোকানীর কাছে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখেই "জাঁপ্পুন কুই" ব'লে অন্য সকলের কাছে জানিয়ে দিতে লাগল। যতই সিগারেটের দাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, ততই সে আমারই সম্বন্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতে

লাগল। শেষটায় লোকটাকে ধমক দিলাম। দোকান হ'তে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে পঁচিশ সেণ্ট ফেলে দিলাম। সিগারেটের দাম হ'ল ট্যাক্স সমেত সতের সেণ্ট। দোকানী পঁচিশ সেণ্ট পেয়ে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করল। আশ্চর্য্য, এই এক মিনিট পূর্ব্বে যে আমাকে "জাঁপ্পুন কুই" বলে বিদ্রূপ করছিল, সে তা'র ন্যায্য দাম থেকেও আটটি সেণ্ট বেশী পেয়ে একেবারে সব ভুলে গেল।

পূর্ব্বেই বলেছি নান্‌কিন্ শহরে কয়েকটী বড় পথ প্রস্তুত করা হয়েছে, তবে তা' হয়েছে সম্প্রতি। ক'লকাতার মত গলিও অনেক আছে। কিন্তু নান্‌কিনে এমন পাড়াও ঢের আছে যেখানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে কেউ যাতায়াত করে না ব'লে শুনেছি। আমি তা'তে কোন পরোয়া করি নাই। গলি দিয়ে চলতে চলতে আমি তা'র দুই পাশের অবস্থাই ভাল ক'রে লক্ষ্য করতাম। গলিপথ ধরে চলতে লাগলাম, দু'দিকের অবস্থা বেশ উপলব্ধি করতেও লাগ্‌লাম। মাঝে মাঝে গরীবদের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম ওরা কি অবস্থায় থাকে। কেউ আমাকে কোনরূপ বাধা দিচ্ছিল না, বরং অনেকে আনন্দের সহিত তা'দের অবস্থা দেখিয়ে আমাদের দেশের লোক তা'দের মতন থাকে কিনা তা' জিজ্ঞাসা করছিল।

এই গলিপথে ঘুরে নান্‌কিন্ সম্বন্ধে আমার ধারণা হ'ল, যে সব লোক ছোট ছোট গলিতে থাকে তা'রা প্রায়ই ভদ্রলোক। তা'রা হয় ব্যবসা-বাণিজ্য নয় সরকারী চাকুরী করে। ওদের আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তায় তা'-ই আমি বুঝেছিলাম। পূর্ব্বকালে নান্‌কিনে অনেক পাতকুয়া ছিল। সেইগুলি ভর্ত্তি ক'রে অনেক স্থানে নলকূপ বসান হয়েছে দেখলাম। জলও বেশ ভালই উঠছে। উঠবার কথাই, যদিও নান্‌কিন্ শহর উপত্যকার মধ্যস্থলে অবস্থিত, তথাপি চল্লিশ হাতের বেশী নল গাড়তে হয় না। কোথাও এর চেয়ে কম গাড়লেও জল মিলে যায়। এই অঞ্চলটার সঙ্গে বিহারের পার্ব্বত্য অঞ্চলের তুলনা করতে পারা যায়, যদিও স্থানটি হ'ল ইয়াংসী উপত্যকার ঠিক মাঝখানে। জল পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, তা'তে লোহা কিম্বা চূণের ভাগ বেশী নাই। কিন্তু এই নলকূপ থাকলেও এখনও শিক্ষিত-সমাজ কাঁচা জল খেতে ভয় পান। ওঁদের নিয়ম হ'ল, যখনই পিপাসা পায় তখনই সবুজ চায়ের জল পান করা। কাঁচা জল কখনও কেউ পান করেন না।

গলিপথ ধ'রে অনেকটা দূর একাকী গেলাম। কোথাও এমন কিছু ঘটল না যা'র উপর রংচং দিয়ে কারও কাছে কিছু বলতে পারি। তবে নান্‌কিনের গলিগুলি কি শুধুই ভদ্রলোকে ভর্ত্তি? অনেকটা তাই। চীনের চোরেরও দয়া আছে বলেছি। তারপর অন্য স্থানের অনুপাতে চুরিও কম হয়। ছেঁচড়া মোটেই নাই বললে চলে। তবু চীনের এই দুর্দ্দশা কেন? কোন দিন হয়তো এর কারণ বলতে পারব। এখন এ সম্বন্ধে চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

লড়াই নাকি সত্যসত্যই বেধেছে, কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্রের অভাবে কিছুই জানতে পারছিলাম না। মিঃ মা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁ'র বাড়ীতে নিয়ে বলতেন, কি জানি আপনি কি ক'রে সাংহাই যাবেন তাতো বলতে পারছি না, তবে যাবার পূর্ব্বে ভাল করে ভেবে দেখবেন। তাঁ'র কথা শুনে মনে হ'ল, হয়তো চীনা ভেবে আমার উপর অত্যাচার হতে পারে। আর চীনারা আমাকে অনেক সময় জাপানী বলে ঠাউরে নিয়েছে। অনেকবার বেঁচে গেছি সত্য, কিন্তু এ যে লড়ায়ের সময়, কি হবে কে জানে?

গদর দলের আড্ডার নিকটবর্ত্তী কোরিয়াবাসীদের একটা আড্ডা হ'তে একজন লোক এসে তা'দের কাছে আমার অভিজ্ঞতা ইংরেজীতে বলতে অনুরোধ করল। নানা প্রশ্ন ক'রেও বুঝতে পারি নাই যে, এরা ছাত্র কি কোন রাজনৈতিক দলের লোক। তা'দের কাছে আমার বক্তৃতার পারিশ্রমিক পনের ডলার চাইলাম। তা'র উত্তরে একটী ছোট ছেলে আমাকে বলল, আমরা গরীব দেশের গরীব ছাত্র। যদি আপনাকে পনের ডলার দিতে হয় তবে আমাদের ভাগ্যে ক'দিন উপবাস আছে তা' বলতে পারি না। ছেলেটীর কথায় একটু বিচলিত হয়ে বললাম, তা' হলে আপনাদের ওখানে বক্তৃতা দেবার পর আপনারা যা' সদাসর্ব্বদা খান তা'রই কিছুটা যদি আমাকে খেতে দেন, তবে যেতে রাজি আছি। ছেলেটী আমার কথায় রাজি হ'ল। রাত সাতটার সময় তা'দের আড্ডায় বক্তৃতা দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি জন পনের যুবক মাথা নত ক'রে ব'সে আছে। প্রত্যেকেরই মুখ শুক্‌না, জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম আজ রাতে তা'রা নাকি আমার বক্তৃতা শুনেই পেটের জ্বালা দূর করবে। এই পনেরজন লোককে যদি পেট ভরিয়ে ভোজন করাতে হয় তবে কয়টী ডলারের

দরকার তা'ই ভাবতে লাগলাম। বেশীক্ষণ না ভেবে ছোট ছেলেটিকে ডেকে এনে আদর ক'রে বললাম, কি হে তোমাদের খাওয়া হয় নাই? ছেলেটি বলল, সাংহাই হতে কোনও সূত্রে তা'রা যে সাহায্য পেত তা' বন্ধ হয়েছে। কাজেই কোন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তা'দের কষ্ট করতেই হবে। ছেলেটীর হাতে দুটী ডলার দিয়ে বললাম, যাও, এ দিয়ে চাল, সব্জী আর মাছ কিনে নিয়ে এস, আগে রান্না হোক, তারপর আমার বক্তৃতা শুনবে। ডলার দুটী নিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে পড়ল। আমি অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। সবাই পরিচয় দিলেন তাঁ'রা ছাত্র। বিদেশে শিক্ষা করতে এসেছেন, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত নাই যা'তে তাঁ'রা নিশ্চিন্তে পড়তে পারেন। একজন বাইবেল এনে আমাকে দেখিয়ে বললেন, আমাদের ভরসা ভগবান। আমরা এসব সহ্য ক'রেই টিকে থাকব। বাইবেল যিনিই লিখে থাকুন না কেন তা'তে অনেক ভাল কথা আছে। আমি যখন বাইবেলের লাল দাগ দেওয়া শব্দগুলি পড়ছিলাম, তখন হঠাৎ আমার চোখ্ পড়ল অন্য দুটী যুবকের উপর। তা'রা মুখ ফিরিয়ে হাসছিল। ব্যাপারটা আমার আদপেই ভাল লাগছিল না। তবে কি আমি প্রতারিত হয়েছি?

ছেলেটী ফিরে এল। তা'কে আমি বেশ পরিষ্কার ক'রে বললাম, দেখ বাপু, আমার মনে হয় তোমাদের কাছে টাকা আছে। আমি তোমাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। ছেলেটী থম্‌কে দাঁড়াল, যেন তা'র মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। সে আমাকে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। দেখলাম, চাল একটী দানাও নাই। তবে এরা হাস্‌ল কেন? আমার এই কথায় ওদের বেশ অপমান হয়েছিল, কিন্তু কেউ প্রাণ খুলে তা'দের মনের কথা বলতে পারছিল না। কত রকমের হাসি লোকে হাসতে পারে সেই সম্বন্ধেই বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ফিরে আসার সময় খেয়েও এসেছিলাম। এই দুইটী লোকের হাসি আমার অনেক দিন মনে ছিল।

নান্‌কিন্ আমার ভাল লেগেছিল। এই শহরে হরেক রকম লোক আছে। যা'রা ভগবানকে পূজা ক'রে স্বর্গে যেতে চায়, আর যা'রা ভগবানকে হিংসা করে স্বর্গে যেতে চায়—এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওদের

সঙ্গে কথা বলতে বেশ আরাম লাগত। আবার, ভগবান নাই, আমরা একটা চক্রের আবর্ত্তনে সৃষ্ট হয়েছি—এই মতাবলম্বী লোকেরও দর্শন পেয়েছি। তারপর দার্শনিকদের কথা তো একটুও বুঝে উঠতে পারি নাই। কিন্তু এই সব লোক আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কথা বলেছে, যেন আমার মতবাদই তা'দের শিরোধার্য্য। অহঙ্কারে আমার বুক ফুলে উঠত। ভাবতাম আমারই পূর্ব্বপুরুষের প্রতি এদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, নতুবা আমার মুখের কথা শোনবার জন্য এরা এত আগ্রহান্বিত কেন! আমার বুঝতে বেগ পেতে হয় নাই যে,এখনও চীনে অনেক লোক আছে যা'রা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান এবং দর্শনকে গণনার মধ্যেও আনে না। তা'রা এখনও চেয়ে আছে ভারতের শাক্যমুনির দিকে। আর তা'রা বোধ হয় একথাই মনে করে যে, যদি নূতন কিছু বের হয় তবে এই ভারত হ'তেই হবে। তারপর ওদের ধারণা হয়েছিল, যে লোকটা ক্যাণ্টন হ'তে নান্‌কিনে উল্টা পথে এসেছে, তা'র মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু আমি জানতাম আমার মধ্যে দুটী গুণ ছিল এবং আছে। সেই দুটী হ'ল অজ্ঞতা এবং একগুঁয়েমি। যখন জ্ঞানীর দল চক্রাকারে আমাকে ঘিরে বসে ভারত সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করতেন, তখন বাস্তবিকই আমার আনন্দ হ'ত, এখনও যে বিদেশে ভারতের সুনাম আছে তা' শুনে। নান্‌কিনের ধর্ম্মমণ্ডলীতে এসে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের জাতিভেদ খুব বেশীদিন যাবৎ প্রচলিত হয় নাই। ভারতে যেদিন দর্শনের যুগ ছিল সেদিন জাতিভেদের কথা কেউ ভাবেও নাই।

এক ভদ্রলোক ফরাসী দোভাষীর মারফৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা কি ছিল তা' বললেন। এসম্বন্ধে তিনি নাকি অনেক বই পড়েছেন। তখন নাকি ভারতের অবস্থা ছিল বড়ই খারাপ, কারণ তখন থেকেই পতন শুরু হয়েছিল। চীনা ভাষার কয়েকখানা বইও আমাকে দেখালেন, তা'র একটা কথাও বুঝলাম না। কিন্তু ভারতের পুরাতন কাহিনীর অনেক চিত্র দেখতে পেলাম। একটী ছবিতে দেখলাম, কতকগুলি কালো লোক কতকগুলি গৌরবর্ণের লোকের সঙ্গে লড়াই করছে। কালো লোকগুলির পতাকায় ত্রিশূল চিহ্ন রয়েছে, আর সাদা লোকগুলির পতাকা ছিল ঘোর লাল, কিন্তু তা'তে কোন প্রতীক দেখি নাই।

সাংহাই যাত্রা

পথহীন পথে

নান্‌কিন্ হ'তে চলে যাবার জন্য মনটা অস্থির হ'য়েছে। কেন যে হয়েছে তা'র কারণ পূর্ব্বেই বলেছি। কোন্ পথে যাব তা নিয়ে একটু ভাবনা ছিল। এখন সে ভাবনা আমার চলে গেছে। দুঃখকষ্ট আমার সহ্য করতেই হবে, কাজেই সাতপাঁচ না ভেবে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়াই ঠিক করলাম। শহর হ'তে বেরিয়েই নদীতীর ধ'রে চলতে লাগলাম। শহরের কাছাকাছি নদীতীরে লোকের বিস্তর বসতি, কিন্তু সাত আট মাইল যাবার পরই বসতি ফুরিয়ে গেল। সমুখে রয়েছে শুধু একটা পথ। পথটা আবার রেল লাইনের কাছেই এসে মিলেছে। আমিও তাই রেললাইন ধ'রেই চলতে লাগলাম। কিন্তু একটু গিয়েই আমাকে থামতে হ'ল। কারণ রেলপথের পাশে পাশে অনেক রক্ষী-সেনা মোতায়েন ছিল। ওরা আমাকে পরীক্ষা ক'রেই ছেড়ে দিতে লাগল। কিন্তু এদের কাজকর্ম্ম দেখে মনে হ'ল এরা যেন নেহাৎ দায়ে পড়েই হুকুম তামিল ক'রে যাচ্ছে। আমার অগ্রগতি পূরাদমে চলতে লাগল। 'যখন রক্ষীদের কাছে নিজের গাঁটরীটা খুলে দেখিয়ে আবার বাঁধতে হ'ত তখন ভাল লাগত না, মনটা বিগড়ে যেত।

বিকাল চারটের সময় একটা ছোট গ্রামে গিয়ে উঠলাম। তা'তে হয়তো দশটি মাত্র পরিবার আছে। প্রত্যেকখানি ঘর টালি দিয়ে ছাওয়া, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আর গ্রামের মধ্য দিয়ে একটী ছোট পথ। তা' দিয়ে অন্ততঃ পাশাপাশি দু'খানা রিক্‌সা একসঙ্গে যেতে পারে। গ্রামে গৃহপালিত শূকর ছাড়া অন্য কোন জীবজন্তু নাই। কয়েকটী মেয়েমানুষ একখানি বাড়ীর ভিতরে ব'সে কি কথাবার্ত্তা বলছিলেন। তাঁ'দেরই দরজার এক পাশে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বারান্দাটা আস্তর করা না থাকলেও বেশ পরিষ্কার ছিল। চীন দেশে ঘরের মেজে কিম্বা বারান্দা

নিকানো হয় না। এ কাজটী চীনদেশের কোথাও প্রচলিত দেখি নাই। আমার বসার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েমানুষ তিনটী ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু ম্যাণ্ডারিন ভাষা আমার না জানা থাকায় বড়ই অসুবিধায় পড়তে হ'ল। ম্যাণ্ডারিন ভাষা চীনে দিন দিন প্রসার লাভ করছে। এমন কি সামান্য কৃষকও সেই ভাষা শিখবার আগ্রহ দেখাচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী কুলি-মজুররা যেমন হিন্দী বলতে পারে, চীনের ম্যাণ্ডারিন ভাষাও সেইরূপ একটা সর্ব্বজনীন ভাষার স্থান দখল করেছে। আমি ওদের কথা বুঝছি না দেখে একজন একটু রেগে ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললেন, "আমাদের দেশে এসেও আমাদের ভাষা বলতে পারেন না, এটা বড় দুঃখের কথা। এমন সুন্দর ভাষা পৃথিবীতে আর নাই।" মাথা নত ক'রে জবাব দিয়েছিলাম, আজ বড়ই আনন্দদায়ক কথা শুনলাম। চীনারা যখন বিদেশে আসে তখন দেখেছি, তা'রা তা'দের ভাষা অন্যকে শিখাতে চায় না। যা'রা পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে চায় তা'দের মধ্যেই এখনও এই নিয়মটী পাকা হয়ে আছে। চীনারা এখনও নবভাব গ্রহণ ক'রে জগতের সামনে আসতে পারে নাই। যেদিন তা'রা নতুন ভাবধারাকে আত্মসাৎ ক'রে নব বলে বলীয়ান হবে, সেদিন তা'রা জগতে একটী অপরাজেয় শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। সাদা-কালো সবাই মিলেও এই পীত জাতির সঙ্গে পেরে উঠবে না।

ভদ্রমহিলা তাঁ'র ভাঙ্গা ইংরেজীতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁ'দের গ্রামে কেউ ভগবানের পূজা করে না, কিম্বা তাঁ'কে ভয়ও করে না। তিনি আমাকে রাত্রি কাটাবার জন্য রীতিমত নিমন্ত্রণ করলেন। সর্ব্বপ্রথমেই ভদ্রমহিলা আমাকে শৌচাগার ও স্নানাগার দেখিয়ে বড় একটা শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার চীনভ্রমণের মধ্যে চীনা মুসলমান বাড়ী ছাড়া এই সর্ব্বপ্রথম এক ভদ্র পরিবারে থাকবার স্থান পেলাম। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এদের ধর্ম্মের গোঁড়ামি মোটেই ছিল না। এরা হলেন পূরাদস্তুর চীনা। চীনে যত গ্রাম দেখেছি তা'র মধ্যে এটীই হচ্ছে সর্ব্বপ্রথম পল্লী যেখানে কোন ধর্ম্মমন্দির বা ধর্ম্মপ্রচারক দেখি নাই। এছাড়া গ্রামটীকে ছবির মত সুন্দর বললেও অত্যুক্তি হয় না।

রাত্রিতে গ্রামের লোক গ্রামে ফিরে এল। তা'রা হাসিমুখেই আমাকে দেখে গেল বটে, কিন্তু সে হাসির মধ্যে যেন বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেছিল। আগের দিন রাতেই জাপানীরা সাংহাই আক্রমণ করেছে এবং পরদিন হ'তে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ছুড়তে সুরু করেছে। প্রাতে ঘুম থেকে একটু বিলম্বে উঠেই দেখি সূর্য্যালোক ঘরে প্রবেশ করেছে। হাতজোড় করে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থকে নমস্কার করেছিলাম। হঠাৎ একটী ছেলে আমার প্রার্থনা দেখে ফেলল। সে হয়তো সেই প্রার্থনার কথা তা'র মা ও বাবাকে ব'লে দিয়েছিল। আমার প্রার্থনার কোন উপকারিতা আছে কিনা, তা' তাঁ'রা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তা'র জবাব দিতে পারি নাই।

তিন দিন চলার পর আর চলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। কোথাও চীনা সেনা জাপানী ভেবে তাড়া করে, কোথাও গ্রামের লোক শত চেষ্টাতেও কথা বলে না। এরূপ ক'রে কাঁহাতক চলা যায়। তিন রাত্রি বাইরে শুতে হ'ল, কারও বাড়ীতে স্থান পাই নাই। সেজন্য আমার দুঃখ করার কিছুই নাই। যা'দের ঘাড়ে বিপদ চাপে, তা'রা বোঝে বিপদ কত কষ্টকর। সে অবস্থায় কাউকে গিয়ে বিরক্ত করা আমি ভাল মনে করি নাই। শুধু মানচিত্র দৃষ্টে যা'তে নদীতীরে যেতে পারি সেদিকেই লক্ষ্য রাখলাম। একদিন দু'দিন চলার পরও নদীতীর আর এল না, এল একটা বড় পাহাড়। তা' দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তখন আমার মানসিক অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে আমার পক্ষে আত্মহত্যা করাটাও আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল না। অনেকে হয়তো সে কষ্টের কথা বুঝবেন না। যাব নদীর দিকে, আর কিনা উল্টা পথে এসে হাজির পাহাড়ে! তখন একটী সুন্দর কবিতার চরণ মনে হয়েছিল, "শীতল বলিয়া এ চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ ভেল"। অগত্যা পাহাড়ের কাছে একটা পরিষ্কার স্থানে বসে পড়লাম। কিন্তু আর এক মুস্কিলে পড়লাম। একে তো পথভ্রান্তি, তা'র উপরে আবার দেখা দিল অর্শ রোগ। শরীর ভাল না থাকলে চলবই বা কা'র জোরে। পূর্ব্বেই বলেছি চীনের জঙ্গলে অনেক ঔষধ পাওয়া যায়, কিন্তু চীনের এই অঞ্চলে শুধু আছে পাথর, গাছের পাতা দূরে থাক, এক গাছা তৃণও মিলা ভার।

প্রাতে ঘুম থেকে উঠলাম। রাগ ক'রে আর সূর্য্যদেবকে প্রণাম করলাম না। ভগবানের নামও নিলাম না। এবার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ক'রে দেখি কতদূর কি গড়ায়। ঠিক করলাম, শুধু পূব দিকে চলব। যেখানেই গিয়ে পড়ি না কেন আর কোন পরোয়া করব না। এবার আর ইয়াংসী নদীর দরকার নাই, চীন সাগরই আমার লক্ষ্যস্থল হবে।

যেদিন থেকে পথ হারিয়েছিলাম, সেদিন থেকেই নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। এবার আমি আমার পথ চলার ধারাই একেবারে বদলে ফেললাম। এতদিন আমি কখনও চীনা হোটেলে থেকে, কখনও বা চীনাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে, তা'দের সঙ্গে আত্মীয়তা জমিয়ে, পরস্পরের সুখদুঃখের কথা জেনে ও জানিয়ে এবং নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন আমার ভ্রমণ পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি কারও বাড়ীতে উঠে কাউকে খাওয়ার জন্য বিরক্ত করি না। থাকবার ও শোবার কথাও ভাবি না। এক কথায় বলতে গেলে আমার এখন 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে'। পথিমধ্যে গ্রামে বা শহরে খাবার কিনে নেই, আর নিরালা প্রান্তরে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে ভূমিশয্যা রচনা করে তা'রই উপর দেহ ঢেলে দেই। কেবলই চলেছি চলেছি। একবার ধু ধু করা পথ শেষ হয়, আবার দূর দিগন্তের সঙ্গে অসীমের মিলনরেখায় পথের সন্ধানে ছুটে চলি।

সেদিন ছিল অন্ধকার রাত্রি। আমি একটা ছোট ধানক্ষেতের উপর শুয়ে ছিলাম। আকাশ একে তো অন্ধকারই ছিল, তারপর কালো মেঘ তার গায়ে কালি মেখে দিয়েছিল। বৃষ্টি সুরু হ'ল, আমি সেই ধান ক্ষেতের মধ্যেই ব'সে রইলাম। ভাবলাম একেতো অর্শের জন্য কষ্ট হচ্ছে, তা'র উপর যদি সর্দ্দি কাশি পেয়ে বসে তবে পূর্ব্ববর্ণিত পোল্যাণ্ডের পর্য্যটকের মত আমারও কবর এই দেশেই হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ ভিজলাম, তারপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ধান ক্ষেত হ'তে একটা গরম বাতাস মাটি ফুঁড়ে বের হ'তে লাগল। কাপড় বদল ক'রে তা'রই উপর শুয়ে পড়লাম। পরদিন ঘুম ভাঙ্গলে শরীরটা বেশ চাঙ্গা মনে করলাম। রক্ত পড়াটাও অনেকটা ক'মে গেল। আরও তিন দিন এরূপ ভাবে শুয়েছিলাম। তাতে আমার অর্শ রোগ কমে গিয়েছিল। চতুর্থ

দিন যখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, যে ইয়াংসী নদীর দিকে যাওয়ার জন্য একদিন আমি ভীষণ উতলা হয়েছিলাম তা'রই ঘোলা জল আমারই সমুখ দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে। আমি একটা ছোট শহরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। শহরটী আমার বেশ ভাল লেগেছিল, কিন্তু সেই শহরের লোক ভীতিবিহ্বল চিত্তে কান পেতে রণবাদ্য শুনছিল, আমার কথা শুনবার মত তা'দের মানসিক অবস্থা ছিল না। যাই হোক একটী লোককে ধরে হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। জাপানীদের আক্রমণ সম্বন্ধে দরকারী সংবাদ সবই পেয়েছিলাম। শুনলাম জাপানী যুদ্ধজাহাজ গোলা বর্ষণ করেছে, উজাং কেল্লায় বিমান থেকে অগ্নিবর্ষী বোমা নিক্ষেপ করেছে, তবুও নির্ভীক ১৯নং পদাতিক বাহিনী প্রাণপণে উজাং কেল্লার উপর চীনের পতাকা দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

দু'পয়সা দিয়ে কতকগুলি চীনা বাদাম কিনেছিলাম। সেই বাদামগুলি কাগজ দিয়ে মোড়া ছিল। ওগুলি খেয়ে যেই কাগজটা ফেলতে যাব অমনি দেখলাম ওর এক স্থানে লেখা আছে, সাংহাইয়ের কমারশিয়াল প্রেস ধ্বংস হয়েছে, এত বড় চীনা ছাপাখানা আর চীনদেশে ছিল না ইত্যাদি। সংবাদটা পাঠ ক'রে ইচ্ছা হ'ল সাংহাই উড়ে যাই, কিন্তু তা' তো হয় না, কারণ আমি তো পাখী নই, আমার বাহন হ'ল সাইকেল। মনটা কেমন দমে গেল। গদাইলস্করী চালে পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

বিজন প্রান্তরে

পূর্ব্বেই বলেছি নান্‌কিন্‌ ত্যাগের পর হ'তেই আমি গ্রাম্য পথে চলতে সুরু করেছি। অন্যান্য স্থান থেকে এই অঞ্চলের পথে সাইকেল চালান একটু কষ্টকর বলা যেতে পারে। তা'র একমাত্র কারণ হ'ল পথগুলি বড়ই উঁচু-নীচু। যা'রা নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কমিউনিষ্ট আখ্যায় ভূষিত ক'রে যা'দের বদনাম রটান হয়, তাদের গ্রামের কাছের পথগুলিই চলাচল করার যোগ্য, অন্যান্যগুলিতে পূর্ব্বের মতই স্থানে স্থানে কাদা জ'মে রয়েছে, আর তাতে গ্রাম্য শূকরগুলি শরীর ডুবিয়ে নাক

ভাসিয়ে দিব্য আরামে আছে। এছাড়া দুর্গন্ধ এতই অসহ্য যে পূতিগন্ধ নরক যেন এখানে বাস্তবরূপ নিয়ে সারা অঞ্চলের বাতাস ভারী করে তুলেছে। অথচ এ পথেই আমাকে চলতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেনাদল বড়ই বিরক্ত করছিল, তা' আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তথাপি আমি এগিয়ে চললাম।

কতদিন চলেছি তার ঠিকঠিকানা নাই। কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি ব'লে কোন দিনলিপি লেখার প্রবৃত্তিও হয় নাই। একদিন ঠিক্ করলাম নদীতীরে যদি পৌছতে পারি তবে অন্ততঃ জাহাজে চ'ড়ে সাংহাই যেতে পারব। কারণ এখানকার লোকগুলি পথিককে আর তেমন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে না। হয়তো এরা বিদেশীদ্বারা অনেকবার অত্যাচারিত হয়েছে। বিদেশীর কথা ছেড়ে দিলেও দেশী সৈনিকরাও তা'দের সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করে না। যারা পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছে, সরকারকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করছে, তা'রা তো গ্রামে ব'সে নাই। তারপর চীনা সৈনিক একটু অন্য রকমের। এরা একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছে। যখনই তা'রা বুঝতে পারে যে সরকার তাদের নয়, তখনই তা'রা বিদ্রোহ ক'রে বসে। ফলে সে একা মরে না, তা'র আত্মীয়-স্বজনের উপরও অত্যাচার গড়ায়। এরূপ ধরণের লোকেরা যে গ্রামে বাস করে হয়তো সেই গ্রামকে গ্রামই তছ্‌নছ্‌ হয়। কারণ গ্রামবাসীরা আপনজনকে ছাড়তে রাজি হয় না। বিশ্ববিখ্যাত চীন জাতির চেয়ে তা'দের ষড়যন্ত্রের নামডাক আরও বেশী। দেখলে বুঝা যায় না এই জাতি দ্বারা এত বড় কর্ম্ম সাধিত হ'তে পারে। তবে এটা লক্ষ্য করেছি, গ্রামের লোক আমার প্রতি কোনরূপ ঘৃণা প্রকাশ করছে না। বরং দায়ে পড়েই যেন এড়িয়ে থাকতে চায়।

আমার মন একেবারে বদলে গেছে, একটুও ভাল লাগছে না। কি দেখব, কি না দেখব, তা' ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না। তারপর কয়দিন ধরে স্নান হয় নাই, খাওয়াও জোটে নাই। কাজেই মনকে ঠিক রাখা বড়ই কষ্টকর। নদীতীর লক্ষ্য করে চললাম। তিন দিন ক্রমাগত পথ চ'লে চ'লে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে আছি এমন সময় দেখি সমুখে আবার পাহাড়। প্রথমতঃ চোখ দুটাকে বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু একটু পরে যখন পাহাড়টার

দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি পড়ল তখন এটী যে ঠিক্‌ঠিকই পাহাড় নদী নয় তা' বুঝতে বাকি রইল না, আমার মগজও অনেকটা বিগড়ে গেল। ধৈর্য্য আমার চির সহায়। তাও বুঝি আর অটল রাখতে পারি না। নির্ব্বাকে বসেই রইলাম। কিন্তু নদীর দিকে ফিরতে হবেই, ভেবে আর কি হবে; এবার নদীর দিকে আর চলতে ইচ্ছা হ'ল না, এবার ইচ্ছা হ'ল চীনসাগরের দিকে যাই।

রাত্রি অন্ধকার, হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। আমি জনহীন প্রান্তরে একা। ভয় বোধ হয় সকলেরই আছে! এরূপ বিজন প্রান্তরে একা রাত্রি-যাপন করা আমার ইচ্ছাকৃত কাজ, তাই কা'রও উপর রাগ হ'ল না, ভয়ও হ'ল না। কিন্তু অর্শ আবার বেড়েছে, শরীরটা বড়ই খারাপ। এমন কি মাইল দু'এক যাবার পরই একবার ক'রে সাইকেল হ'তে নামতে হ'ত। সারাটি দিন এরূপ করে কাটিয়ে নিরালা প্রান্তরে একা থাকাটা সকলের ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে বেশ লাগছিল। তারপর এই চীন দেশে এমন জানোয়ার নাই যে আঁধারে গা ঢেকে এসে আমাকে আক্রমণ ক'রে বিপন্ন করতে চেষ্টা করবে। এক আছে ভূতের ভয়। যে মরা মানুষের কবর খুঁজে সেখানে রাত্রি যাপন করে, তা'র কাছে ভূতের ভয় হাসির বিষয় নয় কি? কিন্তু আকাশ হ'তে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। ভাবছিলাম উঠে চ'লে যাব, কিন্তু কোথায় যাব? সামান্য একটু বৃষ্টি পড়েই তা' বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু, এই যে ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি তা' মাটিতে প'ড়ে একটা গরম হাওয়ার সৃষ্টি করছিল। তা'তে একটু বিরক্তি বোধ হয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম এসে তা'র অবসান করল।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন তরুণ সূর্য্যের রঙ্গীণ আলো আমার মুখে প'ড়ে ঝিকমিক করছিল। শরীরটা বেশ ভাল বোধ করতে লাগলাম। আমি যেন লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলাম। যে অর্শ আমাকে অনবরত রুগ্ন ব'লে স্মরণ করিয়ে দিত তা' অনেকটা কমে গিয়েছিল। এবার উদ্দেশে সাগরতীর লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হলাম।

সুখশান্তি মানুষের চিরদিন সমভাবে থাকে না। যা'দের সঙ্গে এত ক'রে মিশলাম, যা'দের সুখশান্তির অনেকটা অংশী হলাম, তা'দেরই

কতকগুলি লোক আমার প্রতি অত্যাচার করবে তা' মোটেই ভাবি নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে ব'লে এখন আমার তা'দের প্রতি কোন আক্রোশ নাই। পূর্ব্বেই বলেছি এখন আর আমি গ্রামে থাকি না। একাকী বনেজঙ্গলে শুয়ে থাকি। বোধ হয় পাহাড় ছেড়ে আসার তৃতীয় দিন রাত্রিতে একটী পরিত্যক্ত ছোট ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করলাম। ঘরটা পাশে আট হাতের বেশী হবে না, লম্বায় হবে অন্ততঃ পঁচিশ হাত। ঘরটার মধ্যে সামনে ও পিছনে দুটী দরজা, তা'তে পাল্লা নাই। এছাড়া কোন জানালা ছিল না। ঘরটা দেখে মনে হ'ল, অনেক দিন সেখানে কোন লোকজন বাস করে নাই। তবে ঘরটার একপাশে একটু পরিষ্কার স্থান ছিল, হয়তো কেউ রাত্রি কাটিয়ে গেছে। সেই স্থানটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে তা'তেই অয়েল ক্লথের উপর কম্বলটা পেতে বিছানা করলাম। আমার কাছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একখানা ধর্ম্মপুস্তক ছিল। তা খুলে পড়তে লাগ্‌লাম। চীন দেশে থেকে চীনাভাবাপন্ন হয়েও নিজের মাতৃভাষায় বই পড়তে বেশ ভাল লাগ্‌ল। বই পড়ার পর চীনের একটা মানচিত্র দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। কতকগুলি লোক চীনের জাতীয় গান গাইতে গাইতে আমার ঘরের কাছ দিয়েই চলেছিল। চীনের জাতীয় সঙ্গীত এতই বীরত্বব্যঞ্জক এবং প্রাণমাতান যে তা' আশাহীনের বুকেও আশা জাগিয়ে তোলে, দুর্ব্বলের দেহে শক্তির সঞ্চার করে। সেই গান আমি শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটী যুবক সৈনিক বোধ হয়, মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য এই পরিত্যক্ত গৃহে এসেছিল। কিন্তু আমাকে দেখেই সে বাইরে চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে "জাঁপ্‌নু কুই" ভেবে আমার শান্ত মুখের দক্ষিণ গণ্ডে একটী চপেটাঘাত করল। আঘাতটীর সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় আমার গালের উপর তা'র পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ ব'সে গিয়েছিল। চীন দেশে অনেক দিন ঘুরেছি, অনেক কচি মাংসও খেয়েছি, পেঁয়াজের কথা তো না বল্‌লেও চলে। কাজেই আমার "সর্ব্বজীবে দয়া"র ভাব অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যুবক সৈনিকের চিবুকে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটী ঘুসি মেরেই একলাফে তা'র বুকে এমন

একটী পদাঘাত করলাম যে তা'র পল্টনী বুটের লাথির ওজনও তা'র চেয়ে হাল্কা। সৈনিকটীর কাছে বন্দুক ছিল। উঠে গিয়ে সে যেইমাত্র বন্দুক ধরল অমনি তা'কে গুলী করার সময় না দিয়ে আবার তা'র ডান হাতটা ধ'রে এরূপভাবে মুচড়িয়ে দিলাম যে তা'র হাত হ'তে বন্দুক আপনি প'ড়ে গেল। সময় ক্ষেপণ না ক'রে তা'র কোমর হ'তে কার্ত্তুজ-ভর্ত্তি পেটীটা কেড়ে নিলাম। লাঞ্ছিত যুবক মার্কিনী কায়দায় দুটী হাত তুলে ঘর হ'তে বিদায় নিল। কিন্তু আমার ভাববার সময় নাই। এখনই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। সে নিশ্চয়ই তা'র পল্টনে সংবাদ দিবে এবং আমার নিজেকে রক্ষা করবার আর উপায় থাকবে না। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা একটা দরজায় রেখে দিলাম। তা'তে লেখা ছিল হিন্দু পর্য্যটক। অন্য দিকে আমার রঙ্গীণ খদ্দরের চাদরটা হ'তে এক টুকরা ছিঁড়ে তা'কেই পতাকা ক'রে রাখলাম, আর বাকিটুকু দিয়ে পাগড়ী বেঁধে ফেললাম। বন্দুকটা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম তাতে তিনটা গুলী আছে, আর পেটী হ'তে তাড়াতাড়ি খুঁজে মাত্র ছয়টী গুলী পেলাম। সর্ব্বশুদ্ধ আমার নয়টী গুলী হ'ল। অন্ততঃ নয়টী লোকের জীবন-মরণের কারণ হয়ে আমি মরতে পারব, তা'র চেয়ে বড় আনন্দ আর কি ?

যা'দের জাতীয় সঙ্গীত শুনে ঘুম হ'তে উঠেছিলাম, তা'দেরই একজনের হাতের চপেটাঘাত এখনও আমার দক্ষিণ গণ্ডের অনেকটা লাল ক'রে রেখেছে। তারপর ঐ আসে সেই পল্টন, যে পল্টন হয়তো জাপানী সৈন্যের রক্তে স্নান করবে। কিন্তু আমার মত নিরুপায় অস্ত্রহীন লোক আজ তা'দের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। আমি একা, আর তা'দের সংখ্যা এখনও আমি জানি না। পদশব্দে বুঝা গেল ওরা সংখ্যায় কম নয়। যা'দের উন্নতির জন্য সদাসর্ব্বদা চিন্তা করতাম, আজ তা'রাই আমার জীবননাশের জন্য এগিয়ে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের একটা কোণে গিয়ে ডান হাতে বন্দুকটা বাগিয়ে দুটা দরজার প্রতি তাক ক'রে দাঁড়ালাম। যদি ওরা প্রথমেই গুলী ছুড়তে থাকে তবে যে-ই প্রথম আমাকে মুখ দেখাবে তা'কেই তৎক্ষণাৎ শমনসদনে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। কতকগুলি লোক গুলী না করেই ঘরে প্রবেশ করল। তার মধ্যে একজনকে

বড়দরের কর্ম্মচারী ব'লে মনে হ'ল। এক দিকে "হিন্দু" শব্দটা, আর অন্য দিকে গৈরিক বস্ত্র দেখেই তাঁ'রা এতক্ষণ আমার প্রতি গুলী ছোড়ে নাই। এই গৈরিক বস্ত্রের আদর এবং সম্মান যদিও চীন দেশ হ'তে দিনদিনই চ'লে যাচ্ছে, তথাপি এখনও একেবারে লোপ পেয়েছে একথা অন্ততঃ আমি বল্‌তে পারি না। চীনের ধর্ম্মধ্বজীদের হাতে ক্ষমতা গেলে গৈরিক বস্ত্রের রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি কমিউনিষ্টরা কোন দিন প্রাধান্য লাভ করে তবে গৈরিক বস্ত্র যে চীন থেকে চিরতরে বিদায় নিবে এসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাপ্তান আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বল্‌লেন। আমি তাঁ'কে সর্ব্বপ্রথমই বল্‌লাম, আমি এদেশে লড়াই করতে আসি নাই, অনেক বিপদ আপদ গিয়েছে কিন্তু কখনও হাত উঠাই নাই। আজ দায়ে প'ড়েই হাত উঠিয়েছি। যদি আমাকে প্রাণে মারা কিম্বা অঙ্গহীন করা হয় তবে সেজন্য তিনি দায়ী হবেন। কাপ্তান তা'তে রাজি হলেন। সরল বিশ্বাসে আমার জীবনমরণের ভার কাপ্তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে বন্দুক এবং গুলীর পেটী অর্পণ করলাম। মরাই আমার ভাল ছিল। সেদিন যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত এবং অপমানিত হলাম এ জীবনে সেরূপ আর কোন দিন হই নাই। এরূপ ভাবে এ জীবনে পুনরায় অত্যাচারিত হবার পূর্ব্বে হয় শত্রুর হাতে, নয় নিজের হাতে যেন মৃত্যু হয়। আমাকে সৈনিকরা পঙ্গপালের মত ঘিরে ভীষণ ভাবে মারতে লাগল। কিছুক্ষণ প্রত্যাঘাত করেছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত যখন চারিদিক থেকে কিল, ঘুষি, লাথি চলতে লাগল তখন বেশীক্ষণ আমাকে স্বজ্ঞানে থাকতে হয় নাই। অজ্ঞান হয়ে থাকা বোধ হয় ভালই। কারণ তা'তে অপমানের গ্লানি ভুলে থাকা সহজ হয়।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম সাদা ধব্‌ধবে কোমল এক শয্যার উপরে আমি শায়িত। শিয়রে বসে একটি যুবক আমাকে অবিরাম গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। তা'র মুখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ বুজতে ইচ্ছা হ'ল। তা' বুজেও গেল, আবার আমি চেতনাহীন। তারপর আবার হুঁস হল। তখন শরীরে যেন কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে, কিন্তু মুখ হ'তে একটু পর পরই কালো কালো রক্তের চাপগুলি কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌ছিল। ভাবছিলাম জীবনের বোধ হয় শেষ হয়ে এল। মরবার পূর্ব্বে একখানি চিঠি

লিখব। কি লিখব, কাকে লিখব? বেশীক্ষণ আর চিন্তা করতে হ'ল না। আবার চেতনা লোপ হ'ল। এই বার নিয়ে চীন দেশে আমার তিন বার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল। তারপর আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী অনেক লোকই আমার চারিদিকে ঘিরে ছিল। এবার কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার (ছিংছাং) কথা বলতে মানা করলেন।

'বোবাবন্ধু'

আমি কথা বল্‌লাম না। আমার মুখে কতকগুলি ভাতের মাড় একটা চামচের সাহায্যে ঢেলে দেওয়া হ'ল। একটু নয়, পর পর অনেকখানি। তারপর কতকটা চীনে সাদা চা। খাওয়ার ধরণ দেখে অনেকের মুখে হাসি ফুটে এল। কবিরাজ (ছিংছাং) হাত নাড়িয়ে বলছিলেন, আমার রোগী কখনও মরে না, তা সে যেমনই হোক। তারপর একে একে ঘর হ'তে সবাই বিদায় নিলেন, একটি মাত্র যুবক আমার কাছে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে আর মাথার চুলগুলিতে আঙ্গুল চালাতে লাগল। মাঝে মাঝে চীনে ভাষায় দু-একটা কথাও বল্‌তে লাগল। যখনই সে-সব কথার জবাব দিতে উদ্যত হয়েছি, তখনই তার নিজের মুখে আঙ্গুল রেখে সঙ্কেতে জানাচ্ছিল—"কথা বল্‌বেন না।" কিন্তু যুবকের শ্রদ্ধা ও অকপট সেবা পলে পলে আমাকে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছিল। আমার বুকের উপর একটা পুলটিশ বাঁধা ছিল, ওটা বুকের চামড়াতে আঠার মত সেঁটে গিয়ে বেশ চুল্‌কাচ্ছিল। যুবককে তা ইঙ্গিতে সরিয়ে নিতে বল্‌লাম। কিন্তু সে হাতের ইসারায় জানিয়ে দিল—না না, তা হবে না, ছিংছাং-এর আদেশ। বাধ্য হয়ে আমাকে সে যাতনা বরদাস্ত করতে হ'ল। বেশী দিন সে অস্বস্তি পোয়াতে হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই পুলটিশটা ফেলে দেওয়া হ'ল। শরীরও অনেকটা সুস্থ সবল হল।

সেদিন মনে হ'ল, সাংহাইয়ের চাপাই অঞ্চল জাপানীরা নিশ্চিত দখল করেছে, নতুবা গ্রামের লোক আমার দৃষ্টি থেকে এমন করে মুখ লুকিয়ে রাখবে কেন? কথাবার্তা, আনন্দ করা বন্ধ করবে কেন? তবু কিন্তু আশ্চর্য্য বলতে

হবে এই চীনাদের জন্মগত সংস্কার, তারা এত বিপদেও নিত্যকার কর্ত্তব্য ভুলে নাই। আমার প্রতি তাদের বেশ সতর্ক নজরই ছিল। একটি যুবতী সেদিন ম্লানমুখে এসে আমাকে খাবার দিয়ে গেল। একটি কথাও সে বল্‌ল না, বলবার ক্ষমতা হয়তো তার ছিলও না। তবে লক্ষ্য করেছিলাম, তার যেন কোনও নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ হয়েছে, নতুবা বারবার চোখে জল আস্‌ছে আর মুছে ফেলছে কেন? যদি সে অবস্থা আমাদের দেশের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে হ'ত তবে কি দুর্দ্দশাই না প্রত্যক্ষ করতে হ'ত! বিকালে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদের মুখ গম্ভীর—একেবারে কালোপানা। বিপদ যাদের মাথার উপর, মৃত্যু যাদের দ্বারে হাজির, তাদের মুখ থম্‌থমে গম্ভীর হবে না তো হবে কার? কিন্তু বিদেশীর প্রতি, অসহায়ের প্রতি কর্ত্তব্য, বিশেষ যে বিদেশী বিনা কারণেই দেশের লোকের হাতে অপমানিত, প্রহৃত, তার প্রতি কি এদের কোন কর্ত্তব্যই নাই? তার কি কিছু সাহায্য করবার দরকার নাই—অন্ততঃ দেশের, জাতির সম্মান বজায় রাখবার জন্যেও? চীনের লোকের সে ধারণা বেশ আছে। যদিও বিদেশীরা চীনাদের সাহায্যে চীনদেশ ভ্রমণ করে চীনের বদ্‌নাম প্রচারেই পঞ্চমুখ হয়, তবু চীনাদের সহজাত অতিথিসৎকার প্রবৃত্তিতে কোন রকমেরই সঙ্কীর্ণতার ছোঁয়া লাগে না। আমার এই উপায়হীন অবস্থায় যখনই একজন চীনা এসে আমার প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলে ধরেছে, তখনই তাদের অন্তহীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমার অন্তরের দুঃখজ্বালা, শরীরের ব্যথা বেদনা সবই ভুলিয়ে দিয়েছে। মুহূর্ত্তে স্বর্গ যেন নেমে আস্‌ত ধরায়। আমি সব ভুলে গিয়ে ভাবতাম—এই চীনাদের সম্বন্ধে কত বদ্‌নামই না শুনেছি, কত অপধারণাই না পোষণ করেছি, কত ঝালই না পরের মুখে খেয়েছি। অথচ এই চীনারাই এখন আমাকে নিতান্তই আপনজনের মত চিকিৎসা করছে, সেবা কর্‌ছে। তা'ছাড়াও এই বিদেশীর প্রতি তাদের প্রাণের তারে যে করুণা-স্পন্দন জেগে উঠেছে, তার তরঙ্গ, তার প্রেরণা আমার প্রাণেও কি থেকে থেকে পুলক-শিহরণে বেজে উঠছে না? বুঝেছিলাম বলেই আজ প্রাণ খুলে প্রাণের কথা বলছি। যদি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকৃত তবে চীনাদের সকল যত্ন সকল শুশ্রূষা আজ পণ্ড হয়ে যেত, আমারই মুখ হ'তে অন্য কথা বের হয়ে আস্‌ত।

শরীর ভাল হয়ে গিয়েছে। দেহে এসেছে নতুন বল, প্রাণের কথা বলবার শক্তি পেয়েছি, তবুও ছিংছাং আদেশ দিলেন—দ্বিচক্রযানে অন্ততঃপক্ষে আরও দু'মাস চলা হবে না, যদি চলি, তবে বেঁচে উঠতে পারব কিনা সন্দেহ। কবিরাজের কথা মাথায় নিয়ে চীন-সাগরে না গিয়ে আবার চল্‌লাম ইয়াংসী নদীতে তরী ভাসিয়ে আপনা হারিয়ে সব যেন বিলিয়ে দিয়ে।

দিন ঠিক হ'ল, নৌকা ভাড়া করা হ'ল, গ্রামের লোক একদিন এক শুভ্রালোকিত প্রভাতে আমাকে বিদায় দিতে এল। সকলের অগ্রে এলেন বৃদ্ধ কবিরাজ আর শুশ্রূষাকারী যুবকটি। যুবক-বন্ধু আমার সঙ্গে সাংহাই যাবে আমারই তত্ত্বাবধান করতে। তবু কিন্তু সে জানে না আমার ভাষা, বোঝে না আমার একটা কথাও—তাতে কি এসে যায় বন্ধুটির কাছে, সে-ই নিয়ে যাবে আমাকে সাংহাই, তাকে নিরস্ত করে সাধ্য কার! বিদায় নেওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি বিদায়ের অগ্রদূত। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী—সবাই সজল নয়নে নৌকার কাছে এসে নজর বুলাচ্ছে আমার উপর, তাদের বাষ্পাকুল ভঙ্গিটী যেন বল্‌ছে, ক্ষমা কর আমাদের দেশের সেই পাগলা সৈনিকদের, তাদের হয়ে আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

বিদায় বেলায় কবিরাজ বল্‌লেন, 'কিন্তু কারও কাছে বল না এই কষ্টের কাহিনী, চীনের শত্রু আজ চারিদিকে তো আছেই, আপন ঘরের ভিতরও রয়েছে প্রচুর। এই সুযোগে যদি আবার কেহ আমাদের সভ্য করতে আসে তবে দায়ী হবে তুমি। ভুলতে পারবে কি?' হাতজোড় করে ভগবানের নাম নিয়ে আত্মমর্য্যাদাকে মাত্র সাক্ষী রেখে বলেছিলাম—'একথা কোন বিদেশীর কাছে বলব না, বলব গিয়ে দেশের লোকের কাছে যাতে তোমাদের দয়া, তোমাদের ভালবাসার মর্ম্ম তারা চিন্‌তে শিখে। আর বলব গিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে চীনের লোকের অন্তরের বাণী, তারা যে সত্যই ভারতের স্বর্ণযুগের নরনারীর দোসর, যদিও দেহের রং এবং খাদ্যে তাদের হয়ে পড়েছে অনেক প্রভেদ।

নৌকা ছেড়ে দিল। আমরা দুটি জীব নৌকায় বসে, দুজনাই দুজনার কাছে ভাষাহীন, তবে কি কথা বলব বলুন তো? কিন্তু জিহ্বা আমাদের মূক হলেও, প্রাণ তো শুষ্ক নয়। বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় যাদের অন্তর কানায় কানায়

পূর্ণ, তাদের কাছে ভাষা শুধু নিরর্থক নয়, মিলনের অন্তরায়ও বটে। আমাদের বিকাল বেলা কাটল বেশ, তারপর এল সন্ধ্যা, সমভাবেই চল্‌ল আমাদের নীরব আকুতির আদানপ্রদান। মুক্ত নদীর জলে গাঢ় অমানিশার আঁধার পড়ে বেশ ঘনিয়েছিল। চীনদেশে যে পঁয়তাল্লিশ কোটী লোকের বাস তা যেন আমি ভুল্‌তে বসেছিলাম। কতক্ষণ পরে একটা বাতি দেখা গেল। ঐ বাতি বৃটিশ জাহাজের। এখানে একটা ছোট ষ্টেশনও ছিল। জাহাজ তীরে লাগল না, আমাদের উঠতে হ'ল সিঁড়ি বেয়ে। বুকে বড় আঘাত লাগল ঐ সিঁড়িগুলি বেয়ে উঠতে। আমার সঙ্গী যুবক জাহাজে আমার সাইকেল এবং পিঠ-ঝোলাটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েই আগে কেরানীর সঙ্গে কথা বলল। কেরানী আমাদের একটা কামরা দেখিয়ে দিলেন। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছিল, কিন্তু চীনা যুবকের পরিচর্য্যায় অল্প সময়ের ভিতরই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। রাত্রি কাটল, দিন এল। নদীর এপার ওপার দেখা যায়, কিন্তু নদীতে নৌকা নাই, নদীতীরে কোন লোকজনও দেখা গেল না, হয়তো আতঙ্কগ্রস্ত জনগণ নদীতীর ছেড়ে পালিয়েছে। জাপানী গান-বোটগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে—নোঙ্গর করে আছে। ঐ গান-বোটগুলিকে দেখে যত চীনা যাত্রীর মুখে বিদ্বেষের ছাপ ফুটে উঠছিল—ওরা বিষনজর ঢেলে দিচ্ছিল যেন ওগুলিকে ভস্ম ক'রে ফেলতে চায়। বাইরে চুপচাপ ব'সে থাকা আর আমার ভাল লাগল না। নির্ব্বাক সঙ্গীর সহিত আকার ইঙ্গিতে কথা হতে লাগল। এরই মাঝে কতকগুলি 'কোড' করে নিলাম, কাজ চলে গেল বেশ। হিন্দুর সঙ্গী নির্ব্বাক চীনা তরুণ, পরিচয় শুধু আত্মিক—হৃদয়ে হৃদয়ে।

দিন কাটল—রাত্রি এল, তারপর রাত্রিও প্রভাত হ'ল। দূর হতেই দেখা গেল—অনেকগুলি জাপানী গান-বোট নিশ্চল হয়ে আছে। যদি ক্যামেরা থাকত, হয়তো একটা ফটো নিতাম। কিন্তু ভারত-মাতার ভিখারী ছেলে আমি, আমার সে অর্থ নাই—ক্ষমতা নাই যে একটা ক্যামেরা কিনি। আমার সেই দেশে জন্ম, যে দেশের লোক এখনও জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? ফটো নেওয়া হ'ল না। আমরা ধীরে 'উজাং কেল্লা'র কাছে এলাম। 'উজাং' আর 'কেল্লা' নাই। জাপানী গোলা

উজাং কেল্লার অস্তিত্ব উজাড় করেছে। তারপর নদীতীরের ডানদিকে যত বাড়ীঘর দেখতে পাওয়া গেল—প্রত্যেকটিরই অবস্থা এমন যে, দেখলেই মনে হয় —এই পড়ল তো এই পড়ল। গোলার আঘাতের অগুনতি ছিদ্র তো আছেই, উপরন্তু শূন্য হতে বোমাবর্ষণ হয়ে চাল ফুঁড়ে মেজের নীচ পর্য্যন্ত গর্ত্ত হয়ে এক একটি 'পাতকূপে' পরিণত হয়েছে। উজাং কেল্লার অবস্থা দূর হতে দেখে যা মনে হ'ল তার আভাষ দিচ্ছি ; কাছে গিয়ে কি দেখেছি তা একটু পরেই বলব। জাহাজের যত যাত্রী ছিল—গোলাগুলীর সর্ব্বনাশা ফল দেখে অনেকেই থতমত খেয়ে গিয়েছিল। এই চীনদেশে চীনা জেনারেলদের মাঝে যখন একে-অন্যে লড়াই হয়, তখন সাধারণতঃ মেশিনগান ব্যবহার করা হয়, লম্বা খাঁড়া ব্যবহার করা হয়, বন্দুক এবং সঙ্গিন তো মামুলী কথা হাতাহাতির বেলায়। কিন্তু এরূপভাবে লণ্ডভণ্ড বড় বড় কামানের দ্বারাই হয়। দূরপাল্লা কামানের যে-সব গোলা নদীর তীরে পড়েছে, দূর হতেই মনে হয় যেন তাতে এক একটা বড় বড় গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখি নাই এমন নয়। গতবার যখন বেলজিয়ামে গিয়েছিলাম, দেখেছি তখনও ভাঙ্গা বাড়ীগুলা মেরামত হয় নাই। কিন্তু এমন করে তারও তো নিঃশেষে ধ্বংস হয় নাই, যেমনটি হয়েছে 'উজাং' আর তার আশ-পাশের তল্লাটের।

জাহাজ ধীরে ধীরে এসে ছোট নদীটার ভিতর প্রবেশ করল। তারপর ডাইনে বাঁয়ে দেশ-বিদেশের গান-বোটগুলির মাঝ দিয়েই সর্পিল ভঙ্গিতে কোনরূপে জেটিতে গিয়ে ভিড়ল। এই সব জেটি বেজায় লম্বা লম্বা। তারই সমুখ দিয়ে একটা পথ তীর ঘেঁসে রয়েছে, তাহাকে বলে "বাঁধ," ইংরেজীতে বলা হয় Bund ; এই 'বাঁধ'-এর পাশেই জেটির পরে ইন্‌টারন্যাশন্যাল সেটেলমেণ্ট। সঙ্গীটিকে নিয়ে জাহাজ হতে নামলাম। আমার সাইকেল এবং বোঝাটা কুলির সাহায্যে নামিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গীর পরিচিত ফরাসী কনসেশ্যানের 'এশিয়া হোটেলে' গেলাম। সেখানে নরনারী গিস্‌গিস্ করছে, একটা ঘরও খালি পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার সঙ্গী যখন আমার অসুস্থতার কথা বলল, তখন হোটেলের মালিক কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে একটা ঘরের তালা ভেঙ্গে যে ভদ্রলোক তথায় ছিলেন—তার সব জিনিস-পত্র সরিয়ে দিয়ে আমার থাকার সুবিধা করে দিলেন।

পূর্ব্বে ভাবতাম, আমাদের কল্‌কাতার মত বড় নগর অন্ততঃ এশিয়া মহাদেশে আর নাই। যখনই কেহ বলতেন, কলকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা খারাপ; তখনই বলতাম ঐতবড় নগরে এতদূর যে করা হয়েছে তাই প্রচুর। কিন্তু এখন দেখছি যে, চীনদেশে—যে চীনাদের আমরা নোংরা আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করি—তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও আমাদের চেয়ে খারাপ নয়, বরং স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি অনেক অংশেই বেশী। হোটেলের ঘরগুলি প্রশস্ত। গরম ও ঠাণ্ডা জল ঘরের ভিতরই নলের সাহায্যে আস্‌ছে। গরম জলের আমার বেশী দরকার। চীনা-সঙ্গীটি গরম জলের প্রাচুর্য্য দেখে বেশ আনন্দিত হ'ল। সে গরম জলে গামছা ভিজিয়ে, তা নিঙড়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিলে। তারপর আমায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বের হল। কফি, চিনি এবং দুধ কিনে এনে আমাকে কফি পান করাল। সারাটি বিকাল-বেলা আমাকে বিছানা হতে উঠতে দিল না, তারপর রাত্রিতে গিয়ে আমার জন্যে "বুভু" (ফেনযুক্ত ভাত) কিনে এনে খাইয়ে দিল এবং শোবার পূর্ব্বে তারই পরিচিত একজন চীনা ডাক্তারকে এনে বুক পরীক্ষা করাল। ডাক্তার ইংরেজী জানতেন। আমাকে বললেন,—বিপদ কেটে গেছে, এখন হতে একটু-আধটু সাইকেলে বসে ঘুরতে পারব। তবে বেশী ভ্রমণ তো দূরের কথা—বেশী হাঁটতেও আমাকে নিষেধ করে দিলেন। সারারাত্রি সাংহাই নগরীর কল্পিত জাঁকজমকের স্বপ্ন দেখে কাটালাম। শহরটির আভিজাত্যের প্রভাব এমনি করেই আমার প্রাণমন মুগ্ধ করেছিল।

প্রভাত হ'ল। বাইরে লোকজন চলাফেরা করছে। বড় রাস্তার উপর দিয়ে রিক্‌সা গাড়ী, মটরগাড়ী অনবরত চল্‌ছে। ঘর হতে এসবই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তার কানফাটান বিকট শব্দ একেবারেই নাই। এশিয়া হোটেলের দরজাগুলি এত সুন্দর করে আঁটা যায় যে, বাইরের একটু শব্দও ভিতরে ঢোকে না। বাইরের ঐ জনস্রোতকে যেন মূক বলে মনে হ'ল। সাংহাইয়ের প্রথম প্রভাত মনোরাজ্যে প্রচুর আনন্দই উপহার দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করল। শরীরও বেশ হাল্‌কা বোধ করছি। আমার সঙ্গী—আমার বিপদের বন্ধু আমাকে আদেশ দিল বাইরে যেতে। আমি কাপড় পরে নিলাম, তারপর তাকে ঘরে রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। এতবড় একটা শহরের কোথায় কি হচ্ছে,

কোথায় কি দেখবার আছে, চাপাই অঞ্চল কোন্‌দিকে—এসব সংবাদ জানবার জন্য হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বললাম। তিনি আমাকে সাংহাই নগরীর একটা চীনা মানচিত্র দিলেন, বুঝিয়েও দিলেন অনেক কথা; কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে গেল—একসঙ্গে রকম রকম কথা শুনে। এ তো ক'লকাতার মত একখানা শহর নয় যে, শিয়ালদহ হতে হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়া গেলেই একদিককার পাত্তা পাওয়া গেল! একটু চিন্তা করে ঠিক করলাম—ঘরে ফিরে যাওয়াই সমীচীন, এখন কোন অফিসও খোলা পাব না—যেখানে ইংরেজী মানচিত্র বা কোন গাইড পাওয়া যায়।

ঘরের নম্বর বায়ান্ন, তিন তলায় অবস্থিত, লিফ্‌ট আছে, ভাড়া মাত্র এক ডলার কুড়ি পয়সা খাওয়া সমেত। এক ডলার কুড়ি পয়সা তখনকার দিনে ছিল এক টাকার সমান। ঘরে এসে দেখি কোথা হতে একদল যুবক-যুবতী এসে সবাই মিলে আমার অটোগ্রাফ বইটা এত মন দিয়ে দেখছে যে, আমার সঙ্গীটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই যে আমি ঘরে এসেছি। তাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বললাম। এখানে কুলী-মজুরও ইংরেজী বোঝে। যুবকের দল দাঁড়াল আমাকেই ঘিরে, তারপর মাথা নত করে সবাই রইল। একজন বললে, আপনি কি মনে করেন আপনার বুকের রক্তের ঋণ চীনের বদ্‌নামেই পরিশোধ হয়ে যাবে? আমাদের রক্তও কম খরচ হয় নাই, সব আপনাকে দেখাব, দেখলে বুঝবেন আমাদের অবস্থা কি।

চীনে এসে অনেক যুবক-যুবতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের প্রথম কথাটিতেই বুঝে নিয়েছি—ওরা কে। এখন আর ওদের স্বরূপ চিনতে কষ্ট হয় না। তাই বললাম, না ভায়া, চীনের রক্ত, চীনের মুক্তি জগতের বিরাট সম্ভাব্যতা—প্রাচ্যের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের একমাত্র আলো, আমি তা'তে বাদ সাধব কেন? এই তো সামান্য রক্ত মাত্র মুখ হতে বের হয়েছে—তা'তে কি হয়েছে? বসুন, সবাই আরাম ক'রে কথা বলা যাক। 'বোবা সঙ্গী' যেই বলেছি অমনি একজন বেশ একটু চীৎকার করেই বললে, "কি বলছেন আপনি—বোবা সঙ্গী!" সঙ্গী যেমন আমার কাছে বোবা, আমিও তো তার কাছে তেমনি। তবে আর তো পাল্টা প্রতিবাদ করা চলে না, আমারই মুখ বন্ধ হ'ল। আমার দেওয়া বোবা আখ্যা মিথ্যা প্রতিপন্ন

করে বোবা সঙ্গী তখন বেশ কথা বলছিল তার দেশের লোকের সঙ্গে। কাজেই বেশ একটু রগড় হ'ল কথাটা নিয়ে। যুবক-যুবতীরা সবাই ইংরেজী বলতে পারত। তাদের হাসির রোলে কক্ষ মুখরিত হ'ল। প্রাণখোলা সে হাসির ফোয়ারা, তাদের উচ্ছলতা লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল ওরা জানে

একটি কার্য্যই, সেটি হ'ল পবিত্র হাসি। যাদের চরিত্রে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় একটুও অপবিত্রতা এসেছে—তারা এমন করে হাস্‌তে পারে না। কিন্তু এরা হাসতে পারে। এখন এদের কথা অনেকবার আমায় বলতে হবে, কারণ এরা হবে আমার অনেক দিনের সঙ্গী; এদের মারফতে জানব আমি অনেক কথা—এই চীনের, এই সাংহাই নগরীর। এদের জন্যেই জানতে পেরেছি চোখে-দেখা শহরটিই সাংহাইয়ের সব নয়—এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগ। যেমন আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক স্বদেশে ঠাঁই না পেয়ে ছুটে যায় প্যারিসে, লণ্ডনে বা জিব্রাল্টারে, তেমনই সাংহাই হল উত্তম-অধম সকলেরই আশ্রয়স্থল। এতগুলি বিদেশী কন্‌সেশ্যনের কোথাও না কোথাও পলাতকের স্থান হবেই। চিন্তাজগতে যারা এনেছে যুগান্তর—নতুন স্রোত—অবাধ স্বাধীনতা, তেমন বিদ্রোহীদের স্থান ছুনিয়ায় বেশী নাই, এমনি তিন-চারটি অঞ্চল ছাড়া। যুবকদের মধ্য থেকে একজনাকে লটারী করে আমার সঙ্গী নির্ব্বাচিত করলাম, নইলে সবাই আমার সঙ্গে যেতে চায়। যুবতীরা বিদায় নিল, বলে গেল—মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব। কিন্তু তাদের বলে দিলাম, যখন আস্‌বে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে আসবে। তারা হাসিমুখে 'নিশ্চয়ই' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

ছুজনায় মিলে ঠিক করলাম আগে যেতে হবে সংবাদপত্র অফিসগুলিতে। সাংহাই নগরীতে চারখানা ইংরেজী দৈনিক আছে। প্রত্যেকটিরই বেশ কাটতি। প্রত্যেকখানাই দেশের এক একটি জাঁদরেল মুখপত্র বললেই চলে। চায়না প্রেস (China Press) চীনাদের হয়ে কথা বলেন—আমেরিকান স্বরে। এর মানে চায়না প্রেস যে কথাই বলুন না কেন তার মাঝে থাকে চীনের প্রতি মুরুব্বিয়ানা। সেই মুরুব্বিয়ানার মারফতে চীনের যতটুকু উপকার করতে পারা যায় তা করা হয়। 'মারকিউরী'—একখানা দৈনিক, তা শুধু আমেরিকান স্বার্থই দেখে। 'সাউথ চায়না ডেলি প্রেস' (South

China Daily Press) এক কথায় একখানা বৃটিশ সংবাদপত্র। আর একখানি আছে জাপানী মুখপত্র। আমি প্রত্যেক সংবাদপত্র অফিসেই গেলাম। প্রত্যেক স্থলেই কিছু গল্প বলতে হ'ল। শুধু বলতে হ'ল না 'সাউথ চায়না ডেলি প্রেস' পত্রে। তাতে ভারতীয় একজন রিপোর্টার আছেন, তাঁর নাম নায়ার। তিনি আমাকে বললেন, এই পত্রিকায় আপনার সংবাদ একটু আধটু প্রকাশ করতে দিলে আপনার কোন মর্য্যাদা-হানির ভয় নাই। অপর তিনখানায় তো আপনার কথা কিছু লিখবেই। তারা বিদেশী ভাব নিয়ে কিছুতে আপনার স্বরূপটি প্রকাশ করতে পারবে না। তখন কিন্তু আমি বরদাস্ত করতে পারবো না। তাদের আক্রমণ ক'রে অপ্রতিভ করে দিব। এখানে আমি আছি। আর বেশী বলতে হ'ল না মিঃ নায়ারের। বন্ধুত্ব স্থাপন হ'ল এই একমাত্র ভারতীয় সংবাদ পত্রসেবীর সঙ্গে। বিকালে হোটেলে যেয়ে দেখা করবেন বললেন, এখন তিনি বড়ই ব্যস্ত।

সংবাদপত্রের অফিসগুলি বেড়াতেই আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল। ঘরে এসে বসতেই পূর্ব্বপরিচিত দুটি তরুণ এসে বললেন, তবে দেখছি আপনি কথায় কাজে এক। এত বড় কষ্টটা নীরবেই হজম করলেন। জাপানী সংবাদপত্র এত করে আপনাকে বিরক্ত করল, কিন্তু কিছুই যে বললেন না সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আমার সঙ্গী কথাটা শুনে আমার চোখের দিকে তার দৃষ্টি তুলে ধরলে, পরক্ষণেই আবার যে ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিল, তাতেই ডুবে রইল। কিন্তু আমি কথায় বোঝাতে পারব না—কি সে দৃষ্টি! তবে একটা জিনিষ ভুল করি নাই বুঝতে—তার দৃষ্টি যেন মুখর হয়ে জানিয়ে দিল, তার শ্রমের প্রতিদান সে পেয়েছে অশেষ। সংবাদপত্রে এই দুর্নামটা করি নাই যাতে তারই গ্রাম নিংপো কলঙ্কিত হতে পারে। নিজের গ্রাম দুর্নামের কালিমা থেকে অব্যাহতি পেল জানতে পেরেই যে-যুবকের আহ্লাদের সীমা রইল না—সে-যুবকের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই এই রাজ্যে এক অভাবনীয় দীপ্ত পরিবেশের আবাহন করবে।

সাংহাইয়ের বুকে

চাপাই অঞ্চলে

আমার আজই চাপাই দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না। দিনের পর দিন অবিরত সাইকেল চালান এবং পায়ে হাঁটার দরুণ অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার শরীর একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হয়েছিল। তখন যদি কেউ মনে করত যে আমি শ্মশান থেকে উঠে এসেছি তবে তা'তে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই ছিল না। সারাটা বিকাল কতকগুলি ছাত্রের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটালাম। তা'রা কয়েকটী ঘটনা বলেছিল। দেশী-বিদেশী সকলের কাছ থেকেই জান্‌তে পেরেছিলাম যে ঘটনাগুলি সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ সে সব কথা শুনতে চাইবেন কি না জানি না।

পূর্ব্বেই বলেছি আমি তরুণ-তরুণী শিশু-বৃদ্ধ সকলের সঙ্গেই আসর জমাই। এখানেও অন্য তল্লাটের মত তরুণ-তরুণীর সমাবেশ হ'ল, তা'দের মধ্যে একটী তরুণের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল—আমার সঙ্গে কথা বলার মত মানসিক অবস্থা তা'র ছিল না। তা'র কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, তা'র মা, বাবা, ভাইরা এবং সর্ব্বশেষে তা'দের বাড়ীর পোষা বিড়ালটা পর্য্যন্ত সাংহাইয়ের যুদ্ধে মরেছে। যদি চীন-জাপান যুদ্ধের সময় সে হেঙ্কফোঁতে না থাকত তবে হয়তো ঐসঙ্গেই তা'রও শ্মশানযাত্রা ঘটত। যেমনি একটী মেয়ে সাংহাই-যুদ্ধের সময়ে তাদের বীরত্বের কথা বলতে যাচ্ছিল, অমনি সেই যুবক একটু কাছে এসে আমাকে বলল, "ইনি যা' বলছেন তা' শুনুন। এতে আপনার অনেক কথা জানা হবে, আমিও আনন্দ পাব। আমার মা-বোনদের বীরত্বের কথা অনেকবার শুনলেও আরও শুনতে ইচ্ছা করে।"

সিচুয়ান্ রোড হ্যাংকিউ ক্রিকের উপর দিয়ে একেবারে উজাং কেল্লার দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। হ্যাংকিউ ক্রিক পার হ'লে বাঁ দিকে পাওশিং রোড নামে একটী রাস্তা। এই রাস্তাটী নানা দিক দিয়েই বিশেষ প্রসিদ্ধি

লাভ করেছে। একটী কারণ এই যে, এই স্থানেই চীনের বৃহত্তম ছাপাখানা সাংহাইয়ের "কমার্শিয়্যাল প্রেস" অবস্থিত। চীনের যুবকযুবতীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে এই ছাপাখানাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি পতিতা-নিবাস বলেও একটা কুখ্যাতি ছিল। এই বারনারীপল্লীর ভিতরেই একটী হিন্দু মন্দির এবং এক জার্ম্মান্ ভদ্রলোকের বাড়ী আছে। এছাড়া আর কোন ভদ্রলোকের বসতি সেখানে ছিল না। জাপানী উড়োজাহাজ কেন এই দুটী বাড়ী ধ্বংস করে নাই তা' পরে বলা হবে।

ক্যাণ্টনী যুবকসভা যখন মেয়র উ'র নিকটে শুনল যে জাপানীরা কমার্শিয়্যাল প্রেস এবং উজাং কেল্লা দখল করবেই তখন ১৯নং পদাতিক উজাং কেল্লা রক্ষার ভার নিল। আর ক্যাণ্টনী যুবকযুবতীরা নিল কমার্শিয়্যাল প্রেসের ভার। কিন্তু চ্যং-কাই-সেকের সরকার এই ক্যাণ্টনবাসী যুবকদের নেকনজরে দেখত না, এমন কি ওদের দমন করবার জন্য বিদেশী সৈন্য পর্য্যন্ত লেলিয়ে দিত। তাই তা'রা দেশের জন্য আত্মবলি দিতে গোপনে কাজ সুরু করল। চীনে যত বারবনিতা আছে তারা পরিচয় দেওয়ার বেলায় বলত এবং এখনও বলে তারা "ক্যাণ্টনবাসী" বা "কোয়াণ্টাং প্রদেশবাসী"। কাজেই ক্যাণ্টনী যুবকগণ এই যুদ্ধের সময় তা'দের এই মনোভাবকে কাজে লাগাবার একটা মস্তবড় সুযোগ পেল।

তা'রা ধীরে ধীরে প্রকৃত ক্যাণ্টনী বারাঙ্গনাদের রেখে অন্যান্য বারবনিতাদের সরিয়ে দিল, এবং যা'রা সরে গেল তা'দের স্থানে দেশপ্রেমিকা শিক্ষিতা মেয়েদের বসিয়ে দিল। এই শিক্ষিতা, অবিবাহিতা মেয়েদের একরাত্রি মাত্র বারবনিতার কাজের অভিনয় করতে হয়েছিল। এতে তাঁরা বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় তাঁরা ভয়ের কারণ দেখে কোন লোককে ঘরে উঠতে দেন নাই। কিন্তু তা' ব'লে কি দরজা বন্ধ ক'রে রাখা যায়? পুরুষগুলি মরণের ভয়কে ভুলে গিয়ে তাঁ'দের দরজায় আঘাত করতে লাগল। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় এই 'বারবনিতা'দের গৃহে লোক প্রবেশ করল, কিন্তু এই সব লোক আর কেউ নয়, সেই ক্যাণ্টনী যুবকগণ। প্রত্যেক ঘরে এক একজন ঢুকেই দরজায় খিল

দিল। চীনের বারনারীদের নিয়ম হ'ল যে তা'রা প্রত্যেকে সারারাত্রির জন্য একজন মাত্র পুরুষকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। নরপশুর দল এই বারবনিতাদের ঘরগুলিতে হানা দিয়ে নানা উৎপাতের সৃষ্টি করল, কিন্তু উপায় নাই সব ঘরই 'engaged' হয়ে আছে।

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। বিজয়গর্ব্বে জাপানী সৈনিকদল ফরাসী কনসেশ্যনে প্রবেশ ক'রেই সিচুয়ান রোড ধরে ইন্টারন্যাশন্যাল সেটেলমেণ্টে এল। তারপর তা'রা হ্যাংকিউ ক্রিক পার হয়ে পাওশিং রোডে পদার্পণ করল, যে রাস্তায় তা'দের শমন বারবনিতারূপে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন প্রায় দু'হাজার জাপানী সৈন্য পথে ঢুকে পড়েছে অমনি উপর-নীচ দু'দিক থেকে 'বারবনিতা'র দল তাঁ'দের সঙ্গীদের নিয়ে একসঙ্গে গুলী ছুড়তে লাগলেন। কোন হাহাকার উঠল না, উঠল শুধু বন্দুকের ধ্বনি। পথটা অন্ধকার হয়ে গেল। এতে বারবনিতাদের এবং তাঁ'দের বন্ধুদের আরও সুবিধা হ'ল। কোথা হ'তে গুলী আসছিল তা' জাপানী সৈন্য মোটেই বুঝতে পারছিল না। প্রায় দেড় হাজার জাপানী সৈন্য পথেই মারা গেল। আর বাকি সব পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তারপর জাপানীদের প্রতিশোধ সুরু হ'ল। কিন্তু এই যুবক-যুবতীর দল এক ঘণ্টার মধ্যে কোথায় যে স'রে পড়ল তা' কেউ জানে না। তবে সে অঞ্চলের প্রকৃত বারাঙ্গনাদের একটীও আর জীবিত রইল না, সাংহাই নগরীর চাপাই হ'তে তা'দের অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পেল। কিন্তু বারবনিতা সেজে দেশপ্রেমিকা যুবতীরা যে কাজ ক'রে গেলেন, সে কথা শুনে কা'র প্রাণে সাহসের সঞ্চার না হয়?)

যখন এই স্থানটী দেখতে গিয়েছিলাম তখন বহু শিখ এবং পাঠান আমাকে ঐ স্থানটী দেখিয়ে নানা গল্প বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে দাঁড়ান মুস্কিল ছিল, কারণ সে সময় পর্য্যন্তও পথে অনেক গলিত মৃতদেহ প'ড়ে ছিল। জাপানীরা তা'দের বীর সন্তানদের মৃত্যুভূমি চিহ্নিত ক'রে রেখেছিল, হয়তো একদিন সেখানে তা'দের স্মৃতি অমর করবার জন্য ইমারত তোলা হবে।

ঘটনাটী শুনে আমি বিস্ময়চকিত হয়েছিলাম। এর আর কোন কারণ ছিল না। শুধু ভাবছিলাম—গৃহস্থ ঘরের মেয়ে কি ক'রে একরাত্রি বারবনিতায় পরিণত হয়েছিল! সমুখেই যে যুবতী বসেছিল সে আমার

মুখের পরিবর্ত্তন দেখে জিজ্ঞাসা করল, তারা 'কি ক'রে বারবনিতার কাজ করল সে কথাই বোধ হয় আপনি ভাবছেন। আমাকে এই কথার জবাব দেওয়ার অবকাশ না দিয়ে যুবতী বলেছিল,—প্রচলিত রীতির একটু অদলবদল হ'লেই আমরা সমাজ ধ্বংস হয়ে গেল ব'লে চেঁচাই। কিন্তু যে সমাজকে রক্ষা করার কেউ নাই, যে সমাজ পরের ক্রীতদাস হয়ে মরতে বসেছে, সামান্য একটু অসামাজিক কাজের অভিনয় ক'রে সেই সমাজকে যদি বাঁচাতে পারা যায়, তবে দোষ কি? কিন্তু চীনের এই যে মুক্তিফৌজ যাদের জাপানীরা কমিউনিষ্ট ব'লে জগতের কাছে ঘোষণা করছে, তা'দের চরিত্র, তাদের বীরত্ব একটু তলিয়ে দেখবেন। যুবকযুবতী সর্ব্বদাই ভাবছে যে কি ক'রে চীনের মঙ্গল হবে। তা'দের মনে বিন্দুমাত্র অবসাদ নাই। তারা এ'টা নিশ্চিত জানে যে জল্লাদের খড়্গ তা'দের মাথার উপর উদ্যত, তথাপি তা'রা কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে রাজি নয়। তারপর ধরুন যদি বা কেউ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে উপযুক্ত নেতার হাতে পড়লেই আবার সে তা'র আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়। মিঃ বিশ্বাস, এখন বলুন আমরা কিসের দ্বারা চালিত হয়েছি—কাম না দেশপ্রেম?

একে ছিল শরীর দুর্ব্বল তার উপর আবার বুক ধড়ফড় করছিল; নারীর বীরত্বের কথা শুনে নারী যে অবলা তা' ভুলেই গেলাম। ব'সে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। তাই শুয়ে পড়লাম। কি জানি আবার যদি জ্ঞান হারাই। আমি ভাবপ্রবণ নই। কাজেই এ কথা শুনে আমার মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। বিকালবেলা এইভাবে কাটল, সারা রাত্রিও হয়তো কাটত, কিন্তু দেশীভাই এসে ডেকে বললেন, চল বেড়িয়ে আসি। কিন্তু এই সঙ্গীদের ছেড়ে বাইরে যেতে ইচ্ছা করছিল না। ইচ্ছা করছিল যে এদের কাছ থেকে চীনের বীরত্ব কাহিনী অবাক হয়ে আরও শুনি।

অনিচ্ছা সত্বেও দেশীভাইয়ের সঙ্গে ফচো রোডে বেড়াতে চললাম। সেখানে চাপাইয়ের কতকগুলি গৃহহীন আত্মীয়স্বজনরহিত সর্ব্বহারাকে দেখলাম তা'দের বাড়ীঘর সব ভূমিসাৎ হয়েছে, আপন জন হয় কামানের গুলীতে নয় বাড়ীচাপা প'ড়ে মরেছে। কিন্তু তারা বেশ হাসছে, আর মাঝে মাঝে

পথের লোককে বিরক্ত করছে। বিদেশীরা এদের সবাইকে বলছে বারবনিতা। আজ তা'রা একথা বলতে পারে বটে, কিন্তু চীনের যদি প্রতিপত্তি থাকত, তবে আজ এই আপন মা-বোনদের এমন অরক্ষিতভাবে পথে ছেড়ে দিত কি? লোকে যা' ইচ্ছা তা বলুক, তা'তে আমার কিছু আসে যায় না। তাই আমি তা'দের কাছে গিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করলাম। চাপাই, চাপাই—সবার মুখে কেবল এই বুলি। তা কিন্তু আমাদের দেশের আত্মজনবিয়োগে হাহাকার -'হায় অমুক, হায় অমুক'-এর মত নয়। চাপাই কি করেছে—কি করতে পারে নাই—কি করা তার উচিত ছিল, তারই বিশ্লেষণ। সেই শব্দের সঙ্গে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, জাতির গুণগান, ভবিষ্যতের আশা, আরও চাপাইয়ের ভাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

এই হ'ল আমার সারাটী বিকাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। ফিরে এলাম আপন গৃহে। বন্ধু আমার অপেক্ষায় বসে ছিল। তারই বিদেশী বন্ধুর জন্য এনে হাজির করল ক'খানা মানচিত্র। তারই কাছে চেয়েছিলাম, তাই সে কিনেছিল, ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নিলে না, হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করলে। যে হাসি আজ তার মুখে দেখলাম সেরূপ অনেক হাসিমুখ যুবক-যুবতী চীনের তরে তাদের প্রাণ হারিয়েছে আমাদেরই দেশী অনেক সৈনিকের হাতে। তাহলেও আমার সঙ্গে এ ব্যবহার কেন? তবে মনে নাই কি তাদের সে কথা, না, তারা জানে না? সবাই জানে। কিন্তু আমি যে এ দুনিয়ার পথিক, আমার জাতি যে হিন্দু। এ দুনিয়ায় যদি দরিদ্র থাকে, অসহায় থাকে তবে আছি আমি হিন্দু—হিন্দু। চীনারা শুধু শিখ এবং পাঠানদেরই বাঙ্গালী বলে, ভারতের আর যত বাসিন্দা তাদের বলে হিন্দু। কোন কোন চীনাদের মুখেই শুনেছি, "বাঙ্গালী মানুষ খায়, বাঙ্গালীই পৃথিবীর নরখাদক রাক্ষস। বাঙ্গালীদের বাড়ী ছিল পূর্ব্বে মধ্য-এশিয়ার কোথাও, চীনের হাতে অনেক মার খেয়ে পালিয়ে হিন্দুদের দেশে গিয়ে হিন্দুর রক্ত খাচ্ছে। যাদের রক্ত বাঙ্গালী আর বনের দুরন্ত জানোয়ারে খায়, সেই অসহায় হিন্দুর সাহায্য চীনের যুবক করবে না তো কে করবে?"

বন্ধুটী জানাল আজই রাতে সে বিদায় নিয়ে যাবে। দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্মৃতি-চিহ্ন কিছু রেখে যাবে না? হাঁ, রেখে গিয়েছিল

একখানা ফটো। কয়েকজন মিলে এই ফটো তুলেছিলেন, সবাই ছিলেন শিক্ষিত, শুধু সে শিক্ষিত হয় নাই। শিক্ষারহিত এ যুবক দেখা দিয়েছিল আমারই কাছে আর এক অতি বিপজ্জনক স্থানে, যেখানে সে ছিল জেনারেল হো মহাশয়ের ডান হাত। বলেছিল, হয় সাংহাই কোয়ান জাপানীদের হাত হতে রক্ষা করব, নয় মরব। মরার কথাটা বলেই বেশ হেসেছিল, বেদম হেসেছিল। তার নাকমুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিল। সাংহাই কোয়ানে যখন পৌছলাম তখন দেখেছিলাম, সাংহাই কোয়ান ধ্বংস হয়েছে, তবে সে মরে নাই। বেঁচে আছে, তবে সে বাঁচা বাঁচা নয়। সে বেঁচে আছে আরও শত শত জনের মৃত্যুর কারণ হয়ে।

"মানুষ যখন 'মানুষ' হতে পারে তখন অবতারগুলি তাদের সে মনুষ্যত্বকে আর হত্যা করতে পারেন না। চেঙ্গিস খাঁ শুধু নররক্তপিপাসুই ছিলেন, আলেকজান্দারও তাই, কিন্তু অবতারগণ মানুষের রক্ত তো অলক্ষিতেই চুষে খান, মগজটাও চিরতরে দখল করে বসেন; তাই সংসারকে শ্মশান করে রেখে যান। মানুষ বোঝে না সে কথাটি, তাই পুরাতন নিয়ে নতুনের গায়ে বসিয়ে রেখে দেয়। পরিবর্ত্তন দেখতে চায় না, চোখ বুজে থাকে, নতুন এসে নাড়া দিলেও নড়ে না।" বলেছিলেন মিঃ বব তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বল্‌বার পর।

প্রভাত হয়েছে। আমার মন আজ ভাল নয়, আমার সঙ্গী চলে গেছে। মানুষ চায় সঙ্গী। ঘুম থেকে উঠেই চা এবং খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু এরই মাঝে দরজা ঠেলে ভিতরে এল একটা কালো ভূত। ভূত বলছি কেন? তার চোখ দুটা লাল, চুলগুলি অনেকদিন হয় চিরুণী দেখে নাই, দাড়ি গোঁফ কাঁটার মত দাঁড়িয়ে আছে, মুখটা মোটা, পরণে কালোর উপর কালো স্যুট, দেখলেই মনে হয় এ স্যুট অনেকদিন চল্‌ছে। জুতা দুটা বেশ সছিদ্র, আঙ্গুল দুদিকে চারটে বের হয়ে রয়েছে। এমন অপরূপকে ভূত বললে অসঙ্গত হয় না নিশ্চয়। যাহোক 'নমস্কার' বলেই লোকটি চেয়ারটা টেনে কাছে এসে বসলেন। প্রথম কথাই হ'ল 'আপনার বাড়ী বাঙ্গলা দেশের কোন জেলায়?' 'শ্রীহট্ট' জানিয়ে প্রতিনমস্কার করে বললাম, 'অনেক দিন প'র বাঙ্গালী দর্শন।' মিঃ বব বললেন, আমি বাঙ্গালী নই,

ইণ্ডিয়ান নই, আমি 'বব'। আমার পরিচয় আমি হিন্দু। ধর্ম্ম আমার নাই, বাবা ছিলেন চাটগাঁয়ের মুসলমান, কিন্তু আমি 'বব' হিন্দুস্থানের হিন্দু। আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, ভারতে আমি যেতে পারি না। তাই আজ আমি প্রাচ্যের অসহায়ের আশ্রয়—এ শহরে স্থান নিয়েছি, এখানে ছাড়া আর কোথায় আমার মত লোক স্থান পেতে পারে!

ভদ্রলোক মনের আবেগে বলে যাচ্ছিলেন, আর আমি শুনছিলাম। শুনবার মত কথাই। যারা পরগাছার মত মাতৃভূমি ছেড়ে দিয়ে এমন করে পরের দেশে বাস করে, তারাই অমনভাবে কথা বলে যায়, প্রতিবাদ তারা শোনে না, আপনমনেই বকে যায়। যাঁরা জীবনে কোনদিন নির্জ্জন কারাবাস করেছেন, তাঁরা বুঝবেন সেই একঘেয়ে প্রলাপের কারণ; যাঁরা অনেকদিন সমাজ কর্ত্তৃক, রাষ্ট্রশক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়ে বদ্ধ গণ্ডীর মাঝে রয়েছেন তাঁরা বুঝবেন সে দেশবঞ্চিতের মর্ম্মস্পর্শী কথা। মিঃ ববের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনলাম। তখন কিন্তু জান্‌তাম না এই ভ্রমণের সময়ই আমাকে নির্জ্জন কারাবাস করতে হবে। আমেরিকার জেলে যখন দিনের পর দিন নিরালা কারাবরণ করেছিলাম, তখন একবার মিঃ ববের কথা মনে হয়েছিল, পাগলের মত হেসেছিলাম। আমার হাসি আর কেউ শোনে নাই, শুনেছিল সেই ছাব্বিশ তলা বাড়ীটার দ্বিতলের একটা ঘর, যে ঘরে তখনও দেওয়ালে কার বাঙলা অঙ্ক পেন্সিল দিয়ে কষা ছিল। তাছাড়া ঐ দেওয়ালে আরও কত ভাষায় কত কথা ছিল তার হিসাব রাখার আমার সাধ্য হয় নাই, যারা সেখানে যায় তারাই পাঠ ক'রে বোঝে বোধ হয় অন্তরে অন্তরে সেই অর্থহীন সঙ্কেত বাণী। কিন্তু আমার হাসি, আমার কথা, আমার চলাফেরা দেখে সেই কারাগৃহে আমারই ভয় হয়ে গিয়েছিল, পাগল হই নাই তো? তারপর যখন ঐ কারাগৃহ হতে বের হয়েছিলাম তখন জাহাজে পেয়েছিলাম একটি রাশিয়ানকে, সে আমার মতই অনেকদিন বন্দী ছিল। সেও বল্‌ত মিঃ ববের মত কথা, শুনতাম আমি, বুঝতাম না কিছুই। তারপর যখন আমিও বাঙলা ভাষায়, আমার ভাষায়, আমার মর্ম্মকথা বল্‌তাম শুন্‌ত সে, বুঝত কিনা জানি না। কিন্তু আজ যে মিঃ বব বল্‌তে আরম্ভ করেছেন তা বাঙালীর কাছে বাঙালীর কথা, তা আবার আমারই মাতৃভাষায়। শুন্‌ব না কেন?

গুরুদ্বারের অন্তর-বাহির

মিঃ বব বলছিলেন অনেক কথা। তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে একটির পর একটি কাফির পিয়ালা তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছিলাম, আর তিনি তা পান কর্‌ছিলেন আর বল্‌ছিলেন, "আকাশ হ'তে একটার পর একটা বোমা পড়তে লাগল। শিখরা মন্দিরটার উপর একখানা ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে কোথায় চলে গেল তার খবর নাই। আমি হিন্দু, এই মন্দির হিন্দুর, ওকে রক্ষা করা চাই। কিন্তু হাসি পেল ওদের ভগবানে, ওদের ধর্ম্মে শ্রদ্ধার বহর দেখে। 'ভগবান' 'ভগবান' বলে এরা চীৎকার করে কিসের জন্যে জানেন? দল পাকাবার জন্যে, আর তারই সুরাহার জন্যে কতকগুলি বড় লোকের কথা বার বার আবৃত্তি করে। আমি এসব দলের মধ্যে নাই, তবু কিন্তু বিপদ এল! এই ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দিলে তো চলবে না, এরোপ্লেনের লোকদের তো তা দেখা চাই? দুটা শিখকে ধরে নিয়ে এলাম বাতি আনাবার জন্য। তারা বাতি এনে দিল, বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর এদের অভয় দিলাম —তারা এখন আর মরবে না, আর যদি নেহাৎই মরে তবে নিশ্চয় স্বর্গে যাবে। বুঝলেন—বলেছিলাম স্বর্গে যাবে। স্বর্গের লালসা এদের খুব বড়, সেখানে টাকা-পয়সার অভাব নাই, ফুর্ত্তির অভাব নাই, নাচওয়ালী, যৌবন— চির-যৌবন সেখানে সদা অটুট। আর চাই কি, মরতে রাজি, কত বড় লাভটা! বাতি জ্বালিয়ে নীচে এসে দেখি, জাপানী সেনা হিন্দু-মন্দিরের ভিতরে এসে ঘাঁটি আগ্‌লাচ্ছে। চলে যেতে বললাম। কি জানি যদি চীনারা এসে দেখে হিন্দুরা জাপানীদের স্থান দিয়েছে, তা হলে বিপদ আরও ঘনিয়ে আসবে। ভাগ্যে জাপানী ভাষা জানতাম; কত বিনয় করে বললাম তাদের চলে যেতে। তারা তো যেতে প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তারপর জাপানী প্রথামতে বললাম, যদি না যায় তবে 'হারিকিরি' করব, তখন এরা চলে গেল। তিনজনে মিলে দরজা বন্ধ করে দিলাম, তারপর একরাশ বালি দরজায় এমন করে চেপে দিলাম যাতে কেউ সহসা ঢুকতে না পারে।

"ভেবেছিলাম কেউ আসতে পারবে না; কিন্তু এসে গেল চীনা সেনারা। পেশাদার সেনা নয়, সিভিলিয়ান ফৌজ। ঘরে এসে যখন তারা তিনটি

প্রাণীকে দেখল তখন ফের দরজা তারাই বন্ধ করল। চীনা ভাষায় লিখেও গেল যে, তারা যদি বোঝে জাপানী সেনা এই হিন্দু মন্দিরে আশ্রয় নেয় নাই তবে এই মন্দির তারা ধ্বংস করবে না। এই ভাবে কত চীনা কত জাপানী সেনাই একে অন্যকে খুঁজে গেল তার ঠিক নাই। কত বোমা পড়ল আশে পাশে—সব বিপদ মাথায় করেও রইলাম সেই মন্দির রক্ষা করতে ; লুঠ করতে যাই নাই, যদি যেতাম তবে আজ লক্ষপতি হতে পারতাম। কিন্তু আমার ধর্ম্ম নাই, ভগবান নাই। আমার ধর্ম্ম, আমার ভগবান, আমার ইহকাল পরকাল সবই হিন্দুস্থান। ধর্ম্ম যাদের প্রাণের জিনিষ বলে বড়াই করতে দেখা যায়—তারা কি করেছিল শুনবেন। ঐ যে বৌদ্ধ বিহারের শান্ত সৌম্য আওতায় রয়েছেন ধার্ম্মিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নির্ব্বাণের প্রয়াসী ভিক্ষু আমাদেরই এক দেশীভাই—তাঁর কীর্ত্তি বলছি। চীনাদের তিনখানা পরিত্যক্ত মোটরকার রংচং করিয়ে, নতুন নম্বর লাগিয়ে বাজারে আপন নামে চুলচেরা হিসাবে দর কষে বিক্রি করলেন। সে হল ধার্ম্মিক, সে হল নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী। লোকে তাকে ধার্ম্মিক বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু সেই লোকরাই পরম নির্ভীকতায় পরধন লুণ্ঠন করে আপন করে নিয়েছে! ধম্ম ধর্ম্ম, ভগবান ভগবান, এসব হ'ল ভড়ং—পরের সর্ব্বস্ব হরণের এক একট অস্ত্র বিশেষ।"

মিঃ বব হাস্তে লাগলেন, যেমন পাগলে হাসে। আমিও ভেবেছিলাম লোকটি পাগলই হবে, নতুবা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জন্মমরণের নিয়ন্তা, আর তাঁর প্রচারক, প্রেরিত পুরুষদের নামে এত কলঙ্ক রটাবে কেন? ভগবান দয়াময়, তাঁর নামে এত বিদ্বেষ পোষণ করে কেন? কিন্তু ববের মত অবস্থা হ'লে, আত্মশক্তির বিকাশ হ'লে, মানুষ যে কত বড় হয়ে যায়, যেদিন এক ফরাসী বৃদ্ধের (নাম বোধ হয় তার "রোমাঁ") সঙ্গে একত্র বসে কথা বলেছিলাম বুঝেছিলাম সেদিন। নাম মনে নাই কারণ এত বড় লোককে আমায় খুঁজে বের করতে হয়নি।

মিঃ বব আমার আগমন-বার্ত্তা একজন বার্ত্তাজীবীর মারফত পেয়েছিলেন। যখন তাঁর কথার ফোয়ারা অনেকটা নিঃশেষ হয়ে এল, তখন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চাপাই অঞ্চল দেখতে বের হলাম। মিঃ ববকে নিয়ে পথে বেড়াতে ইচ্ছা হ'ল না, ভয় হ'ল কি জানি কোন্ অজানা বিপদ ঘাড়ে এসে চাপে।

সাংহাই স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র সত্য কথা, কিন্তু সকলের জন্য নয়। যারা নিজের দেশ চিরতরে পরিত্যাগ ক'রে এসেছে তারাই এখানে স্বাধীন। তারা আপন আপন সরকারকে তো গালি দিচ্ছেই—যে কোন সরকারকে যে কোন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে কসুর করছে না। মিঃ বব যে সেই দলের লোক তা অনেকটা বুঝা গেল।

একটা কথা সকলেই জানেন যে, এত বড় একটা শহরে যেখানে নানা ভাবের গুপ্তমন্ত্রণা চলে সেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেদের গুপ্তচর রাখে। এই নগরীতে নানাদেশীয় গুপ্তচর আমার নজরে এসেছে। তাঁদেরে আমার খুঁজে বের করতে হয়নি, তাঁরাই দয়া করে আমার অস্থায়ী আস্তানায় এসে কথা কয়ে গেছেন—নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। কথাবার্ত্তা শুনে যখন বুঝতে পেরেছেন আমার মত লোকের দ্বারা কারও উদ্দেশ্যেরই সাহায্য হবে না, তখনই কল্পিত মস্তবড় শিকার ছেড়ে দিয়ে তাঁদের চলে যেতে হয়েছে। লোকে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করে। যারা ক্যানভাসার কিম্বা বেতনভোগী পর্য্যটক তাদেরই মত ও পথ ঠিক থাকে। কিন্তু যারা আমার মত একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে চলে, তাদের মতের ও পথের পরিবর্ত্তন হয় নব আবেশের আবর্ত্তে প'ড়ে। ভ্রমণ যাদের উদ্দেশ্য, তাদের মত ও পথ কি করে পরিবর্ত্তিত হয় আজ তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রবল বাসনা নিয়ে জনকোলাহলপূর্ণ পথে এসে দাঁড়ালাম, আজ চাপাই শহর দেখব। সিচুয়ান রোড ধরে ইণ্টারন্যাশন্যাল সেটেলমেণ্টের ভিতর দিয়ে চললাম। নানারূপ দৃশ্য পথে পড়ল, কিন্তু এখন সে বর্ণনার প্রয়াস করব না। কারণ এই দৃশ্যের কথা বহু প্রচারপত্রে পাওয়া যাবে। হ্যাংকিউ ক্রীক পার হয়েই পড়লাম চাপাই অঞ্চলে। দু'দিকের অনেক বাড়ী তখনও নিখুঁত ছিল। ক্রমে এলাম ঐ পথে যেখানে হিন্দু মন্দির এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঐ পথটা ধরে চললাম কমারশিয়্যাল প্রেসের বাড়ীর দিকে। যদিও আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি মাত্র, তবুও দেখতে পেয়েছিলাম সে দৃশ্য,—বহু দূর পর্য্যন্ত যেদিকে তাকান যায় একটি বাড়ীও আপন ভিত্তির উপর খাড়া নাই, সবই ভূমিসাৎ হয়েছে। উপর থেকে বোমা ফেলে এত অল্প সময়ের মধ্যে যে অত বড় একটা শহর ছারখার করা যায় তা আমার ধারণাই ছিল না।

এগিয়ে গিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম—সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে কত নরনারী ঘরে পচে আছে, কিন্তু জাপানী পুলিশ এসে আমাকে বাধা দিলে। তার কথা মানতে চাইনি, কিন্তু সে বুঝিয়ে দিলে, যদি এই পচা নরদেহের মাঝে অনেকক্ষণ থাকি তবে আমার অসুখ করবে, হয়ত মরতেও পারি। মৃত্যুভয় কার না হয়, তারপর যদি তা হয় আবার বিনাকারণে। এই চীন জাপান "বিবাদের" নমুনা দেখে ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। একটু পরিষ্কার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দুজন চীনা যুবক এসে আমাকে পরিষ্কার ইংরেজীতে যে সব কথা জিজ্ঞেস করেছিল তা ঠিক ঠিক তাদের কথায় না বললে বোধ হয় বলে উঠতে পারব না। তারা বললে,—

"You see Mister how cruel are these Japanese. We are Roman Catholic Christians, we feel shame to witness such cruel actions."

তখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম একটি চিহ্নিত স্থানে। সেই স্থানে অনেক জাপানী চীনা-'বারবনিতার' চোরাগুলীতে প্রাণ হারিয়েছিল। এই বিষয়টিই ভাবছিলাম। মনে করেছিলাম—এই দুইটি চীনা যুবক হয়ত বলবে, এই পথের কোথায় তাদেরই কোন আত্মীয় মরেছে। কিন্তু তা না বলে বল্‌ল, আমরা 'খৃষ্টান' তারপর তাদের বিশেষত্ব 'আমরা রোমান ক্যাথলিক'। যেন তাদের শরীর হতে চীনাত্ব লোপ পেয়ে গিয়ে তা ভ্যাটিক্যানের পোপত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। চোখে প্রেম-বারির প্রস্রবণ বইছে। ওদের সঙ্গে বেশী কথা বল্‌তে ইচ্ছা হ'ল না। শুধু বলে দিলাম, "মরেছে এখানে চীনা এবং জাপানী, ইটালীয়ান কেউ মরে নাই যে আপনাদের অশ্রুপাত করতে হবে। লজ্জাকর কাজটি দেখছি আমি, আমি একজন ভারতবাসী, চীনদেশ আমার বাড়ীর কাছে, তাই আমার এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার আছে। আমি ভেবে দেখব এই কাজটি লজ্জাকর, কি আনন্দদায়ক। আপনারা ইটালিয়ান, আপনাদের তাতে কিছু আসে যায় না। জাপানীরা এখনও রোম জয় বা ধ্বংস করে নাই।"

আমার এই শ্লেষপূর্ণ বচন শুনে যুবকদ্বয় বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে নাই;— পালিয়ে গেল, তলিয়ে গেল লোক-সমুদ্রে। চীনা যুবক দুটি তো সামান্য সাধারণ জীব, এই চীনদেশে যতদিন ছিলাম এক অধ্যাত্মবাদী ছাড়া যিনিই

আমার কাছে কোন ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করেছেন, তাঁরই মুখোস খুলে দিয়ে তাঁর স্বরূপ বের করে দিয়েছি। তার জন্যে কোথাও কোনরূপ অপমানিত হতে হয় নাই, যদিও কতকগুলি নরপশু আমার হত্যার ফিকিরে ছিল। কারণ, আমি তাদেরই ধাপ্পাবাজির প্রচারকগুলির বিপক্ষে অনেক কথা বলেছিলাম।

দুধের দালালও ধর্ম্মপ্রচারক হয়—চীনদেশেই তা সর্ব্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলাম। যেদিন সেই দুধের দালালকে প্রচারকরূপে বাজারে দেখি, সেদিন হতেই বুঝতে পেরেছিলাম—এই চীনদেশেও হরেক ধর্ম্মের ভোলে ভুলিয়ে বেশ অত্যাচার চলেছে আর চীনের সর্ব্বসাধারণ সে অত্যাচার মাথা পেতে বহন করছে। পূর্ব্বে ভাবতাম শিক্ষা মানুষকে শুধু মানুষই করে। কিন্তু এই শিক্ষাই যে মানুষকে সেয়ানা পাপী করে ফেলে তাও লক্ষ্য করেছিলাম অনেক অনেক স্থানে। তবে এখন চীনদেশ সম্বন্ধে কথা বলছি ব'লে এখানকারই এরকম কয়েকটি উদাহরণ খুঁজে বার করব। আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ান কায়দায় লেখা-পড়া শিখে যখন যুবক-যুবতীর দল তাদের দৈনিক খরচের চাহিদা মিটিয়ে উঠ্‌তে পারে না, তখন কেউ কেউ নতুন অভ্যাস ত্যাগ ক'রে পুরাতনে ফিরে গিয়ে নিজের মান-ইজ্জত বজায় রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে পড়ে। এরূপ যুবকগণ সাধারণতঃই শিক্ষা-বিভাগে আত্মনিয়োগ করে। তাদের দৈনন্দিন আয় এবং ব্যয় ভাল করে হিসাব করে দেখলে—দেখ্‌তে পাওয়া যায়, উভয় ঘরেই শূন্য। এ কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে দেখেছি, হঠাৎ এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল যিনি নানা ভাষায় এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অথচ তাঁর জীবন সাধারণ লোকের মতই। এই শ্রেণীর লোককে অবশ্য গ্রাম্য স্কুলেই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের মাইনে নাই। তাঁরা ছেলেমেয়েদের অভিভাবকের পরিবার-ভুক্ত থাকেন এবং পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। যত পর্ব্ব আছে তাতে তাঁরা দরকারী পোষাক পেয়ে থাকেন। আর চাই কি? এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে শিক্ষার উন্নতি ক'রে সাধারণের এরূপ শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন যে, মনে হয় গ্রামশুদ্ধ লোক যেন তাঁদের কেনা গোলাম। গ্রামের পথ-ঘাট হতে আরম্ভ ক'রে মামুলী বিচার-আচারও পাঠশালার শিক্ষকের আয়ত্তাধীন। এরূপ একটি পাঠশালার শিক্ষকের পদোন্নতি হতে হতে শেষটায়

একজন প্রাদেশিক গবর্ণর পর্য্যন্ত হয়েছেন। অবশ্য সেই পদটি কেন্দ্রীয় সরকার হতে উমেদারী করে পান নাই, কেন্দ্রীয় সরকার "ছুং" পরিবার হতে কেড়ে নিয়ে সে পদটি এঁকে দিয়ে দিয়েছেন, এতে দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়েছে ঢের। যখন ছুং পরিবারের কথা বলা হবে তখন এই জেনারেলের নাম আপনি এসে যাবে। ঐ পাঠশালাগুলি কিন্তু ভারতীয় পাঠশালার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। পরিদর্শকগণ তথায় যান না, যাবার দরকারও নাই। গেলে পাত্তাও পান না। চীনারা আজকাল দায়ে পড়ে মানুষ হতে শিখেছে। পূর্ব্বে চীনারা এই শিক্ষিত সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখত। কিন্তু যখন দেখল তাদের পেটে হাত পড়েছে, বাঁচবার আর উপায় নাই, তখন ধর্ম্মযাজকদের উপর আর নির্ভর ক'রে থাক্‌তে পারল না। ধর্ম্মযাজকদের বুলি ছিল, "ভাগ্যে নাই, তাই আজ খাওয়া মিলে নাই, ভাগ্যের দোষে আজ অমুক না খেয়ে মরল, ভাগ্যের দোষে অমুক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।" এসব ধোঁকার টাটি আর কতদিন চলে! যখন শিক্ষিত যুবকগণ সাদাসিধে বেশে শহর ছেড়ে গ্রামে এসে এদেরকে বুঝাল—এসব ভাগ্যটাগ্যের উপর নির্ভর না করে ভগবানের দেওয়া নাকমুখচোখাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহার কর; দেখতে পাবে—কল্পিত ভাগ্য বুদ্‌বুদের মত উড়ে যাবে হাওয়ায়! যখন এরা কাজে ক'রে এসব দেখিয়ে দিলে, তখন গ্রামের লোক বেঁকে বসল দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে—তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহকেই আজ জাপান বলছে কমিউনিষ্ট আন্দোলন; পাদ্রি বল্‌ছে—ধর্ম্মের লোপ; মোল্লা বল্‌ছে—কাফেরী। কিন্তু চীনের লোক আজ এই শিক্ষিত সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ এ পথে এসেই তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষিতের ভিতর চাকুরি যাদের জুটল না, শহর ছেড়ে যেতে যাদের সাহস হল না, তারা পড়ে রইল—ঐ আঁস্তাকুড়ের মধ্যে। তারপর তাদের দৈনিক খরচতো আছেই। খরচ আছে—আয় নাই, ঋণের দায়ে লজ্জায়-ভয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল যে যেদিকে পারে। ওদেরে কুড়িয়ে নিল ধর্ম্মযাজকের দল, কেন্দ্রীয় সরকারের লোক, আরও কত কে কুড়াল—কে জানে। উদ্দেশ্য ওদের মারফত চালাবে প্রচার—গোপন ও প্রকাশ্য, সব রকম। তার খবর যতটুকু শুনেছি, সত্য বলে অনুভব করেছি, এর বেশী বলতে পারব না। যাদের

শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা, লোকসেবা, অভাবের তাড়নায় ক্ষণিক সুখের মোহে তারা তাতে জলাঞ্জলি দিলে। ওদের অভিযানও চলেছিল গ্রামে গ্রামে, কিন্তু এরা ভাড়াটে। যারা কল্পিত কষ্টের ভয়ে কেঁপে ওঠে, সত্যিকার ত্যাগব্রত থেকে দূরে সরে যায়, তারা ভাড়াটে হয়ে কি কাজ করতে পারে? তারা গ্রামে থাকতে পারল না, ফিরে এল শহরে। কেউ হ'ল রোমান ক্যাথলিক, কেউ হল গোয়েন্দা, আরও কত কি। রোমান ক্যাথলিক ভায়ারাও এই দলের।

ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—বিরাট চীনজাতির জীবন-মরণের সন্ধিস্থল। চীনা যুবকযুবতীর বীরত্ব-গাথাও মনে এল। তাঁদের স্বদেশ রক্ষার—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রতিজ্ঞার কথা কখনও ভুলব না।

মিঃ ববের রক্ষিত সেই হিন্দু মন্দির দেখার ইচ্ছা হ'ল, তাই মন্দিরে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম—কয়েকজন শিখ বসে আছেন, আর গল্প করছেন। এত বড় একটা শহরের ইঁট চুন সুরকী কি ক'রে এক হয়ে গেল আমি তাঁদেরই কাছে বসে নতুন মানুষ না সেজে কথায় যোগ দিলাম। মিঃ ববের কথা তুললাম। মিঃ ববের কথাটা পাড়তেই একজন বলে উঠলেন, 'কি চালাক সে বাঙ্গালী, কত তাড়াতাড়ি একটা বিরাট ইউনিয়ন জ্যাক তৈরী করল, তারপর তুলে দিল মন্দিরের উপর! এত তাড়াতাড়ি আমাদের দ্বারা কাজটি হওয়া সম্ভপর ছিল না। মন্দিরটি তার দ্বারাই রক্ষা পেয়েছে, মাত্র একটি কোণ তার বাঁচে নাই,—ওখানটায় একটা বোমা পড়েছিল। দেখা যাবে এখন এর জন্যে টাকা দেয় কে—জাপানী না চীনা!' একজন বললেন, 'সমুদায় মন্দিরটা ভেঙ্গে গেলে বেশ মোটা টাকা পাওয়া যেত, নয় কি? এই বাঙ্গালী লোকটাই বাদ সাধল, এল কেন সে মন্দিরটা বাঁচাতে? লোকটা নাকি আবার বলে কোন ধর্ম্ম মানে না; অথচ মন্দির রক্ষার বেলা সে-ই প্রাণ দিতে এল!' কথা বলার বিষয়টি পরিবর্ত্তন হ'ল, আমার পিছনে এরই মধ্যে একজন ফেউ লেগে গেছেন। ইনি বললেন, "হাঁ আপনারই তো নাম রামনাথ বিশ্বাস, না?" বললাম, "আজ্ঞে হাঁ"। আমার কথাবার্ত্তা শুনে ও ভাব-ভঙ্গী দেখে লোকটার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কেন? যারা পরের দাস হয়ে অপরের

সর্ব্বনাশ কর্‌তে আসে, পাপের বোঝা তাদেরই বহন করতে হয় অষ্টপ্রহর, তাই। তারা কোন দিন মাথা উঁচু রাখ্‌তে পারে না বেশীক্ষণ, তাড়াতাড়ি মাথা নত করে ফেলে। গুরুদ্বারের লোক আমার পরিচয় চাইল, পরিচয় দিলাম। তারপর তারা যে কথাবার্ত্তায় আমারই সামনে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে সেজন্য ক্ষমা চাইল। একজন উঠে এসে গুরুদ্বারের বিধ্বস্ত অংশটি আমাকে দেখিয়ে দিল। দেখলাম বেশী ক্ষতি হয় নাই বললেই চলে, সামান্য যা হয়েছে দশ ডলার খরচ করলেই তা মেরামত করা যাবে। কিন্তু এই দশ ডলারের পরিবর্ত্তে কত শত ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়েছে তা কে জানে? বৃটিশ কন্‌সালের বাড়ীতে গিয়ে কত রকম আবেদন নিবেদন করেছে তা তো স্বকর্ণেই শুনেছি। আসবার বেলা বলে এলাম,—এই সামান্য ক্ষতির জন্য চীনা বা জাপানী কারও নিকটে আবেদন-নিবেদনের প্রয়োজন নাই, চুপচাপ থাকাই ভাল। কিন্তু তা কি হয়? কবে বৃটিশ কন্‌সালের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী পেশ করা হয়ে গেছে।

জাপানী সেনাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে বেশ বুঝেছিলাম, বাগে আনা যাবে চীন সরকারকে—জাপানীদের নয়। হাজার আবেদন-নিবেদন হোক না কেন, সে-সব থাকবে জাপান সরকারের নথিবদ্ধ হ'য়ে। যখনই জাপানী সৈনিক পথের মাঝ দিয়ে চলে তখনই সবাই সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। এমন কি ইউরোপীয়ানরা পর্য্যন্ত ভয়ে যেন অস্থির,—আবার কখন কি ঘটাবে। এদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই যেন মঙ্গল। কিন্তু ধন্য বাঙ্গালী সেপাই—পাঠান আর শিখ। তারা নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পথের মাঝে। তারপর তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এটাও বুঝেছি, বৃটিশ-সরকারের হুকুম পেলে তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়তও—সঙ্গে নিয়ে আসত ঐ গদরদের পর্য্যন্ত। কারণ এরূপ করে মানুষকে মেরে ফেল্‌তে দেখলে আধমড়ারও রক্ত চঞ্চল হয়—মেরে মরতে ইচ্ছা হয়। যখন জাপানে গিয়েছিলাম—তখন জাপানীরা আমার কাছে ঐ শিখ এবং গুর্খাদের খবর নিত। কেন নিত তারাই ভাল বোঝে, তবে আমার মনে হয় দরকার না থাকলে কেউ কারও সংবাদ নেয় না।

ইউথ্ লীগ

গুরুদ্বার হতে ফিরবার পথে শিখ যুবক একটি এসে বল্লেন,—বহু কষ্ট করে যখন দেশ থেকে এতদূর চীনমুলুকে এসে হাজির হয়েছেন, তখন একবার আমাদের 'ইউথ্ লীগে'র বাড়ীটিতে পদার্পণ কর্বেন না? এমন দিনও ছিল যে সময় এ গৃহচূড়ে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়ে আকাশের গায়ে দাগ কাট্‌ত। আজ আর সেখানে জাতীয় পতাকা নাই। জাপানী গোলার দাপটে উপরতলাটার বেশীর ভাগই ভেঙ্গে গেছে, তবে নীচেকার তলায় এখনও বসবাস করা যায়। নিদারুণ গোলাগুলী বর্ষণের ভিতরও আমরা জাতীয় পতাকার গরিমা অম্লান রেখেছিলাম, কিন্তু পরে যে কারণে চীনারা সাংহাই নগরী ফিরে পেল না, সেই কারণে আমরাও লীগের এ-অট্টালিকা থেকে বেদখল হয়েছি। আজ এ-বাড়ী জাপানীদের কড়া নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাতেও গোড়ায় আমরা তেমন হতাশ হই নাই, কিন্তু তখনও জাপানীদের স্বরূপ আমাদের কাছে অজানিতই রয়ে গিয়েছিল। জাপানীদের ভাল করেই চিনে নিলাম আমরা সেদিন—যেদিন এ জাতীয় ভবন থেকে তারা আমাদের জাতীয় পতাকা টেনে ফেলে দিল।

যুবকটির সঙ্গে যেতে হল বাড়ীটি দেখতে। দেখলাম—বাড়ীটা যে একেবারেই বাসের অযোগ্য হয়েছে, এমন নয়; ইচ্ছা করলে থাকা যায় একরকম আরামেই। কিন্তু থাকবার আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল করবার হাত জাপানীদের।

যুবকটিকে বল্লাম,—ভায়া, আমি ঈশ্বরভক্ত নই, দেবদেবী অবতার পীর-পয়গম্বর—এ সবকে ভক্তি করতেও শিখি নাই। স্ত্রী-পুত্র চেলা-চাপাটি নিয়ে আড্ডা গেড়ে যে সব ঘর-বাড়ীকে তাঁরা পবিত্র করেন, সে-গুলার ইঁট-চুন-সুরকীর উপাসকও আমি নই। সেই হিসাবে এ বাড়ী দেখেও আমার পক্ষে ধন্য হবার কারণ কিছুমাত্র নাই—যেমন ক্ষুব্ধ হবারও নাই। একদিন জাতীয় পতাকা ছিল, তাই এর কাছে মস্তক নত কর্‌তে হবে, আর এখন নাই সেজন্য আপশোষে বুক ফাটাতে হবে, এমন মনোবৃত্তির দাস আমি নই। আমি যদি আপনাদের মত এ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হতাম, তবে হয়তো আশপাশেরই

অন্য একটা বাড়ীতে জাতীয় পতাকা ওড়াবার চেষ্টা করতাম এবং যে দুর্ব্বলতার মোহে জাপানীরা এ অসঙ্গত কার্য্যটি করেছে, তাদের সে মোহ দূর করতে চেষ্টা করতাম।

শিখ যুবকটি আমার কথা শুনে যেন আঁৎকে উঠলেন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন,—তবে আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন না ?

না হেসে থাকতে পারলাম না। সারা দুনিয়ায় আমার মত কত শত জীব 'ভগবান' 'ভগবান' করে কত শত রকমের গবেষণা করে গেছেন, কিন্তু কেউ তাঁর ঠিক-ঠিকানা কিছু বলে যেতে পারেন নাই। এমন অনির্ব্বচনীয়কে বিশ্বাস করা না-করা দু-ই আমার কাছে সমান। তাই শিখ যুবককে বল্‌লাম,—'মিছে বাজে কথা বলে আমি আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না, আর কিছু দেখবার থাকে তো চলুন।' যুবকটি মাথা নত করে রইলেন, মনে হ'ল কোথায় যেন তাঁর আপত্তি রয়ে গেছে। তাঁর সে অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হল। তাই প্রবোধ দিয়ে বললাম,—ভাই, আমি পর্য্যটক, আমার ভগবান আমিই নিজে। আর তাতে যদি সুখী হতে না পার, তবে তুমিই আমার ভগবান, জেনো।

তাঁর মন পরিষ্কার হ'ল, তখন দুজনায় মিলে ছোট একটি প্রাইভেট শিখ হোটেলে ঢুকে বেশ করে ডাল-রুটি খেয়ে নিলাম। তারপর তাঁর নির্দ্দেশে একখানা রিক্সা ভাড়া করে একটি 'কাবেরে' দেখ্‌তে চল্‌লাম।

'কাবেরে'

'কাবেরে' শব্দটি কোন্ ভাষার তা বল্‌তে পার্‌ব না, সে-সব খোঁজ-খবর নেবার মত ফুরসৎ আমার কই! তবে যা দেখেছি, তা-ই বল্‌ব আর তাতেই তার মর্ম্মকথাটি ফুটে উঠ্‌বে, ভাষার সন্ধান না-ই বা হল। বাড়ীখানি সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে। দ্বিতলে প্রকাণ্ড একটা 'হলঘর', চারিদিক রুদ্ধ, বাইরের আলো আসবার অধিকার দেওয়া হয় না। ভিতরে বিজলী বাতি যেন হেসে সারা হচ্ছে। কতকগুলি লোক ইউরোপীয় কায়দার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এক কোণে বসে আছে। হলঘরটির অন্য এক পাশে ভদ্রবেশী মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়েই মহা ফুর্ত্তিতে লাল সিরাজী পান করছেন। তাঁদের কাছেই পাউডার-মাখা মেয়ে-মানুষ একদল—শ্রম-কাতর দেহলতা তাদের চেয়ারে এলায়িত। তারাও মাঝে মাঝে সোনালী শ্যাম্পেনপূর্ণ পানপাত্রে চুমুক দিচ্ছে আর মদির আঁখি হতে কটাক্ষ হান্‌ছে। সহসা বেজে উঠ্‌ল ইউরোপীয় একতান বাদ্য। নর্ত্তকীর দল সার দিয়ে দাঁড়াল—ভদ্রবেশীরা এগিয়ে এসে যে যার মনোনীতকে আঁকড়ে ধরলে—তারপর চল্‌লো যুগলে যুগলে নৃত্যহিল্লোল হলঘরের ঠিক মাঝখানটায়। নাচের ধাঁজ ঠিক ইউরোপীয় 'বল্'-নৃত্যের মত। কিছুক্ষণ সে নৃত্য দেখলাম, নর্ত্তকীদের লক্ষ্য করলাম, ভদ্রবেশী নর্ত্তকদেরও নিরীক্ষণ করলাম—তারা সবাই চীনা। আর বসে এ দৃশ্য দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌ল না। শিখ যুবকটিকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। বাইরের মুক্ত হাওয়ায় পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যুবকটিকে বল্‌লাম,—বেশ দেখিয়েছেন মশাই, ধন্যবাদ আপনাকে, কি তোফা নাচ! তবে এখন বিদায়, শরীরও আমার অসুস্থ, অন্য এক সময়ে এসে দেখা করব এবং ত্রিশ সেণ্ট মূল্য দিয়ে আবার যাতে আপনাকে এ অমরাবতীতে প্রবেশ করাতে পারি, তার ব্যবস্থা আমিই করব, আপনার নিমন্ত্রণ রইল। শিখ যুবকটি ম্লান মুখেই বিদায় নিলেন।

এ কি দেখলাম! নব জাগরিত চীনের বুকে এ কি স্বপ্নমায়া! একদিকে মৃত্যুদেবতার হুহুঙ্কারে চাপাই অঞ্চল অহরহ থর্ থর্ কাঁপছে। পিতৃহারা, মাতৃহারা, পুত্রকন্যাহারা, সর্ব্বস্বহারা চাপাইবাসী নরনারী মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, একবেলার অন্নসংস্থানও তাদের নাই। এই বুভুক্ষুর দল শহর তোলপাড় করে তুল্‌ছে, কেউ কারু দিকে তাকায় না। বাপ-মা ভাই-বোন হারিয়ে কোলের শিশু পথে গড়াচ্ছে, কে তার দিকে নজর দিবে! তার উপর চীন সরকার এখনও ঠাউরে উঠতে পারছে না কাকে তারা বরণ করে নেবে সর্ব্বনিয়ন্তারূপে—মিঃ ওয়াংচি ওয়াই'কে, না—চ্যাং কাইশেককে! আর অন্যদিকে সাদা রাশিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চীনা ধনিকের দুলাল-দুলালীরা—তারা যেন এ চরম দুরবস্থাকে পরিহাস করে 'কাবেরে'-গুলিতে দিনরাত সমজ্ঞান করে মাদকতার আনন্দে বিভোর হয়ে শুধুই নৃত্য করছে; তা দেখে আর কেউ না হাসুক, অন্ততঃ মুখ ভেংচে হাস্‌ছে জাপানী। কারণ এ তো প্রমোদ-বিলাস নয়, এ যে জাতির কর্ম্মনাশা পতনের পথ।

বীভৎস দৃশ্য দেখে ঘরে ফিরে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়লাম। ভেবে স্থির করতে পারছি না—এ শহরে আরো কিছুদিন থাকব, না এখনই চলে যাব! আর এখন যাবই বা কেমন করে? শরীর অপটু, মন চঞ্চল—কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারছি না। এদিকে জুতা ছিড়ে গেছে, হোটেলের ভাড়া দেওয়া হয় নাই। ভাবনা-চিন্তায় কূল-কিনারা কিছুই পেলাম না, যন্ত্রচালিতের মত শয্যা গ্রহণ করলাম।

সারাটা বিকাল বেশ ঘুম হল, দেহও বেশ হালকা বোধ হ'ল, মনটাও যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। চাপাই অঞ্চল দেখা হয়ে গেছে, এবার দেখতে হবে—উজাং কেল্লা। প্রবেশ করতে পারব কি? শুনছি জেনারেল চেন নাকি ওটাকে একেবারে ধ্বংস করে রেখে গেছেন; তাই দেখবার জন্যে কৌতূহলটা যেন আরো একটু বেড়েছে। কিন্তু হাতে যে টাকা আদপেই কিছু নাই, এবার টাকার সংস্থান না করলেই নয়। আর তার একটি মাত্র উপায়ই রয়েছে, সেটি হ'ল ভিক্ষা—অথচ সেই ভিক্ষা করতে হবে আমাদের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব হিন্দুদেরই কাছে। চীনে বাঙ্গালী যদিও সংখ্যায় বেশী, তবু মাইনে তাদের কম, কাজেই অবাঙ্গালী হিন্দুদের কাছে ছাড়া অন্যত্র হাত পেতে কোন লাভ নাই। মিঃ নায়ারের এক বন্ধু আছেন, নাম মিঃ রাও। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মডেল তৈরী ক'রে বিক্রি করেন, তাতে তাঁর বেশ দু-পয়সা লাভ হয়েছে এবং এখনও হয়। কারণ প্রত্যেকটি মডেল হাজার হতে দেড় হাজার ডলার পর্য্যন্ত দামে তিনি বেচেন। তাঁর কাছেই পরামর্শ গ্রহণ করতে বের হয়ে পড়লাম। এক জাপানী মদের দোকানে তাঁর সঙ্গে দেখা হল, আসাই বিয়ার পান করে শিবনেত্র হয়ে বসে আছেন তিনি। আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে তাঁর খুবই আনন্দ হ'ল। তৎক্ষণাৎ দুই বোতল বিয়ারের আদেশ দিলেন। আমি যেন কোনরকম উত্তেজক পানীয় না গ্রহণ করি—ইহাই ছিল কবিরাজের আদেশ। তাই আমার আর বিয়ার পান করা হ'ল না। মিঃ রাও চটে গিয়ে বললেন,—এই করে বুঝি স্বরাজ লাভ হবে? যে ভদ্রলোক বিয়ারের মাদকতায় বুঁদ হয়ে আছেন, তাঁর খাম-খেয়ালী উপদেশ শিরোধার্য্য করা বাতুলতা মাত্র। পরামর্শ করা হ'ল না, বাসায় ফিরে এলাম। সামান্য যে ক'টি পয়সা হাতে ছিল তাও গেল। চা-পানের সম্বল অবধি রইল

না। মাথা নত করে সেদিনের একখানি সান্ধ্য ইংরেজী দৈনিক পাঠ করতে লাগলাম।

দরজায় ঘা পড়ল। খুলতে হল, প্রবেশ করলেন—তিনটি তরুণী আর এক তরুণ। সমাদর করেই তাঁদের বসালাম। কিন্তু অভ্যর্থনার যোগ্য একটি সিগারেট পর্য্যন্ত ছিল না। নিজের দরিদ্রতা গোপন করে রাখবার জন্য চাতুরী খেলা আমার কোনদিন অভ্যাস ছিল না, আজও নাই। একজন তরুণী আমার অভাব বুঝে নিলেন, কারণ অন্যবার যখনই তাঁরা এসেছেন নিজ হাতে কাফি তৈরী করে নিজেরাও খেয়েছেন, আমায়ও খাইয়েছেন। কিন্তু আজ কাফি নাই, চিনি নাই, রুটি নাই—কিছুই নাই। যুবতী দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন,—আমি এখুনি আস্‌ছি, কি মজা করি দেখুন না! তরুণ তাকে বাধা দিলেন। আমি যখন এর কারণ জান্‌তে চাইলাম, তখন কিন্তু প্রথমটায় কেউ কিছু বল্‌লেন না। তবে একটু পরে যুবক আর না বলে থাকৃতে পার্‌লেন না, সোজাসুজিই বলে ফেল্‌লেন,—ধার যদি চান্ তো আমি দু ডলার পর্য্যন্ত দিতে পারি। কৃত্রিম সঙ্কোচকে তাড়িয়ে দিয়ে যুবকের প্রস্তাবে আমি অবনত মস্তকে সায় দিলাম। ধার পাওয়া গেল। দশ মিনিটের ভিতর দরকারী জিনিষ সব এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হলেন একজন বাঙ্গালী, তাঁকে বহু পূর্ব্ব হতেই আমি জানতাম। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই মিঃ ববের মত অনর্গল কথার ফোয়ারা ছুটাতে লাগলেন। কথাগুলো শুন্‌তে সবাইকে ইঙ্গিত করলাম। চীনা তরুণ-তরুণী নবাগতের বাংলা বুলি একটুও বুঝ্‌লেন না। যুবক-যুবতীদের কাছে তাঁর নাম না বলে ফেলি এজন্য নবাগত আমায় আগেই হুঁসিয়ার করে দিলেন, কারণ তিনি আমার পূর্ব্বপরিচিত, তাঁর নাম আমি জানি। তাই এঁদের কাছে পরিচয় দানের বেলায় তাঁকে আমি মিঃ কানাবাবু আখ্যা দিলাম। কিন্তু আমার এ স্বদেশবাসী বন্ধুটি সে নাম নিতে রাজি হলেন না। তখন তাঁকে একটু হিত উপদেশ দিলাম,—দেখুন আজ আমি লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করেছি, যদি না ত্যাগ করতাম তবে আজ আপনি আমার ঘরে কাফি পেতেন না। কানাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন,—লজ্জা ছাড়া আপনার বহু পূর্ব্বেই উচিত ছিল। এখনও যে তা বুকে আঁকড়ে রেখেছেন সেজন্য আমি মোটেই আপনার তারিফ্ করতে পারি না। কতকগুলি আহাম্মোক নিজেদের মানুষ

বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব্ব অনুভব করছে, আর সেই মানবতার বাহাদুরী শুধু আপন ভাইদের উপরই বেশী করে ফলাচ্ছে। শিক্ষিত বলে গৌরব বোধ, মানুষ বলে পরিচয়-দানের স্পর্দ্ধা অন্ততঃ আমাদের পরাধীন ভারতবাসীর করা উচিত নয়। তখনই আমি বন্ধুটিকে স্মরণ করিয়ে দিলাম,—তবে কানাবাবু বল্‌লে চটেন কেন? আমরা তো চোখ থাকতেও অন্ধ। কথার রেশে আমরা দুজনেই হাসির রোল তুললাম। কিন্তু কানাবাবুটি বেশীক্ষণ আর আমাদের মজলিশে বসে থাকতে পারলেন না, তাঁকে যে ছেলে পড়িয়ে গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে হয়। তিনি বিদায় নিলেন, বল্‌লেন আর এক দিন আসবেন।

তরুণীরা চীনা ভাষায় নিজেদের ভিতর কি একটা যেন মতলব এঁটে আমায় বল্‌লেন,—চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিব। আপনি পথিক, আপনার লজ্জিত হবার কোন কারণ নাই। আমাদের হাজার হাজার ভাই বোন আজ বিপাকে পড়ে নগ্ন, বুভুক্ষু। তাদের জন্য সাধ্যমত সাহায্য ভিক্ষা করে বেড়াতে তো হচ্ছেই, তার সঙ্গে না হয় আপনার জন্যও কিছু কর্‌লাম। দেখে নিন, শিখে নিন, দেশে গিয়ে বল্‌তে পারবেন—চীনের যুবতীরা আর লোহার জুতা পরে অকর্ম্মা হয়ে বসে থাকে না, তারাও যুবকদের মতই কাজ করতে শিখেছে।—বেরিয়ে পড়লাম তাঁদের সঙ্গে। তরুণটি রইল আমার ঘরে বসে।

মেয়েদের সঙ্গে পথ চলার অভ্যাস নাই, কিন্তু আজ চল্‌তে হল। তবু মনের কোণে গুম্‌রে ফিরছিল তরুণীদের বাণী—আমি পথিক, আমার আবার কুণ্ঠা থাক্‌বে কেন! বড়দরের একটি ষ্টোরে গিয়ে আমরা পৌঁছলাম। এই ষ্টোরটি হ'ল সাংহাই শহরে সব চেয়ে বড় দোকান। নাম—ওয়াং ষ্টোর, নান্‌কিন্ রোডকে এটি যেন জাঁকিয়ে তুলেছে। দোকানের মালিক একজন কোটিপতি, তাঁর সাক্ষাৎ পাবার সৌভাগ্য আমাদের মত ভবঘুরেদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কিন্তু ম্যানেজার যাবে কোথায়? আমাকে সাহায্য দানের জন্য তরুণী তিনটি এমনভাবে ম্যানেজারকে চেপে ধরলেন যে, সে-দৃশ্য দেখে আমারই মাথা নত হয়ে এল। যদিও এ সাহায্যের উপরই আমার সকল আশা-আকাজ্ক্ষা নির্ভর করছে, তবু এর উত্তেজনা আমার মনকে স্পন্দিত করে নাই—টাকা পাব

কি পাব না, সে কথা একবারও মনে ভাবি নাই; কিন্তু বিস্ময়চকিত হয়ে লক্ষ্য করলাম—পরোপকার সাধনের সময় কি করে জীবনপণ করতে হয়, চীনের যুবতীরা তা ভাল করেই আয়ত্ত করেছেন। ষ্টোর হতে ফিরে আসার সময় এই কালো কুৎসিত বিদেশীর হাতে স্বয়ং ম্যানেজারই ১২৫ ডলার দিয়ে দিল—তাও যে শুধু ঐ তিনটি তরুণীকে খুশী করবার জন্যই, একথা আর বেশী করে বলতে হবে না আশা করি। তাই পথে এসে হাসিমুখে তরুণীরা আমায় বল্‌লেন,—এই যে অকারণ লজ্জা, যা নিয়ে আমরা মাতৃজাতি এত বড়াই করি, তার কি মূল্য আছে এতটুকু? নিশ্চয়ই নাই। আমাদের মা-বোনেরা আজ পথের ভিখারীর চেয়েও অধম, কত কষ্টেই না তাদের জীবন-দীপ অকালে নিভে যাচ্ছে, আর আমরা—দেশের শিক্ষিতারা যদি তা দেখেও ও-রকম বাজে অজুহাতের দেমাকে দূরে সরে থাকি, তবে তার চেয়ে বড় লজ্জা আর কি হতে পারে? দেশকে, দশকে মুক্ত না করা পর্য্যন্ত আমাদের কি স্বস্তি থাকা উচিত! আজ যদি লজ্জাহীনার মত আমরা ম্যানেজারের মন দখল না করতাম, তা হলে আগামী কল্যই আপনাকে পথে দাঁড়াতে হত। শরীর আপনার সুস্থ নাই, মনও আপনার মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নয়। আপনাকে সাহায্য করা তো আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ওদের আবেগপূর্ণ কথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে হোটেলে ফিরে এলাম। ষ্টোর থেকে হোটেলের ব্যবধান যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে উবে গেল। যুবক-বন্ধু তখনও আমাদের প্রতীক্ষায় উৎসুক ছিলেন, যুবতীরাই তাঁদের এ সফল শফরের সকল খুঁটিনাটি যুবকটির কাছে খুলে বল্‌লেন। কি অমায়িক সরলতা চীনের এসব শিক্ষিতা তরুণীর, তা-ই ভেবে দেখ্‌তে লাগলাম, কিন্তু তুলনা খুঁজে পেলাম না আমার দেখা দুনিয়ার কোথাও।

চীনদেশে এরকম যুবক-যুবতী কর্ম্মীর দল একত্র বেড়াতে দেখেছি, একত্র আহার করতে দেখেছি, আবার একত্রেই কর্ত্তব্যের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি—কিন্তু কোথাও একবারের জন্যও এদের ভিতর পঙ্কিল ভাব নজরে পড়ে নাই। বিশেষ করে মিলে-মিশে দেখেছি, যখনই দরকার তখনই এরা হাসে, দিক্ গুল্‌জার-করা উচ্ছল হাসি, কিন্তু তার পরই একেবারে সংযত, নীরব নিস্তব্ধ—যেন একেবারে মৃত, তাতে রস নাই রহস্য নাই, তাতে মোহ নাই সৌন্দর্য্য নাই—যেন গুরুতর কর্ত্তব্যের আহ্বানে গভীর চিন্তামগ্ন, যেন ধ্যান-

লোকের শুচি-শুভ্র আবেশে তন্ময়। এ শ্রেণীর যুবক-যুবতীর সঙ্গে চীনের অন্যত্রও দেখা মিলেছে, সেকথা যথাস্থানেই বল্‌তে চেষ্টা করব।

টাকার চিন্তা আমার দূর হয়ে গেছে, তাই খোশ মেজাজে হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলে তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম কথায় আর কথায়। 'কাবেরে'র কথাও কোন্ এক মুহূর্ত্তে উঠে পড়্‌ল। সেই প্রসঙ্গেই একটু শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে ফেল্‌লাম—দেশের এ দুর্দ্দিনে জাতির যারা আশা-ভরসা চীনের সেই যুবকযুবতী নাচে মশ্‌গুল হয় কি করে? জবাব দিলেন এক তরুণী—যিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত খুব কম কথাই বলেছেন। বিষাদ মাখা সুরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে চল্‌লেন—

চীনদেশে বরাবরই রাজা ছিল স্বেচ্ছাচারী। তার তাঁবে যে অগুন্‌তি লোক ছিল প্রভাবে-প্রতাপে সেরা—তারাই কি কম জুলুম চালিয়েছে চীনের বুকে! চীন জাতটার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে তারাই। তারপর দীর্ঘদিনের শোষণের, নিপীড়নের পর উষার ক্ষীণ আলো দেখা দিল ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেনের আবির্ভাবে। তিনিই আমাদের দেখিয়ে দিলেন মুক্তির পথ। কিন্তু তিনিও দেশকে পূর্ণ শান্তি উপহার দিয়ে যেতে পারেন নাই, মহাকালের নির্ম্মম আহ্বান এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিল চীনের স্নেহের কোল থেকে। তারপর উদয় হলেন স্বয়ং মহারাজ চ্যাং কাইশেক। তিনি কি মনোভাব নিয়ে দেশ-শাসন করছেন তা তো চীনের দিকে দিকেই রক্তাক্ষরে লেখা রয়েছে। আর তার অনেক কিছুই আপনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। সে কথা আর আপনাকে আমাদের বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না নিশ্চয়। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে দি—টাকাই চীনের মহাশত্রু—তা অতীতে যেমন সর্ব্বনাশা ছিল আজও তার চেয়ে বড় কম নাই। টাকা চীনদেশ হতে বিদেশীরা ঢের ঢের নিয়েছে, তবুও যা আছে তাতেই দেশকে যেন ছারেখারে দিতে বসেছে। কারণ এই টাকা তো আর জনসাধারণের হাতে নাই। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মধ্যেই তা গণ্ডীবদ্ধ। তাই বিলাসী অন্তঃসারবিহীন এই ধনিকের দল দেশের স্বার্থে উদাসীন হয়ে দশের দুঃখ উপেক্ষা করে পাপের পথে এগিয়ে চলেছে, আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে যত সাদা রাশিয়ানের দল। যারা এই পাপকর্ম্মকে দেশের বুক থেকে নিঃশেষে পুঁছে ফেলতে চায়, তারা আর কেউ

নয়, তারা হল সদাপ্রচারিত, তথাকথিত কমিউনিষ্টদল—যাদের ধর্ম্মযাজক হতে জাপানী পর্য্যন্ত দস্যু-কমিউনিষ্ট বলে বদনাম গেয়ে ফির্‌ছে। সারা বিশ্ব না জেনেই তা মেনে নিচ্ছে। জগতের লোকের ধারণা হয়েছে, মহাচীন আজ না হয় কাল কমিউনিষ্ট বনে যাবে। তাই সাম্রাজ্যবাদী জাপান এমন এক সংগঠন করেছে, যার উদ্দেশ্য হ'ল—চ্যাং কাইশেকের মারফত চীনের যত প্রগতিশীল বাস্তবে শিক্ষিত নরনারী—তাদের সমূলে বিনাশ করা। কিন্তু এও নিশ্চয় জান্‌বেন যে, চীন তবু মর্‌বে না—বেঁচে উঠ্‌বে, আর এমনিভাবে বেঁচে উঠ্‌বে যে, সারা দুনিয়া আজ যাদের দুর্দ্দম প্রতাপে আতঙ্কগ্রস্ত, সেই অসীম বলীয়ান শক্তিকে ভুলে গিয়ে জগৎ মহাচীনেরই জয়গান কর্‌বে, কারণ চীন চরম উন্নতির শিরে উঠলেও পররাজ্য হরণ করতে এগিয়ে যাবে না।

সন্ধ্যা সমাগত। ঘরে আর মন তিষ্ঠিতে চায় না, তাই বেরিয়ে পড়লাম। তরুণ-তরুণীরা চলে গেলেন এক পথে, আর আমি একা চললাম দুচোখ আমায় যেদিকে নিয়ে যায়—বেড়াতে, শিখ্‌তে, জান্‌তে। যদি তেমন কিছু পাই, দেশে ফিরে আপন ভাইবোনদের তা উপহার দিব।

ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একটি ভারতীয় সিন্ধির সিল্কের দোকানে গেলাম। দোকানের লোকেরা কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইল না। আমি এককোণে চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়িয়ে রইলাম যেন কিছু কিন্‌ব। সিল্কের চাহিদা চীনদেশে একেবারে ব্যাপক, কারণ সিল্ক না হলে চীনাদের পরিচ্ছদের আশ মেটে না। সিল্ক তাদের চাই-ই। কিন্তু চীনদেশে এত সিল্ক উৎপন্ন হয় না যাতে সমগ্র দেশের চাহিদা মেটাতে পারে। তার উপর আবার জাপানী সিল্ক চীনারা প্রাণান্তেও কিন্‌বে না। তাই আজ চীনে ভারতীয় সিল্ক ব্যবসায়ীদের হয়ে পড়েছে একরকম একচেটে রাজত্ব। কিন্তু সেয়ানা ব্যবসায়ীরা দুপয়সা লাভের লোভে হীন কারসাজি চালাতেও পেছপা হচ্ছে না। তারা জাপানী সিল্কে ভারতের ছাপ অঙ্কিত করে তাই বিক্রি কর্‌ছে খাঁটি ভারতীয় বলে। দেখলাম বিক্রেতা সিন্ধি ইংরেজী ভাষায় চীনা ক্রেতাদের বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে—আমাদের ভারতে প্রচুর সিল্ক তৈরী হয়, কিন্তু রং-করার কাজটা ভালরকম উৎরাতে পারেনা। কাজেই থানে থানে সিল্ক আমাদের চালান দিতে হয় জাপানে। সেখানে প্রত্যেক ভারতীয় ব্যবসাদারেরই একটি করে কারখানা

রয়েছে—আর তাতে আমাদের নিজেদের লোকের তত্ত্বাবধানে জাপানী কারিগরেরা রং-য়ের কাজটি করে দেয়। এতে রংও বেশ কায়দাদুরস্ত হয়, আবার খরচও পড়ে কম। আমাদের দেশে রং করার ওস্তাদ কারিগর তেমন নাই, অথচ ইউরোপ থেকে ডাইং মাষ্টার (Dying Master) আনাতে চেষ্টা করা হয়েছে, তারা নিজের দেশের রঞ্জন-শিল্পের আভিজাত্য নষ্ট হবার ভয়ে সহজে ভারতে আসতে চায় না, যদি বা রাজি হয়, তবে এত চড়া মাইনে হাঁকে যে, তা দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তবে আশার কথা এই যে, জাপানে আর ইউরোপে ভারত থেকে বহু যুবক আজকাল যাচ্ছে অন্যান্য নানারকম উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটিও শিখে আস্‌তে। তাদের প্রথম ব্যাচ্ দেশে ফিরে এলেই ভারতে সিল্ক রং-করা ভাল রকমেই সুরু হয়ে যাবে, তখন আর আমাদের সিল্ক জাপানে পাঠাতে হবে না। আপনারা ভারতে রঞ্জিত ভারতীয় সিল্কই পাবেন, সামান্য কিছুদিন আর আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে সেজন্যে। এমন কি, তখন আমরা এদেশেও বড় বড় কারখানা খুলে বস্‌তে পারব। আপনারা যথেষ্ট অনুগ্রহ করে আস্‌ছেন, আর ক'টা বছর সবুর করুন, তারপরই আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াব আর সিল্কের পণ্যে চীনের সব কিছু চাহিদা মেটাব।

চীনা ক্রেতারা ব্যবসায়ীর কথাগুলো আনন্দের সঙ্গেই শুনছিল আর অকপটেই তা বিশ্বাস করে নিচ্ছিল। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও দরদ এত বেশী যে, তারা চতুর ব্যবসায়ীর কথার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করে না। মহাচীনে ভারতের সুনাম চলে এসেছে দূর অতীত হতে বংশপরম্পরাক্রমে। এজন্যেই চীনদেশবাসী নরনারী মহাসমাদরে ভারতের সিল্ক ক্রয় করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে সিল্কের অধিকাংশই জাপানী। আবার শুধু কি সিল্কই কিনে, তারা ভারতের খদ্দরও কিনে, অবশ্য সে খদ্দরও সিল্কের মতই জাপান থেকে পাঠান হয়। জাপানী মিলের খদ্দর তো ভারতেও আমদানী হয়, ভারতেও তার চল্‌তি যে একেবারে নাই, এমন নয়। তাই ভারতীয় সিল্ক বিক্রেতার কৌশলে জাপানী সিল্ক ভারতের নামে বিক্রয় দেখে আশ্চর্য্য হই নাই, বরং দুঃখই হ'ল। চীনদেশের অনেক স্থানেই ভারতীয় সিল্ক ব্যবসায়ীর দোকান আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি, তাই আজ আমার অজানা

নাই—জাপানের কোন্ কোন্ ফ্যাক্টরী হতে সিল্ক চীনে পাঠান হয়, কোন্ কোন্ মিল্ থেকে চালান দেওয়া হয় খদ্দর, আর সে-সব মাল কোন্ কোন্ ভারতীয় ব্যবসায়ী চীনা খরিদ্দারগণের নিকট বিক্রয় করে খাঁটি ভারতে প্রস্তুত বলে। দেখে শুনে স্বতঃই একথা মনে উদিত হ'ল—এ তো সিল্কের ব্যবসা নয়—এ হ'ল ভারতের সুনামকে হীন পণ্যে পরিণত করা, যার জন্যে ভারতকেই একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

উজাং কেল্লা

যখন দোকান একটু নিরিবিলি হ'ল তখন দোকানী ভারতীয় ভাইকে বললাম, "বেশ দুপয়সা কামিয়ে নিচ্ছ ভায়া ভারতীয় সিল্ক বিক্রি করে?" লোকটি একটু থতমত খেয়ে গেল। তাকে ফের বল্লাম, "কেন, ভারতে কি সিল্ক নাই, তা এখানে আনিয়ে বিক্রি করা যায় না?" দোকানী যা বললে এবং আমার যা বলার ছিল তা এখানে বিশদভাবে বল্‌বার প্রয়োজন নাই, শুধু এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, ভারতীয় দোকানীরা বিদেশে গিয়ে ভারতীয় জিনিষ বিক্রি করতে চাইলেও পায় না। কেন পায় না—বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যদি কিছু লিখি তবে সে প্রসঙ্গ সে-সময় তোলা যাবে। ব্যবসায়ীদের চোখ ফুটাতে হলে সে সব কথা বাংলা ভাষায় বলেও লাভ নাই কারণ বিদেশে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মাত্র দেখেছি একজন, তিনি প্যারিস নগরীতে মাইকার ব্যবসা করেন। তাঁর ব্যবসাও প্রায় টলমল। এর জন্য দায়ী বোম্বাই অঞ্চলের ঝানু ব্যবসায়ীর দল—তাদের নিপুণ প্রতিযোগিতায় বাবু বাঙ্গালীর টিকে থাকা দায়, কেন না, ব্যবসার চুলচেরা হিসেব এদের মজ্জাগত। আর বাঙ্গালী কারবার করতে এখনও একরকম নামেই নাই। যা নেমেছে, তাকে হাতেখড়ি বলা চলে। কাজেই ঝানু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে বাংলা ভাষায় কোন কথা বলা আর না বলা দুই সমান।

সিন্ধিভায়া আমাকে আবেগের সহিত বলেছিল, "যদিও আমরা সামান্য ভারতীয় সিল্ক বিদেশে আনতে চেষ্টা করি, বিক্রয়ও করি, তা আমাদের নিজেদের মাঝে নিজেদের জন্যে।" তারপর তার মুখ বন্ধ হয়েছিল। মিঃ

ডেভিড বলে এক ভারতীয় ইহুদী এসেই আমার পরিচয় চাইলেন। আমার পরিচয় দিবার পরই দেখলাম সিন্ধি ভায়ার মুখ আরও কালো হয়ে গেছে। সিন্ধি ভায়া বললে, "তবে আপনি দেশে গিয়ে আমাদের ব্যবসার কথা বলে দিবেন নাকি ? তা করবেন না। এতে আমাদের বদনাম হবে।" মিঃ ডেভিড বললেন, "বদনাম স্থনামের কথা ছেড়ে দিন, এই যে লোকটি এতদিন ধরে এখানে এসেছে, কেউ কি তার খবর নিয়েছেন, সংবাদপত্রগুলি তো বেশ লম্বা লম্বা নিবন্ধ লিখছে লোকের মন পরিবর্ত্তন করবার জন্যে অথচ আমরা আমাদের দেশের লোকটির সঙ্গে পরিচিত হতেও চেষ্টা করি না।" এরই ভিতরে পিছনদিক হতে একটি চীনা যুবক আমাকে টানল, ইংরেজীতে বল্‌ল, "আপনি না উজাং কেল্লা দেখতে যাবেন বলেছেন, আগামীকল্য প্রাতে যাবেন তো বলুন। আমার উপর সে ভার পড়েছে।" ছেলেটিকে দেখেই মিঃ ডেভিড ও সিন্ধির চমক লেগে গেল। তাঁরা বললেন, "এই ছেলেটি আপনাকে কি করে জানে ?" আমার জবাব তৈরী ছিল না। আমার ঘরে যারা আসত তাদের একদিন বলেছিলাম, উজাং কেল্লা দেখতে যাব, আর কাউকে বলি নাই। মিঃ ডেভিডকে বললাম, "এ ছেলেটিকে জীবনে এই প্রথম দেখলাম, আমি উজাং কেল্লা দেখতে যাব সে কি করে জানল সে-ই জানে। হয়তো হোটেলের কেরানীদের কারও কাছে বলেছিলাম, তারা ঠিক করেছে।" তারপর ছেলেটিকে বললাম, "তুমি কাল প্রাতে এস সাইকেল নিয়ে, আমার সঙ্গে প্রাতে খেয়ো, তারপর দুজনায় যাব, বুঝলে ?" ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বললে, "হাঁ তাই হবে।" ছেলেটি বিদায় নিবার পর মিঃ ডেভিড বললেন, "এই ছেলেটা গুণ্ডার দলের লোক, তা কি আপনি জানেন না ? গুণ্ডার দলের লোকের সঙ্গে কেউ ইচ্ছা করে মেলামেশা করে না, তা আবার এই বিদেশে-বিভূঁইয়ে যেখানকার ভাষা জানা নাই, আচার-ব্যবহার জানা নাই।" আমার মনে হ'ল, তবে কি আমার নানকিনের সঙ্গীও গুণ্ডা ছিল ? এরূপ গুণ্ডা তো কখনও দেখি নাই। যা হোক মিঃ ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে জানলেন ? "আমরা এই শহরে অনেকদিন ধরে আছি, দেখলেই বুঝতে পারি কে কি রকম লোক। তবে এটা বলতেই হবে যে, আমরা যেখানে আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টাও করতে পারছি না, সেখানে ঐ চীনা গুণ্ডার

দল পর্য্যন্ত যখন আপনার সাহায্যার্থে এসে পড়েছে, তখন আপনার আর কোন ভয়ের কারণই নাই।" তারপর সিন্ধি দোকানীকে বললেন, "আপনাদের এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একদিন এঁকে নিমন্ত্রণ করুন না?" একথা শুনে সিন্ধি ভায়ার মাথা নত হয়ে এল। ব্যাপার বেশ মালুম হল। আর দেরী না করে আমি বিদায় নিলাম আমার দেশী ভাইয়ের দোকান হতে।

ছেলেটা গুণ্ডার চর, গুণ্ডা আমাকে সাহায্য করছে, এ তো ভাল কথা নয়—আমার দুর্ব্বল মনে এই ভাবনা এল। এ কথা ভাবতে ভাবতে নান্‌কিন রোড ধরে চলেছি আর দেখছি নান্‌কিন রোডের দোকানীদের পণ্যসজ্জার পারিপাট্য। যে দিকে চলেছি তার ডান দিকে মোড় ফিরে তবে আমার হোটেলের পথ। মোড়টা ফিরেই হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। পথেরই পাশে দাঁড়িয়ে একটি যুবক চীৎকার করছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" যুবকটি বললে, "না খেয়ে মরতে বসেছি, মরবার পূর্ব্বে একটু চীৎকার করে নেই।" ভাবভঙ্গীতে যুবকের অবস্থা বুঝতে বাকি রইল না। তাকে একটা চীনা হোটেলে নিয়ে গিয়ে দুজনায় মিলে খেতে বসলাম। যুবকটি বেপরিমাণই খেয়ে ফেল্‌ল, তার ভাতের দামই আমাকে পনের পয়সা দিতে হয়েছিল। খাওয়া হয়ে গেলে যুবক মিনতি করে বললে, "আপনার দেশ কোথায়?" আমি তাকে বললাম, "আমার দেশ হিন্দুস্থান, আমি হিন্দু।" যুবক আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "যদি কিছু না মনে করেন তো আপনাকে একটি স্থানে নিয়ে যেতে চাই, যাবেন কি?" মরণে যার ভয় নাই, পথই যার বিশ্রামের স্থল, মানুষ মাত্রেই যার মিত্র, তার কাছে আবার স্থানভেদ কোথায়, ভয়ই বা কিসের? চললাম তার সঙ্গে। ইণ্টারন্যাশন্যাল কনসেশন পার হয়ে ফরাসী শহরে এলাম, বড় রাস্তা অতিক্রম করে একটা ছোট গলিতে প্রবেশ করলাম। বাতি আছে সে গলিতে। গলির দুপাশে দোকানীরা নানারূপ কাঁচা মাল বিক্রি করে, তবে অনেক দোকানী সওদা বিক্রীর পর দিনান্তের হিসাব নিকাশ করতে ব্যস্ত। আমি পিছনে পিছনে নিশ্চিন্ত মনে দুপাশের দোকানগুলি দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। তারপর আর একটা ছোট গলি, দূরে দূরে মিটমিটে বাতি। তবু চল্‌তে ভয় হল না, কারণ চীনা গুণ্ডাই বলুন আর নেহাৎ ছিঁচকেই বলুন, পেছন দিক থেকে কেউ

ছোরা মারে না। ছোরা যদি আসে তো আসবে সামনের দিক হ'তে। একটু এগিয়ে যাবার পর আমার আগে যে লোকটা চলেছে তারই উপর একখানা ছোরা ঝলসে উঠল। ইঙ্গিত করা মাত্র ছোরাখানার অস্তিত্ব লোপ হ'ল। তারপর আর একখানা ছোরা, তারপর আর একখানা, কিন্তু কেউ আমাকে আঘাতও করল না, সঙ্গী যুবকটিকেও না। তারপর একটা বাড়ীর ছোট্ট একটি দোর। আমরা পৌঁছবার পর কড়া নাড়তেই দোর খুলে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম।

প্রথম ঘরে বসে কতকগুলি লোক হিসাব করছিল এবং তারই পাশে ত্বজনা একখানি মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে মিটমিটে আলোতে কি দেখছিল। দ্বিতীয় ঘরে তিনজনা লোক আরাম করে ধূমপান করছিল। আমরা যেতেই উঠে দাঁড়াল। আমি আমাদের প্রথামত তাদেরে নমস্কার করলাম। তারপর এগিয়ে চল্‌লাম। তৃতীয় ঘরটি সাদাসিধে, একজন লোক বসে একখানা বই পড়ছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁকে নমস্কার জানাতেই আমার দিকে চাইলেন, তাঁর চোখ ত্বটা কেন যেন জ্বলে উঠল। সঙ্গীটি কি কতকগুলি কথা বলার পর তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হ'ল, আমাকে বস্‌তে বল্‌লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "চীনদেশে এতদিন হয় এসেছেন, কি দেখলেন, আর কি শিখলেন—বল্‌তে পারেন?" আমার বলার অনেক ছিল, কিন্তু এই মাত্র বল্‌লাম, চীনদেশে এসে শিখেছি ঢের। ভদ্রলোক বল্‌লেন "না, শেখা হয় নাই কিছুই, দেখা হয় নাই কিছুই। আরও দেখতে হবে, শিখতে হবে। আমার লোক আপনাকে অনেক দেখাবে এবং শেখাবে। এখন যান, এখন হ'তে আর কোনদিন কোন ভিখারীকে আপনি ভিক্ষা দেবেন না, বোধ হয় কেউ আপনার কাছে হাতও পাতবে না।" লোকটির কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলাম না, শুধু সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কে, আর আপনিই বা কে?" সঙ্গীযুবক হেসে বল্‌লে, "তা জেনে দরকার নাই—হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ুন!" হোটেলে ফিরে এলাম, ওদের কথা আর না ভেবে আরাম করে শুয়ে পড়লাম।

চোখত্বটা বুজবামাত্র দরজায় ঘা পড়ল, উঠে দরজা খুলে দিলাম। একটি অপরিচিত লোক এসে বল্‌লে, "আপনার আগামী কল্য প্রাতে উজাং কেল্লায় যাবার কথা ছিল, একটি ছোট ছেলে বলেছিল আপনাকে নিয়ে যাবে, তা সে

আস্‌তে পারবে না। আপনার অন্য কাজ থাকে তো করে নেবেন। আর না হয় যদি একা যেতে চান তাও যেতে পারেন। আপনার বন্ধুর এ অনুরোধ—যে বন্ধু নান্‌কিন হতে আপনার সঙ্গে এসেছিল।" এ কথা বলেই লোকটি চলে গেল। রকম-সকম ভাল বোধ হ'ল না। আজকেকার সব ঘটনায়ই যেন কেমন একটা আবছা কুহেলী। গুণ্ডা, দস্যু, কমিউনিষ্ট, গুপ্তচর—চীনের এত সব দলাদলি আমায় ধাঁধায় ফেলেছে। ঠাউরে নিতে পারি না কার স্বরূপটি কি!

সে ছেলেই বা কে, আর এই লোকটিই বা কে? আমার চোখের জ্যোতিও কমে গেছে, এদের আবার দেখলেও চিনতে পারব না; কাজেই চিন্তা করেই বা লাভ কি? যারা আমার সঙ্গে এসে কথা বলে যায়, তাদের কেউ নাম কিম্বা বাড়ীর ঠিকানা কোনদিন বলে নাই। আমিও তা জিজ্ঞাসা করি নাই, এখন তবে আর ভেবে দরকার কি? তবুও ভাবতে হয়, ভাবলাম অনেকক্ষণ বসে। মাথাটা বেশ গরম হয়েছিল বলে ঘুম হ'ল না। আবার বের হয়ে গেলাম, বাঁধের কাছ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চল্‌লাম। বড় বড় হোটেল হতে আনন্দ-ধ্বনি উঠে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ইউরোপীয়ান ও জাপানী সৈনিকের দল বুক টান করে চলে যাচ্ছিল এক হোটেল হতে অন্য হোটেলে। গরীব চীনে মজুর তখনও মাল বয়ে নিয়ে চলেছে গন্তব্য স্থানে। মাঝে মাঝে দুএকটী ক্যাণ্টনী ছেলে হাওয়ার আগে একদিক হতে অন্য দিকে চলে গিয়ে গা-ঢাকা দিচ্ছিল কা'র যেন কানকথা শোনবার জন্যে। আর আমি এই বাঁধের ধারে ধারে আপন কথা ভেবে একা চলেছি।

একা চল্‌তে, নিছক আপন কথা ভাবতে মানুষ পারে কতক্ষণ? সে পারারও একটা সীমা আছে, তারপরে আর একঘেয়ে আপন কথা ভাবা ভাল লাগে না, মন পরিবর্ত্তন চায়! তাই মন আমার আপন কথা বেশীক্ষণ ভাবতে চাইল না। কে আমার সঙ্গে উপযাচক হ'য়ে কথা বল্‌বে, আর এই গভীর রাতে কোথায় বা একজন হিন্দুকে খুঁজে পাব। নতুন পণ্য, নতুন শিল্পদ্রব্য দেখলে মনের পরিবর্ত্তন হতে পারে, কিন্তু সে সুযোগ কই, দোকানপাট সব বন্ধ। তাই আপন মনে ঠিক করে নিলাম, হোটেল সেভয়ে গিয়ে বাঙ্গালী নামে পরিচিত পাঞ্জাবী দারওয়ানদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিব, এতে হয়তো মনের একঘেয়ে ভাবটা দূর হতে পারে। হোটেল সেভয় বেশী দূরেও নয়, একটু ঘুরে

গলেই পাওয়া যাবে। আমাকে হোটেলের সামনে দেখেই দারওয়ান ভায়া াগিয়ে এল, বল্‌ল, "বাবু কি চাই ?" "চাই আর কি, একটু কথাবার্ত্তা ভাই, াার কিছু নয়।" দারওয়ান বললে, "এখন নয়, এ হোটেলের সমুখে আর দেরী চরবেন না। এখানে রকমারি লোকজন আসে, হয়তো কেউ সন্দেহ করবে মাপনি এই গভীর রাতে কোন্ মতলবে বেরিয়েছেন!" কথা বলতে যে চায় না তার সঙ্গে কথা বল্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কাজেই আবার হোটেলের দিকেই রওনা হলাম। পাশ দিয়ে কতকগুলি কচি ছেলে চলে যাচ্ছিল, এমন ভাবে পদক্ষেপ করছিল যেন হাঁটিতে পারছে না। কিন্তু এদের প্রতি দয়া আমার হ'ল না, তাতে আবার কোন্ বিপদ আসে কে জানে। বিশেষ করে আজকার শোনা হুঁসিয়ারী বাণী মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নাই। পাশ কাটিয়ে চলে এলাম তাড়াতাড়ি সদর রাস্তায়, তখনও কয়েকখানা মোটর আরোহী নিয়ে দ্রুত চলেছে গন্তব্য স্থানে, রিক্সা-পুলাররাও বয়ে চলেছে সওয়ারদের। চিন্তা করে ঠিক করতে পারলাম না, যে শহরের একটা দিক এমন নির্ম্মমভাবে ধ্বংস হয়েছে, কি ক'রে সে শহরের অন্য অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবন অটুট শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এমন ধারা অবাধে চলতে পারে! এর গূঢ় রহস্যটি কি ?

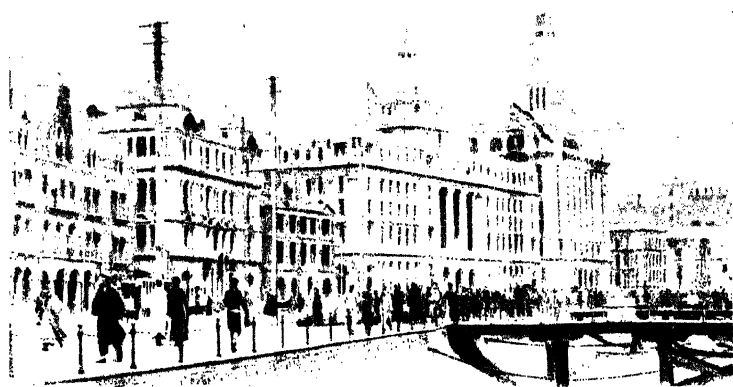
বিশাল চীনদেশ অনেকটা দেখেছি, তবুও ঠিক করতে পারছি না কি দেখেছি। এই সাংহাই নগরীর এক অংশ একেবারে লোপ পেয়েছে—অন্য অংশে বেশ সিনেমা, থিয়েটার চলছে। এদের প্রাণে কি সহানুভূতি নাই, অন্তরে নাই জাতীয়তা-বোধ ? এই চিন্তা অনবরত আমার মনকে তোলপাড় করে তুলছিল। এই গভীর রাতে কাকে পাই যে, মনের কথা বলি! হোটেলে এলাম, লিফ্‌টে উঠতে যাব এমন সময় কেরানী বললেন, "আপনার তো রাতে বাইরে থাকা উচিত নয়, ঠাণ্ডা লাগলে আবার শরীর খারাপ হতে পারে।" কেরানীকে বেশী বকতে দিলাম না, একেবারে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশাই, স্বচক্ষে দেখে এসেছি চাপাই এরিয়া সব শেষ হয়েছে, তবে চীনাদের কি একের প্রতি অন্যের সহানুভূতি নাই, এ তল্লাটে দেখ্‌ছি মজাসে নাচগান চলেছে! মোটরে-রিক্সায় চলেছে নৈশ অভিযানের সমারোহ!" কেরানী বললেন, "এতেই আপনার হয়তো এত রাগ হয়েছে। বসুন, আজ আপনাকে এ দেশ সম্বন্ধে কিছু বলব।" এরই ভেতর চা আনতে বলা হয়েছিল। কেরানী ধীরে ধীরে বলতে

লাগলেন, "সুখ-শান্তি কে না চায়? কিন্তু জাত যখন মরতে বসে, তখন জাতের যারা হোমরা-চোমরা তারা অন্যের কথা ভুলে গিয়ে শুধু নিজের সুখ-শান্তির দিকেই তাকায়। চ্যাং কাইশেক হতে আরম্ভ করে যত সরকারী কর্ম্মচারী সবাই এই দলের। এদেরই গাড়ী আছে, রিকসা আছে। আর কাদের আছে জানেন? যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে দু পয়সা জমিয়েছে, তারাও যোগ দিয়েছে চ্যাং কাইশেকের দলে, তারাই ফুর্ত্তি ক'রে সারারাত কাটিয়ে দিচ্ছে। আর যত গরীব লোক খেটে মরছে একমুঠা খাবারের জন্যে। সান-ফু দৈনিক কাগজের অফিসে কাল গিয়ে দেখে আসবেন কত ফৌজ তা পাহারা দিচ্ছে, জাপানীদের তাড়াবার জন্যে নয়, চীনা যুবকদের শায়েস্তা করবার জন্যে। কাগজখানা এমন বাণী প্রচার করছে যে, দেশ ও দশকে একেবারে যার তার হাতে তুলে দিতে রাজি, তবু চাই নিজেদের মুষ্টিমেয় ধনিকের সুখ এবং শান্তি। চীনের টাকা আর চীনাদের অর্থলোভই হয়েছে চীনের শত্রু। এই অর্থ জিনিষটাকে যে পর্য্যন্ত চীনের যুবক তাদের হাতে আনতে না পারছে, টিকেট সিষ্টেম স্থরু করতে না পারছে ততদিন চীনের রক্ষা নাই। তবে বেশীদিন নয়, চীনের যুবকযুবতী ঘুমিয়ে নাই, জেগেছে। আবার দশ বৎসর পর এই সাংহাই নগরীতে আসবেন, দেখবেন হাওয়া উল্টে গেছে।" কথা বলে ও শুনে মনটা অনেকটা হালকা হল, ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গল, একটি আশ্চর্য স্বপ্নের রেশ নিয়ে জেগে উঠলাম,—আমি যেন চীনা কচি কচি ছেলেদের মাঝে দাঁড়িয়ে চীনা ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছি আর তারা তা মন দিয়ে শুনছে।

সাইকেল করে উজাং কেল্লা দেখতে চললাম। কেল্লার কাছে গিয়ে দেখলাম, দেখবার মত কিছুই নাই, যা লোকমুখে শুনেছিলাম তা সত্য নয়। কেল্লার চারদিকে কামানের গোলা এত বড় বড় গর্ত্ত করেছে যে, কাছে যেতে ইচ্ছা হয় না। গোলার এমন কতকগুলি অংশ অনেক সময় তাজা থেকে যায় যে, তাকে একটু নাড়লেই ফুটে যায় এবং তাতে মৃত্যু ঘটান বিচিত্র নয়। দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। যারা এই কেল্লাটাকে রক্ষা করবার জন্য মরেছে আর যারা মরেছে এটাকে জয় করবার জন্য—এখানে তাদের বিষয়ই ছিল লক্ষ্য করবার। তাদের কি ভোগবাসনা ছিল না? তবে তারা মরল কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে ঠিক করলাম, "যারা



নকিন রোড, সাংহাই



সাংহাই ইন্টার-ন্যাশনেল সেটলমেণ্ট বাঁধ (Bund)

মরেছে তারা অমর হয়েছে, আর তাদের দেশে যারা বেঁচে আছে তারা যদি ঐ মৃতদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে পূজা না করে, তবে তারা কৃতঘ্ন। জাপানীরা তাদের মৃতদের নামে সদা-সর্ব্বদাই ভক্তির অঞ্জলি দেয় তা তাদের কাজকর্ম্ম দেখলেই মনে হয়। চীনারা কি করছে? শ্রদ্ধা নিবেদন নেবার মত সময় এদের আসেনি, মরণের পালা সুরু হয়েছে মাত্র।

আমার মত, কতকগুলি জাপানী যুবক-যুবতী উজাং কেল্লা দেখতে গিয়েছিল, তারাও আমারই মত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছিল। প্রত্যেকে মাথা নত করে ছিল কিছুক্ষণের জন্য, তারপর কি কথাবার্ত্তা বলতে বল্‌তে আমারই সঙ্গে ফিরে এল। লক্ষ্য করে দেখলাম, ওরা যখন ফিরে এল ওদের মুখের ভাব তখন মলিন, ক্রন্দন করা অভ্যাস থাকলে হয়তো কাঁদতই। কিন্তু এদেরই আত্মীয়-স্বজনের প্রাণের পরিবর্ত্তে পেয়েছে মস্ত বড় একটা ঠাঁই। মরল এরা সাংহাই নগরীতে, পেয়ে গেল পূরা মাঞ্চুরিয়ার তিনটে প্রদেশ। দেনা-পাওনার হিসাবে পাওনাটা বেশ বড়ই হয়েছে। তবু যে এরা এত মুখ-ভারী করে আছে, তার কারণ নিশ্চয়ই এদের আপনজনের বিয়োগ!

হাঙ্কো পার্কে

ফিরবার পথে হাঙ্কো পার্কে এলাম। এই পার্কে একদিন কুকুর এবং তার সঙ্গে চীনাদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কুকুর আর প্রবেশ করতে পারে না বটে, তবে চীনাদের এখন প্রবেশ অবারিত। এই অধিকার লাভ তাদের আবেদন-নিবেদনে হয় নাই, দস্তুরমত বুক নিঙড়ে শক্তি খরচ করতে হয়েছিল চীনা যুবকদের। চীনা যুবকগণ একে একে দেশের ও দশের স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে—যা দেখে অনেকের গাত্রজ্বালা উপস্থিত। এখন জাপানী যুবকগণও নাচার হয়েই বেমকা বেপরোয়া চীনা যুবকদের সমীহ করে চলে। কেন করে তা বলছি।

জাপানী ট্যাঙ্কগুলি যখন চাপাই অঞ্চলের বুকের পাঁজর নিষ্পেষিত করে সবেগে চলত, তখন চীনা যুবকগণ আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারত না। তারা নাকি নানারকমের বোমা নিজের পরিচ্ছদে লুকিয়ে নিয়ে বেমালুম

পোষা টিয়াপাখিটির মত জাপানীদের অভ্যর্থনার ছলে ট্যাঙ্কের নীচে গড়িয়ে পড়ত, আর তারই ফলে অনেক জাপানী ট্যাঙ্ক নাকি চুরমার হয়ে যেত। জাপানীরা যেমন হারিকিরি ক'রে জগতকে দেখিয়েছে তারা মরতে জানে, চীনা যুবকগণও ঠিক সেরূপ জাপানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে জগতকে বেশ বুঝিয়েছে, চীনারাও মরতে ভয় পায় না। তবে আমার মনে হয়, চীনে সেরূপ মরণজয়ী যুবকের সংখ্যা বেশী নয়। যদি বেশী হ'ত তবে অবস্থা অন্যরূপ হয়ে দাঁড়াত।

পার্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, অবাক্ হয়ে দেখছি সমুখে মাটি ও লোহার তার দিয়ে ঘেরা। তার একটা ইতিহাস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ সব কিছুই আমার জানা নাই। একটি লোক আমাকে নমস্কার করল। এরূপ অযাচিত নমস্কার আমি পেয়েছি ঢের এবং দিয়েছিও তার চেয়ে কম নয়। এতে আর এমন কি বিশেষত্ব! ঘাড় ফিরিয়ে নমস্কার করে বললাম, "কেমন আছেন?" ভদ্রলোক বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।" 'না' বলবার কোন কারণ ছিল না, আমি এই ভবের মাঝে একা চলেছি, যে আমাকে ডাকে তারই ডাকে আমি সাড়া দেই এই হ'ল আমার অভ্যাস। ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর নম্বর, পথের নাম মায় পথের মানচিত্র অবধি এঁকে দিয়ে গেলেন। কি পরিমাণ যে বিনয় দেখালেন তা একেবারে আদি ও অকৃত্রিম অর্থাৎ নিতান্তই অননুকরণীয়। আমি যদি এক বৎসর ধরেও শিক্ষকের অধীন থেকে এই বিষয় শিক্ষা করি, তবুও আমার মনে হয় সেরকম বিনয়ের অভিনয় আমি করতে পারব না। হাসলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ। পরে সাইকেলটা ঘুরিয়ে পথ ধরতে যাব, এমন সময় রাতের ছেলেটা আমার সামনে এসে পড়ল, বলল, "Whereto sir?" যে কাগজে ভদ্রলোক আমাকে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাগজখানা দেখিয়ে বললাম, "স্থানটা কোথায় হে?" সে জবাব দিলে,—আপনারই হোটেলের কাছে 'কোরাই কই' (কোরিয়ার লোক) থাকে, যাবেন নাকি? লোকটি সম্বন্ধে তার মত জিজ্ঞেস্ করায় সে বললে, হাঁ লোক ভাল বটে, কিন্তু টাকার আশা করতে পারেন না। ছেলেটিকে বিদায় দিয়ে পথ ধরে চললাম।

বাড়ীটার কাছে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, সাইকেলটা ভিতরে রেখে এলেন। পরে দুজনায় লিপ্টে তেতলায় গেলাম। অনেক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন। এতটা আমি কিন্তু মোটেই আশা করি নাই। প্রথমেই খাবারের বন্দোবস্ত হ'ল, তারপর আলাপ পরিচয়। ব্যবস্থা মন্দ বলতে পারি না। একদিন নানকিনে কতকগুলি কোরিয়ান যুবককে আমার বাধ্য হয়ে খাওয়াতে হয়েছিল, সে কথা মনে পড়ল। কথায় কথায় সেই পুরাতন ঘটনাটি বলতে ভুলি নাই। কয়েকজন ভদ্রলোক সেকথা শুনে যেন থ' হয়ে গিয়েছিলেন।

আলাপ পরিচয়ের পর উঠল ধর্ম্মের কথা, তা আবার ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে। কথাটা আমার আদপেই ভাল লাগছিল না। তবু অনিচ্ছায় অনেকক্ষণ কথা চালাতে হ'ল। তাঁরা বললেন, "ভগবান আছেন বা নাই তা নিয়ে তর্ক করা হবে না, তবে কথা হল এই,—ভগবান বলে যাই থাকুন ভগবান বুদ্ধ তাঁর সঙ্গে Non-co-operation করেছিলেন কি না!" দলের ভিতর কয়েকজন ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তাঁরা বেশ প্রমাণ করলেন, ভগবান বুদ্ধ ভগবানকে বয়কট করেছিলেন, অতএব মহাত্মা গান্ধী যা করছেন তা নতুন কিছু নয়, ভগবান বুদ্ধেরই অনুকরণ, তবে কিনা ধর্ম্মের ব্যাপারে আরোপ না করে করেছেন রাষ্ট্রনীতিতে, প্রভেদ এইটুকু মাত্র। প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তটা শুনে বেশ হাসি পেল—এই ভেবে যে, এত বড় একটা বিষয়ের শেষকালে পরিসমাপ্তি হ'ল কিনা এমন একটা ছেলেমানুষী যুক্তিতে! একেই বলে ধর্ম্মান্ধতা। তবে গর্ব্ব হ'ল মহাত্মা গান্ধীকে খর্ব্ব করবার জন্যে ওদেরই উৎসাহের আতিশয্য দেখে। আমি বললাম, তবে এটা মেনে নিচ্ছেন, পুরাতন হোক, নতুন হোক, বিষয়টা ভাল, কেমন বিনা রক্তপাতে কাজ হাসিল হয়। একবাক্যে সকলেই তা মেনে নিলেন। আমিও গর্ব্ব অনুভব করলাম, যদিও মনে মনে জানি যুগের পরিবর্ত্তন হয়েছে, পুরানো ধরণের 'বয়কট' আর চলবে না। তারপর ভদ্রলোকেরা আমাকে তাঁদের দেশেও যেতে বল্‌লেন এবং কতকগুলি বিষয় তন্ন তন্ন করে দেখতে বলে দিলেন।' শুধু নোট বুকে সব কথা টুকে রাখলেই চলে না—এ আমার ঠেকে শিখা,

যা দেখলাম মনে আঁকতে হয় তার ছবি, তার সব জিনিষই দেখতে হয় চোখ খুলে, তা মনের সুখেই হোক আর সন্তাপেই হোক। পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্য মাইল গণনা নয়। অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে সবার সঙ্গে মিশতে হয়, কথা কইতে হয়। ব্যবধান মিটিয়ে আদান-প্রদান করতে হলেই কিছুটা ছাড়তে হয় নিজস্ব দাবী, যা নাকি সাধারণতঃ নিজের মনে মনেই গড়ে তুলি আমিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে। সেই নিছক শূন্যতা দিয়ে গড়ে তোলা অহঙ্কার ছাড়তে পেরেছি বলেই সিঙ্গাপুর হতে সাংহাই পর্য্যন্ত আসতে পেরেছি, আরও যত ছাড়তে পারব ততই এগিয়ে যাব। তবে আমার মনের এ অবস্থা বজায় থাকে কি-না কে জানে!

পূরাপূরি বিদায় নিয়ে আসা আমার হ'ল না—নিমন্ত্রণ হ'ল ফের যাবার জন্য। তাই ঐ প্রবাসী কোরিয়ানদের সম্বন্ধে পরে আরও বল্‌তে হবে। হোটেলে ফিরে এসে দেখি একটি পার্শী যুবক আমারই অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি বললেন—তাঁর পিতা আমাকে তাঁদের বাড়ী যেতে বলেছেন। পরের দিন প্রাতে এগারটার সময় দেখা কর্‌তে যাব বলে যুবকের হাতে তখনকার মত রেহাই পেলাম। তারপর এল কলকাতার এক ভদ্রলোক। কথায় বুঝলাম কলকাতারই হবেন। আমি তো আর কাউকে চিনি না, যে যা ব'লে পরিচয় দেন তাই মেনে নিতে হয়। তিনি বললেন, একদিন তিনিও এই সাংহাই নগরীতে ছিলেন, এখন উত্তর চীনে গিয়ে একখানা ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশ কর্‌ছেন। প্রথম প্রথম সাংহাই হতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাঁকে সাহায্য করত। পরে তারা সে সাহায্য কেন বন্ধ করে দিয়েছে তিনি তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নাই। তিনি অনেক দিন বিদেশে বেড়িয়েছেন—নানকিনের যাত্রাপথে সম্প্রতি সাংহাইয়ে এসে হাজির হয়েছেন—এখানে পৌঁছে সংবাদপত্রে আমার নাম পড়ে দেখা করতে এসেছেন।

আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁরাই, যাঁরা আমার মত হয় পথিক, নয় সর্ব্বহারা—নেহাৎ কায়ক্লেশে দিন গুজরান্ যাদের নিত্যকালের সাথী। নানা কারণেই লোকে এই বিদেশে দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। ভ্রমণকারী থেকে ব্যবসায়ী কি অস্থায়ী চাকুরিয়া অথবা রাজনৈতিক পর্য্যন্ত

কেউ বাদ যান না দারিদ্র্যের রথচক্র হতে। তবে যে হোমরা চোমরা হয়েও আমার মত ছন্নছাড়ার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, সে কেবল ভারতের খবর নেবার জন্য। তা বলে আত্মগরিমার দাপটে আমি কাউকেই অবহেলা করি নাই, সেজন্য এখন প্রাণে অনেকটা শান্তি পাই।

নাম জিজ্ঞাসা করা আমার রীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু ইনি বাঙ্গালী, আমার জাতভাই, নামটা জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, নাম জিজ্ঞাসা করবেন না। এতক্ষণ বেশ তো কথা হচ্ছিল ভালভাবে, এখন আবার এ সঙ্কীর্ণতা কেন! আমাদের দেশ হিন্দুস্থান, আমরা হিন্দু, এখনও নাম বলবার সময় আমাদের হয় নাই। দেবদেবী, ভগবান—সবই জানি, জানি মাটির শরীর মাটিতে মেশাবে, তবু কিন্তু মায়া কাটিয়ে নির্লিপ্ত কর্ম্মী হতে পারি না। দার্শনিকতা আমাদের মুখে মুখেই। তাই যখনই একটি মাত্র পয়সার কথা ওঠে, তখনই আমরা সব ভুলে গিয়ে পয়সাটি আঁকড়ে ধরি। আমরা ভয় দেখাবার পূর্ব্বেই গোপনীয় কথা বলে দিই—হয় প্রাণের মায়ায়, নয় পয়সার লোভে। আপনি যে সেই শ্রেণীর লোক নন তার প্রমাণ কি? দেশ থেকে এসেছেন, কিছু শিখে যান, জেনে যান—তবেই যথেষ্ট হবে, আমার নাম জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নাই আপনার। যেরূপ ভাবে ভদ্রলোক কথাটা বললেন আমার বড়ই ভাল লাগল। বাস্তবিকই আমি তো দেশ ভ্রমণ করি না, অনেকটা সময়েই যে টাকা টাকা করে কাটিয়ে দিচ্ছি। আমার দেশের লোক যারা বিদেশে আছে, তারাও আমার কাজের তেমন প্রশংসা করে না। যা পেয়েছি তা সহৃদয় চীনাদের কাছ থেকেই। চক্ষু নত করে ভদ্রলোককে নমস্কার করলাম, বললাম, ক্ষমা করবেন মশাই, আমি এখনও আপনার নাম জিজ্ঞাসা করবার অধিকারী হই নাই। আমার মন দুর্ব্বল, এখনও নরকের ভয়ে, অর্থ পাব না এই ভয়ে ভগবানের নাম নেই, আর দেশ-সেবা তো দূরের কথা, নিজের পরিবারের সেবাও করি না।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং আজই নানকিন রওনা হবেন বলে আমার কাছ হতে বিদায় নিলেন। তাঁর নাম জানা আমার হ'ল না। এরূপ কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার হিসাব দেওয়াও কষ্টকর। তাঁরা আসেন, দেখা দেন আবার চিরতরে প্রস্থান করেন অন্তরালে।

হাঙ্কো ক্রীকের পাশ দিয়ে বাঁধের কাছ ঘেঁসে যে রাস্তাটা রয়েছে তা বাঁয়ে রেখে একটু দূর গেলেই জাপানী "কলোনী" দেখতে পাওয়া যায়। জাপানীরা তাদের এই আনন্দের দিনে কেমন করে জীবনটাকে উপভোগ করছে দেখতে ইচ্ছা হ'ল। বিকেল বেলা, অস্তরবির রামধনু-লীলা তখনও লুকাচুরি সুরু করে নাই, তবুও তার আসন্ন আগমনীর আবেশে পাড়াটা ঝকমক করছে। সেখানে ফুর্ত্তির লীলাখেলা চলেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম—কোথাও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। একটু দূরে ফুটপাথের উপর একটি চিনা ভিখারী শুয়ে শুয়েও হাত পেতে আছে—এক মুষ্টি অন্নের জন্য, আর তারই পাশে "কাবেরে"টিতে অগুন্তি চীনা ধনীর ছেলে-মেয়ে মাতাল হয়ে নৃত্যে চটুল। ভিখারীর কাছে গেলাম। সে তার মানব জীবনের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করে বিদায় নিয়েছে। কাপড়টা তুলে দেখলাম, চোখ দুটি তখনও খোলা, যেন চেয়ে আছে। দুঃখ হ'ল। মৃতদেহের কি করা যায় একটু ভাবলাম। পুলিশকে বললাম, দেখে যাও একটি গরীব পথে মরে পড়ে রয়েছে, অন্ততঃ পক্ষে সাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেও একে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। অরণ্যে রোদন হ'ল। পুলিশ বললে, জাপানী ঘাঁটিদার নিয়ে যাবে, আমরা এখনও এ স্থানটার ভার নেই নাই। গরীব, রক্ত জল করে যে ট্যাক্স দাও পুলিশকে প্রতিপালন করতে, সেই পুলিশ—তোমার দেশের পুলিশও আজ তোমার প্রতি বিমুখ। চলে আসতে হ'ল। কতক্ষণ আর শবটার প্রতি চেয়ে থাকা চলে। চীনা না হয়ে অন্য জাতের হলে বরং ভাল হ'ত। কারণ সেস্থলে সে জাতির কনসালকে গিয়ে জানাতে পারতাম।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি কয়জন ছাত্র এসেছেন আমাকে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। সেখানে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে। আমি অনুরোধ এড়াতে পারি না, তাই গেলাম তাঁদের সঙ্গে। তবে আগে হতে বক্তৃতা তৈরী করে নিয়ে যেতে হয় নাই। সে সময়ও ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে কানাচেও যেতে পারি না, কিন্তু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে আহ্বান আসে, সেজন্য অনেক সময় গর্ব্ব হয়। আমি স্বভাবতঃই দুর্ম্মুখ। যে মরা মানুষটা পথে পড়ে আছে দেখে এসেছি, বক্তৃতায় তারই কথা বলতে আরম্ভ করলাম। শ্রোতা হাসে, আর আমি কাঁদি তাদেরই মৃত

ব্যক্তির জন্য, এ তো মজার কথা! প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিলাম, অন্য কথা সুরু করলাম। হৃদয়োচ্ছ্বাসে বললাম অনেকক্ষণ, আমার নিজেরই কেমন তৃপ্তি হ'ল না, তবে হাততালি পড়্‌ল খুব। বক্তৃতা শেষ হ'লে নানা জনে নানা মত প্রকাশ কর্‌লেন। একজন ক্যাণ্টনী ছাত্র দাঁড়িয়ে বললেন, ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন বন্ধুগণ, ঐ মড়াটি চীনা, এবং আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই দেশের লোক,—সেই আপন ভাইয়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের কথা আপনাদের ভাল লাগে নাই। আপনাদের ভাল লেগেছে পরের দেশের কথা। বলুন তো আপনাদের সম্বন্ধে পরিব্রাজক কি ধারণা মনে পুষে নিয়ে যাবেন? অবশ্য তিনি যে ধারণাই অন্তরে গেঁথে নিন্ না কেন, তাতে চীনের চীনত্ব ঘুচে যাবে না, কিন্তু সারা বিশ্ব জান্‌বে চীন চীনই রয়ে গেছে, বাইরের সজ্জায় নতুন রং বুলিয়ে ভোল ফিরাবার চেষ্টা হলেও অন্তরে তার যুগ-যুগান্তের জীর্ণ রং-চটা পরিবেশই স্থায়ী হয়ে আছে। এমন করে ক'দিন চলবে? নাচ-গান আর বেশীদিন নয়। হয়তো এবার যখন চাপাইয়ের মত নতুন করে অন্য শহরের পালা সুরু হবে, তখন কোন্ কাজে লাগ্‌বে আপনাদের এই বৈদেশিক সংস্কৃতি শিক্ষার উৎকট আগ্রহ? যুবকসমাজের মত বদলে গেল, আবার আমায় অনুরোধ জানান হল আরও কিছু বলতে, অর্থাৎ যে মৃতদেহের কথা বলতে বলতে অপূর্ণ রেখেই থেমে গিয়েছিলাম, তারই কথা সমাপ্ত করতে।

আবার সেই কথা নতুন করে বলতে আমার আপত্তি ছিল না। সেই প্রসঙ্গই আরম্ভ করলাম। এবার তাদের হাততালি বন্ধ হ'ল, মুখ শুষ্ক, চোখে জল, তারপর একে একে সবাই মাথা নত করে রইল। আমার ভ্রমণ-কথা বলা সার্থক হ'ল, চীনের আকুতি চীনাদের কাছে শ্রদ্ধায় নিবেদন করে আমার রসনা তৃপ্ত হ'ল। বড়ই দুঃখের কথা চীনে বিদেশী পর্য্যটক নাকি অনেক এসেছেন, কিন্তু কেউ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন নাই,—এই তোমাদের অবস্থা, আর চোখ মেলে চেয়ে দেখ জগত এগিয়ে চলেছে কি দুর্নিবার গতিতে। এসেছেন, ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, যাবার বেলা "সবই ভাল" বলে চলে গেছেন চীনা-যুবকদের স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করে। কিন্তু আমি ভারতবাসী, 'ভাবের ঘরে চুরি' আমার অভ্যাস নাই। যদি আমারই ত্রুটি

কথায়, নগ্ন বাস্তবের রূপায়ণে ওদের কল্যাণ হবে তবে কেন বল্‌ব না আমি, হোক সে অপ্রিয় সত্য।

বক্তৃতার পর কয়জন ছাত্রকে নিয়ে এলাম সেই মরা মানুষটাকে দেখতে। তখনও ঐ মৃতদেহকে কেউ স্পর্শ করে নাই। যুবকগণ শবব্যবচ্ছেদ গৃহে সেই মৃতদেহটি নিয়ে গেল। আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এর পর যতদিন এই সাংহাই নগরীতে ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আসতেন। তাঁদের দ্বারা একজন বাঙ্গালী পরিচালিত একটি ইংরেজী স্কুলেরও পত্তন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কানাবাবু তার শিক্ষকতা অনেক দিন করেছিলেন, সে সংবাদ পেয়েছিলাম। আজ চীনের বুকে ধ্বংসলীলার রুদ্র তাণ্ডব, সে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আছে কি-না জানি না।

গুপ্ত-সমিতি

পরদিন এগারটার সময় পার্শী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলাম। পূর্ব্বেই বলেছি তাঁর ছেলে এসে আমাকে অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিল। সর্ব্বপ্রথমই তিনি আমাকে আমার অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। একশত পঁচিশ ডলার যে উপায়ে পেয়েছি তা তাঁর কাছে বললাম। কথাটা শুনেই তিনি মুখ কালো করে নির্ব্বাক্ হয়ে গেলেন, একটু দম নিয়ে পরে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে, গুপ্ত সমিতির লোক আপনাকে পেয়ে বসেছে। যা হ'ক এখনও সময় আছে, আমরা চাঁদা তুলে দিচ্ছি, নিয়ে সত্বর সাংহাই হ'তে চলে যান।' যে যে স্থান বেড়িয়ে এসেছি তাঁকে তার একটা ফিরিস্তি দিলাম, তিনি আরও কয়টি স্থান দেখতে বললেন, তারপর অনুরোধ করলেন—যেন সত্বর সাংহাই পরিত্যাগ করি। সেদিনই তিনটার পূর্ব্বে আমার হাতে দুইশত পঞ্চাশ ডলার দিলেন। তারপর বলে দিলেন, যেদিন যাই তাঁকে যেন আগে জানাই। আমি টাকাটা তাঁর কাছেই রেখে দিলাম। আমার জমা পঞ্চাশ ডলারও তাঁর হাতেই দিয়ে এলাম। তখনও যে আমার বুক ঠিক হয় নাই তা তাঁর কাছে বলি নাই। তবে দেখা যাক্ না গুপ্ত-সমিতির

দৌড় কত! আমার মনে হ'ল, যাকে তিনি গুপ্ত-সমিতি ব'লে বল্‌ছেন, চ্যং কাইশেক হয়তো তাদেরই কমিউনিষ্ট ব'লে দলন করেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকরা তাঁদের ব্যবসায় বাধা পান বলে এদেরই চিহ্নিত করে রেখেছেন বিধর্ম্মী দস্যু নামে, আর জাপানীরা ভয় পান এদেরই সঙ্ঘবদ্ধতা, এদেরই দেশাত্মবোধ, এদেরই গণজাগরণের প্রয়াস দেখে, তাই শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে এদের শূলে চড়াতে চেষ্টা করেন। আমি ভারতের হিন্দু, আমার ভয় করবার কি থাকতে পারে! পার্শী ভদ্রলোক আর তাঁর বন্ধুর দলের হয়তো ভয় করবার কারণ আছে। কেননা, যার হাতে পয়সা আছে ভয় তার সর্ব্বত্র। সেই টাকার ভয় আমার নাই—অতি সামান্য টাকা, তা থাকলেও যা, না থাকলেও তা। তাদের দেশে যতদিন থাকব ততদিন চীনারা আমাকে খেতে দিবেই, এখনও তাদের বুকের উপর বুদ্ধদেবের চরণ-রেখা উজ্জ্বল আছে, যদিও তারা বল্‌ছে মুছে ফেলেছে। তাই দেবতার দেশের লোক আমি, আমায় তারা অনাদর করতে পারে না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম মহানন্দে, কারণ টাকার ভাবনা এখন কিছুদিনের জন্য মিটে গেছে।

পথে হোটেলে খেয়ে এলাম, কিন্তু বুকটার ভিতর বিষম একটা যাতনা হতে লাগল, গতিক সুবিধার নয়, হয়ত রক্তবমি হবে। যা'হোক আমি দরজা খুলেই শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়েছিলাম, গভীর নিদ্রাই এসেছিল নিশ্চয়, ঘুম থেকে উঠে দেখি সেই পরিচিত তরুণী তিনজন আমারই কাছে বসে আছেন। ঘুম ভেঙ্গেছে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? যা হয়েছিল তাঁদের বললাম। তাঁরা বল্‌লেন, অন্ততঃ তিন দিন বিছানা ছেড়ে ওঠা আমার উচিত হবে না। আরও বল্‌লেন, পালা করে তাঁরাই আমাকে পাহারা দিবেন। একজন কবিরাজকে ডাকান হল। তিনি বল্‌লেন, ভয়ের কোন কারণ নাই; তবে বিশ্রাম চাই। আর কি আমার রক্ষা আছে? ওঁরা পালা ক'রে আমার সেবা-যত্নে লেগে গেলেন। যদিও আমার প্রতিমুহূর্ত্তেই ইচ্ছা হচ্ছিল যে উঠে পড়ে চলে বেড়াই, কিন্তু তরুণীদের সেদিকে নজর ছিল কড়া, আমায় কিছুতেই উঠতে দেওয়া হয় নাই। মায়ের শাসনে ছোট্ট শিশুর মত আমি কাটালাম দীর্ঘ এই দিন তিনটি। এই তিন দিনের মধ্যে খুব কম হলেও তিনশত দর্শক আমার ঘরে এসেছিলেন। তার ভিতর চিকিৎসক অন্ততঃ

পক্ষে ছিলেন কুড়ি জন, যুবতী আর যুবক প্রায় সমান সংখ্যায়। আবার বালকও কম নয়। প্রত্যেকেই আসার সময় কিছু নিয়ে আসতেন। তৃতীয় দিন পার্শী ব্যবসায়ীটির ছেলে এসেছিল আমাকে দেখতে। সে আমার অবস্থা দেখে হয়তো মোটেই দুঃখিত হয় নাই, কিন্তু আমার শুশ্রূষাকারিণীদের দেখে যে তার ভয় হয়েছিল এতে সন্দেহ নাই। যুবকটির ধারণা, এরা সবাই ডাকাতের দলের লোক, কিন্তু সে হয়তো জানে না চীনের ডাকাতেরও দয়াধর্ম্ম আছে, আদর্শ রয়েছে মহান্। তার উপর সে শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত, সে সভ্য, সে আমাদের মত নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করে না। বিদায়ের বেলা যুবক বলল, বাড়ী গিয়ে আপনার অবস্থা বাবাকে বলব, বাবা হয়তো আসবেন না, কাল আমিই এসে আবার দেখে যাব। যুবক যা হিন্দীতে বলেছিল, ইংরেজীতে তর্জ্জমা করে চীনা যুবক-যুবতীদের তা বুঝিয়ে দিলাম।

ওদের যত্ন, ওদের শুশ্রূষা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। বলতে লজ্জা নাই, ওদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। ওরা আমাদের অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে। কোথাও কোথাও চীনাদের ধারণা, ভারতবাসী কালোলোক, চীনাদের চেয়ে হাজার গুণে নিকৃষ্ট। কিন্তু সেই 'কালো ভূত' আমি, যাদের নিকৃষ্ট ব'লে ওদেশের পাঁচ বৎসরের ছেলেরও ধারণা, তাকে ওরা এত সেবা করে কেন? কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে ছাড়া আর কিছুরই জন্য নয়। কর্ত্তব্য-জ্ঞান ওদের নিতান্তই স্বতন্ত্র ধরণের। হাওয়া বদলে গেছে, তাই ওরা আমাকে এত পরিচর্য্যা, এত সমাদর করছে। সেকালে চীনে সতীত্বের মাপকাঠি নির্দ্ধারিত ছিল পায়ের খর্ব্বতা, যার পা যত ছোট হবে সে হবে ততটাই সতী-শিরোমণি। এখন সে সতীত্ব এরা ঘুচিয়েছে, তা বলে এরা ব্যভিচারিণীতে পরিণত হয় নাই, এরা শিখেছে প্রকৃত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। সেরে উঠলাম। আবার আমি সাংহাই নগরীতে নব উদ্যমে বের হয়ে পড়লাম। এবার আমার নতুন পথ। মরতেই তো বসেছিলাম, আবার আচম্কা কোনদিন্ মহাকালের বাস্তব আহ্বান আসে তার ঠিক কি, দেখে নেই মরবার পূর্ব্বে যা কিছু দেখা আমার দ্বারা হয়ে উঠতে পারে।

একদিন প্রকাশ্যে বললাম, আমি চীনের গোপন-সঙ্ঘের সভ্যদের দেখতে চাই—যাদের দর্শন চীন সরকার কেন, কোন বৈদেশিক সরকারও সহজে পান

না। যদিও বা পান, তবে মরা মানুষের শরীর তল্লাস করে, জীবিতের নয়। এমন গুপ্ত-সমিতির লোকজনের চলাফেরা দেখতে আমার লোভ হ'ল। সেই গোপন-সঙ্ঘের কর্ম্মীদের দর্শনের বাসনা পূরণ করতে এক যুবতীকে বললাম। তিনি সম্মতি দিলেন। তবে কঠোর সর্ত্ত হ'ল যতদিন চীনদেশে থাকব ততদিন কারো কাছে বলতে পারব না—সেখানে আমি কি দেখেছি। তরুণীর সঙ্গে যেদিন দুপুরে কথা হয়েছিল, সেদিনই রাতে একজন ডিটেকটিভ আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং এতদিন থাকার কারণ জান্‌তে চান! সঙ্গে সঙ্গে এটাও জিজ্ঞাসা করেন, এত চীনা তরুণ-তরুণী আমার কাছে কি করতে আসে! আমার জবাব হল নিছক সত্য কথা। সাংহাই যাত্রাপথে আমার যে দুর্গতি ঘটেছিল তা বলে দিলাম। তবে গোয়েন্দাটিকে হুঁসিয়ার করে দিলাম বার বার—আমাকে যে চীনা সৈনিকেরা মেরেছিল কোন ক্রমে কোন সংবাদপত্রে তা যেন বের না হয়। যদি তা প্রকাশ পায় তবে আমি অস্বীকার তো করবই, পাল্টা মানহানির মোকদ্দমা করব। তাতে আমার একটুও বেগ পেতে হবে না, কেননা সেস্থলে আমার পীড়ার কারণ হবে সাইকেল হতে পড়ে যাওয়ার দুর্ব্বিপাক। আমি যে এত সাদাসিধে সত্য বলব ডিটেকটিভ তার প্রত্যাশা করেন নাই, যাবার বেলা বলে গেলেন,—'I am very pleased with you. Very few men I have seen who can speak so frankly.' ডিটেকটিভ বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হতে যতদিন সাংহাইতে ছিলাম ততদিনের ভিতর আমার চীনা বন্ধুগণকে আর আমার ঘরে দেখি নাই। কি করে যে আমার সঙ্গে ডিটেকটিভের কথাবার্ত্তা তাঁরা জানতে পেরেছিলেন তা আমার ধারণার অতীত। এমনিধারা সত্য কথা বললে অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয় না, কারণ মিথ্যা বলেও দেখেছি ধরা পড়ে যাই। সত্য কথা মনে থাকে, মিথ্যা কথা মনে না থাকার জন্যই ধরা পড়তে হয়। বহুদিন পূর্ব্বেই আমি সত্য বলা অভ্যাস করেছি, এখন আর মিথ্যা বলতেও মন সায় দেয় না, চেষ্টা করা দূরে থাক্।

বন্ধু বিচ্ছেদ, বিশেষ এই বিদেশে, সে যে কি শেলাঘাত, তা বলে বুঝাবার নয়। কিন্তু কি আর করা যায়, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এদিকে পরিস্থিতি সঙ্গীন্, তা আঁচেই বুঝে নিলাম। মনস্থ করলাম,—আর নয়, এইবার

সাংহাই ত্যাগ করতেই হবে, আর তা যত সত্বর সম্ভব। যে টাকা জমেছিল তা একটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে বন্দোবস্ত করলাম, যে স্থান হতে চিঠি দিব সেই স্থানেই ব্যাঙ্ক টাকা পাঠিয়ে দিবে। বিদায়ের বন্দোবস্ত একরূপ ঠিক হয়েছে। শুক্রবার গিয়েছিলাম চাপাই অঞ্চলটি আবার ভাল করে দেখবার জন্যে, ঘুরতে ঘুরতে অনেকদূর চলে গেছি, পথ যেন হারিয়ে ফেলেছি, দুর্ভাগ্যের পশরা ভরপূর করবার জন্যে কোমরের ব্যথাটাও আবার চাগান দিয়ে উঠেছে। একটি রিক্‌সা ভাড়া করে চল্‌লাম। প্রায় আধ ঘণ্টা চলেছি, তবুও চেনা পথে এসে পড়্‌তে পারছি না বলে মনে একটু উৎকণ্ঠা হ'ল, তারপরই আবার কি একটা নতুন দৃশ্য দেখে সব ভুলে গেলাম। সারাপথ একটা কথা নিয়েই ভাবছি, বুকের ভিতর তা-ই খচ্‌ খচ্‌ করে বিঁধছে, আজ সত্যই আমি সাথীহারা। এমন সময় রিক্‌সা দাঁড়াল একটি বাড়ীর সামনে, চীনা টাউনে। রিক্‌সাওয়ালা যেই থেমেছে, অমনি সেই পরিচিত ছোঁড়াটা এসে বললে, অনেকদিন দেখা হয় নাই, কোথা হতে আসছেন? সর্ব্বপ্রথমই ছেলেটিকে বললাম, দেখ হে বাপু, ওকে তো আমি এখানে আসতেও বলি নাই, দাঁড়াতেও বলি নাই, সে কেন এখানে এসে দাঁড়াল জিজ্ঞাসা কর তো? ছেলেটি একটু হেসে বললে, আমিই তাকে এখানে এনেছি। আপনি কিছু দেখবেন বলেছিলেন কারো কাছে, দেখবেন না? মনে হ'ল সেই গুপ্ত-সমিতির কথা। "হ্যাঁ দেখব বই কি, কোথায় সে আড্ডা?"

রিক্‌সাওয়ালা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ ব্যক্তির ইঙ্গিতে এই দরজায় এসেছিল, বুঝতে বাকি রইল না, ছোঁড়াটা তো উপলক্ষ মাত্র। কড়াটা নাড়তেই দরজা খুলে গেল। ছোট একখানা পুরানো ধরণের বাড়ী, তবে এ বাড়ীর বিশেষত্ব আছে। পুরানো বাড়ীটার ডাইনে এবং বাঁয়ে সমান্তরাল করে দুটী জানালা বসান হয়েছে। চীনা প্রথা মতে রাজবাড়ীরও জানালা থাকে না, দরজা যত খুশী থাক না কেন। সমুখের ঘরে বসে একজন নব্য যুবক বই পড়ছিলেন। তাঁর পরণে চীনা পোষাক, মাথায় গোল কালো চীনা টুপি। মুখ উজ্জ্বল, হাসি-ভরা। নানা ভাষায়ই কথা বলতে পারেন দেখলাম। বয়স একুশের বেশী বলে মনে হ'ল না। "আপনার জন্য কি করতে পারি, আসুন বসুন", ব'লেই একখানা চেয়ারে বসতে বল্‌লেন। ছেলেটা আমায় ঢুকিয়ে দিয়েই ভিতরে কোথায় চলে

গিয়েছিল। নিরুপায় যদিও ছিলাম, তবু সাহস হারাই নাই, বল্‌লাম, মতলব এঁটে এখানে আসিনি আমি, পথ হারিয়ে দায়ে পড়ে হাজির হয়েছি। আপনাকে দেখে তো মনে হয় না যে, আপনি কোন অসঙ্গত কার্য্য করতে পারেন! নব্য যুবক বল্‌লেন, "আপনি কি সেরকম কিছুর সন্ধানেই বেরিয়েছেন ?" "মনে যে সেরকম কিছু ছিল না আদপেই, এমন কথা অবশ্য বল্‌তে পারি না, তবে এখন দেখ্‌ছি বোধ হয় আমার ভুলই হয়ে থাক্‌বে।" "ভুল সবই ভুল, আসাও যেমন ভুল হয়েছে, যাওয়াটাও তেমনি ভুল হবে। তবে আপনি চমৎকার লোক, কি করে যে সাংহাই পর্য্যন্ত এসেছেন তাও তো ভেবে পাচ্ছি না, তবে এখন আসি—" বলেই নব্য যুবক মুখ গম্ভীর করে চলে গেলেন। বাস্তবিকই আমি কোন কথাই গুছিয়ে সেয়ানার মত বলতে জানি না, কার সঙ্গে কি করে কথা বল্‌তে হয় যদি জানতাম, তা হ'লে হয়তো এমনটি হ'ত না। যাহোক, আমার লক্ষ্য নতুন কিছু দেখা, তা যতক্ষণ হবে আমার আপশোষ করবার কিছুই নাই। একটু পরেই অন্য একজন ভদ্রলোক এলেন, তিনি হুবহু বাঁদর-মুখো, দেখলেই ভয় হয়, কিন্তু ইংরেজী বলার কায়দাটি অদ্ভুত। তাঁকে বল্‌লাম "আমাকে তো বিদায় দেওয়াই হয়েছে, দরজাটা খুলে দিলেই চলে যেতে পারি, কি বলেন ?" "হ্যাঁ এখানে কেউ বেঁধে রাখবে না তোমার মত আহাম্মোককে। তবে জেনে রাখ এখনও কথা বলতে শিখ নাই, এত সরল হলে চলে না, কি করে যে এতটুকু পথও আসতে পেরেছ তা তো বুঝতে পারি না! বল্‌তে পার তোমাদের দেশের সব লোকই কি তোমার মত নিরেট ?" কি জবাব দিব তা সহসা ঠাউরে উঠ্‌তে পারি নাই তাই চুপ করে রইলাম। ... ভাল স্থান নয়, আর যেমন আঁটঘাট বাঁধা তাতে ধরে বেদম প্রহার কাংলেও পালাবার উপায় নাই, রুখবার চেষ্টা তো ব্যর্থ হবেই। তার উপর আমার শরীর শুধু জলে ভরা, আবার রোগেও বেশ ভুগেছি, পরিণাম ভেবে মহা ফাঁপরে পড়লাম। চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ঠিক করলাম চুপ করে থাকাও ভাল নয়, কথা বলাই উচিত, নতুবা আরও অত্যাচার হবে। একটু ন্যাকা স্বরেই বল্‌লাম, "আজ্ঞে না, আমার মত নির্ব্বোধ আমার দেশে আমিই প্রথম, যদি বোকা না হতাম তবে আপনাদের দেশে আসতাম না, কে ইচ্ছা ক'রে নিজের মাথায় নিজে আঘাত করে ?"

লোকটির মাথা নত হ'য়ে এল, চোখ দুটা আর ভার ঠেক্‌ল! নিমেষে মুখের ভাব বদ্‌লে নিয়ে তারপর বল্‌ল, "সেদিন তুমি যে ভাবে পুলিশের কাছে কথা বলেছ তা ঠিক হয় নাই। সত্য বলেছ বটে, কিন্তু সে সত্যের দ্বারা অনেকেরই সর্ব্বনাশ হতে পারত, তোমার মন ভয়ানক দুর্ব্বল। তুমি বোধ হয় জান না যদিও আমরা স্বাধীন বলে লোকে জানে, কিন্তু আমাদের ঘর ঠিক হয় নাই। আমাদের কথায় শাসন হয় না। আমাদের যুবকগণের উপর জাপানীদের দিনরাত লক্ষ্য, চীন সরকারেরও তেমনি। আমরা চাই দেশের উন্নতি, কিন্তু সরকার চায় পরের ধামাধরা হয়ে থাকতে, তাই বর্ত্তমানে দেশের এই দুর্দ্দশা। চাপাই দেখেছ, কত লোক আমাদের মরেছে তা বোধ হয় জান না, জানবার চেষ্টা কর। গুপ্ত-সমিতি মানে চোর-ডাকাতের চোরাই আড্ডা, এটা তা নয়। এই সমিতিতে তোমার মত দুর্ব্বলমনা, সত্যবাদীদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কাজের যোগ্য করে গড়া হয়। সে সব তোমার মাথায় ঢুক্‌বে না। পর্য্যটক হয়ে বের হয়েছ তাই কর, এর বেশী তোমাদ্বারা হবে না। এ কথাগুলি বলার জন্যেই আমাদের কৌশলে তুমি এখানে এসেছ। এর পর যাবে কোথায়?" আমি বললাম, যাব সংটাং হয়ে পিকিন, যাওয়ার টাকাও জোগাড় হয়েছে, শরীরও অনেকটা ভাল। দরজাটি খুলে গেল, যে রিক্‌সায় এসেছিলাম, সেটি চলে গিয়েছিল, অন্য রিকসা ভাড়া করে বাসায় ফিরে এসে এই অপমানের কথাই ভাবতে লাগলাম। সত্য সত্যই কি আমি দুর্ব্বল? এরা বলেছে বলেই কি আমায় মেনে নিতে হবে যে, আমার দ্বারা এই পৃথিবী পর্য্যটন ছাড়া অন্য কিছু হবে না? কত কিছু ভাবলাম তার ঠিক নাই। নিদ্রাও আসে না, সংবাদপত্রও নাই। মনের এই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়ই কানাবাবু এসে উপস্থিত, তাঁর কাছে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, "ওরা কমিউনিষ্ট নিশ্চয়ই, আর ওদের সঙ্গে মিশবে?" মিশব না একথা ঠিক, কিন্তু ওরা এত যে অবমাননা কর্‌ল আমায়, তার কি কিছুই প্রতিকার নাই? মনে মনে ভাবলাম, এখন হতে আর সত্য কথা বল্‌ব না। কানাবাবু উপদেশ দিলেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, চল ফ্রাস্কোপিন প্লে হচ্ছে দেখে আসি, মন খুলে যাবে, ভুলে যাবে সকল মনস্তাপ। তাই করলাম, মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল।

তারপর ঠিক করলাম এখন হতে আর রিক্‌সায় তো যাবই না, এমন কি, পরিচিত চীনাদের সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলব না।

সাংহাই নগরীর মেয়রের সঙ্গে বেলা দুটার সময় দেখা করতে গিয়েছিলাম। রক্ষী বললে, তখনও তিনি ঘুমাচ্ছেন। তাঁর ঘুমের সময় নাকি ভোর হতে বেলা চারটে পর্য্যন্ত। তারপর অফিসের কাজে যোগদান করেন। বিকালে কোথাও যাব না বলে ঠিক করেছি, তাই আর চীনের মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে যাই নাই। কিন্তু দেখা হয়ে গেল অন্য এক স্থানে। তিনি ছুং পরিবারের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, সেখানে আমাকে দেখে তিনিই ডেকে পাঠালেন। বেশ আরামে কথা হয়েছিল, তাঁর রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থাটাও বলতে ভুলি নাই। আমার কথা শুনে তিনি হাসি চেপে রাখতে পারেন নাই। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, মেয়র বলে যে দাম্ভিকতা দেখান, যা নাকি পদস্থ উপরওয়ালাদের ভিতর হামেশা দেখতে পাওয়া যায়, তা কিন্তু করেন নাই। তাঁর উপর জনসাধারণের আস্থা আছে বলেই তাঁকে এই গুরুভার অর্পণ করেছে, এবং তিনি সর্ব্বসাধারণের মনিব নন, তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, তাদের সেবক মাত্র,—জেনারেলও কথাবার্ত্তায় সেই ভাবই অনেকটা দেখালেন বটে, কিন্তু তাঁর জাত-ভাইয়ের সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে কেমন ব্যবহার করেন তা তিনিই জানেন।

টাকা আমার সংগ্রহ হয়ে গেছে, সাংহাই নগরীও দেখা শেষ, মনটাও পালাই পালাই রব তুলেছে—এখন আমার এই শহর ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু শরীরটা কোন মতেই চল্‌তে চায় না। শরীর দুর্ব্বল নয়, কিন্তু একটু চলাফেরা করলেই বুকে ব্যথা ধরে। এ অবস্থায় থাকা উচিত কি যাওয়া উচিত, ভাবতে লাগলাম। একটা কাজও আমার বাকি ছিল, সেটি হ'ল বৃটিশ কনসালের সঙ্গে দেখা করা। অবশেষে তাও সেরে এলাম। কনসালের সঙ্গে সর্ব্বত্র দেখা করতে হয়, দস্তখত নিতে হয়, পারলে উপদেশও মান্‌তে হয়। কিন্তু যেখানেই ভারতীয়ের সংখ্যা বেশী সেখানেই কনসালের সহানুভূতি পাই নাই। তার একমাত্র কারণ হল, আমাদের দেশী-ভাইয়েরা যেখানে যায়, সেখানেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই অর্থাৎ একে অন্যে বেশ খোঁচাখুঁচি করে, আর তার প্রতিধ্বনি পৌঁছে বৃটিশ কন্‌সালের

কানে। এতে দুঃখ করার কিছু নাই, এক দলের শিক্ষার অভাব, অন্য দলের যদিও বা একটু আধটু লেখাপড়ার দখল হয়েছে কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ হয় নাই মোটেই। কি করে নিজের সম্মান বজায় রাখতে হয় তার কোন খোঁজ-খবরই কেউ রাখে না। শুধু তোষামোদি। আমরা ভাবি চাটুকারিতা দ্বারা কাজ আদায় হয়। হতে পারে, তবে তা ক্ষণিকের তরে। যাকে তোষামোদ করা হয় সে মনে মনে জানে চাটুকার কিরূপ জীব। মুখে মুখে হয়তো আপ্যায়ন করে, কিন্তু অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। যে মানুষ, সে কি কখনও গরুর সঙ্গে মিতালি করে! গরু পোষে লোকে যতক্ষণ দুধের দরকার হয়। এই কথাটা কি সাংহাইয়ের হিন্দু-ভায়ারা বোঝে না? সবই বোঝে, কিন্তু অভ্যাস সহজে যায় না, অন্ততঃ যতক্ষণ না কঠোর হস্তে তার প্রতিকার হয়। কোথাও কোথাও দেখেছি এমন নমনীয় প্রকৃতির লোকদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে সংশোধনাগারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তুরস্কে মিল্‌বে তার এক নম্বর দৃষ্টান্ত। কই তুরস্কের লোক তো আর আল্লা আল্লা বলে হল্লা করে না, তারা শিখেছে অনেক। যারা এই ধরণের কিছু শিখতে চায়, গিয়ে দেখে আসুক আতাতুর্কের* দেশ, মিকাডোর দেশ।

পুলিশের নজরে

মনে বড়ই লেগেছে, আমি বোকা! এ দাগ মুছে ফেল্‌তে পারছি না অন্তর হতে, তাই মনে মনে পণ করলাম—এখন থেকে সতর্ক হব, আর কোন দিন এ সব ব্যাপারে হাত দেব না। তারপর ছোটখাট ভ্রমণ স্থরু করলাম সাইকেলে। ফরাসী কন্‌সেশনটা বেশ ভাল স্থান, দেখবার উদ্দেশ্যে সেখানেই যাতায়াত স্থরু করে দিলাম। ফলে এই কন্‌সেশনের বেশীর ভাগ বাসিন্দা

* নবতুরস্কের জন্মদাতা কামাল পাশা (আতাতুর্ক) আর ইহজগতে নাই। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ইনেনো আতাতুর্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলেছেন। তুরস্ক-নারীর 'পর্দ্দা' বর্জ্জন, ধর্ম্মান্ধতা দূরীকরণ, গণশিক্ষা প্রচলন, রোমক লিপি প্রবর্ত্তন, জাতীয়তার নবদৃষ্টি প্রচার সকলই আতাতুর্কের কীর্ত্তি। 'তরুণ তুর্কি' পুস্তকে সে-সব আমি বল্‌তে চেষ্টা করেছি।

যে সাদা রাশিয়ান তাদের সঙ্গে পরিচয় আর আলাপ হতে লাগল। তারা প্রায় সবাই ইংরেজী বলতে পারে। এই ফরাসী কন্‌সেশন হতে একখানি সাদা রাশিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র বের হয়, সে অফিসেও আনাগোনা করেছি। সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বড়ই ভাল লোক, আমার সঙ্গে সবাই অবাধে গল্প কর্‌তেন। তাঁরা প্রায়ই ভারতের কথা জিজ্ঞেস করতেন। লাল রাশিয়ানরা যে একেবারেই সৎ লোক নয় এটা ছিল তাঁদের কাথাবার্ত্তার প্রধান প্রতিপাদ্য এবং সুযোগ পেলে যে একদিন তাঁরা আবার জারের কোন-না-কোন নিকটস্থ বংশধরকে রাশিয়ার সম্রাট করবেন তাও আবেগের আতিশয্যেই বলতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে খিটিমিটি বেধে উঠ্‌ত ভগবানের কাছে তাঁদের আকুতি জানাবার বহর নিয়ে। আমি সোজা বলে দিতাম—এভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করে কোন লাভ নাই, যুক্তিও দেখাতাম, কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে, তাঁরা বিদ্বান বুদ্ধিমান হয়েও অনেক সময় যুক্তির ধার ধার্‌তেন না, বরং পরাজয়ের গ্লানি তাঁদের ধৈর্য্যহারা করে ফেল্‌তো আর তাঁরা আমার উপর চটে উঠ্‌তেন।

এই সাদা রাশিয়ানরা রুশ দেশ হতে পালিয়ে এসে চীনের বড় বড় শহরে বসবাস আরম্ভ করেছেন। সাংহাই নগরীতে যত 'কাবেরে' আছে তার প্রায় সবগুলিই তাঁদের দ্বারা চালিত হয়। দুটি ডলার মাত্র ফেলে দিলে সাদা রুশ যুবক যে আত্মমর্য্যাদার কথা ভুলে গিয়ে যা-তা করতে রাজি হতে পারে, একটি ঘটনা থেকেই তা আমি মালুম করে নিয়েছি। সাদা জাতির উপর আমার একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা চিরদিন ছিল। আমার ধারণা ছিল, টাকার প্রলোভনে ওদের দিয়ে অন্যায় কিছু করান যায় না। কিন্তু পরীক্ষার্থে একদিন একটি সাদা রুশ যুবককে আমিই বলি যে, সে যদি কাজটি হাসিল করে দেয় তবে তাকে পাঁচটি ডলার পুরস্কার দিব। প্রস্তাব করা মাত্রই সে তা করতে রাজি হয়েছিল। তাকে পাঁচ ডলার দিয়েছিলাম, সেও কাজটি করেছিল, যদিও আমি তার ফল ভোগ করি নাই, কারণ যে কাজের ভার দিয়ে ওকে পরখ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে কাজটি হল বিলাসিনী সংগ্রহ। তা ছাড়াও একদিন আমারই হোটেলে একজোড়া সাদা রুশ স্বামী-স্ত্রী মাতাল হয়ে প্রকাশ্যে যে জঘন্য আচরণ করেছিল, তা বোধ হয় আমাদের

দেশের কোন লজ্জাহীন নীচাশয় দ্বারাও সব সময় সম্ভব হয় না। পেটের দায়েই হোক বা যে জন্যই হোক, যখন জাপানীরা চীনাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল তখন এই সাংহাইয়েরই বুকে সাদা রুশ যুবকেরা চীনের অন্নে পুষ্ট দেহ নিয়ে জাপানীদের তরফে কুলির কাজ করেছিল। ফরাসী সরকার ওদের অনেককে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করেছেন। ওদের আচার-ব্যবহার এবং সংযম সৈনিকের হিসাবে বেশ ভাল, তা কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি। সৈনিক জীবনে কতকগুলি নিয়ম-কানুনের অধীন থাকতে হয় বলেও তা হতে পারে। ওদের ভিতর জুয়াখেলা বেশ প্রচলিত। এমন কি ছোট ছোট ছেলেরাও যে চীনা ফ্যাসানে 'মাজাং' খেলে বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করে তা আমারই চোখের সমুখে হোটেলে বসে দেখেছি। এই শিশুদের মা-বাপ এর কোন খবর রাখেন কিনা বুঝা কঠিন, কারণ আমারই পাশের ঘরে এ শ্রেণীর ছোকরার দল যে 'মাজাং' খেলে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছে তা অনেক সময়ই টের পেয়েছি, তাদের পিতামাতা নিশ্চয় তাদের ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন। আবার যাদের হাতে বেশ দু'পয়সা হয়েছে, তারা নিজেদের দুর্দ্দশার কথা ভুলে গিয়ে হারিয়ে-যাওয়া আভিজাত্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। এরা নিজ দেশ হতে বিতাড়িত, চীনাদের দ্বারা ঘৃণিত, অন্যান্য ইউরোপীয়ানদ্বারা অবহেলিত—এদের দেখলে মানুষ মাত্রেরই বোধ করি দয়া হয়, কারণ এদের দেশ নাই, বাড়ী নাই, আয় নাই—এক কথায় এই মাটির ধরায় সর্ব্বহারা যাযাবর বলে পরিচয় দিবার দাবী যদি কোন এক জাতির থাকে, তবে তা এদের আছে ষোল আনা। বিকালবেলা কিন্তু কাবেরেতে ওদের নৃত্যগীত দেখলে মনে হয় না, এদের কোন অভাব-অভিযোগ থাকতে পারে, কিম্বা বাস্তবে লাল রুশদেরে তাড়িয়ে দেশে যাবার চেষ্টা এদের রেয়েছে এতটুকুও। এদের ভিতর আবার নানারূপ ভিখারীও আছে; তবে এটা লক্ষ্য করেছি, দ্বিচক্রযানে পৃথিবী ভ্রমণ, হুইল-কারে জিনিষ-পত্র রেখে পৃথিবী প্রদক্ষিণ প্রভৃতিকে ব্যবসাতে পরিণত করতে এদের আর দোসর নাই। এদের এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে ঘৃণা জন্মেছিল সাইকেল ভ্রমণের উপর, ইচ্ছা হয়েছিল, সাইকেলটা রেখে দিয়ে দেশে চলে আসি। পরে কিন্তু দেখতে পেলাম, এরা শুধু চীনের ভিতরই ঘোরে, বাইরে যায়

না। এরাই শুধু যে ভ্রমণকে পেশারূপে আবিষ্কার করেছে এমন নয়, ইউরোপের অনেক বেকার যুবকও আজ অনুরূপ পৃথিবী-ভ্রমণ করে জীবিকার সংস্থান করছে। তবে এই সব বেকার যুবক বেশীর ভাগই ইউরোপে থাকে, পূর্ব্বদেশে বড় আসতে পারে না।

সাদা রাশিয়ানদের দৈন্য দেখলে মনটা আপনি কেঁদে ওঠে। আমি চেষ্টা করেছি ওদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কতটুকু তা এক এক করে তুলনা করতে, জানি না তাতে কতটুকু কৃতকার্য্য হয়েছি। সাদা রাশিয়ানদের অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি তারা দেশে ফিরে যেতে চায় কি-না। অনেকেই বলেছে, প্রাণ তাদের দেশে ফিরে যাবার জন্য অতিষ্ঠ, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, ভগবান, টাকাকড়ি—এই কয়টির মায়া কাটাতে পারে না বলেই দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। যদি এই কয়টি পদার্থ ছাড়তে পারে, তবে দেশের দ্বার তাদের জন্য অবারিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক ভেবেছি এই ব্যক্তিগত স্বার্থ কয়টির কথা নিয়ে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি নাই।

একদিন একটি সাদা রাশিয়ানের দোকানে বসে আছি, এমন সময় একটী চীনা আমার দিকে বিষ নজর হেনে চলে গেল। আমি তা লক্ষ্য করতে পারি নাই, কারণ আমার সে চক্ষু নাই। সাদা রাশিয়ান ভদ্রলোক আমাকে বলে দিলেন—"দেখেছেন একটী লোক আপনার দিকে কেমন কট্‌মট্ করে চেয়ে চেয়ে গেল, একটু হুঁসিয়ার হয়ে পথে চল্‌বেন।" ভদ্রলোককে কিছু বলি নাই, কিন্তু একথা আমার জানা ছিল—হুঁস যদি আমার থাকৃত তবে এত বিপদে আমায় হামেশা পড়তে হ'ত না। মুখ খুলেছি তো এমন একটা বক্তব্য মুক্তি পেয়ে গেল যে, সবাই তাতে অসন্তুষ্ট হ'ল। সেদিনই বিকাল বেলা যখন হোটেলে ফিরছি, পিছনদিক হতে একটি ভদ্রলোক আমাকে বল্‌লেন, 'একটু আসবেন?' ফিরে দাঁড়ালাম; অপরিচিত মুখ, তা বলে ভয় হ'ল না। জিজ্ঞাসা করলাম—'কোথায় যেতে হবে?' ভদ্রলোক বল্‌লেন—'সিনেমা ঘরটার পাশেই।' গেলাম তাঁর সঙ্গে। একটু দূরে একটা বাড়ীর ফটকে পৌছে তিনি বললেন—'এই বাড়ীটার ভিতরে চলুন। আপনার ভয় নাই।' ভয় তো আমার কোন দিনই ছিল না, এখনও তবে বারে বারে ও-কথা শুনতে

হচ্ছে কেন তা-ই অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোকের অনুগমন করলাম। বাড়ীর উপর তলায় এক ভদ্রমহিলা একটা চীনা পা-জামা সেলাই করছিলেন। তাঁর চোখে চশমা ছিল। তাঁকে আমি নমস্কার জানালাম। ভদ্রমহিলা আমাকে বসতে দিয়েই বললেন, "অনেক দিনের ইচ্ছা একবার ভারতে গিয়ে দেখে আসি—ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষ, হিন্দুস্থান, কিন্তু হয়ে উঠ্‌ল না। আদপেই কখনও হবে কিনা তাও বল্‌তে পারি না। আমি ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করি এবং আপনার হোটেলের কাছেই থাকি, তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম—আমারই বড় ভাইকে ; এত তাড়াতাড়ি যে আপনার সাক্ষাৎ মিলবে তা ধারণা করতে পারি নাই। চীনা খাবার খেতে পারেন তো?" আমি বল্‌লাম, "নিশ্চয়ই পারি।" খাবারের ঘরে নিয়ে গেলেন। চমৎকার খাবার, পরিপাটী ব্যবস্থা। আহারের পর আমাকে বিদায় দিলেন। আবার হোটেলের দিকে রওনা হলাম। পথে আবার একটা লোক ডাক্‌ল, কিন্তু লোকটার ডাকের ভঙ্গি, তার সচকিত হাবভাব আমার মোটেই পছন্দ হ'ল না, তবুও ঘুরে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি চাই?' 'চাই না কিছুই, শুধু কথা বল্‌তে চাই'—বলেই লোকটি আমার পকেটে হাত প্রবেশ করিয়ে দিল। ডান দিকের পকেটে ছিল তিনটা পয়সা। সে তা বার করে বল্‌লে, 'এ আমি চাই না, চাই আর কিছু ; নিয়ে নাও'—বলেই পয়সা তিনটা আমার পকেটে ফেলে চলে গেল। ধরতে পারতাম লোকটাকে। কিন্তু ধরি নাই, শ্রমের ভয়ে—শরীর অপটু বলে একটুতেই হায়রান্ হয়ে পড়ি, কি জানি আবার যদি রক্ত ওঠে।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি একজন চীনা-ভদ্রলোক আমার ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে স্পষ্ট করে বললেন, তিনি গুপ্ত পুলিশ, কয়টি কথা বলতে এসেছেন। তাঁকে ঘরে এনে বসালাম। পুলিশ যে ধরণেরই হোক তার সঙ্গে আমি কোন রকম ঝগড়া করি না। কারণ এই পুলিশ হতে সব সময়ই কিছু উপকারের আশা রাখি। তিনি আমাকে স্পষ্ট করে বললেন, আমার সরলতাই নাকি আমার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যত সত্বর হয় আমার সাংহাই ত্যাগ করা উচিত, নতুবা বিপদ হতে পারে। এ শহর সত্বর না পরিত্যাগ করে যাবার কারণ তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। অসুস্থতার

কথা শুনে তিনি দুঃখ করলেন, তারপর বললেন যে, আগামী কল্য হতে এ স্থান ছেড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমার নিরাপত্তার জন্যে একজন হিন্দু গুপ্ত-পুলিশ দিবেন। সেই হিন্দুটি সব সময়ই আমার কাছে থাকবে। অন্তরের সহিত তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে খট্‌কা লাগলো—এ তো আবার আমার উপর খবরদারি করবার অজুহাতে নজরবন্দী রাখার ব্যবস্থা নয়! কে জানে, আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়ে অযথা সময় নষ্ট হয়।

এই গুপ্ত-পুলিশের সঙ্গে আমার মুখে কথা হয় নাই, তিনি এক টুকরা কাগজে তাঁর বক্তব্য বলেন, আমি তার জবাব লিখে দেই। একবার তিনি আর একবার আমি—এমনি পালা করে লেখার কসরৎটা চল্‌ল—এ যেন বোবায় বোবায় কোলাকুলি! যখন কথা সব সারা হয়ে গেল, তিনি এমন করে একটা দেশলাই জ্বাললেন যেন সিগারেট ধরাবেন। একটা সিগারেট চেয়েও নিলেন। তারপর আমারই সম্মুখে যখন কাগজখানা ছাই হয়ে গেল, তখন তা ঘরের বাইরে ফেলে দিলেন। সে ভদ্রলোক বেশীক্ষণ বসলেন না। চলে যেতেই এলেন হোটেলের কেরানী।

কেরানী ভদ্রলোক সাংহাই নগরীর একজন পুরাতন বাসিন্দা, সাংহাই সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন। তিনি বললেন, ঘাবড়ে গেছেন বুঝি? ঘাব্‌ড়াবেন না, আমাদের দেশে এসেছেন, চীনজাতিকে, চীনের চাতুরীকে আপনার এতদিনে বুঝে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু সে ব্যাপার সোজা নয়। আপনার বুঝা দূরের কথা, এমন কি "আম্লকই"ও (ইংরেজ ভূতও) বুঝতে পারে না। এখানে বলে দেওয়া দরকার যে, চীনাদের মতে বিদেশী সবাই "কই" অর্থাৎ 'ভূত', শুধু চীনারাই ভূত নয়। ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, আর সাতটা দিন থাকলেই আমার শরীর চাঙ্গা হবে। এই সাতদিন আমি আর বের হচ্ছি না। যাঁরা দেখা করতে ইচ্ছা করবেন, এই ঘরেই আসবেন। কেরানী হেসে বললেন, 'যদি কেউ আপনার অনিষ্ট করতে চায়, এই ঘরেও তা অনায়াসে করতে পারে। তবে আপনার কেউ কিছু ক্ষতি করবে না জেনে রাখুন।' তাঁর কথায় বেশ হাসি পেল, কিন্তু চেপে গেলাম। তিনি আমাকে স্পষ্ট করে বললেন, "একদিন ছিল যখন চীনদেশকে জোর-জুলুমে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা কেউ মনেও স্থান দিত না, কারণ সেকালে মুখের কথাই

যথেষ্ট ছিল। এখনও সে ভাব অনেক স্থানে আছে, কিন্তু আমাদের লোভী সমর-নেতার (war-lord) দল আমাদের সর্ব্বনাশ করেছেন, আর করেছেন দেশী খৃষ্টানগুলি, নতুবা আজ আমাদের এই তুর্দ্দশা হত না। আমাদের দেশের গোপনীয় কথা যেরূপভাবে প্রচার হয়ে পড়ে, তা যদি না হ'ত তবে জাপানীরা এত সহজে মাঞ্চুরিয়া দখল করতে পারত না। তবুও যেটুকু সেয়ানা দৃষ্টি আমাদের আছে তারই কারসাজিতে আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন দেখে আমি কিন্তু তুঃখিত নই, বরং আনন্দিত। তা হলে কি হবে, এটুকু শক্তিই কি পূরাপূরি দেশের কাজে নিয়োগ করা যাচ্ছে নির্ব্বিবাদে? যদিও আজ চ্যাং কাইসেকেরও জাপানী প্রেম অনেকটা কমে গেছে, তবুও দেশের লোক তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না বলেই তুটি প্রতিষ্ঠানের ভিতর অনুক্ষণ ঝগড়া চলেছে। আপনি পড়েছেন তুটি প্রতিষ্ঠানেরই নজরে, এতে আপনার অকল্যাণ হবার কিছুই নাই।

"প্রথমটি ভেবেছে, আপনি দ্বিতীয়টির সাহায্য-প্রার্থী এবং প্রথমটির গুপ্তকথা দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে বরাবর দিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম প্রতিষ্ঠানটী প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে, দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চ্যাং কাইসেকের আমন্ত্রণে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে। প্রথম প্রতিষ্ঠান চ্যাং কাইসেকের রাষ্ট্রতন্ত্রকে যে কোন মুহূর্ত্তে ঠেলে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু মিঃ ওয়াং চি ওয়াই সেই সাহসটুকু এখনও বুকে বাঁধেন নাই কেবল শক্তিশালী জাপানীদের আজই ঘাঁটাতে চান না বলে। নিজের শক্তি আরো বৃদ্ধি করে যন্ত্রবলে জাপানের অনেকটা সমকক্ষ হওয়ার প্রতীক্ষায় আছেন। তিনিই হলেন প্রথম প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উপদেষ্টা, চালক এবং রক্ষক। মার্শ্যাল "উ পে ফু" (Yu peh foo) হতে আরম্ভ করে তথাকথিত খৃষ্টান জেনারেল ফেঙ্গুশেন পর্য্যন্ত তাঁরই কথায় ওঠেন বসেন।"

কথাগুলি শুনতে বেশ ভাল লাগছিল, আরও শুনবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু অন্য এক ভদ্রলোক এসে তাতে বাদ সাধলেন। সেই ভদ্রলোক আর আর কেউ নন, যাঁর অযাচিত আহ্বানে তাঁর বোনের বাড়ীতে খেয়ে এসেছি। এসেই বললেন, যদি কাজ না থাকে চলুন রাত ১০টা অবধি গল্প-গুজবে কাটান যাবে।

তাঁর সঙ্গে এবার গেলাম তাঁর নিজের বাড়ীতে। গিয়ে দেখি ঘরটাতে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে আছেন—আমারই অপেক্ষায়। চীনা প্রথামতে যখনই কারও কাছ হতে অর্থ হোক আর অজানা তথ্যই হোক—এমন কিছু আদায় করবার মতলব করে ডাকা হয়, তখন তাকে বেশ আদর-আপ্যায়ন করা হয়। চীনা এবং ইংরেজী দুই রকমের চা ছিল। দুধ এবং চিনি মিশান চা-কে ইংলিশ চা বলা হয়। শুধু গরমজলে সিদ্ধ চা-কে চীনা চা বলা হয়। তাছাড়া পিষ্টকেরও অভাব ছিল না। সিগারেট চীনাও ছিল, বিদেশীও ছিল। তবে লক্ষ্য করলাম দিবার বেলা চীনা সিগারেটই আমাকে দিলেন, বিদেশী সিগারেট তাঁদের হাতে উঠল না, সরকারী মহলে কিন্তু বিদেশী সিগারেটই চলে বেশী। যথারীতি ভোজের ব্যাপার সমাধান করে মজলিশ জমিয়ে বসা গেল। সূচনায় সামান্য ভ্রমণ-কথা বলার পরই ভারতের রাজনীতি হতে সমাজনীতি পর্য্যন্ত সব রকমের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হতে লাগ্‌ল। যা আমার জানা ছিল তাই বলেছিলাম। আমার নিছক সত্য কথা শুনে সমবেত জনতা বিশেষ করে ভদ্র-মহিলাগণ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ভদ্রমহোদয়গণের মুখে কিন্তু জাপানী প্রথামতে "ছ-দিশ-কা ?" (Saw Dish Ka) বাণীটিই বার বার উচ্চারিত হল। এই 'ছ-দিশ্-কা' মানে 'তাই-নাকি !' কিন্তু এত সাদাসিধে এর বলবার উদ্দেশ্য নয়। এর সঙ্গে উহ্য আছে আরেকটু ভাব—সেটি হল 'এমন অবস্থা আর চল্‌তে দেওয়া হবে না, প্রতিকার করতেই হবে।' এত রকমারি প্রশ্নের পর প্রশ্ন যে আমার প্রতি করা হবে, তা আবার এতটা সূক্ষ্ম চুলচেরা হিসাবে ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে—এমনটি আমি কল্পনা করতেও পারি নাই। আমার ধারণা হল, যাঁরা ভারতে অতি বিচক্ষণ গোয়েন্দা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং বই লিখেছেন, তাঁরাও এমন সুন্দর করে প্রশ্ন করতে পারতেন না। এই সর্ব্বপ্রথম আমার দেখা হ'ল চীনের একদল আধুনিক যুগের পরম জ্ঞানীর সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কথা হওয়ায় চীনের অনেক গভীর তত্ত্ব অবগত হয়েছিলাম, অবশ্য ভারতের অনেক কুরীতি-নীতির কথা বলে তবে সে সব আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়েছিল।

বিবাহ-পদ্ধতি

আমাদের দেশে যেমন ছেলের পিতা মেয়ের মা-বাপের যথাসর্ব্বস্ব পণরূপে গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধা করে না, চীনদেশেও মেয়ের পিতা-মাতা ছেলের মা-বাপের উপর তার চেয়েও বেশী জুলুম করত। তাদের পথে বসাতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করত না, সঙ্গে সঙ্গে যে নিজের মেয়েকেও রিক্ত নিঃস্ব করা হচ্ছে, তাও তারা গ্রাহ্যির মধ্যে আন্‌ত না। বর্ত্তমানে সে সব আর নাই বললেও চলে। চীনাদের সমাজে একই বংশে বিবাহ হয় না। ওদের নামের সঙ্গে বংশ-পরিচয় যোগ দিবার কায়দাটি নিম্নে যে দুটি ভাইয়ের নামের নমুনা দেওয়া হ'ল, তা থেকেই পরিষ্কার বুঝা যাবে, যেমন,—চ্যং মথ এবং চ্যং ওয়া। সাধারণতঃ আমরা এই "চ্যং" শব্দটাকে ইংরেজী (cheong) থেকে বাংলা অনুবাদেই হোক আর য-ফলাকে 'ইয়' উচ্চারণ করার ভারতের প্রদেশবিশেষের বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক—'চিয়ং' করে ফেলি, কিন্তু ঠিক ঠিক উচ্চারণ হল "চং", এই শব্দই বংশবিশেষের পরিচায়ক। আর তা বসান হয় ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়মূলক নাম-কঙ্কালের পূর্ব্বে। এমনি করে প্রত্যেকের নামের প্রথম ভাগে থাকে বংশ-পরিচয়। যার নামের পূর্ব্বে চ্যং শব্দ আছে, কোন চ্যং বংশীয় চীনা যুবক বা যুবতী সেই পরিবারে বিবাহ কর্‌বে না, সে বিবাহ কর্‌বে ওয়াং, লুং এবং অন্যান্য বংশে।

গরীবদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। ক্রমে তা মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছুটা প্রসার লাভ করেছে। সে প্রথাটি হ'ল এই যে, তারা তাদের ছেলে-মেয়ের জন্ম হবার পরই বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলে। ছেলে বড় হলে তারা এত টাকা সংগ্রহ করতেও পারবে না, ছেলের বিবাহ দেওয়াও ঘটে উঠ্‌বে না, অথচ বেশী বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না দিলে যদি ছেলে অসৎ প্রতিপন্ন হয়, তবে সে ছেলের মৃত্যু পিতামাতাকে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হয়। এরূপ ঘটনা অনেক ঘটেছে বলেই পিতামাতা দুই মাসের ছেলের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়।

চীনদেশে বারবনিতা ছিল না, এখনও পল্লীগ্রামে নাই। তার নানা কারণ আছে। তার মধ্যে বিশেষ কারণ হচ্ছে তাদের বিবাহ প্রথা; বিশেষ

ক'রে গরীবদের মধ্যে। যেদিন ছেলের জন্ম হল, তার তিন চার দিন পরই ছেলের পিতামাতা লেগে যায় ছেলের বউ খুঁজতে। বউএর হয়তো তখনও জন্মই হয় নাই। আমাদের দেশে যেমন লোকে 'মিতালি' করে ঠিক তেমন চীনাদের ভিতর সখ্য স্থাপনের প্রথা আছে। সাধারণতঃ মিত্র হয় অন্য কোন বংশের লোক যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন চল্‌তে পারে। যেই ছেলের জন্ম হল, অমনিই ছেলের বাবা দৌড়ায় মিত্রের বাড়ী। মিত্রের স্ত্রী হয়তো গর্ভবতী, ব্যস, অমনি কথা পাকাপাকি রকম হয়ে যায়, 'দোস্ত, তোমার যদি মেয়ে হয়, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবে।' যদি মিত্রের মেয়ে না জন্মায়, তখন বাধ্য হয়েই অন্যত্র মেয়ে ঠিক কর্‌তে হয়। ধরে নেওয়া যাক্, ছেলের বয়স তিন মাস, মেয়ের মাত্র একদিন, তখন থেকেই ছেলের পিতামাতা মেয়ের পিতামাতাকে তিন ডলার করে মাসিক ভাতা দিতে আরম্ভ কর্‌বে। ছেলে এবং মেয়ে একই স্কুলে যাবে, অবাধে মিলে মিশে একে অন্যের বাড়ী যাতায়াত কর্‌বে, তাদের পতি-পত্নী সম্পর্কের কোন খবরই তাদের দেওয়া হয় না, তার মর্ম্মও বুঝবার কথা নয়; তাই মনে করে যেন তারা ভাইবোন অথবা খেলার সাথী মাত্র। তারপর যখন বছর দশেক তাদের বয়স হয়, তখন একদিন ছেলে এবং মেয়ের মা-বাপ বলে দেয় তারা স্বামী এবং স্ত্রী। ক্রমে যখন বয়স বাড়তে থাকে তাদের জ্ঞান জন্মে, মিলনও ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। তারপর যখন আঠার বছর বয়স হয়, তখন একদিন তাদের বাস্তব বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে যায়। এই বিবাহে উভয় পক্ষই আনন্দিত হয়, কারণ কোন রকম দায়-দাবী থাকে না কোন পক্ষেই। বিবাহে পুরোহিত আসেন বটে, কিন্তু কিছু পান না, বরং আশিসের সঙ্গে উপহারই দিয়ে যেতে হয়। বর আমাদের দেশে যেমন মুকুট পরে, ওদের দেশেও মুকুট পরার প্রথা তেমনি রয়েছে, তবে হয়তো মুকুটের ডৌলটা অন্য রকমের। মেয়ের মাথায়ও আমাদের দেবীমূর্ত্তির মুকুটের মতই একটি পরান হয়। মেয়ের মুখখানি রাখা হয় অনাবৃত, তবে চোখ দুটীর দৃষ্টি ডাইনে বাঁয়ে ঘুরাতে দেওয়া হয় না একরকম—সমুখে শূন্যদৃষ্টিতেই নিবদ্ধ রাখবার নিয়ম প্রচলিত। বিয়ের মন্ত্রও বড়ই সাদাসিধে। কয়টি কথা বলার পরই মেয়েটি উপস্থিত সবাইকে 'ফিকা-চা' খেতে দেয়, তারপর বিবাহ-আসর থেকে বর এবং কনে চলে যায়।

যার বাড়ীতে বিয়ে হয় তাকেই উপস্থিত লোকজনকে খাওয়াতে হয়। এই হল বিবাহ অনুষ্ঠানের আদি ও অন্ত।

যদি এই বিবাহ হবার পূর্ব্বে ছেলেটি মরে যায়, তবে ছেলের পিতা মেয়েকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার ইচ্ছামত বিবাহ দেয়, যেন সে-ই মেয়ের পিতা। অবশ্য বিবাহের সময় মেয়ের প্রকৃত পিতামাতাকেও নিমন্ত্রণ করতে হয়। যদি মেয়েটি মরে যায়, তবে মৃত মেয়ের পিতা বাগদত্ত ছেলেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং নিজের ইচ্ছামত কোন গরীবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজ বাড়ীতেই রাখে। সম্পত্তি বিভাগের বালাই নাই, যেহেতু ভূ-সম্পত্তি যাদের থাকে তারা এরূপ বিবাহ-প্রথা অবলম্বন করে না। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, যার স্ত্রী মরে গেছে, তাকে বিধবা বিবাহ করতে হ'ত, কুমারীর সঙ্গে কোন মতেই তার বিবাহ হবার সুযোগ দেওয়া হ'ত না। কিন্তু যদি কোন লোক স্ত্রী মরার পর বিবাহ না ক'রে কোন বিধবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করত, তবে স্ত্রী-পুরুষ দুজনকেই একত্র বেঁধে এক গুলীতে মারা হ'ত। কোন অজুহাতেই এ অপরাধের ক্ষমা ছিল না। এখন সে-নিয়মের কতকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে বটে, মাঝে মাঝে কিন্তু পূর্ব্বের নিয়মের জের এখনও চলে। এমনিধারা কড়া নিয়ম থাকার জন্যই চীনদেশের অভ্যন্তরে কোনরূপ নারীঘটিত ব্যভিচার চলতে পারত না বলে শোনা যায়। অভিজাতেরা তাঁদের মেয়েদের পায়ে লোহার জুতা পরাতেন, শুধু তাদেরে পঙ্গু করে রাখার জন্যই অর্থাৎ তাদের অসৎ পথে যাবার অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, নারীকে দাবিয়ে রাখা, সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের আজ্ঞাধীনা ও কৃপার পাত্রীরূপে পরিণত করে তাদের উপর স্বেচ্ছাচার চালান।

বংশ-গৌরব চীনদেশে কোন দিন অহমিকার মোহ বিস্তার করতে পারে নাই, এখনও পারে না। তবু যদি কেহ বলেন দুনিয়ার সব দেশেরই মত সেখানেও আভিজাত্য-গর্ব্ব আছে, তা হলে তাঁকে বলব, তিনি দয়া করে একবার চীনের গ্রামগুলি বেড়িয়ে আসুন—দেখতে পাবেন, যুগ-যুগাগত যে সাম্য সেখানে বিরাজিত, আভিজাত্যের স্পর্শ তাতে কোনদিনই লাগে নাই। তবে সে স্পর্শ লেগেছে কোথায় এবং কখন? ইউরোপীয়ানদের আগমনে চীনের জনপদবাসী শিখেছে সে বদ্‌অভ্যাস। একদিন যাঁরা রাজা ছিলেন,

মহারাজা ছিলেন, কোনমতে যদি তাঁদের পতন হয়ে যেত, তবে তাঁরা সামান্য মজুরের কাজ ক'রে দিন কাটাতেও কুণ্ঠিত হতেন না। যাঁরা চীনের ইতিহাস পাঠ করেছেন তাঁরাই সেকথার সাক্ষ্য দিবেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন আভিজাত্য আর সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়ে চীনের মেয়েদের লোহার জুতা পরান্ হ'ত? তার উদ্দেশ্য তো আগেই ইঙ্গিতে বলেছি। তবে আরও একটু রহস্য আছে। চীনের স্ত্রী-জাতিকে তখনকার দিনের জন্য দুভাগে বিভক্ত করতে পারি। একটি হল,—গরীবের স্ত্রী, যাকে—ঘাটে, মাঠে, নৌকায় কাজ করতে হত; তারা লোহার পাদুকা পরে পা ছোট করত না। যাদের পরিবারে এসব কাজ করতে হ'ত না, কোন প্রকার অভাবের তাড়না না থাকায় আলস্যে-বিলাসে অখণ্ড অবসর কাটাতে হ'ত, তাদেরই মাঞ্চু রাজ-পরিবারের অনুকরণে পা ছোট করবার জন্য লোহার জুতা পরতে দেওয়া হত শিশুকাল হতে। মাঞ্চুরা নিয়ে এসেছিল এ-সব সঙ্কীর্ণতা, বিলিয়ে দিয়েছিল তাদের পদানতদের মধ্যে; তারপর যখন আর কিছু বিতরণ করবার মত থাকল না, তখন বাধ্য হয়েই কিছু কিছু গ্রহণ করতে লাগল। ধীরে ধীরে শেষটায় মাঞ্চুদের সঙ্গে এদের বিভিন্নতা আর কিছুই রইল না। পরাধীন চীন মাঞ্চুদের আপন সত্তায় বিলীন করে নিল। ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেন তাদের দেওয়া লোহ-শৃঙ্খলের সঙ্গে শিখা এবং লৌহজুতাও চীন সাগরে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। সেই বিসর্জ্জনই সব নয়,—তাঁর নিজের জীবনে অর্জ্জিত পাশ্চাত্য দেশ থেকে সভ্যতার নামে ধার-করা আভিজাত্যের উৎকটতাও ছিল সে বিসর্জ্জনের অন্যতম উপচার; আর তারই সঙ্গে ছিল মাঞ্চুদের দেওয়াই বলুন, আর জোর করে গ্রহণ করানই বলুন, মাঞ্চু-আভিজাত্যের মূল কাঠামো; সেদিনই চীন প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হল সমাজ-গঠনে।

মানুষ সমাজের রীতি-নীতি, চিরাগত প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে কত যে অসৎ কার্য্য করতে রাজি হয় তা স্বদেশে তো দেখতেই পাওয়া যায়। এই চীন দেশেও তেমন কুপ্রথা নেহাৎ কম নাই। জনৈকা মহিলা তাঁরই দেশের এমন বহু কদাচারের বিষয় আমার কাছে বল্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই। তাতে দূষণীয় কিছু নাই, কারণ এই শ্রেণীর দিলদরিয়া ব্যক্তিকে কোন একটা দেশের বা একটা জাতির অপরিসর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁদের বিরাট

ব্যক্তিত্বের অপমান করা হয়; তাঁরা হলেন যাঁরা বিশ্বের, তাই তাঁরা নিজের স্বার্থকে পায়ে দলন করে জগতের মঙ্গলে ব্যস্ত হন। চীনের যে সব ছেলে চিরকুমার থাকত তাদের প্রতি সমাজের লোকের শ্যেন-দৃষ্টি সব সময় পড়ত। যেই কোন দোষ পাওয়া যেত অমনিই তাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে এমন শাস্তি দেওয়া হত যে, তারা জীবন রাখার চেয়ে শেষ করাই শ্রেয় মনে করত। এসব দুঃখকষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচাতে তারা চাঁদা তুলে বিবাহও করতে চেষ্টা করত। কিন্তু চাঁদা সংগ্রহে যদি কৃতকার্য্য না হ'ত, তবে তারা এমন একটা অপকৌশল অবলম্বন করত, যা বড়ই ঘৃণার্হ। ধনী-প্রৌঢ়রা যুবকের বিবাহের বন্দোবস্ত করত এবং সেজন্য বিবাহের পণের টাকাও দিত। বিবাহের পর কিন্তু কনেকে বরের বাড়ী না পাঠিয়ে যে পণের টাকা দিয়েছে তারই বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট কিছুদিন কাটাতে হত, তারপর সে বরের বাড়ী আসতে পেত। এখন আর সে প্রথা নাই।

এইতো গেল নিছক সামাজিক আলোচনা। তারপর শুনেছিলাম চীনের লোক কি করে লোকের মন গড়ে তুলছে—ভগবান, ধর্ম্ম, সমাজ সম্বন্ধে আধুনিক ভাব-ভাবনার ধারা জনগণের ভিতর কি করে প্রচার করছে—তারই কথা। কথা যত হয়েছিল লক্ষ্য করেছিলাম একজনই ছিল বক্তা, যখনই কারুর মতের গরমিল হচ্ছিল তখনই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ না করে বক্তার কথা শেষ হবার অপেক্ষা করছিল। আমার যদিও নানা কথাই জিজ্ঞাস্য ছিল তবু যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার মাথামুণ্ড কিছুই মনে নাই। মনে কি-ই বা থাকবে, আর জিজ্ঞাসাই বা করব কি? গভীর রাত্রিতে সভাভঙ্গ হ'ল, আমি হোটেলের দিকে রওনা হলাম।

নতুন রহস্য

ওদের কাছ থেকে চলে একটা ছোট পথে পড়েছি। বাতিগুলি মিট মিট করে জ্বলছে, লোকের চলাচল নাই বললেও চলে, মাঝে মাঝে যে দু-একটি লোক চল্‌ছিল, তারা যেন কি এক বিভীষিকা হতে আতঙ্কে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট টানতে টানতে

হোটেলের দিকে চলেছি। আমার ঠিক মনে আছে, তখন ভাবছিলাম 'টাকু' কি করে যেতে হবে, কারণ পিকিনের পথ এই টাকু থেকেই ধরতে হয়। টাকুর পথঘাটের মানচিত্র পর্য্যন্ত কিনেছি, তাই মাথায় খেলছিল, যেন আমি টাকুরই কোন পথে হাঁটছি। হঠাৎ দুটী লোক এসে আমাকে ধরল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের অনুসরণ করতে বল্‌ল। হোটেলের কেরানী বলে দিয়েছে, কোন বিপদ হবে না। গুপ্ত-পুলিশ বলে দিয়েছে, সাবধানে থাকতে। দেখাই যাক কি হয়, ওরাও তো ইংরেজী বলছে, নিশ্চয়ই সাধারণ গুণ্ডার দলের লোক হবে না। বেশীদূর যেতে হল না, কাছেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু অন্ধকারেই বুঝতে পেরেছিলাম বাড়ীটা পুরাতন। পিছনে চলতে হয় নাই আগেই চল্‌তে হল। প্রথম ঘরটা অন্ধকার, এত অন্ধকার যে তিনজন লোকের বেড়াজালে ঘিরে যদি আমাকে শক্ত করে ধরে না রাখা হ'ত তবে এই তক্কেই পালিয়ে আসতে পারতাম। সেখান থেকে নিয়ে গেল আর একটা ঘরে, তাতে একটা চর্ব্বি বাতি মাত্র জ্বল্‌ছে, লোকজন নাই। তারপর আর একটা ঘর। দরজাটা খুল্‌তেই দেখলাম দুটী লোক দাঁড়িয়ে আছে দুদিকে দুটা পিস্তল নিয়ে। আমাকে ওরা টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসাল। বসলাম একটা টুলের উপর।

কতকক্ষণ পরে একজন লোক এল। সে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললে, "তোমার কাছে আমাদের লোক দুবার গিয়েছিল, কিছু দাও নাই কেন?" কে আমার কাছে গিয়েছিল আর কি চেয়েছিল তা আমার মনেই হ'ল না। আমি বললাম, কেউ আমার কাছে গেলেও কিছুই চায় নাই। না চাইলে আমি দিব কি করে? "হ্যাঁ ন্যাকামীর দরকার নাই। সেদিন 'হিন্দুদের কাছ থেকে দুশ' পঞ্চাশ ডলার পেয়ে, তারপর পেয়েছ বড় দোকান হতে একশ' পঞ্চাশ ডলার, এখন চিঠি লিখে দাও মিঃ কমিসেরিয়েটের কাছে—সব টাকা পাঠিয়ে দিতে। যে পর্য্যন্ত টাকা নিয়ে না আসবে, সে পর্য্যন্ত তুমি এখানে বন্দী।" টাকাগুলি পাঠিয়ে দিতে পার্শী ভদ্রলোকের কাছে চিঠি লিখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, দয়া করে দু'খানা কম্বল দিন, যাতে রাত কাটাতে পারি। কম্বল পাব কিনা জবাব পেলাম না। চুপ করে বসে থাকতে হ'ল অনেক সময়। তারপর একটি লোক এসে পাশের একটা ঘর

খুলে দিল। বেশ সুন্দর সাজান বিছানা, সিগারেট এবং চা তাতে দেওয়া ছিল। আকাশ-পাতাল চিন্তাকে সাথী করে বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে পড়লাম। সকল ভাবনা কোথায় উবে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়লাম।

প্রভাত হ'ল। একটা লোক এল চা এবং ক'খানা চীনা বিস্কুট নিয়ে, বেশ করে খেয়ে নিলাম। লোকটাকে চিনতেও পারলাম, এ লোকটাই কট মট করে আমার দিকে চেয়ে ছিল সাদা রাশিয়ানের দোকানে। তাকে কিছুই বললাম না! চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মনকে একটা প্রসঙ্গে নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলাম। এতে এমন একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে হয় মনে মনে, যাতে সব ভুলে গিয়ে একটি কথাতেই মন নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। আমার কিন্তু একসঙ্গে তিনটি শব্দই অনবরত মনে আসতে লাগল, তাও আবার এমন জটবাঁধা হয়ে যে একমনা হওয়া তো দূরের কথা, মনটা রাজ্যের যত চিন্তায় আরো বেশী করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগ্‌ল। আমার একটি রোগ আছে, সেই রোগটি আবার আমার মনকে একাগ্র হতে অনেক সময় দেয় না, তাই আমি সব সময়ই চেষ্টা করি যাতে আমার মনে কোন চিন্তাই আসতে না পারে। পর্দ্দার ছবির মত চিন্তার পর চিন্তায় অনেক সময় কাটিয়ে শেষটায় ঘুমিয়ে পড়লাম। দ্বিপ্রহরের খাবারের ব্যবস্থা কেউ ক'রে দেয় নাই, তাই ঘুম থেকে উঠে বসে আবার চিন্তাই সার করতে হ'ল। সিগারেট অনেক ছিল, তাই রক্ষা! যদি একটা বই থাকত হয়তো পড়তাম, কিন্তু কোন বই ছিল না। পকেট থেকে যত কাগজ-পত্র ছিল সবই বার করে ফেললাম, তাতে এমন কিছু ছিল না যা পড়তে পারি। ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম, এমন কোন ফাঁক-ফোকর ছিল না যে পালিয়ে যেতে পারি। হাতে ঘড়ি ছিল না যে সময় নির্ণয় করতে পারি আবার চুপ করে থাকতে হল। এই একঘেয়ে চুপ-চাপ্‌ থেকে কি করে সময় কাটাতে হয় তার একটা সহজ উপায় হল, ভগবান বলে একটা বৃহত্তর জীবের মনে মনে সৃষ্টি করা এবং তারই আরাধনা করা; তাও যদি না করতে ইচ্ছা হয়, তবে মন যদিও একটাই, তবুও তাকে দুটো ঠাউরে নিয়ে—দেহের মন আর প্রাণের মন এ দুটীর পৃথক সত্তা আবিষ্কার করে একটীর সঙ্গে অন্যটীরে

দিয়ে কথা বলান ; এতে অনেক সময় পার করে দেওয়া যায়, নানা উদ্বেগেরও শান্তি হয়। যাঁরা নির্জ্জন কারাবাসে দিন কাটান, তাঁদের মনের গতি কি হয় বলতে পারি না, তবে আমার সময় কাটত এমনি করেই।

সারাটা দিন কাটল, কেউ এল না, এদিকে ক্ষুধায় অস্থির হতে হচ্ছে। ক্ষুধার সময় ভাল খাদ্যের কথা চিন্তা করতে নাই, ভাল খাদ্যের কথা চিন্তা করলে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় এবং যাতনা অসহ্য হয়ে ওঠে। ক্ষুধার কথা যেই মনে হতে থাকৃত, অমনি আমি চিরতা, নিমপাতা, কুইনিন—এসব তিক্ত ঔষধের কথা ভাবতে স্বরু করে দিতাম। মাঝে মাঝে খানিকটা ফিকা চা'র জল মুখে দিয়ে জিভটা একটু ভিজিয়ে নিতাম। এরূপ নানা চিন্তা-ভাবনায় দিনটা কাটল। সাঁঝের আমেজের সঙ্গে মনে হতে লাগল, হয় তো রাতে এরা আমাকে একেবারে সাবাড় করে দিবে ; কারণ, মিঃ কমিসেরিয়েট টাকা তো দিবেনই না, বরং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিবেন। পুলিশে খবর দিলেই নিশ্চয় মৃত্যু। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে মানুষের মনের গতি কি হয়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না ; যারা তার অভিনয় করে তারাও বোধ হয় সেই অভিব্যক্তিতে কৃতকার্য্য হয় না। আমার মন হুবহু সেই অবস্থায়—দেহ থেকে আলাদা হয়ে প্রাণটা যেন নির্লিপ্ত দর্শকে পরিণত। তবে সেই অবস্থাটা আমার জীবনে এর আগে অনেকবার এসেছে কিনা, তাই আর তেমন ডর-ভয় হয় না। মরতে তো একদিন হবেই, তবে আর মৃত্যুকে—জগতের একমাত্র সমদর্শী বন্ধুকে ভয় করে লাভ কি ?

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। বাতির তেল কেউ এনে দিল না, অন্ধকারে বসে থাকৃতে হল। বসে বসে ক্লান্ত হয়ে আবার বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম, কি হবে না হবে তার ফলাফল ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দিয়ে। মনের কি ভাব হয়েছিল তা বলবার দরকার নাই, শুধু বলব, জীবনের প্রত্যেক মিনিট, মিনিটের মত মনে হয় নাই, মনে হয়েছিল, যেন এক একটা ঘণ্টা। এমনই করে কতকক্ষণ কেটে গেল, তারপর দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল আঁধারে তাকে চিনতে পারি নাই। দেশলাইয়ের সাহায্যে বাতিটা জ্বালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমুখে দেখতে পেয়েছিলাম সেই মুখখানি।

হাসতে হাসতে ছেলেটি বললে, আজ যদি আমি আপনাকে মুক্ত না করতাম তবে আর কেউ করতে পারত না। চলুন এখন হোটেলে দিয়ে আসি, কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আপনি যে আবদ্ধ ছিলেন, কারও কাছে একথা বলতে পারবেন না। দ্বিতীয় সর্ত্ত হল—আপনার পরিচিত কোন যুবক-যুবতীকে যদি কোথাও দেখেন, তবে উপযাচক হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। সর্ত্ত দুটি শিরোধার্য্য করেই ঘর থেকে বের হয়ে ছেলেটিকে বললাম, নিয়ে চল তো একটা হোটেলে, আগে কিছু খাই।

দুজনায় এডওয়ার্ড রোডের উপর একটা ভাল হোটেলে খেতে বসলাম। আমারই পাশে বসেছিলেন ক'জন পরিচিত ব্যক্তি; তাঁদের মধ্যে যুবক-যুবতী অনেকেই ছিলেন। মাথা নত করে খেয়ে নিলাম কারুর সঙ্গে কোন কথা না কয়ে। খাওয়া হয়ে গেলে পরিচিতা এক তরুণী আমার হাতে একখানি পাঁচ ডলারের নোট দিয়ে বললেন,—"Perhaps I have seen you somewhere, I think you are the Hindu traveller" চুপে চুপে বললেন, "আর দেখা হবে না, এখন সরে পড়ুন। বোধ হয় শরীর ভাল হয়েছে।"

চোখ তুলে ধরলাম, দেখলাম তরুণী একা নহেন। কয়েক জোড়া চক্ষুই পরিচয়ের মায়ায় মুখর, যদিও মুখ তাঁদের মূকই রইল আমার সমুখে। আমিও কথার জবাব দিইনি কথার অভাবে নয়, ছোকরার সেই সর্ত্তে। নইলে কৃতজ্ঞতা জানান যে কর্ত্তব্য, তা বুকের ভিতর সাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তাই বলে নোটখানা অবশ্য পকেটে পুরতে ভুলি নাই।

উঠে পড়লাম। বিল চুকিয়ে দিয়ে হোটেলে এলাম। হোটেলের ম্যানেজার থেকে ছোট কেরাণীটী পর্য্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তাঁদেরে বললাম, পথ হারিয়ে গিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলাম, শেষটায় একজন দয়া করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেন নাই, সবাই মুখ মলিন করে চলে গিয়েছিলেন। অনিচ্ছায় মিথ্যা বলেও পরিণাম দেখে বিবেকের চোখরাঙানি থেকে রেহাই পাই নাই।

বিদায় !

বিদায়, সাংহাই বিদায়! তোমার ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের পরতে পরতে দাগ কেটে বসে আছে। তোমায় ভুলতে পারব না! সঙ্কট-কণ্টকিত রহস্যময় সাংহাই, বিদায়! আজ অনিচ্ছায়ই তোমায় ত্যাগ করে যাচ্ছি। ইচ্ছা ছিল, শহরটি আরো ভাল করে দেখে তার একটি বিশেষ বিবরণ লিখে নিয়ে যাব, তা আর হল না। এই সাংহাই নগরীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত জটিল যে, শহরে থেকেও অনেকে বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কি! পূর্ব্বে কতকগুলি ঘটনা বলেছি, তা থেকেই বুঝা যায়, বাতাস কোন দিকে বইছে। তবে এটা বুঝতে অবশ্য বাকী ছিল না, চীনের সাংহাই নগরীর নব্য যুবক-যুবতী আজ সংঘবদ্ধ হতে শিখেছে এবং যারা তাদের অনিষ্টকারী নয়, তাদের কোনই অনিষ্ট করতে তারা আর রাজি নয়। যদি তাই করতে ইচ্ছা করত, তবে আমার মত সামান্য মানুষের এই সাংহাই নগরী থেকে বের হয়ে আসা মুস্কিল হয়ে পড়ত। আমাকে টাকু যেতে হবে, তার কোনই বন্দোবস্ত করি নাই। অবশ্য এই বন্দোবস্ত করতে একটু চালাকি খেলতে ছাড়িনি। আমার যত বন্ধুবান্ধব ছিলেন তাদেরে বলে দিলাম, আমি বৃটিশ জাহাজে করে টিয়েনসিনের কাছে টাইকো চলে যাচ্ছি এবং কাজেও তা দেখাবার জন্য একখানা টাইকোগামী জাহাজে গিয়ে উঠলাম এবং বেশ আরাম করে শুয়ে পড়লাম। বন্ধু-বান্ধবীরা যখন বুঝল, আমি ঠিক ঠিকই টাইকো চলেছি, তখন তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমিও তার একটু পরে জাহাজ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ইয়াংসী নদীর অপর পাড়ে চলে গেলাম। কি ক'রে বন্ধুদের চোখে ধূলি দিয়ে নদী পার হয়ে চলে গেলাম বিশেষ করে বলা দরকার, নতুবা অনেকে তা বুঝতেই পারবেন না।

পিকিনের পথে

নদীটার অন্য নাম থাকতে পারে, তবে আমি বলব সাংহাই নদী। মুখে বিদায় নিলেও সাংহাইয়ের প্রভাব থেকে মুক্তি পাই নাই তখনও। নদীর বুকের উপর এই গভীর নিশায় বিদেশীদের রণতরী থেকে বিজলী বাতির আলো পড়ে নৃত্য করছে। মদের নেশায় আপনাকে ভুলে গিয়ে অনেকে শিষ দিয়ে গান করছে। আমি একখানি চীনা নৌকায় নদীর ওপারে গিয়ে একটা ভাঙ্গা কারখানা ঘরে অন্ধকারের কুহেলীজালে আত্মগোপন করলাম। রাত্রি গভীর, চীনা মাঝির দেনা-পাওনা পূর্ব্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলাম, সে আমার কাছ থেকে "ছিনচাইলা" অর্থাৎ "ভাল" শব্দটি বলেই বিদায় নিল। এই কারখানা গৃহে যদিও কেহ মরে নাই, তবুও অন্ধকারে এখনও সাধারণ চীনাদের ভূতের ভয় প্রচুর আছে, তাই বোধ হয় চীনা মাঝি বেশীক্ষণ থাকতে চায় নাই। আমার উদ্দেশ্য, এবার দুই দলের চোখকেই ফাঁকি দিয়ে পালাব, নতুবা চীন ভ্রমণ সুবিধার হবে না। টানা-হেঁচড়া আর ভাল লাগে না, মনটা একেবারে তিক্ত হয়ে গেছে।

কানাবাবু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের পিকিন বা পাইপিংএর ঠিকানা একটা খশখশে কাগজে লিখে দিয়েছিল, তা আমার বুক পকেটে ছিল! হাত বাঁরবার বুক পকেটে যাওয়াতে কাগজটা বেশ খশখশ করছিল, রাগ করে কাগজটা বুক পকেট থেকে এনে ফেলে দিলাম। যদি পাইপিং বা পিকিনই যেতে পারি, তবে রাজার সন্ধান নিতে বেগ পেতে হবে না। আবার ঐ বিপদের সময় রাজা-রাজড়ার নাম মনে মোটেই আসে না, মনে আসে তখন বিপদের কথা, কেমন করে তার হাত থেকে রক্ষা পাব তাই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র ভাবনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, কি করে এখানে রাত্রি যাপন করা যায়। ভেবে ভেবেই সারা হলাম, কিন্তু চিন্তা করে লাভ কি? রাত যখন এ অন্ধ-তমসায়ই কাটাতে হবে, তখন বিলম্ব করবার কোন সার্থকতা নাই। তাই একটু দূরেই সামান্য পরিষ্কার জায়গা ছিল, তারই

উপর বিছানা বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমার ওঠা চাই, নতুবা বিপদ আসবে। ঠিক সূর্য্য ওঠবার অল্প কিছু সময় পূর্ব্বেই হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল। একটু দূরেই লঞ্চ দাঁড়িয়েছিল, সাইকেল নিয়ে লঞ্চে উঠে পড়লাম। ছেড়ে দিল লঞ্চখানা, আমরা এগিয়ে চললাম।

ভোর বেলা আবার উজাং কেল্লার দৃশ্য দেখতে পেলাম। চোখ ভরে দেখে নিলাম সে সমরক্ষেত্র। মনে মনে অর্ঘ দিলাম তাদের প্রতি, যারা বুকের রক্ত নিংড়িয়ে এ রণক্ষেত্রকে করেছে অমর, করেছে চিরস্মরণীয়। লঞ্চখানা এগিয়ে চলল পবনের বেগে। দেখতে দেখতে আমরা ইয়াংসী নদীতে এসে পড়লাম। এতক্ষণ আমি লঞ্চের পরিচালকের সঙ্গে কথা বলি নাই। তার প্রতি যেমন আদেশ ছিল সে তেমনটি করে যাচ্ছিল। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, এখান হতে কোথা যাব, তার সে সংবাদ নিবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু যেই আমরা ইয়াংসী নদীতে পড়লাম, অমনি সামনেই একখানা জাপানী গান-বোট দেখতে পাওয়া গেল। চীনা পরিচালকের মুখেও শঙ্কিত বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। তাকে আমি অভয় দিলাম, কিন্তু তাতেও যখন সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না, তখন খুলে বললাম কেন এভাবে চলেছি নদীর ওপারে, সঙ্গে সঙ্গে পাসপোর্টটাও দেখালাম। ড্রাইভারের মন শান্ত হল, তারপর পূর্ণবেগে চালিয়ে দিল লঞ্চখানাকে।

আমি একটু দূরে একটা কেরোসিনের টিনের উপর বসে সাইকেলটা যাতে না পড়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখছিলাম, ড্রাইভার আমাকে তারই কাছে গিয়ে বসতে অনুরোধ জানাল। সাইকেলটা বেঁধে রেখে দিয়ে তার গা ঘেঁসে বসলাম। সে বলতে লাগল, যদি আজ আপনার কাছে বৃটিশ পাসপোর্ট না থাকত তবে হয়তো লঞ্চ ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম। বৃটিশের পাসপোর্টের মূল্য আছে, কিন্তু বৃটিশ দুধ-কলা দিয়ে যে কাল-সাপকে পুষছেন হয়তো সেই সাপই একদিন তাঁর মাথায় কামড়াবে। আজ সাংহাই, কাল কোন্ দিকে জাপানীর জুলুম চলে তা আগে থেকে চিন্তা করে ঠাওরান বড়ই কঠিন। তারপর অনবরত কত কথা যে সে বলে যেতে লাগল তার সীমা-সংখ্যা নাই। আমি তারই পাশে বসে বসে ঢুলতে লাগলাম আর মাঝে মাঝে যখন মটর লঞ্চখানা কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তখনই আমার চোখ খুলে যাচ্ছিল আপনা হতে,

আর অমনিই কানে ভেসে আস্‌ছিল চীনা ড্রাইভারের সুখ-দুঃখের কাহিনী—সেই যে কখন্ সুরু করেছে তার বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, চলেছে তো চলেছেই একটানা। এমনটি হয় যখন লোকের মনে রুদ্ধ ক্ষোভ একেবারে জমাট বেঁধে অনড় হয়ে থাকে—মুক্তির কোন পথ না পেয়ে।

প্রশস্ত নদী। গঙ্গানদীকে দেখে যাঁরা ভাবেন বেশ বড়, তাঁদের পক্ষে ইয়াংসী নদী দ্রষ্টব্য, কারণ নদীর প্রশস্ততা গঙ্গার চেয়েও বেশী। তাহলেও গঙ্গায় যেমন ঘোলা জল বয়ে যায়—হাঙ্গর, কুমীর এবং বৃহৎ মৎস্যের আনাগোনা দেখা যায়, ইয়াংসী নদীতেও তেমনই দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গায় যেমন ছোট ছোট গাঙচিল ওড়ে, ইয়াংসী নদীতেও হুবহু তেমনি করে গাঙচিল মাছ শিকারে মেতে উঠেছে চোখে পড়ল। চোখে দেখতে দেখতে চলেছিলাম সে দৃশ্য। আর মাথায় জটলা পাকাচ্ছিল চীনের বর্ত্তমান সমস্যা; বাংলার জলবায়ু, বাংলার শ্যামলিমা যেমন সৃষ্টি করেছে মিরজাফরের দলকে, চীনেও ঠিক সেরূপ অনেক জেনারেল আজ দল পাকিয়ে নিয়েছে, যারা নিজের সুখশান্তির জন্য জাতির সর্ব্বনাশ করতে তৎপর। বৃহত্তর স্বার্থ যেমন মরণমুখী জাতি বোঝে না, বুঝাতে গেলে উল্টে গালি দিতে আসে, চীনের আজ সেই দশা। তবে আশার আলো একটু একটু দেখা দিচ্ছে, হয়তো সেই আলো শীঘ্রই জগতের দরবারে আপন আসন করে নেবে, যা দেখে বিশ্বের লোক অবাক হয়ে যাবে। তারই আরতি আজ চীনের দিকে দিকে, নতুবা আজ আমি আর এই লঞ্চে নদী পার হতে পারতাম না।

ক্রমশঃ আমরা তীরের নিকটবর্ত্তী হতে লাগলাম, কিন্তু একটীও লোক চোখে পড়ল না, সব চলে গেছে নদীর পাড় উজাড় করে দিয়ে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না, তাদেরে কে রক্ষা করবে? যাদের রক্ষা করার কেউ নাই, যারা নিজেকে শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে গড়ে তুলবার বুদ্ধি রাখে না, তারাই পালায়, তারাই বশ্যতা স্বীকার করে, দাসখতে নাম লিখে দেয়। জাপানী গান-বোটের ভয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চীনারা পালিয়েছে, কোথায় পালিয়েছে কে জানে। ড্রাইভার বল্‌লে "Mr, no one to care for them, we got no organization here, but get on, you sure get help, I tell you" শুনলাম সেই কথা, কিন্তু মনটা ওদের দুর্দ্দশা দেখে উতলা

হ'য়ে উঠল। এখানে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান নাই, সাহায্য দানের দেশব্রতী নাই, তাই পালিয়েছে। যদি একটিও বুদ্ধিদাতা নেতা থাকত, তবে পালাত না।

লঞ্চ থেকে নেমে সাইকেলটা নামিয়ে নদীতীরে রেখে এসে আবার পিঠ-ঝোলাটা নিয়ে গেলাম। ড্রাইভার তীরে উঠে আমার কাছ থেকে সিক্তকণ্ঠে বিদায় নিল, বিদায়ের বেলা কোলাকুলি হ'ল নিবিড় শুভেচ্ছায়। যেখানে মনের মিল দুটি প্রাণের তারে ঝঙ্কৃত হয়, আর একপক্ষ হয়তো কাজে নেমেছে, অন্যপক্ষ নামে নাই, সেখানে নিষ্কর্ম্মা লোকটার মাথা সম্ভ্রমে নত হয়ে আসে, নিজের অলসতার জন্য ধিক্কার আসে শিরায় শিরায়। আমার মাথাও ঐ যুবকের চরণে অবনত হ্য়ে এল নির্ব্বাক প্রশস্তি জানাতে। যুবক যখন চলে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ভাবলাম। এইবার সত্য সত্যই সাংহাইকে পিছনে ফেলে চললাম। আর আবেগ না বাড়িয়ে সাইকেলে গতিসঞ্চার করে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিলাম পথের মায়ায়। সাইকেল আমায় টেনে নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। প্রতি মুহূর্ত্তে সাংহাইয়ের সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে চেল্‌ল।

ছোট পথ। দু' দিকে কচি ঘাস দিয়ে ঘেরা, তারই ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট পর্ণকুটীর। কুটীরগুলিতে লোক নাই। মাঝে মাঝে দু একটা শূকর-ছানা এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে পালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ যাবার পর একটা ছোট্ট হাটের কাছে এসে পড়লাম। সেখানে অনেকগুলি শূকর বেঁধে হাটের একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে। কেউ এসে দাম জিজ্ঞাসা করে' শূকরটার ওজন দেখে চলে যাচ্ছে। বাজারের লোকগুলো বেশ ধীরে কথা বল্‌ছে। আমাকে অনেকটা আড়নয়নে দেখল, তারপর যে যার পথ ধরতে লাগল। আমি বে-পরোয়া। জানি না কখন বাজার পার হয়ে চলে এসেছি। একটা গ্রাম। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। একটু বিশ্রাম করার ইচ্ছা হল, তাই একটা বড় বাড়ীর কাছে সাইকেল থামিয়ে বারান্দায় বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালাম। কোথা থেকে একটা লোক এসে আমাকে বললে' 'ইসলাম'? আমি তাকে বললাম, আমার ধর্ম্ম 'ইসলাম' নয়। লোকটি চলে গেল। ধর্ম্মের সাহায্যে নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রথার কথা চীনদেশে এই সর্ব্বপ্রথম শুন্‌লাম। মনটা বিষিয়ে উঠ্‌ল। ধর্ম্ম আবার কি? যত বাজে অকেজোদের সৃষ্টি ধর্ম্ম।

যাদের শক্তি আছে, রাজ্য আছে, তারা কখনও আত্মপরিচয়ে ধর্ম্মের দোহাই দেয় না। স্বার্থপর কাপুরুষই নিজের আত্ম-পরিচয় দেয় ধর্ম্মের তকমা এঁটে। কারণ তার স্বাধীনতা নাই, অর্থ তার আরাধ্য, শুধু আত্মগোপন করবার, জোচ্চুরি করবার প্রশস্ত পথ বলেই—তারা ভগবানের নাম করে, ধর্ম্মের নাম করে। রাস্তার কোথাকার ছোটলোক আমার পরিচয় চায় আমার ধর্ম্মের খবর নিয়ে, জাহান্নামে যাক, গোল্লায় যাক সে নরাধম!

কতকক্ষণ বসে থেকে আবার চললাম। লক্ষ্য আমার গ্রাণ্ড রোড ধরা। গ্রাণ্ড খালের তীর বয়ে সে বড় পথ পিকিনের দিকে চলেছে। পিকিনে যদি যেতে পারি, তবে আর একটি বড় পথ ধরব—যে পথ নিয়ে যাবে আমাকে 'মুখদেন'। সাইকেলের প্যাডেল তালে তালে ঘুরছিল, কিন্তু মন ব্যস্ত ছিল ঐ কথাটা ভাবতে—'ইসলাম'! তবে কি এখানেও সেই ধর্ম্মের ধাপ্পাবাজী চলেছে? দক্ষিণ-চীনে তো তার নামগন্ধও এ পর্য্যন্ত পাই নাই। অনেকক্ষণ এই কথা নিয়ে ভাবার পর হঠাৎ একটা অঘটনের আহ্বানেই সাইকেল থেকে নামতে হল। একটা রিক্সা-ওয়ালা অন্য একটা রিক্সা-ওয়ালার গালে এমন আঘাত করেছে যে, দাঁত ক'টা বোধ হয় ভেঙ্গেছে, রক্ত দরদর করে ঝরছে। কয়েকটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝে, বেশ লেকচার দিচ্ছে। আমার লেকচার শুনবার দরকার হল না, পুঁটলীটা খুলে টিনচার আইওডিন এবং কটন বার করে লোকটাকে বসিয়ে রক্ত পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। চীৎকার করে বললাম, 'ছুঁই লাই লা,' অর্থাৎ জল নিয়ে এস। একটা ছেলে জল নিয়ে হাজির হল, তা দিয়ে লোকটার মুখ পরিষ্কার করার পর দেখলাম দাঁত ভাঙ্গে নাই; তবে একদিকের ঠোঁট একেবারে দাঁতে বিঁধে গিয়েছে। ক্ষতস্থানগুলিতে টিনচার আইওডিন লাগিয়ে দিলাম বেশ ভাল করে। তারপর, লোকটা চলে গেল। এ কাজটি করে সাইকেলে উঠ্ব—এমন সময় একটি ছেলে এসে বললে, "জাপ্পন কই" অর্থাৎ জাপানী ভূত তুই নাকি? আমি বললাম 'না হে, আমি হিন্দু'। ছেলেটা অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখ্লে আমাকে, তারপর আমি বিদায় নিলাম।

কয়েক দিনের মাঝে এমন কোন ঘটনা ঘটল না, যা বলার যোগ্য। কিন্তু এটা লক্ষ্য করে দেখ্লাম যে, সবাই যেন একটা কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত

হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের লোক যেমন 'আমি ব্যস্ত' বলে—লোককে হাঁকিয়ে দিতে একেবারে হাঁপিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। যার সঙ্গে দেখা করতে তোড়জোড় বেঁধে এসেছে, তার কাছে কথাটি বলা শেষ করে সেই নিমেষেই চলে যায়, অযথা বাজে কথায় সময় নষ্ট করে না বা পরিচয়ের জন্যও নামের কার্ড ব্যবহার করে না।

একদিন একটা বড় বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। টাকা আছে, তবুও কিছু বলে তো উঠ্‌তে হবে গিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ীতে? আমার কার্ডখানা পাঠিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—তিনি মোটেই ইংরেজী জানেন না, তারপর আমি যে চীনা ভাষা জানি তার একটা কথাও বুঝেন না। অনেকক্ষণ আমার এলবাম বইটা দে'খে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। লোক আসতে লাগল, চীনা ফ্যাশনে তাকে কেউ নমস্কার করে নাই, কিম্বা কোন রকম অভিবাদনও করে নাই। এক-একটা লোক আসে—হয়তো একখানা পত্র নিয়ে, তার জবাব তিনি তৎক্ষণাৎ পত্রের পিঠে লিখে দেন, অমনি লোকটা চলে যায়। তারপর কেউ এসে কোন কথা বললে, অমনি তার জবাব দিয়ে বিদায় করে দেন। অনেকক্ষণ বসার পর একটা লোক এল, কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে মোটেই তাকালে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পারলে ফ্রাংছে মশিও।' আমি বললাম 'পারলে ইংলে।' তখন লোকটী আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে সুরু করলে। একটু কথা বলার পরই —যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসেছিলাম, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমাকে বললেন। আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, এই ভদ্রলোকের অনেক কাজ, তাই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে সময় ক্ষেপণ করবেন না। আমার যা দরকার, তার ব্যবস্থা এই ইংরেজী-জানা ভদ্রলোকই করবেন। ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তিনি কোনও ধরণে আমাকে নমস্কার জানালেন না। যাহোক দুজনায় মিলে একটা ছোট বাড়ীতে এলাম; বাড়ীটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—একটি যুবতী দরজা খুলে দিল। বাড়ীতে প্রবেশ করেই আমার সাইকেল থেকে বোঝাই করা পিঠঝোলা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলা খুলে ফেললাম। আমাকে একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল, ইচ্ছা হ'ল একবার খালি গায়ে বসে আরাম করে নিই। ইংরেজী-জানা ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার

বোধ হয় অনেকদিন স্নান হয়নি এবং বিশ্রামের দরকার, এবাড়ীতে সবই পাবেন, এই স্ত্রীলোকটি আপনাকে সবই দিবে, এখন আমি আসি, সন্ধ্যার পর এসে দেখা করব।'

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে জামা খুলে দেখি এর মধ্যে গায়ে চর্ম্ম-উকুন দেখা দিয়েছে। সবগুলি কাপড় ছেড়ে দিয়ে খদ্দরের চাদরটা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে বের হয়ে পড়লাম স্নান করতে। গরম জল তৈরী ছিল। বেশ করে কার্ব্বলিক সাবান দিয়ে শরীর ধুয়ে নিলাম। তারপর ঘরে এসে পোষাক পরে পরিত্যক্ত কাপড়গুলিকে ভাল করে ধুয়ে ফেলবার জন্য স্ত্রীলোকটির কাছে দিলাম। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম, চর্ম্ম-উকুন তাতে লেগে আছে, যেন অন্য কাপড়ের সঙ্গে মিশান না হয়। সে হেসে হেসে তাই নিয়ে চলে গেল এবং কতকক্ষণ পরে খাবার এনে দিল। খাবার খেয়ে আমি একটা ম্যাপ দেখতে লাগলাম। বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলাম, এখন আমি কোথায় এসে পৌচেছি। গত ক'দিন শুধু উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলেছি। কোথায়, কোন জেলার কোন গ্রামে এসেছি তা আমি জানতাম না, শুধু এগিয়েই চলেছিলাম। রাত কেটে গেছে কখনও কোন পরিত্যক্ত বাড়ীতে, কোথাও গ্রাম্য হেটেলে। মানচিত্র দেখে অনেকক্ষণ কাটল, কিন্তু কোথায় আমি— বুঝতে পারলাম না। হাসি এল, ভাবলাম আমি হারিয়ে গেছি! দেশ দেখাই যার একমাত্র পেশা, তার আবার হারিয়ে যাওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে? সবই তার অচেনা—নামহীন পথও, নামজাদা পথও। তবে সত্যিকার হারিয়ে যাওয়া এই বিদেশে বড় কম কথা নয়। তা করতে বুকের পাটা একটু পুরু করতে হয়, এসবে অভ্যস্ত হয় মায়ে-তাড়ান বাপে খেদান ডানপিটেরাই বেশী।

শুয়ে পড়বার উপক্রম করছি, এমন সময় স্ত্রীলোকটি একখানা "চিত্রে চীন" আমার কাছে ছুড়ে ফেলে দিল। সাপ্তাহিক পত্রিকা বটে, তবে চীনে হরেক অঞ্চলে হরেক ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা মেটাবার জন্য শুধু চিত্রদ্বারাই সংবাদ প্রচার করা হয়; সকল ভাষাভাষীর পক্ষেই এটি সহজবোধ্য। ভারতে এরূপ 'চিত্র পত্রিকা'র সম্ভব এখনও হয় নাই, কখন হবে, জানি না। তার স্বরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুধু চিত্র। পাতা ওলটাতে লাগলাম, একটা ছবি দেখে ভয় হল। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক চিত্রের নীচে চীনা এবং ইংরেজী ভাষায়

চিত্রের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।' এরই একপাশে মহাত্মা গান্ধীর চিত্র। তিনি, ভারতীয় ধনী এবং সরকার একপক্ষে আর অন্যপক্ষে কতকগুলি তরুণ-তরুণী, তাদেরই পুরোভাগে অনেকের ছবি দেখলাম—যাদের পূর্ব্বে কখনও জানতাম না। না জানবার কারণ, ভারতীয় সংবাদপত্র অনেকদিন পাঠ করি নাই। পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যতীন দাস;—মর-মর তার অবস্থা, ছিন্ন মুণ্ডে দাঁড়িয়ে, আর তার পিছনে আর একটি মোটা যুবক, তার পিছনে একটি কচি ছেলে। কার্টুনই বলুন আর ফটোই বলুন, এই চিত্রে সাময়িক উত্তেজনা এনে দেয়। এখানে চীনা প্রকৃতি বেশ করে ফুটে উঠেছে। ওদের সঙ্গে আমাদের এখানেই খাপ খায় না। ওরা ধরে যেয়ে মরিয়া হয়ে গাছের গোড়াটায়ই, তাকেই কাটতে চায় এবং যে পর্য্যন্ত তা না হচ্ছে, ওদের স্বস্তি নাই; তাই ওদের দেশের বড়লোক আজ ভয়ে ভীত;—এমন ভীত যে, পথঘাট তাদের বন্ধ, বাইরের আলোতে মুখ দেখান তাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে ছোটখাট পদবীধারী সরকারী অফিসারগুলি এখনও নিরাপদে নিজেদের কাজ গুছিয়ে চলেছে।

মারশ্যাল উপে ফোর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তাঁর চেহারা দেখে ভাবতেই পারি নাই যে, ইনিই—উপে ফো। একটা চাকর এল, বলল, ভিতরে আসুন। সেই চাকরটিই নিয়ে গেল মারশ্যালের সেক্রেটারীর কাছে। সেক্রেটারী বললেন, 'মারশ্যাল আজ দেখা করবেন না বলে মনে হয়।' আমি তাঁকে বললাম, 'এ আর কিছুই নয়, শুধু আমি হিন্দু বলে আমার প্রতি, আমার জাতের প্রতি, আমার দেশের প্রতি অবজ্ঞা।' চাকরটা বল্‌লে 'তোমার কি চাই হে মারশ্যালের কাছে?' 'আমার আর কিছু চাইবার নাই, শুধু তাঁর অটোগ্রাফটা নিতে চাই, আর তাঁকে—শুধু একবার দেখব; কারণ, চীনের জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন।' জবাবে লোকটা বলল, 'হাঁ, চীনের জন্য তিনি যা করেছেন তা তো শুনেইছ, কিন্তু তিনি আজ আর বের হতে পারেন না, কতকগুলি ছোকরা তাঁর পিছনে লেগেছে। তা যা হোক তুমি দেখতে চেয়েছ তাঁকে, দেখে নাও, বইটা দাও তো।' বইটা দিলাম, আর ঐ চাকরটা চট্‌পট কতকগুলি হিজিবিজি লিখতে সুরু করল। বেজায় বিরক্ত হলাম, তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিব ভাবছি, সে মুহূর্ত্তেই বইটা ফিরিয়ে আমার হাতে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমায় বিস্ময় দোলায় একেবারে ভাসিয়ে এমন গম্ভীর, এমন প্রভুত্ব-

ব্যঞ্জক মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কথা বল্‌তে স্বরু করল,' আমার পা থেকে মাথা অবধি শিহরণ খেলে গেল—"শোন তবে, মারশ্যাল আর এখন মারশ্যাল নন, এখন তিনি পথের ঝাড়ুদার। তাঁর হাতে অর্থ নাই যে, তিনি কিছু দিবেন তোমাকে, তবে এই নাও।" বলে আমার হাতে একটি মুদ্রা দিলেন। তারপর চলে গেলেন বাড়ীর মধ্যে। আমার পদতল হতে যেন কঠিন পৃথিবী সরে চলে যাচ্ছিল—অতি কষ্টে সেক্রেটারীর টেবিলটা ধরে আমি নিজেকে সাম্‌লে নিলাম। সে দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে।

আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি, কিন্তু চীনা যুবক-যুবতী নব শিক্ষায় কখনও ভক্তির ধার ধারে না, ধারে কাজের, দেশের, দশের। এইখানেই তফাৎ তাদের আর আমাদের। মারশ্যাল এখন পাইপিং নগরীতে আছেন. বাকী জীবনটা তাঁর সম্ভবতঃ সেখানেই কেটে যাবে। তিনি বরণ করে নিতে চেয়েছিলেন চ্যাং কাইসেককে, উত্তর চীনের জেনারেল চাং স্যুয়া লিয়াংয়ের উপর টেক্কা দিতে—কিন্তু মাঝ পথে এসে চ্যাং কাইসেক নিশ্চল হয়ে রইলেন। সেজন্য দায়ী কে, কে জানে, তবে ভবিষ্যতে যখন পিকিনের কথা বল্‌ব, তখন হয় তো একটু বলতে চেষ্টা করব—কোন পথে তখন কে চলেছিলেন, চীনের ভাগ্য চীনজাতি তখন কোনদিক দিয়ে গড়ে চলছিল।

ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার জুতা আর মোজা জোড়া নিখোঁজ। আমার মাত্র এক জোড়া জুতাই হামেশা থাকে, সে জোড়াই খোয়া গিয়েছে, কাজেই খাল পায়ে চল্‌তে হবে অন্ততঃ অন্য এক জোড়া যোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু খালি পায়ে হাঁটা কষ্টকর, সম্প্রতি সে অভ্যাসও নাই। অথচ দেশে থাকতে কখনও জুতার মুখ দেখি নাই, তা হলে কি হবে বিদেশে এসে ক্রমাগত জুতা পায়ে দিতে দিতে পায়ের চামড়া পাতলা হয়ে গেছে। তার উপর বিপদ নতুন জুতা যে কিন্‌ব তাতেও অশেষ বাধা, প্রথমতঃ জুতাকে চীন ভাষায় কি বলে তা শিখি নাই। দ্বিতীয়তঃ এ পল্লীতে জুতার দোকানের সন্ধান পাব কার কাছে, আদৌ দোকান আছে কি না তারই বা ঠিক কি!

দরজা খুলে দেখি, জুতা জোড়া ব্রুশ করে এবং মোজা ধুয়ে কাছেই টানান রয়েছে। মনে ভারী আনন্দ হ'ল। এই বিদেশে কে আমার আপন জনের মত এ দরকারী কাজটী আমার হয়ে সেরে রেখেছে, তাকে কি ভাষায় ধন্যবাদ

দিব? ভারতের মেয়েদের সঙ্গে তবে চীনের মেয়েদের প্রভেদ কি? না,—বিভেদ কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। ঐ যে চীনের মেয়েটী আমার এই কাজ দু'টি করেছে, সে চীনের মেয়ে হয়েও চীনের মেয়েদের বিদেশীর প্রতি ঘৃণা ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, নতুন বাতাস তার গায়ে লেগে দৃষ্টি হয়েছে দূর-প্রসারিত, সে হয়ে পড়েছে সত্যিকার নারী, আজ আর সে দাসীত্বের হীনতায় আপন সত্তাকে ঘিরে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী টেনে দেয় না।

চীন-নারী

সহজাত প্রবৃত্তিরূপে চীনদেশের মেয়েদের প্রাণে একটা ঘৃণা নীড় বেঁধে আছে, তা তারা আরোপ করে বিদেশীর উপর। চীন-নারী ভাবে তারা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এই পৃথিবীতে মানবীরূপে, আর বাদবাকী যত জাতির স্ত্রীলোক সবই নেহাৎ বৈশিষ্ট্যহীন ঘৃণিত দাসী। নিজেদের উৎকৃষ্টতর সভ্যতার জীব ভেবে যারা অপর জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাদের, দু'দিন আগে হোক আর পরেই হোক, পতন অবশ্যম্ভাবী। চীনেও ঘটেছিল তাই, চীন জাতির পতনের ফলে সেদিন মাঞ্চুরা এল। তারা চীন-নারীকেও নিষ্কৃতি দিল না, তাদের পতন পূর্ণ করে আজব রেওয়াজের প্রবর্ত্তন করল—আর তারই মোহে পা ছোট করে অভিজাত্য অর্জ্জনের আশে চীনের নারী হল লালায়িত। কি আশ্চর্য্য সে পতন! কিন্তু তারা আজ সবই বুঝতে পেরেছে,—নতুনের বাতাসে। আর সেদিন নাই। কেউ আর নিজেকে দাসী বলে মানতে রাজি নয়—সে হীন মনোবৃত্তি পরিহার করে আজ তারা সহচরী, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার অধিকারিণী। তাই আজ আমার মত কালো লোকের মোজা ধুয়ে দিতে তাদের ঘৃণা নাই, অহেতুক অভিমানে বাধে নাই। অথচ এরাই একদিন হিন্দু তো দূরের কথা, শ্বেতাঙ্গদেরও ছায়া মাড়াতে রাজি হ'ত না—বিদেশীদের নিতান্তই কৃপার পাত্র মনে করত বলে।

মানবের মেরুদণ্ড মানবী। মানবীই পুরুষের শক্তি—পুরুষের রক্ষাকবচ। এই মানবী যদি দানবী হয়, পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণে সদা-প্রসারিত কল্যাণ-হস্তের অভাবে তখনই জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। স্বাধীন জাতির পিছনে দাঁড়িয়ে

আছে তাদেরই মা-বোন, গোলাগুলী নয়। দানবী তাণ্ডবলীলায় মত্ত হয়ে ভাসিয়ে দেয় জাতিকে অন্তহীন সমুদ্রে। চীনজাতি ভেসে চলেছিল চীন সাগরে, কিন্তু মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন তাতে বাধা দিলেন, ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ইয়াংসী নদীর মোহনা হতে। হাতে কলম, পরণে ফিনফিনে শাড়ী, বাঁ-হাতে একখানি বিদেশী কথা-সাহিত্য, তারপর সজ্জিত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কোকিল স্বরে বক্তৃতা—এসব সখের বিলাস করলেই শুধু চলে না, তাতে স্বরাজ যেচে এসে ধরা দেয় না, চাই কাজ, আর কাজ। মাদাম সান অনন্যমনা কর্ম্মী, তাই নামের পরিবর্ত্তে কাজ করেছেন। তাই চীন সাগর হতে ফিরিয়ে আন্‌তে পেরেছেন জাতির জীর্ণ ভেলা—মায়াবিনী দানবীকে আবার মানবী-রূপ দিয়ে। এই ভেলাতে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদেরই একজন আমার মোজা ধুয়ে দিয়েছেন, জুতা মুছে রেখেছেন। মহাশূন্য হতে নেমে এসেছেন সেই দেবী মাটীতে, তাঁর চা পানের ফুরসৎ নাই, সিনেমা দেখা তাঁর হয় না। তাঁর চিন্তা—নিজে বেঁচে থেকে সন্তানদের বাঁচান, সৎপথে চালান, আর বলে দেওয়া—এটা কর, এটা তোমাকে করতেই হবে! মজা এইখানে। এটা করহে. তোমাকে এটা করতে হবে যদি তুমি আমার অন্তরের ভালবাসা চাও। যেমন করতেন আমাদের দেশের রাজপুত রমণীরা। কিন্তু বলেন না, এটা ক'র না। এর মানে এই যে, যে কাজের কথা বলা হয়েছে তা করতে হলে তোমাকে অকরণীয় অনেক কিছুই বর্জ্জন করতে হবে। বেশ তো সুন্দর শিক্ষাদান প্রণালী।

যারা রেলে-জাহাজে দেশ বেড়ায় তাদের চোখ কি আবিষ্কার করতে পারে চীন-নারীর মনের মণিকোঠার রত্নরাজীকে? কখনও তা পারে না। আমাদের দেশের অনেকের লেখায় ফুটে ওঠে কাজের কথা, কিন্তু কাজটি কি করে হবে তা কেউ বলে দেয় না, কিছুটা আভাস দিলেও, হাতে কলমে করে দেখাতে কেউ এগিয়ে আসে না, তাই হয়েও ওঠে না। বাস্তব কাজ ফলে চিরদিন থাকে আকাশকুসুম। কিন্তু চীনের স্ত্রী-জাতি জাপানী নারীর অনুকরণে আজ অনেক কিছু শিখেছে, দেখেছে মাদাম সান-ইয়াৎ-সেনের কর্ম্মসূচী, তাই তাদের মন ফিরে গেছে একদম। কাজকে তারা ঘৃণা করে না, তারা কাজ করতে শিখেছে। এমন কাজের ধারা শিখেছে যে, পুরাতন রীতি-নীতিকে অগাধ্ জলে বিসর্জ্জন দিয়ে একেবারে নতুন পথে দাঁড়িয়েছে। এতে

করেই চীন উদ্ধার হবে, চীনজাতি বেঁচে উঠবে, মাতৃজাতির জাগরণে জগৎ জুড়ে লোক চীনের জয় জয়কার দিবে।

পথ-নির্দ্দেশ

জুতা ও মোজা ঘরে এনে রেখে দিয়ে আবার "চিত্রে চীন" দেখতে লাগলাম। অনেকগুলি ছবি, কোনটা জানি কোনটা জানি না, তবু আগ্রহসহকারে তা দেখ্‌লাম। সন্ধ্যা হয়ে এল, স্ত্রীলোকটি একটি প্রদীপ নিয়ে ঘরে রেখে দিয়ে চলে যাবেন, এমন সময় তাকে চা আনতে বললাম। অভয় দিয়ে বললেন, এনে দিবেন। চা এনে দিলেন, তাতে দুধ চিনি উভয়ই ছিল। চা খেয়ে বেশ আরাম হ'ল, মানচিত্রটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ইংরেজী-জানা ভদ্রলোক এসে দেখা দিলেন। কথা বলতে লাগলেন ক্রমাগত। আমার দোষই হোক কিম্বা গুণই হোক আমার একটা গোঁ আছে, আমার যা জ্ঞাতব্য তা যতক্ষণ না জানতে পারব, ততক্ষণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে পারি না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, আমি নদীতীর হতে বেশী দূরে আসি নাই। তিনি আঙ্গুল দিয়ে মানচিত্রে দেখিয়ে দিলেন কোথায় এখন আছি আমি। তারপর জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, এই স্ত্রীলোকটী কে? জিজ্ঞাসা করতে কুণ্ঠা বোধ হচ্ছিল বটে, কিন্তু না জিজ্ঞাসা করেও শান্তি পাচ্ছিলাম না। শেষটায় যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন জবাব হ'ল, ঐ স্ত্রীলোকটি একজন কর্ম্মী ছাড়া আর কেউ নন। পরিচারিকা কিম্বা দাসী নন্। ইংরেজী তিনি হালে শিখতে আরম্ভ করেছেন। অনেক কথা হয়েছিল সে ভদ্রলোকের সঙ্গে, এখন তা মোটামুটিভাবে বলে ফেলা দরকার মনে করি।

তিনি বলেছিলেন, চীন জাতি ভাঙ্গনের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে রক্ষা করবার জন্য সরকার কিম্বা বড় বড় নামজাদা লোক—কেউ অঙ্গুলি হেলনও করেন নাই। চীনের নব্য যুবক-যুবতী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম গণ্ডী ভুলে গিয়ে কাজে লেগে গেছে। এই গণ্ডী মিটিয়ে দেওয়া মানে প্রাদেশিকতা দূর করে দিয়ে অখণ্ড মহাচীনের ধারণা বদ্ধমূল করা। কাজের তালিকা মুখে বলা বড় সহজ, প্রাদেশিকতা মুখে মুখে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু

বাস্তবে তা উড়িয়ে দেওয়া অমানুষিক শ্রমসাধ্য ব্যাপার। চীনা তরুণ-তরুণীদের পক্ষে তা একরূপ অসম্ভবই হ'ত—যদি না জাপানীরা বার বার চীনের বুকের উপর এমন করে চড়াও হ'ত। যতবার জাপানীরা চীনের উপর অত্যাচার করেছে, ততবারই চীনারা কিনেছে সেই মূল্যে এক-একটা নৈতিক জয়, যার পরিণামে তারা অনেক ছোটখাট হীনভাব মন থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই একদল লোক জাপানের প্রতি চীনের হুমকিকে আশীর্ব্বাদ বলে গ্রহণ করেন।

আমি যখন যেখানে থাকি তখন সেখানকার কথাই ভাবি। ভুলে যাই দেশ, ভুলে যাই আপন, হ'তে চাই সে-দেশেরই লোক, ভাবতে চাই সে-দেশের মর্ম্ম-কথাটি একেবারে সে-দেশের লোক বনে গিয়ে। কতকটা তাতে কৃতকার্য্যও হয়েছিলাম। তাই চীনের অন্তরের কথা এত জান্‌তে সক্ষম হয়েছি। নতুবা আরসোলা খাওয়ার কথা বলেই অন্যান্য পল্লবগ্রাহী ভ্রমণকারীর মত আমারও বক্তব্যের সমাপ্তি হ'ত।

ভারতের লোক ভাবে চীনের লোক আরসোলা খায়, ওরা জঘন্য। আমাদের চোখে ঘৃণিত হতে পারে, কিন্তু তারা আরসোলা খায় না। চীনের প্রাচীরে পাশাপাশি যেমন সতেরটা ঘোড়া চলে বলে ভারতবাসী জানে, ঠিক সেইরূপই জানে চীনারা আরসোলা খায়। এসব বাজে কথা বলে সময় কাটাতে চাই না। আমার মন টানছে আমায় পথের দিকে, তাই আমায় দেখতে হবে ঐ ইংরেজী-জানা ভদ্রলোক আমায় পথ বলে দিতে পারেন কিনা। ভদ্রলোককে পথের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সান্‌টাং প্রদেশের পথঘাট মোটেই ভাল নয়, এমন কি সাইকেল চালানও কষ্টকর। তাঁর কাছ হতে বড় খালের সংবাদ জেনে নিলাম। তিনি বললেন, বড় খালের তীর দিয়ে একটা পথ আছে বটে, সেটি ধরে যাওয়া আর মরণকে স্বেচ্ছায় ডেকে আনা একই কথা। সর্ব্বপ্রথম আপত্তির কারণ হ'ল, সরকারী সেনাদের জুলুম। এদের ভিতর এমন নির্ম্মমও আছে, যে অত্যাচারকে করে নিয়েছে আমোদের উপকরণ। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, শিক্ষিত গুপ্ত ফৌজ। ওদের এখন আর দয়া-ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। ওরা এর আগে অনেককে দয়া করেছে, অনেককে সাহায্যও করেছে, পরিবর্ত্তে পুরস্কার পেয়েছে বিশ্বাসভঙ্গ—গুপ্তচরের যোগ্য

আচরণ। যে ভদ্রলোককে সাহায্য করেছে সেই ভদ্রলোকই সরকারী লোকের কাছে ভালমানুষ সাজতে গিয়ে সব কথা বলে দিয়েছেন, ফলে অনেক শিক্ষিত ছদ্ম-ফৌজ অনর্থক প্রাণ দিয়েছে। তাই তারা আর কাউকে দয়া দেখায় না, তারা হয় মারে নয় মরে। তৃতীয় কারণ হ'ল, জাপান সরকারের গোপন সন্ধানী। এরাও বড় কম নয়। এরা জাপানী নয়, তবে জাপানের স্বার্থে কাজ করে জাপানী টাকা খেয়ে। শিক্ষিত গুপ্ত ফৌজ এই দুই দলের সঙ্গেই লড়ে। সেক্ষেত্রে আমার আকৃতি যখন অনেকটা জাপানী ধরণের, তখন হয়তো অনেকে আমাকে জাপানী বলে ধারণা করতে পারে, গুলী ছুড়তেও পারে, তার ফল মরণান্তও হ'তে পারে। এই তিনটি কারণ দেখিয়ে ভদ্রলোক সান্টাং প্রদেশের পথে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আমার মন তাতে দমে নাই।

সান্টাং প্রদেশে একরকম উদ্ভিদ হয়, তা দ্বারা অনেক দুরারোগ্য রোগ দূর করা যায়, তা আমি অতি বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌তে পেরেছিলাম, এমন কি নমুনা স্বরূপ একটু পেয়েও ছিলাম। এই উদ্ভিদ দেখে নেওয়া এবং আমাদের দেশে কোথাও তা আছে কিনা দেশে গিয়ে খোঁজ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যদি প্রাণের মায়া করতে হয়, তবে এই উদ্ভিদ দেখা হবে না। এত নিকটে এসেও যদি না দেখে যাই, তবে মনে দুঃখ থাক্‌বে, তাই ভদ্রলোকের উপদেশ শুনে ভাল লাগল না। আমাকে চিন্তিত দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন আমার চিন্তার কারণ কি? তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি তো হেসেই সারা। তিনি বললেন, প্রিয় হিন্দু বন্ধু, লোক বাঁচাবার ঔষধ খোঁজবার আপনার দরকার নাই, এখন দেশে গিয়ে যাতে লোকক্ষয় করতে পারেন, তার ঔষধ শিখে যান। আমাদের দেশে একদিন ঐ ঔষধ খুঁজতে অনেক লোক আসত বটে, পেত কি-না জানি না, তবে এই দুর্দ্দিনে ঔষধ না খোঁজাই ভাল। যদি একান্তই ঔষধ খুঁজতে চান, খুঁজুন, কিন্তু বুলেট যদি বুকে বিঁধে যায় তবে আপনার শরীরের মাংস খাবে শূকরে, জেনে রাখবেন। ভদ্রলোক ফের বলতে লাগলেন, ভারতের লোক কি এখনও এসব ঔষধের বুজরুকি বিশ্বাস করে? আমাদের তো ধারণা তারা তা করে না, তারা দেশের এবং দশের

উন্নতিতেই ব্যস্ত। ভাল লাগল না লোকটির কথা, তবে অপ্রিয় সত্য শুনে অপ্রতিভও হতে হয়েছিল একটু। তবুও বললাম, আগামী কল্য বিশ্রাম করে আমার পথ আমিই ঠিক করে নেব, আর পথ-নির্দ্দেশের দরকার হবে না।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আপন মনে আমি ভাবছিলাম কি করে পথের সন্ধান পাই। ভদ্রলোক আবার ফিরে এসে বললেন, যদি ইচ্ছা হয় তো আপনার যাবার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি; তা কি আপনার ভাল লাগবে? তার পর এই মাত্র সংবাদ পাওয়া গেল, আপনি বড়ই সাদাসিধে লোক, আপনাকে কিছু বলাও সঙ্গত মনে করি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, সাহায্য হতে বঞ্চিত হবেন না। আমার মনে হ'ল, নিশ্চয় আবার সেই দলের খপ্পরেই পড়েছি! আমার যে দেশে জন্ম, যে সমাজে আমি লালিত-পালিত, তাতে আমি কি করে ওদের ইচ্ছামত চলতে পারব? ওরা কথায় কথায় প্রাণ দিতেও পেছপা হয় না, আর আমার প্রাণের উপর তো দস্তরমত মায়া আছেই, জীবন যাবে বলে ধারণা করতেও ইচ্ছা হয় না!

মুক্তির বেদীমূলে

পরদিন প্রাতে স্ত্রীলোকটি খাবার এনে দিলেন, সঙ্গে ছিল একখানা মানচিত্র। একদিকে চীনা ও অন্যদিকে ইংরেজী লেখা। খাবার খেয়ে নিয়ে সাইকেলটা বোঝাই করে স্ত্রীলোকটিকে দেশী মতে পা ছুঁয়ে নমস্কার করে বিদায় নিলাম। পথ বেশই আছে, তবে গ্রাম্য পথ, চল্‌তেও বেশ লাগল। ফস্ ফস্ করে সাইকেল চালিয়ে দ্বিপ্রহরে একটা বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করছিলাম। একটি চীনা রমণী নিকটেই মাঠে যে ছোট ছোট ঘাসগুলি গজিয়েছে, ধীরে ধীরে তা তুলে নিয়ে জমা করল। তারপর একটি ছোট নালাতে তা ধুয়ে নিয়ে হাঁসকে খেতে দিল। কৌতূহলের সঙ্গে তা লক্ষ্য করতে লাগলাম। হাঁসগুলি চপ চপ করে ঘাসগুলি খেয়ে ফেল্‌ল। ততক্ষণে আমারও অবসাদ দূর হয়েছে, আবার পথে ফিরে এলাম। এবার সাইকেলের

গতি ধীর। সন্ধ্যা হবার পূর্ব্বেই পেলাম একটা ছোট শহরের উপকণ্ঠ। শহরের প্রবেশপথেই একখানা ফোর্ড মোটর গাড়ী ভগ্নাবস্থায় পড়ে ছিল। টায়ারগুলি বোধ হয় পচে গেছে, মেশিনটা উঠিয়ে নিয়ে গেছে, শুধু বডিটা পড়ে আছে। এরই কাছে একটা ছোট দোকান, তাতে চীনা চা এবং সিগারেট বিক্রি হয়। এক পেয়ালা চা কিনে খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "হোতেল ইয় ?" অর্থাৎ হোটেল আছে কি ? একটি ছেলে বল্‌লে 'yes'। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম "Show hotel ?" অর্থাৎ হোটেলে নিয়ে যাবে কি ? তার জবাবও দিল, 'yes'। আমার মনে হ'ল হয়তো ছেলেটির ইংরেজীতে দখল আছে। সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল, আর আমি তার পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। একটু দূরে গিয়েই সে একটা গলি ধরল। সে গলি-পথে সাইকেল নিয়ে চলতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। অতি কষ্টে কিছুদূর এগিয়ে একটা দরজার সামনে থামলাম। একজন বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। নাতি-নাতনীদের কোলে-পিঠে করে থাকা যাঁদের অভ্যাস তাঁদের নিয়ম হল দাড়ী রাখা এবং নখ না-কাটা। বৃদ্ধকে দেখেই মনে হ'ল, তার শুধু নাতি নাতনীই হয় নাই, বোধ হয় তাঁর নাতি-নাতনীর ঘরেও আবার নাতি-নাতনীর শুভ আবির্ভাব হয়েছে। আমার প্রবেশের পর তিনি দরজা বন্ধ করলেন। যে ছেলেটি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সে কি যেন আপন ভাষায় বল্‌ল। হয় তো আমার বিষয়েই বলে থাক্‌বে মনে করে আমার একখানা কার্ড দিলাম। বৃদ্ধ ভাল করে তা পাঠ করে আমাকে আরও ভিতরে যেতে বল্‌লেন। এগিয়ে চল্‌লাম। কতক্ষণ পর কতকগুলি যুবক-যুবতী এসে দেখা দিল। ওরা কিচির মিচির করে নানা কথা বলতে লাগল। বুঝলাম আমাকে নিয়েই কথা চলেছে। একটা বড় ঘরে গিয়ে বস্‌লাম। একটি যুবতী এসে একখানা কাগজ আমার হাতে দিল, তাতে ভারতীয় একখানা ছবি ছিল। এই ছবিখানাতে ছিল ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিশদ ব্যাখ্যা। দেখে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আপনা হতেই বেরিয়েছিল। এখানে পলিটিক্স এসে গেল। যার সামান্য জ্ঞান আছে এই সাধারণ বিষয়টুকু তার জানা দরকার।

এক পাঠান হিন্দু ডাক্তার বলেছিল, 'বাবু, দেশে হিন্দু-মুসলমান লড়ছে,

কিন্তু আমি দেখতে চাই দেশের মুক্তি, তা হিন্দুর দ্বারাই হোক আর মুসলমানের দ্বারাই হোক।' কথাটা শুনে হেসেছিলাম, তাতে ডাক্তারের বড়ই রাগ হয়েছিল। তেড়েমেড়ে বলেছিল, 'তুমিও দেখ্‌ছি একটি ফকিরের মতই। ওরাও এই কথাটা বললেই হাসে আর বলে আল্লার ইচ্ছা। ফকিরেরা কিন্তু ভয়ে চলে যেত আমার কাছ হতে; ওরা কি সত্যই সাধু? কখনও হতে পারে না। যারা ভয়ে মুখ বুজে থাকে তাদের আবার আল্লা কি? তুমিও সেই দলের, তোমার পর্য্যটনের কোন মানে নাই, যাও চলে, আমি তোমাকে কিছু দিব না।' লোকটি কোন্ দুঃখে এসব কথা বলেছিল সে-ই জানে। আমারও বুক থেকে কোন্ দুঃখে আজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মুক্তি পেল, তা আমিও ভাল করে জানি না।

ছবি দেখা হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিলাম। ইঙ্গিতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাত্মা গান্ধীর কত সিপাই, কত বন্দুক, কত কামান আছে?' বন্দুকটাকে চীনা ভাষায় "পাং" বলে। আমি তার জবাব দিলাম, "কিছুই নাই।" বৃদ্ধ বিশ্বাস করলেন না। যদি কথাটা বিশ্বাস না করেও আমাকে ওরা অমনি অমনি ছেড়ে দিত, তবে হয় তো এত বিপদে পড়তে হ'ত না। কিন্তু ওরা ঠাউরে নিলে, আমি নিশ্চয় ভারত হতে গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করতে এখানে এসেছি। আমার সত্যভাষণই পূর্ব্বেকার বহুবারের মত এবারও আমার শত্রু হল, আমার উপর সঙ্কট-সন্ধিক্ষণ আসন্ন হল। যে যুবকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে আমারই কাছে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে একটা লোক এসে আবার কিচির মিচির করে যুবকটিকে কি বল্‌ল, অমনি সে উঠে গেল। আমি একা ঘরে। ঘরে বাতি ছিল, একটু পরেই একটি যুবক এসে দরজাটা বন্ধ করে বাতিটা নিয়ে চল্‌ল। গতিক ভাল নয় দেখে বাতি নিতে নিষেধ করলাম। যুবকটি তৎক্ষণাৎ ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর হতে বের হয়েই বাইরে থেকে দরজায় শিকল এঁটে দিল। আমি বন্দী হয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে দেশলাই ছিল, মোমবাতি ছিল; তা বের করে বাতি জ্বালিয়ে নিলাম। অনেকক্ষণ ভাবলাম, তারপর একটী চীনা কেরানীর লেখা সুপারিশ পত্র বের করে ঠিক করলাম যদি আবার কেউ আসে তবে তাই দেখাব। কারণ তাতে ছিল, আমি একজন পর্য্যটক এবং মামুলী ধরণের পেট্রিয়ট। সারাটি রাত কেউ

এল না, পরদিন প্রাতে দরজা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দুটী লোক এল! তাদের সেই লেখাটুকু দেখালাম, কিন্তু তারা তা না দেখেই সমুখের দরজা খুলে দিয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলল। হাঁপ ছেড়ে ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম। পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি। প্রাণে পূর্ণ শান্তি। গলিপথ ধরে বের হতে বড়ই কষ্ট হ'ল। তারপর যে পথে শহরটিতে প্রবেশ করেছিলাম সেই পথে পড়্‌তে না পারায় দিগ্‌ভ্রম হয়েছে বলেই মনে হল। তবুও এই অন্ধকূপ হতে যে বের হতে পেরেছি তাই ভেবে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করলাম।

শহর দেখেছি বহু, আর গ্রামের তো কথাই নাই, তবু এরূপ ছোট ছোট গলিভর্ত্তি শহর বা গ্রাম আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তারপর সর্ব্বত্র এত দুর্গন্ধ যে লাহোর শহরকেও টেক্কা মারে; এত মশা যে, বাঙলার যে-কোন শহরকে পরাস্ত করে, যেন একটা জীবন্ত নরক-কুণ্ড। শহর হতে দূরে এসে পথেরই পাশে একটা ছোট দোকান হ'তে কয়েকখানা পিষ্টক এবং চীনা চা খেয়ে দোকানীর সঙ্গে মানচিত্র নিয়ে আলোচনা করে উত্তরদিকে রওনা হলাম। গ্রামের পর গ্রাম পথের পাশে রেখে এগিয়ে চললাম। এদিকের চীনা গ্রামগুলি দক্ষিণের চীনা গ্রামের মত নয়। অধিকাংশ বাড়ী-ঘরই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে ইঁটের পরিবর্ত্তে পাথরের গাঁথুনি। যাদের বাড়ীতে ইঁটের গাঁথুনির পরিবর্ত্তে পাথরের গাঁথুনী তারা ধনী বলে মনে হ'ল। বিশেষ করে লক্ষ্য করছিলাম গ্রামগুলি প্রায়ই নিস্তব্ধ। যে কোন পথচারীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, সে-ই আমাকে গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এতে তখন আমার মনের আনাচে কানাচে আপন ধন্দ জেঁকে ঘুরে বেড়াতে বেশ সুবিধা পেয়েছিল, তেমন করে বেমালুম ভাবতে ভাবতেই অনায়াসে চলে যেতে পারতাম। নিজের ভাবে এত মগ্ন হ'য়ে পড়তাম যে, সমুখের পথ কেটে যে ছোট ছোট নালা আড় হ'য়ে শুয়ে আছে তার প্রতি ভুলেও চোখ যেত না। ভাবতে বেশ আরাম লাগত, কিন্তু পরে যখন একস্থানে বসতাম, স্মরণ করতে পারতাম না কি বিষয় নিয়ে ভেবেছি। চিন্তার নেশা এসেছিল, তা চলে গেছে। এবারে প্রকৃতিস্থ 'আমি'-কে সজ্ঞানে পেয়ে আদেশ করলাম, 'দেখ তুমি এখন হ'তে কারও বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তে পারবে না, থাকবে বাইরে।' দু'এক রাত্রি বাইরেও কাটিয়েছিলাম, কিন্তু ভাল লাগত না, ইচ্ছা

হ'ত লোকের বাড়ীতে নয় হোটেলে থাকি। কিন্তু আবার কোন্ বিপদে পড়ি এই ভেবে কারও বাড়ীতে যেতেও মন সর্‌ত না—এমন কি গ্রাম্য হোটেলেও না।

গ্রাম হ'তে বহুদূরে শুয়ে আছি। নিদ্রায় তখন অজ্ঞান, কিন্তু কি একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার রাত্রি। দূরের জিনিষ যদিও দেখা যায় না, তবুও ধারণা হ'ল আবছা ছায়ার মত কয়েকটা মূর্ত্তি যেন চলাচল ক'রে কিছু একটা কাজ করছে। দেশে হ'লে ভূতের ভয়ে রাম নাম জপতে স্বরু করতাম। কিন্তু এ বিদেশে রাম নামের দরকার হয় না, কারণ রাম নামের দাপটে পালাবার মত ভূত এখানে আসে না। মাথা খাটিয়ে আক্কেল মেজে-ঘষে বাগিয়ে ধরতে হয়, শুনতে হয়, বুঝতে হয়, বিষয়টি কি! বুঝতে চেষ্টা করলাম, বুঝলামও। কতকগুলি যুবক এই গভীর রাতে লক্ষ্য বিদ্ধ করার শিক্ষায় হাত পাকাচ্ছিল। ঘণ্টাদুয়েক তারা এ কসরৎ করে চলে গেল। আমার ভূতের ভয় দূর হল, কিন্তু চিন্তা হ'ল এরা রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কেন এই ব্যায়াম চর্চ্চা করছে? এদের সরকার কি তা করতে মানা করে? যাক্‌গে এ সব বাজে কথায় মাথা ঘামাতে নাই।

কয়েকদিন পর একটা ছোট গ্রামে গিয়ে হাজির হয়েছি। তখন বেলা তিনটা। গ্রামের সমুখে ভিড় জমেছে। বিচারক বসে বিচার করছেন। সাম্‌নে নত-মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে কয়টি যুবক। দোষ তাদের জানি নাই, চিন্তাও করি নাই, বিচারককে চিনিও নাই, চিনবার স্বযোগও পাই নাই। বিচার হ'য়ে গেল। একটু দূরে পুলিশ ছয়টি যুবকেরই হাত পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে নিল, চোখ বেঁধে নিল, তারপর ঘাড়ের উপর চুল যেখান পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে সেখানে পিস্তল রেখে ঘোড়া টেনে ধরল। যুবকদের ঠিক তালু দিয়ে গুলী বের হ'য়ে গেল। তৎক্ষণাৎ যুবকদের বোধ হয় প্রাণ গেল। এরূপ করে যখন ছয়টি যুবকেরই অকালে ইহলীলা সাঙ্গ হ'ল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, সাইকেলটাতে উঠে চট্‌পট্ রওনা হ'লাম। গ্রাম হ'তে বহু দূরে গিয়ে বসে পড়লাম। মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, জল খেয়ে অনেকটা শান্তি পাওয়া গেল। তখন সাহস সঞ্চয় করে পথবাহীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে বুঝ্‌তে পারলাম—এই মরণ চুরির জন্য নয়, ডাকাতির জন্যও নয়, মরণের

জন্যই এই মৃত্যু। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, যদি এরা আমার ছেলে হ'ত তবে কত দুঃখ হ'ত! কিন্তু এই ছেলেরা চীনের মুক্তির বেদীমূলে আপন আপন নব যৌবনকে দিয়েছে উপহার।

একে একে ছয়টি যুবকের মৃত্যু দেখে মনটা অপরিসীম ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। আমারই যখন এ অবস্থা, এদের বাপ-মার তখন কি দশা ভেবে আরও অস্থির হ'তে হ'ল। অনেক ভাবলাম, তারপর একটা বৃক্ষতলে রাত্রির জন্য শয্যা রচনা করে চীনা রুটি একটু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চিন্তা আমাকে রেহাই দিল না···মৃত্যু যখন দরজায় এসে ধাক্কা দেয় তখন সম্মতির অপেক্ষা রাখে না। অনুনয়-বিনয়েও তার মন টলে না। তাই চীনের যুবকের সম্মুখে যখন কঠোর কর্ত্তব্য পথ আগলে দাঁড়ায়, তখন সে সেই অবধারিত মৃত্যুকে 'স্বাগতম্' জানাতে ইতস্ততঃ করে না। ভুলে যায় মৃত্যুর বিভীষিকা, ভুলে যায় সারা দুনিয়া, কর্ত্তব্যকে এত উচ্চে স্থান দিতে পারে সে। মা চান্দ সান্ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়েও—ঝানু আফিংখোর হ'য়েও যখন দেখল, জাপানী যদি ঘাড়ের উপর চেপে বসে, তবে আর রক্ষা নাই, জাতের মেরুদণ্ড ভাঙবে, অতল সাগরে ডোবাবে—তখন অতুল সম্পত্তির মালিক হয়েও সে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যতক্ষণ শক্তিতে কুলাল লড়াই চালাল, যখন আর পারল না তখন ধর্ম্মহীন, ভগবানহীন কাফেরের দেশে পালিয়ে গেল। উদ্দেশ্য রইল—যদি পারে আবার আসবে, আবার হানা দিবে, মুক্ত করবে মাঞ্চুরিয়া জাপানীর হাত থেকে। জাপানীরা তার সম্বন্ধে যত পারল মিথ্যা প্রচার করল। কোবি নামক এক জাপানী-শহরে একদিন দাঁড়িয়ে আছি একটা বড় ট্রাম-ষ্টেশনের কাছে, দেখলাম কতকগুলি যুবক মহানন্দে মা চান্দ সানের মৃত্যুবার্ত্তা যাকে পাচ্ছে তারই হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে। কত আনন্দ—কত উল্লাসের সংবাদ তাদের কাছে। কারণ মা চান্দ জাপানের শত্রু—তাদের সাম্রাজ্যলালসার কণ্টক, তার মৃত্যু তাদের কাম্য। সংবাদ শুনে হাঁ করে বেয়াকুবের মত আর দাঁড়িয়ে রইলাম না, সবাই আনন্দে নিমগ্ন, আমি তা না ক'রে কাগজখানা হাতে নিয়ে উল্টা করে ধরলাম। জাপানী এক ছোক্‌রা কাগজটা উল্টা করে ধরেছি দেখেই কাছে এসে তা সিধা করে ধরিয়ে দিল। কিন্তু আমি তার কি বুঝব, ভাঁজ করে ঘরে নিয়ে গেলাম, তারপর একজন ইংরেজী-জানা জাপানীকে দিয়ে তা পাঠ করালাম। সেও

মহাফুর্ত্তিতে বললে—মা চান্দ মরেছে। কিন্তু এটা ছিল জাপানীদের একটা মিথ্যা প্রচার। মা চান্দ এখনও জীবিত।

ঐ ছয়টি যুবকের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে আঘাত লাগল, হৃদয় শূন্য অনুভব হ'ল। ওদের মরণ-পণ দেখে ভাবতে লাগ্‌লাম, এ ওরা করল কেন? আহা! দেখ্‌তে তারা প্রত্যেকেই যেন একটি গোলাপফুল, নিজের পাঁপড়ী নিজের হাতে ছিঁড়ল কেন? কারণ আর কিছুই নয়, ঐ যুবকগুলি ধর্ম্মাধর্ম্মের ঊর্দ্ধে, ভগবানের ঊর্দ্ধে, মৃত্যুরও ঊর্দ্ধে; মাটির ধরায় যতদিন ছিল মুক্ত তো ছিলই, এখন দেশের জন্য সে মুক্ত আত্মাকে দেহকারা থেকে চিরতরে দিল মুক্তি। যারা মুক্ত তা'দের প্রাণ কাঁদে মানবের উপর মানবের অত্যাচার দেখে। একদিকে জাপানী ধীরে ধীরে পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে, অপর দিকে চীনা ধনীর দল চ্যাং কাইসেককে কেন্দ্র করে কর্‌ছে শাসন এবং শোষণ, দরিদ্রের দল আর্ত্তচীৎকারে হাহাকার জানিয়েও ভগবানকে নামিয়ে আনতে পার্‌ছে না পৃথিবীর পঙ্কে। দরিদ্রের দল না খেয়ে পথে পথে ঘুরে কুকুর-বিড়ালের মত মরছে, আর চীনের ধনীর দল কাফে কাবেরে, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও—এসব বিলাস নিয়েই মশ্‌গুল। তা দেখে কি ঐ মুক্ত বীর-যুবকের দল নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে? তাদের দেহ বহন করতে পারে না আর্ত্তমনের ভার, তাদের পায়ের নীচ হতে মহাচীনের মাটি সরে যায়, মাথার উপরে চীনের আকাশ হতে লুপ্ত হয়ে যায় বাতাসের চিহ্নটুকু। জীবনের পানপাত্রখানি তাই মৃত্যুর আশিসে পূর্ণ করে তারা নিঃশেষে পান করে। নীলকণ্ঠের মত হয়ে পড়ে অমর। তারা যদি এই নশ্বর মানব দেহ জাতির তরে, রিক্তের তরে বিলিয়ে না দেয় তবে আর কে দিবে? আজ চীনা যুবক-যুবতী কামনা-লালসা পরিত্যাগ করে কর্ম্মের ব্রত নিয়েছে দেখে জাপানীর মুখ শুকিয়েছে। যদিও বহির্মঙ্গোলিয়াতে ঝাঁকে ঝাঁকে জাপানীরা উড়ে এসে ধাপে ধাপে জুড়ে বস্‌ছে, তথাপি ফল ভাল হবে না। ঐ ব্রতচারী এবং ব্রতচারিণীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, ফিরে তাদের যেতে হবেই একদিন।

চীনা নারীদের সভ্যতা পূর্ব্বে সত্য সত্যই কি ছিল তা জানি না বল্‌লেই ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা পায়। কেননা, যেটুকু বিশ্বে প্রচারিত, তার উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ নারীদের কথা পুরুষে বল্‌তে গেলেই

তাদের নিজের দিক বজায় রেখেই বলবে। চীনেও এই অপচেষ্টার কসুর হয় নাই, তার প্রমাণ স্বরূপ এখনও লৌহজুতা পরা বৃদ্ধার দল বিদ্যমান। একথা মনে করবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, চীনের নারী কোন কালেই প্রাচ্যের অন্য নারীর মত পিঞ্জরাবদ্ধ হয় নাই, ওরা স্বাধীনতা অনেকটা বজায় রেখেছিল। নিদর্শনস্বরূপ, চীনের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষরা যত আল্লার আদেশ মেনে চলে, নারীরা কিন্তু ততটা মেনে চলে না। তারা তাদের মুখ ঢাকে না, যে-কোন পুরুষের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলে থাকে এবং আমন্ত্রিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে স্বামীসহ এক টেবিলে বসে খেতেও অবগুণ্ঠনের কুণ্ঠিত আবরণ বালাই হয়ে তাদের স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরে না। তারপর চীনের নারীরা বুদ্ধ এবং কন্‌ফিউসিয়াস—এই দুটি অবতারেরও ধার ধারে না বললেও চলে। সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা সে দেশে বড়ই কম। যাঁরা আছেন, তাঁদের শ্রেয় বড় কি প্রেয় বড় তা জানা বড় কঠিন।

একে একে ছ'টি মোটাসোটা যুবকের মৃত্যু দেখে মনে হয়েছিল আর একটা মৃত্যুর কথা। এই ছ'টি যুবক মরেছে স্ব-ইচ্ছায়, আর আমার এক আত্মীয় মরেছিল অনিচ্ছায়। রক্ত বমি তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, আর ওদের মৃত্যুর কারণ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন। আত্মীয়টিকে যখন দাহ করে ঘরে ফিরেছিলাম, তখন আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিলাম। আজ বৃক্ষতলে একাকী, তবু ভয় কোথায় চলে গেছে! কত কি ভাবলাম, তারপর মৃদুল স্নিগ্ধ বাতাসে আপনা হ'তে চোখের পাতা মুদিত হয়ে এল। গভীর রাতে একটা অট্টহাস্য শুনে ঘুম ভাঙল, চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, কাছে লোক আছে কিনা। কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। পরক্ষণে কাছেই শুনলাম সে হাসি। কিন্তু এবার ভয়ের পরিবর্ত্তে রাগ হ'ল; কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। আমি হাঁকলাম—"কে রে?" জবাব পেলাম না। আর মাথা না ঘামিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোর হয়েছে, চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুম থেকে উঠে দেখি কাঁচা সোনার মত সূর্য্যের আলো গাছের ডগায় ডগায় নেচে বেড়াচ্ছে। আগে উপাস্য দেবতাকে নিদ্রা হতে উঠেই মাথা নত করে প্রণতি জানাতাম, কিছুদিন আর তা করি না। প্রাতঃকৃত্য করে পথ ধরলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই

ছেলেগুলির জন্য এমন দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে উঠ্‌ছিল, যেন পাঁজরগুলা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কতক্ষণ যেয়ে হাসি এল, এও তো আমার মনেরই দুর্ব্বলতা, এদের জন্য এত দুঃখ কেন? মরতে এসেছে মরেছে। কিন্তু মনে হল "Babies are loved, youths are cared and olds are hated." এরাও বৃদ্ধ হোক তারপর মরুক, দুঃখ করবার কিছু থাকবে না। কিন্তু তখনই মনে পড়ল, এ তো এদের মৃত্যু নয়, এদের ব্রত উদ্‌যাপন—মাতৃপূজার যজ্ঞে চরম ও পরম আহুতি।

গণ-জাগরণ

এগিয়ে চলেছি। অভ্যাসের বশে গানটি আপনি মুখ হতে বের হয়ে পড়ল —"এমন মধুর হরিনাম নিতাই কোথায় পেয়েছে।" গাইছি মনের আনন্দে, কিন্তু ঐ দূর হতে সুয়াবীনের মাঠের চাষী আমার গান শুনে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে, অনেকে আবার অশ্বগুলির গতিরোধ করে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে আমার কণ্ঠ হয়ে গেল রুদ্ধ। দু চোখ তখন সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। কালো সাজে ভূষিত হয়ে এই গরমে ওরা কেমন করে মাঠে লাঙ্গল দেয় তা দেখবার মতই। অনেক দেখেছি তা, কিন্তু আজ ইচ্ছা হল আবার দেখি, আবার কথা কই ওদের সঙ্গে, কিন্তু কোন্ ভাষায়? হাতের ইঙ্গিতে আর মনের মিলে। সাইকেলটা রেখে দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে মাঠে 'ব্যাজটা' পরে। চীনের কৃষক পড়তে জানে, হিন্দুস্থান কোথায় তারা জানে। আমাদের দেশে ক্যালেণ্ডারে শুধু দেবপ্রতিমা ছাপান হয়, চীনের ক্যালেণ্ডারে কিন্তু থাকে শুধু ভৌগোলিক তথ্য। কৃষক আমার পরিচয় পেল, কথা বল্‌ল, কিন্তু ভাষা বুঝলাম না, তবে এটা বুঝলাম, কৃষক আমাকে ভালবেসেছে এবং বসতে বলছে। বস্‌লাম, ওরা তামাক দিয়ে আমার অভ্যর্থনা করল।

দু হাত লম্বা একটা বাঁশ, তার মাঝে একটা গাঁট। যেখানে গাঁট শেষ হয়েছে তাঁর নীচের দিকটা ফাঁকা, উপরের ফাঁপা ফাঁদলে খানিকটা জল ঢেলে দিয়েছে, বোধ হয় পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ। গাঁটের ঠিক উপরে ছিদ্র ক'রে বসানো একটা নল, লম্বা হবে চার ইঞ্চি, তারই অগ্রভাগে কাটাতামাক পুরে দেওয়া হয়, আর কাগজের নলের আগুনে তার একদিকে ধরিয়ে দিয়ে উপর

হতে টানা হয়। তামাক একটু জললেই টানা হয় এবং তা জলে গেলে উপর হতে ফুৎকার দিয়ে পোড়া তামাক বের করে দেওয়া হয়। এই হ'ল চীনা কৃষকের তামাক খাওয়া। তবে একবারের সাজা তামাক দিয়ে বেশীক্ষণ টানা চলে না, বারবার নিবাতে হয় আর বারবার তামাক পূরে জ্বালাতে হয়। যখন তৃপ্তি হল, তখনই বন্ধ করে দেওয়া হয়। একজনের হুঁকা অন্যকে দেওয়া হয় না। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক একটী হুঁকা থাকে। অভ্যাগত বা হুঁকাহীন লোককে দিবার জন্য পৃথক একটি থাকে, এবং যখনই কাউকে দেওয়া হয় তখনই গরম চা'র জল দিয়ে যেখানে মুখ দিয়ে টানা হয় সেখানটা ধুয়ে ফেলা হয়। চীনা মজুর গরম চা'র জল সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যায় না, কারণ তাই তাদের পানীয়।

চা এবং তামাক খেয়ে রওনা হবার জন্য উঠেছি, কৃষক আমাকে ছাড়লে না, কাছেই একটা ছোট টালির ঘরে তার স্ত্রীর হেপাজতে আমায় রেখে কাজে ফিরে গেল। সে গৃহের সমুখে পিছনে তিনটি কামরা। সকলের পিছনে একটা ছোট ঘরে কয়টি শূকর ছানা এবং ধাড়ী শূকরটা রয়েছে। আমাকে বসতে দিয়েছিল সমুখের ঘরেই। কৃষকরমণী আমাকে দেখে ভয় পান নাই। বরং প্রতিবেশীকে ডেকে নতুন জীবের আগমনবার্ত্তা বলে দিলেন। মেয়েদের দল তো এলই, তারপর ছেলেপিলের দলও। এরা কিন্তু কিচির মিচির স্বরু করে দেয় নাই। এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, এদের ভিতর বেশ গাম্ভীর্য্য আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও কম নয়, অন্ততঃ পরিচ্ছদের দিক দিয়ে তো বটেই। এদের সবার মুখের একটা কথা ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম "হিন্দু বরজোয়া"। এখন এই শব্দটির অর্থ বুঝি, পূর্ব্বে বুঝতাম না। একে অন্যের দিকে চেয়েই বল্‌ত, হিন্দু বরজোয়া। তখন ভাবতাম হয়তো তারিফের কথাই কিছু বল্‌ছে। কিন্তু কৃষক-পত্নী হাত দিয়ে ইঙ্গিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা আছে কি-না? আমি বললাম, নাই। সকলের মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল, ওরা আমার কাছে আসতে আর কুণ্ঠা বোধ করল না, ব্যবধান যেটুকু ছিল, তা দূর হয়ে গেল। খাবারের বন্দোবস্ত দেখলাম বড় স্থবিধার নয়। একটি গোবৎসের বাসি মুণ্ড সিদ্ধ করা হচ্ছে ঝোলের জন্য এবং তাতে কয়টুকরা শূকরের চর্ব্বি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষক পত্নীকে

ইঙ্গিতে জানালাম—এসব খাই না, শুধু সব্জী খাব। অমনি সবাই মিলে বলে উঠল—"মহামাদ কই" অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী ভূত। তাতেও রাজি, কিন্তু ঐ বাসি পচা গোবৎসের মুণ্ডের ঝোল খাওয়া আমার দ্বারা হবে না। এখানে বলে দেওয়া ভাল, কই শব্দ ভূতও বুঝায় 'অসভ্য'ও বুঝায়। এখানে অসভ্যই বলা হয়েছে, চীনাদের মতে সবাই অসভ্য, আর তারাই শুধু সভ্য। শুধু ইসলাম ধর্ম্মকেই অসভ্যতা বলে ওরা বুঝে না, বৌদ্ধ এবং কনফিউসিয়ানকেও ওরা অসভ্য বলেই ধরে নেয়। চীনের মেয়েরা "থিন্‌কং" এবং "কই" উভয়কেই একই ভাণ্ডে ফেলে দিয়ে ভক্ষণ করবে বলে মনে হল। থিনকং মানে ভগবান এবং কই মানে ভূত।

আমার খাদ্যের বন্দোবস্ত হতে লাগল। চীনারা বিপাকে পড়ে তাদের দেশের ইস্‌লাম চীনাদের যখন ভোজন করায় সে-যে এই ব্যবস্থাতেই তা বেশ বুঝে নিলাম। সর্ব্বপ্রথম একটা কড়াইকে উপুড় করে আগুনের উপর ধরে রাখা হ'ল। কড়াইটা যখন আগুনের আঁচে থেকে থেকে লাল হয়ে গেল তখন সেটাকে নামিয়ে তার উপর জল ঢেলে দিয়ে রাখা হ'ল। তারপর লোহার হাতাটাকেও তদ্রূপ লাল করা হ'ল এবং জলে রেখে ঠাণ্ডা করে নিকটস্থ নালা হতে মাটি দিয়ে মেজে-ঘষে পরিষ্কার করা হল। দোকান হতে একটা নবপাত্রে খানিকটা সূর্য্যবীনের তেল এনে কতকগুলি শাক কুটে তেলটা গরম হবার পর ছেড়ে দেওয়া হ'ল; নতুন লবণ কেনা হয়েছিল। লবণ ছেড়ে দিয়ে যখন সিদ্ধ হয়ে গেল তাই হ'ল সব্জী। রান্না করা শাকগুলা নবপাত্রে রেখে কড়াইটা পরিষ্কার করে তাতেই ভাত চড়ান হ'ল। ভাত হবার পর আর একটা নতুন কাপ এবং দুটা নতুন কঞ্চি দেওয়া হ'ল। তারপরই আমাকে খেতে ডাকা হ'ল। বেশ আরাম করে খেয়ে নিলাম—যেন কোন পাতা চচ্চড়ি আর ভাত। চীনা মুসলমান চীনা হোটেলে খায় না, বিপদে পড়ে যদি ওদের বাড়ীতে খায় তখন এরূপই ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই খাবারের পরিণাম বড় ভাল নয়, চীনা মুসলমান আজ শক্তিতে হীন। যদিও আমাদের দেশের বৌদ্ধ শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণদের মতই ধনী এবং জ্ঞানী, তথাপি সঙ্কীর্ণতা তাদের মাথায় এমন কুঠার হেনেছে যে তাদের ধন-জ্ঞান কিছুই কার্য্যকরী নয়। চীনের মুসলমান মরণমুখী, আর চীনারা গৃহযুদ্ধে, জাপানী-যুদ্ধে

যতই মরছে, ততই যেন তাদের শক্তি ক্রমশঃ বাড়ছে, রক্তবীজের বংশ আর কি।

যদিও মেয়েমানুষগুলি আমাকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলেই ঠাউরে নিল, তবুও এদের ধারণা ছিল আমি হিন্দুস্থানের লোক, আরবের নই। খেয়ে দেয়ে বেশ একটু ঘুম দিলাম; বিকালে একে একে কৃষকের দল বাড়ী ফির্‌ল। কোন কোন কৃষক আবার দু'চার কথা ইংরেজীও জানে। তার একমাত্র কারণ হ'ল অবস্থার ফেরে পড়ে কেউ সাংহাই, কেউ পিকিনে গিয়ে রিকসা টানার কাজ করে এসেছে এবং বিদেশী সৈনিকদের কাছ হতে অবাচ্য ইংরেজী বুকনিগুলি আচ্ছা করে আউড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। লোকগুলা গালিটা শিখেছে চটপট—ভাল কথার চেয়ে, তার কারণ ঐ সব রিক্‌সা যা'রা টানে তারা গালিই খায় বেশী, তার ফলে গালিটাই শিখে বেশী। পিকিনফেরতা কয়েকজন এমনি রিক্‌সাওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল, তারা পঞ্চমুখে পিকিনের সুখ্যাতি করল, তার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের শ্রাদ্ধ করতেও ছাড়ল না। কিন্তু কতকগুলি কৃষক দেখলাম একেবারে চুপচাপ গম্ভীর। মনে হ'ল এরা এমন এক নতুন মন্ত্র—নতুন পথের হদিস্ পেয়েছে, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় এদের মনে এত আঘাত লেগেছে যে, আর কথা বলতে পারছে না, শুধু ভাবছে। এদের সংখ্যাও কম নয়, এরাই যে ভবিষ্যতে হবে চ্যাং কাইসেকের শত্রু, জাপানীর দুষমন, এতে আমার সন্দেহ নাই এতটুকু। কিন্তু এরা আছে শুভ মুহূর্ত্তটীর প্রতীক্ষায়, যখন সে যোগাযোগের সন্ধিক্ষণ ঘনিয়ে আস্‌বে তখন আমার মনে হয় 'চ্যাং কাই' এবং 'জাপ্পুন' একই আগুনে পুড়ে ছাই হবেন। ভিতরে ভিতরে ইন্ধন প্রস্তুত, শুধু বাইরে থেকে জ্বলন্ত শিখাটির ছোঁয়া পেলেই হয়।

এদের সঙ্গে মনের সুখে বেশ কথা হ'ল, কিন্তু ছেলে যেমন আধো আধো কথা বলে, এরাও ঠিক সেরূপ আধো আধো বুলি বলতে শিখেছে। কাজ সুরু হয়েছে মাত্র, তবে তার পূর্ণ বিকাশ হতে সময় লাগবে, কারণ দেশের মঙ্গল দেখতে পারে না এখনও চীনে এমন সর্ব্বনাশা লোক আছে, তারাই হ'ল পুরাতনের উপাসক। কিন্তু তারা ভাল করেই জানে যে পতন তাদের নিশ্চিত। এখনও তারা মাটিতে পড়ে নাই বটে, তবে পড় পড় হয়েছে তবু ভরসা তাদের এই যে, আজও শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন সেভাবে থাক্‌তে পারবে,

তা-ই তারা মন্দের ভাল মনে করে। দিনগত পাপক্ষয় আর কি। এর নাম কি বেঁচে থাকা, এমন বেঁচে-মরা হয়ে লাভ কি! এদের চোখে ধূলি দিয়ে প্রগতিপন্থী চলেছে এগিয়ে। তারপর শক্তিমান সরকার আছে। এই সরকারেরই আবার ধর্ম্মপ্রচারক আছে। তারা নানা ছল করে ঘরে-বাইরে নজর রাখে কোন্ দিকে বেপরোয়া প্রগতিপন্থী পা বাড়ায়। যদি কোন প্রগতিকামীকে হাতে কলমে ধরতে পারে গোপন কর্ম্মধারার আবহাওয়ায়, তবে তার মৃত্যু দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। অনেক সময় যমদূতও ক্ষমা করে, কিন্তু সরকারের কাছে ক্ষমা নাই।

'মডেল' গ্রাম

সন্ধ্যার পর গ্রাম থেকে বের হয়ে পড়লাম, প্রাণের ভিতর হতে সাবধান বাণী উৎসারিত হচ্ছিল যে, ঐ গ্রামে রাত্রিবাস আমার মত পথিকের অন্যায় আব্দার। একবার ঢাকা শহরেও আমার সেরূপ অন্যায় আব্দার করতে হয়েছিল, কোনও আশ্রমে রাত কাটাবার অনুমতি চেয়ে। ভিতরে ঢুকে দেখেছিলাম, আশ্রমে ভগবানের আস্তানা, সাধু মোহান্তের সমাবেশ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারীদের আড্ডা; কিন্তু এ গ্রামে বাস কতকগুলি দরিদ্র কৃষকের। যদি এ সব কৃষক কোরিয়ার অধিবাসী হ'ত, তবে জাপানী কোন্‌দিন তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দিত তার ঠিক ছিল না এরূপও শুনেছি। কিন্তু এ গ্রাম চীনেরই এলাকায়, তাই হয় তো এখনও উড়ে যায় নাই, তবে নামের তালিকায় টিপ্ দিয়ে রাখা হয়েছে বলেই অনুমান হ'ল,—উড়েও যেতে পারে, পড়েও যেতে পারে। এরূপ গ্রামে—আমাদের মত পথিকের থাকা নিষেধ। আমরা কোন 'ইজ্‌মে'র গণ্ডীতে ঘেরা নই; যেখানে পেট ভরে খেতে পাই সেখানেই যাই, কিন্তু যেই পেটটি ভরা হ'ল—অমনি সরে পড়ি; আমাদের দেশ-বিদেশের এসব 'ইজমে'র মধ্যে পড়লে চলে না।

রাত্রি অন্ধকার। কখন-বা পথের পাশের ছোট ছোট গর্ত্তে গিয়ে পড়তে লাগলাম, কোথাও-বা বেড়ার সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেতে লাগ্‌লাম, এমনি করে নাকাল হয়ে হয়ে গ্রাম হতে কোন রকমে বের হয়ে পড়লাম, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞান আর রইল না। খানিকটা-দূরে গিয়ে ভাল একটা পথে

পড়লাম। ভাবলাম কিছুদূর গিয়েই কোথাও শুয়ে পড়ব। কিন্তু চিন্তা হল, যে পথে এসেছি, সে পথে ফিরে চল্‌ছি না ত? আমার অভ্যাস—পিছু না হটে নিত্য নতুনের হাতছানিতে শুধু এগিয়ে যাওয়া। কতদূর গিয়ে একটা পতিত জমিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন উঠে আর গ্রামে গেলাম না, পথের লোককে সান্‌টাং প্রদেশের পথ জিজ্ঞাসা করে করেই চল্‌তে লাগ্‌লাম। আমার মনে হ'ল, সমুদ্রতীরে এসেছি। সমুদ্রতীরে এসেছি, কিন্তু বন্দর কোথায়, শহর কোথায়,—আমি কোথায়? এরূপ ভাবে দিক্‌-বিদিক্‌ হারিয়ে যাওয়ায় একপক্ষে যেমন অভিনব আনন্দ, অপরপক্ষে তেমনই দেশের কথা মনে জেগে ভয়ের সঞ্চারও করে। যাঁরা মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চ্চা করেন, তাঁরা গবেষণা করে দেখবেন—এরূপ হয় কেন?

আমার মনে হ'ল, এরূপ করে দিশেহারার মত যদি চলতে থাকি তবে হয় তো পিকিনে সারাটি বৎসরেও পৌছতে পারব না। অতএব এবার পথের সন্ধান নিতে হবে,—কোথায় আছি জানতে হবে, অন্ততঃ প্রসিদ্ধ খালটিকে একটীবার দর্শন করতে হবে, তারপর মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে হবে—কোথায় চীনের কি বৈশিষ্ট্য, এর পর যখন প্রয়োজন হবে, বলতে হবে তো লোকের কাছে। একটি ছোট্ট গ্রামের কাছে একজন ভদ্রলোক মুক্ত বাতাসে পায়চারী কর্‌ছিলেন, আমাকে তিনি ডাকলেন। প্রথম তিনি আমার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বললেন, কিন্তু আমার সে ভাষায় জ্ঞান নাই দেখে ফরাসী কায়দায় আমার সঙ্গে ইংরেজী বলতে লাগলেন। প্রথমেই তিনি তাঁর নিজ পরিচয় দিলেন। তিনি পিকিনে অধ্যাপকের কাজ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেও লিখতেন। কিন্তু তাঁর সে নৌকরী বেশী দিন টিকল না, তাঁকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আস্‌তে হয়েছিল। তিনি যে-সংবাদপত্রে কাজ করতেন, সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক এখন জীবিত কি মৃত কেউ জানে না; তবে এটা সবাই জানে—মুদ্রাযন্ত্রটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক মহাশয় এখন রেশম ব্যবসায়ী। কিন্তু এখনও পিকিনের প্রতি তাঁর টান আছে এবং তিনি বললেন, যদি তাঁর বাড়ীতে আমি কয়দিন অবস্থান করি তবে আমার সঙ্গে সাইকেল যোগে তিনিও পিকিন যাবেন। কথাটা শুনে বেশ আনন্দ হ'ল, কারণ ক্যান্টনে গিয়ে 'সঙ্গী চাই' বলে বিজ্ঞাপন দিয়েও

সঙ্গী পাই নাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে একটা গ্রাম্য হোটেলে নিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম এটাই তাঁর বাড়ী। হোটেলে অনেক ভদ্রমহিলা আছেন, অনেকে হোটেলেরই কাজ করেন। একদিন থাকার পর যখন ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন, তখন বুঝলাম যে, আমি পূর্ব্বদিন হোটেলে বাস করেছি। ভদ্রলোকের দুটি মাত্র ছেলে, সংসারে এই দুটি ছেলে ছাড়া তাঁর স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মা আছেন। তাঁর বৃদ্ধা মা আমার সঙ্গে ইচ্ছা করে সাক্ষাৎ করলেন না, তাঁর কারণ জানলাম—তিনি হিন্দুদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। ঘৃণা করায় একমাত্র হেতু হ'ল—হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্ম তাড়িয়ে দিয়ে ভগবানের পূজা আরম্ভ করেছে, ভগবানকে পূজা করা আর ভূতকে পূজা করা—এ বৃদ্ধার মতে এ দু-ই এক। পূর্ব্বে বলেছি এদেশের বৌদ্ধদের বিশ্বাস, ভগবানের সঙ্গে প্রভু তথাগতের ঘোর বিরোধ ছিল। তাই এই বৃদ্ধার মতে ভগবানকে পূজা করলে কোন লাভ নাই; কারণ ভগবানের কোন শক্তি নাই। বায়ুর শক্তি আছে—কিন্তু বায়ুও নিয়মের অধীন, প্রকৃতির অনুগত; ভগবান জিনিষটাও তাই। তার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ নিয়মের ধারায় না মিলে ততক্ষণ তার কিছুই শক্তি নাই, অর্থাৎ প্রকৃতির আইন-কানুনকে উল্টে দেবার ক্ষমতা তার নাই, ইত্যাদি। ভদ্রলোক এ সব কথা বলে—তাঁর মাতার অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ভদ্রলোকের দুটি ছেলেই চিনি খেতে অভ্যাস করেছে, কারণ চিনিতে নাকি হাড় মোটা হয়। অনেক অঞ্চলেই দেখেছি, চীনের কচি ছেলে-মেয়ে কখনও গব্যদুগ্ধ এবং চিনি খায় না, খেতে দেওয়াই হয় না। ভদ্রলোক ছেলে দুটিকে আমারই সামনে চিনি খেতে দিলেন, এবং দেখিয়ে দিলেন, ওরা চিনি খেতে ঘৃণা করা তো দূরের কথা, মুখও বিকৃত করে না। ভদ্রলোকের স্ত্রী কিন্তু এখনও চিনি খান না, গুড়ই ব্যবহার করেন—বিশেষ করে পিষ্টক তৈরী করবার বেলা। ভদ্রলোকের নাম এখন বলব না, কারণ তিনিও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁর নাম বলেন নাই। তাই আমি যখন তাঁর কাছ হতে বিদায় নিব তখনই তাঁর নাম বল্‌ব।

সারা দুনিয়ায় কত শত হোটেল এটাও একটি হোটেলই বটে, কিন্তু

ক'দিন থাকার পরই অবাক হয়ে দেখলাম অনেকেই ভোজন করতে আসে, কিন্তু যাবার বেলা পয়সা তো দিয়ে যায় না। খায়, গল্প করে, আমার দিকে আড়নয়নে তাকায়, তারপর চলে যায়। যারা আসে তারা সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এবং খাবারের বন্দোবস্তও অনেকটা সাদাসিধে শাকসব্জীই বেশী, মাঝে মাঝে এক একদিন মাছ এবং ডিম হয়। মাছ এবং ডিম সকলে খায় না, শুধু সব্জী এবং ভাত খেয়েই চলে যায়। যুবকেরা যেমন খেতে আসেন তেমন যুবতীরাও আসেন, কিন্তু এই যুবতীদের দেখলেই মনে হয় এদের অপরূপ সৌন্দর্য্য অতি সাধারণ পোষাকের মাঝ দিয়েও ফুটে উঠেছে। যেসব যুবক আসে তাদের গোলাপী গাল, পেশীবহুল সুঠাম দেহে অদম্য শক্তি, কিন্তু সংযত এবং ভাবুক। ভুলেও কখনও তাদের যুবতীদের উপর লালসাজড়িত নির্লজ্জ নজরে চাইতে দেখি নাই। ভদ্রলোককে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম কবে রওনা হবেন, কিন্তু তিনি কেবল আজকাল করে সময় কাটাতে লাগলেন। একদিন বল্লেন, চীন ভ্রমণে এসেছেন, এখানে কি কিছুই নতুন দেখছেন না যাতে আপনার শিখবার আছে? আমার ফাঁকা জবাব—কি আর শিখব এখানে, গ্রামে কি দেখব, এই কয়টী মাত্র লোক তারাও ঘড়ির কাঁটার মত আসে আর চলে যায়, কেউ কথাও বলে না। ভদ্রলোক আমার কথা শুনে মাথা চুলকিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিয়ে গেলেন। তারপর যখন দেখা হল সেই ফরাসী সুরে তন্ন তন্ন করে ভারতের সংবাদ নিতে লাগলেন এবং লিখতে লাগলেন। যখন তিনি আমার কথা চীনা ভাষায় লিখছিলেন তখন দু একজন ঝুঁকে পড়ে তা পাঠ করে মনে যে ব্যথা পেয়েছিল তা তাদের মুখ দেখেই বুঝেছিলাম।

আমি ক্রমাগত ভারতের কথা বলে যাচ্ছিলাম আর তিনি লিখছিলেন, কিন্তু অনেক সময় আমার মুখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভারতের বাইরে গেলে চিনা যায় আমরা কিরূপ জীব। যারা বাইরে যায় না এবং আপন আপন মতলব হাসিল করবার জন্য নিজেদের অক্ষমতার অপরাধ, দেশের অন্ধ সংস্কার ও অজ্ঞতা প্রভৃতির সব দায়িত্বই অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, তারা বুঝবে না, বুঝতে পারবে না—কত সঙ্কীর্ণ তাদের দৃষ্টি, কত হীন প্রকৃতির লোক তারা। আমিও একদিন ভাবতাম পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলেই

রিক্ত নিঃস্বের এই দুর্দ্দশা; কিন্তু এখন সে ভাব মন থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, মানুষকে মানুষ ভাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু এ বিদেশ, বিদেশে জেনে শুনে নিজের বদনাম মুখে আসে না, কিন্তু কতক্ষণ সে-সব কথা লুকিয়ে রাখা যায়। কথা বলা হয়ে গেলে ভদ্রলোক বললেন, আপনার আর এ গাঁয়ের আনাচে কানাচে ভ্রমণ করে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, তবে দয়া করে এই হোটেলটা দেখুন। কতকগুলি পুরাতন প্রথা আমাদের ভিতর ছিল, তা আপনাকে বলে দিচ্ছি, সেগুলির কথা একটু ভাবুন আর তুলনা করে দেখুন বর্ত্তমানের সঙ্গে।

পুরাতন চৈনিক নিয়মগুলি ভদ্রলোক বললেন। তার কতকগুলি পূর্ব্বে আমিও প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু বলেছি। তবু দু'একটা নতুন বলে মনে হ'ল। চীনা পুরুষেরা জানত বাঁদরের মাংস খেলে এবং বিশেষ করে বাঁদরের মগজ খেলে পুরুষের দৈহিক ক্ষমতা বাড়ে এবং দীর্ঘকাল বলবান থাকা যায়, তাই তারা বাঁদর তো খেতই, এমন কি বাঁদরের মাথা ভেঙ্গে তাজা মগজও খেত, এতই ছিল তাদের পুরুষত্ব অটুট রাখবার হীন প্রবৃত্তি;—অবশ্য এসব রুচিবিকার এসেছিল মাঞ্চুদের কাছ থেকে। কিন্তু বর্ত্তমান চীনারা তা একরূপ ভুলেছে বললেও ত্রুটি হয় না। কিন্তু সেই পুরাতনপাপী, সমাজ-রক্ষকের দল, বর্ত্তমান সরকার-ভক্তের দল—এখনও অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে কোনরূপ কুণ্ঠা অনুভব করে না। কিন্তু চীনের যুবক-যুবতী তাদের শাস্তির ভার নিজ হাতে নিয়েছে। এই সম্পর্কে—একজন ইংরেজ জাহাজের কাপ্তান 'সাউথ চায়না ডেলী প্রেস' পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, একদিন তাঁকে একটি আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য যেতে হয়। বিষয়টি ছিল—একটি পাচক তার সহকারীকে কোন কারণ বশতঃ হত্যা করে। সহকারীর ভাই জাহাজের অন্য বিভাগে কাজ করত। সে যখন জানল যে, তার ভাইকে পাচকই মেরে ফেলেছে, তখনই সে একটি সাবল নিয়ে পাচকের মাথায় এমন আঘাত করল যে, তাতেই তার পঞ্চত্ব লাভ হল। সহকারীর ভাইকে যখন বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আনা হয়—তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, "life for life, case is already tried." কাপ্তান তা শুনে এমন চমকে গেলেন যে, তাঁর মাথার টুপি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসেই বিস্মৃতি বশে ফেলে এসেছিলেন।

পুরাতন প্রথা বলা হয়ে গেলে ভদ্রলোক গাঁয়ের পরিচয় দিলেন, এই গ্রামে মানুষ গড়া হয়, যেমন হয় কামান ও বন্দুক। কামান-বন্দুক থাকলে কি হবে—যদি তা কেউ ব্যবহার করতে না জানে! তোমাদের দেশের কেতাব এখানে পড়ান হয়। তবে বোধ হয় তা তুমি পড়তে পারবে না। বইখানার নাম হ'ল 'সীতা'। কথাটা শুনেই মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। ভদ্রলোক বললেন, আমাদের পূর্ব্বঅঞ্চলের লোক এত অহং-ভাবাপন্ন হয়েছে যে, প্রত্যেকটি এক-একটি জীয়ন্ত ইহুদী। নিজের মতলব ছাড়া আর কিছুই বুঝে না, তাই এখানে এই বইখানা পাঠ করে বুঝান হয়,—যদি দেশের জন্য, জাতির জন্য মর, তবে নিশ্চিত স্বর্গ। মরেও যদি কিছু পাও, তবুও লাভ; কারণ সে তো আর অন্য কিছু নয়, একেবারে স্বর্গ, এর চেয়ে বড় কি আছে এই দুনিয়ায়। তাতেই অনেকে যে সুখী হয় তার একমাত্র কারণ, কাজের বদলে কিছু পাওয়া চাই-ই। মনে মনে ভাবলাম—বেশ বই পড়াচ্ছ, কি বিষয়-বস্তুর কি বিপরীত অর্থ করেছ। এখানেই ভদ্রলোকের আত্মতৃপ্তির বক্তৃতা শেষ হ'ল না, চল্‌ল অবিরাম, তা আমার শুনাই হচ্ছিল মাত্র, কিন্তু মন ছিল পিকিনের পথে। ভাবগতিকে বুঝলাম, ভদ্রলোক এক পা-ও নড়বেন না, শুধু আমাকে আট্‌কে রাখার ফন্দি মাত্র। ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার পর বললাম, আগামী কল্য প্রাতে আমি পিকিনের দিকে রওনা হব, যে কোন প্রকারেই হোক সানটাং প্রদেশ আমার দেখা চাই-ই। উদ্ভিদ দেখা যে আমার উদ্দেশ্য, তা আর বলি নাই। ভদ্রলোক বললেন, আপনি চলেছেন তো পিকিনের পথে, সানটাং অন্যদিকে যে! একটু ভাবলাম, তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গে আগামী কল্য প্রাতে দেখা হবে বলে বিদায় নিলাম। ভদ্রলোক যেন আমাকে তাচ্ছিল্য দেখিয়েই বিদায় নিলেন। রাত্রি বেলা 'ধ্রুবতারা'টি ঠাউরে নিলাম সপ্তর্ষিমণ্ডলের সঙ্গে হিসাব করে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকও ঠিক হ'ল। সাগর যেদিকে থাক্ তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার গতি হবে উত্তর দিকে।

প্রভাত হ'ল। আমি কাউকে কিছু না বলে, পথ বেছে নিলাম। উত্তর দিকে গ্রামের পর গ্রাম পেছনে রেখে, নানারূপ গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চল্‌লাম। গ্রামগুলির কোনটার গায়ে অতীতের হাওয়া, তাই অবস্থা নেহাৎ খারাপ, কোনটার রূপায়ণে নতুন আবেশ, তাই উন্নতিশীল, এখন

বাইরের সাজ দেখেও এটুকু মালুম করে নিতে আমার বাধে না। কিন্তু মন এত হায়রান্ হয়েছিল যে, মানুষ দেখলেই মনে হ'ত—তার শ্বাসে-শ্বাসেও না জানি কোন্ বদ্মতলব ভেসে আস্ছে। কারণ, অন্যদেশে এমন মানুষ এ জন্মে দেখি নাই—যার মুখে সরলতার হাসি ফুটে উঠে অথচ অন্তর থাকে কুটিলতায় ভর্ত্তি। হরেক জাতের মানুষই এ জীবনে দেখেছি। গুপ্ত-পুলিশ—যারা চোর-ডাকাতের সন্ধান করে, তাদের মুখ এক রকম হয়; আর যারা অন্য কাজ করে—তাদের মুখ অন্য রকমের হয়। মুখ দেখলেই বুঝা যায় লোকটার প্রকৃতি—কিন্তু চীনের সে পুলিশই হোক আর পুলিশ-নাশকই হোক্, চ্যাং কাইসেকের লোকই হোক আর তথাকথিত কমিউনিষ্টই হোক,—সবাই বেশ ভালমানুষের মতই হাসে। সে হাসিতে আমার মনে বেশ খট্‌কা লেগেছিল। একদিন হয়তো একটা অসৎ লোকের কাছে থাকা গেল, জানা গেল তাদের রকম-সকম কি। তা সয় যদি আর দশদিন মনের মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু এ যে দেখছি সবাই এক স্বরে বাঁধা। রহস্য লেগেই আছে। তাই ঠিক করলাম—এখন থেকে আর ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। বিকালে একটা গ্রাম্য হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করলাম। যখন বন্দোবস্ত করেছিলাম তখন সেই হোটেলে একটিও ইংরেজী টুপি-পরা লোক দেখি নাই, কিন্তু সন্ধ্যা হবার পরেই ইংরেজী টুপি-পরা লোকের আমদানী হতে লাগল। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। আমার দরকার নাই—এসব ভদ্রলোকদের মাঝে গিয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দরজায় ঘা পড়ল! দরজা খুলে দিলাম। এবার বাংলাতে কথা বলতে লাগলাম। ওরা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কিন্তু পাছে আবার গ্রামে যেতে হয়,—নব্য-চীনের সোভিয়েটের অনুকরণে মডেল গ্রাম দেখতে হয়, সেই ভয়ে আর একটা কথাও ইংরেজী বল্লাম না। নমস্কার করে আবার দরজা বন্ধ করে দিলাম। এরূপ করে চল্‌তে চল্‌তে আবার সমুদ্রতীরে এলাম। কোথায় বা সানটাং প্রদেশ আর কোথায় বা আমি!

সাম্যের পূজারী

আমার ধারণা ছিল যে, ধৈর্য্য আমার খুব বেশী। এমন কি সাধারণ অসহিষ্ণুদের দেখে মনে মনে সেয়ানা হাসি হাসতাম। কারণ ধৈর্য্য দ্বারাই

অনেক সময় কাজ সেরে নেওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি আমার ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘট্‌ছে একটুতেই। তার জন্য আমার সদ্য ঝেড়ে ওঠা অসুস্থতাটাই হয় তো দায়ী। তবু কিন্তু একটি বৃক্ষ-নিম্নে সারারাত অনিদ্রায় কাটালাম, শুধু ভাবলাম, কেন আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল, কেন আমি সমুদ্রতীরে এলাম। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম পিকিনের পথ। সে একটু চিন্তা করে পথ বলে দিল, আমি চললাম এবার সেই পথ ধরে। টাকা আছে, ভিক্ষার দৈন্য আপাততঃ মনকে পীড়া দিবে না। কিন্তু সেটিই যে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি করেছে তা আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি নাই, জেনে নিলাম সে মুহূর্ত্তেই যখন খুচরা টাকাগুলি চলে গেল, ক'টি লোকে মিলে সড় করে নিয়ে গেল জোর-জবরদস্তি চালিয়ে। এইবার চীনের বুকে কলকাতার মত ধড়িবাজ পাকা চোরের সন্ধান পেলাম।

সন্ধ্যা হয়েছে, একটা ছোট গ্রামে গিয়ে উঠেছি। দেখা হ'ল কতকগুলি লোকের সঙ্গে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম হোটেলের কথা, নিয়ে গেল তারা তাদের নিজেদের আড্ডাতে। খাওয়াল বেশ ভাল করে, তারপর গভীর রাতে একটি বিল দিল ইংরেজী ফ্যাশনে, লিখে দিল তাতে সাত ডলার নব্বই পয়সা। যখন তা দিতে গিয়ে মানিব্যাগটা খুলেছি, অমনি সবাই মিলে তা ছিনিয়ে নিল আমার হাত হতে। তারপর যে সব ভাল দু-একখানি কাপড়-জামা ছিল তাও কেড়ে নিয়ে বের করে দিল আমায় উন্মুক্ত প্রান্তরে, যেখানে উপরে আছে নক্ষত্রখচিত আকাশ, আর নীচে শুধু পথের ধূলি। চলে গেল টাকার দেমাক, জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেল স্বচ্ছ দৃষ্টি ফুটিয়ে। এখন আমি পথের ভিখারী, এখন আমায় কথা বলতে হবে, দরজায় দরজায় ঘা দিতে হবে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত, অফুরন্ত সহনশীলতা নিয়ে শুন্‌তে হবে বিশ্ববার্ত্তা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

রাত কাট্‌ল মুক্ত মাঠের বাধাহীন পটভূমিতে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম, আমি পিকিনে বসে যেন কার সঙ্গে কথা বলছি। লোকটি বেশ, দাড়ি আছে তার লম্বা, মাথায় তার ইংরেজী কুলি-টুপি। ঘুম থেকে উঠে দেখি, চাষীর দল আমার চারিদিকে ঘিরে আছে। যখন উঠে বসলাম, অনেকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালাল। দেখে আমি খুব হাসলাম। তারপর যারা পালায় নাই, ঝোলা হতে আমার বিজ্ঞপ্তি বার করে তাদের হাতে

এক একখানি দিয়ে দিলাম। অনেকে তা পাঠ করে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল, তাদের মুখের রং বদলাল। চাষীদের সঙ্গে কথা বলা অন্যায় মনে করলাম। হয়তো এরাও কোন-না কোন দলভুক্ত হবে। চীনের তরুণ-তরুণীদের গণ-সংযোগে এরা কোন্ রূপ ধরেছে ঠিক কি। তাই একজনের নিকট হতে কিছু ভাত চেয়ে নিয়ে পথে এলাম।

দ্বিপ্রহরে আর চল্‌তে পারছিলাম না,—ক্ষুধা, ভয়ানক ক্ষুধা। গ্রামে কোনমতে পৌঁছে গিয়ে একটা ছোট হোটেলে ভাত চাইলাম। ভাত দিল বটে, পয়সা চাইতেও ভুল করে নাই। কিন্তু কোথায় পয়সা? দোকানীকে পকেট খুলে দেখালাম একটা পয়সাও নাই। সে আমাকে বসতে বলল। তবে কি এরা পুলিশে খবর দিবে নাকি? কিন্তু তা করল না, খবর দিল একটা আড্ডায়। কতকগুলি যুবক অগৌণে এসে হাজির হ'ল। প্রথম যুবকটি আমাকে বলল, "Then you traveller?" আমি তাকে আমার বিজ্ঞপ্তি দিলাম, কিন্তু কথা বল্‌লাম না। সে আমার হাত ধরে তাদের গ্রাম্য স্কুলে নিয়ে গেল। কমার্শিয়্যাল প্রেসে আঁকা একখানা মানচিত্র স্কুলে টাঙ্গান, আমার পথ দেখাতে বল্‌ল। আমি তাকে বাঙলা ভাষায় বুঝিয়ে দিলাম, তারপর সেই মানচিত্রখানা বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ভারতের নেপাল, ভুটান, শিকিম, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ অর্দ্ধেকটা, মলয়, ইন্দোচীন, ফরমোজা, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া—এই সব স্থানের উপর কালো দাগ দেওয়া রয়েছে। অর্থাৎ এই দেশগুলি একদিন ওদের অধিকারে মহাচীন সাম্রাজ্যের অঙ্গ ছিল, তা ফিরে পেতে হবে। সমগ্র চীন দেশটার উপর একটা পিঙ্গল বর্ণের আলেপ দেওয়া, শুধু বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রক্তবর্ণ চীনের পতাকা আঁকা আছে, আর এমন সুন্দর করে তাতে রং ফলান হয়েছে যে, সকলের আগে চোখ তাতে পড়ে। বুঝলাম, স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ। আরও দুখানা মানচিত্র তারই পাশে ঝুলছে। একখানিতে এশিয়ার পরাধীন দেশগুলি কালো রং করে দেখানো হয়েছে, অন্যখানি মামুলী ধরণের, কোন বিচিত্রতা নাই। শিক্ষকগণ ছাত্রদের আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, একজন ইংরেজীতে বললেন, "He does not speak English." কথাটা শুনে মনে মনে হাসলাম। কথা না বলাই ভাল। আমার আহার ও

শয়নের বন্দোবস্ত হ'ল, আরাম করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এতদিন ধরে যে-চীনের সঙ্গে বল্‌তে গেলে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই কর্‌তে পেরেছি, আমি আর সে চীনদেশে নাই, নতুন চীনে পৌঁচেছি। এদিকটা দক্ষিণচীন হ'তেও উন্নত বলেই মনে হ'ল। দক্ষিণ চীনের লোক চায় দেশের চিরাগত নিজস্ব হালচাল বজায় রেখে যতটা পারা যায় নতুনকে খাপ খাইয়ে নিতে ; কিন্তু এরা চায়, সবই চলে যাক্ ক্ষতি নাই, কিন্তু পবিত্র গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট পাওয়া চাই-ই। তারপর আরও চায়—সাম্য, ধনী-দরিদ্র বিভেদ তুলে দিতে। কিন্তু এসব বিষয় তো আমার লক্ষ্য নয়, আমার লক্ষ্য পিকিন।

রাতের ভোজন হয়ে গেল। তাতে লোক ছিল অনেক। সমুখেই যেন একজন পরিচিত লোক বসে আছে বলে মনে হ'ল, কিন্তু কোথায় দেখেছি তা আর মনে হ'ল না। তার দিকে চেয়েই অন্য দিকে চক্ষু ফিরালাম। ভাবলাম, আমার ভুলও তো হ'তে পারে ; বিশেষ করে রোগে ভুগে আমার চোখে আর তেমন জ্যোতি নাই, স্মৃতিশক্তিও অনেকটা লোপ পেয়েছে, হয়তো একদিন নিজের নামই ভুলে যাব। ভোজে যারা বসেছিলেন, প্রত্যেকের দীপ্ত প্রশান্ত বদন, কথায় প্রতিভার ছাপ। মনে হ'ল হয়তো তাঁরা একদিন দেশের বড়লোক হবেন। সবাই হবেন হোমরা-চোমরা—এ ধারণা আমার হ'ল, কারণ গণতন্ত্রে বড়-ছোট নাই, সবাই সমান। আমাকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনাই হ'ল। তারপর একখানা মানচিত্র এঁকে দেওয়া হ'ল আমার পরবর্ত্তী যাত্রাপথ দেখিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বসে আছি তাও বলে দেওয়া হ'ল। তারপর উপদেশ। এই উপদেশ হ'তে রক্ষা পাবার জন্যই আজ ইংরেজী বুলি বলা হয় নাই। তবু উপদেশ এড়ান দায়।

পরদিন বিদায়ের বেলা ভদ্রলোকগণ আমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করলেন। যা আমাকে দিলেন যদিও তা যৎসামান্য তথাপি তা অন্তরের দান, আর সে দান আমাকে নয়, চীনজাতির পক্ষ হ'তে ভারতবাসীদের। সে দান যে নিঃস্বার্থ, তা দাতার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। নিছক দান হলেও এ দানের মর্য্যাদা আছে, ভবিষ্যতে একদিন গরিমার সঙ্গেই গুন্‌তি হবে সে দানের প্রত্যেকটি পয়সা। কারণ কাঞ্চন-কলুষে এ দান মলিন নয়, বরং ভাব-কৌলীন্যে উজ্জ্বল! বিদায়ের বেলা একটি যুবক অনেকদূর আমার সঙ্গে এলেন পথ

দেখিয়ে দিতে। যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিবেন এমন সময় আমি তাঁকে ইংরেজিতে বললাম, "চলুন না আমার সঙ্গে পিকিনে?" আমার মুখে অপ্রত্যাশিত ইংরেজী ভাষা শুনে তাঁর তাক লেগে গেল। লাগবারই কথা। একটা স্থানে বসে ভদ্রলোককে জানালাম, তাঁরা যে পথের পথিক আমার সে পথ খোলা নয় এবং আমি উপযুক্তও নই তার প্রতি সুবিচার করবার। তাই ইচ্ছা করেই তাঁদের উপদেশ আমার নেওয়া হয় নাই। ভদ্রলোক আমার অনুরোধের উত্তরে বল্‌লেন, এখন তাঁদের ফুর্ত্তি করবার সময় নাই; কাজ তাঁদের প্রচুর হাতে, এমন কি সাংহাই গিয়েও তাঁদের সিনেমা দেখবার অবসর মিলে না। তাঁদের সুখ-শান্তি তাতেই,—যাতে জাতির জাগরণ সম্পূর্ণ হয়, দেশ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। দুঃখ করে বল্‌লেন, যদি তাঁদের দেশ মুক্ত হ'ত তবে তিনিও দেশ-পর্য্যটনে বের হয়ে পড়তেন। কথাগুলি শুনে আমার আনন্দ হ'ল, কিন্তু দুঃখও কম হয় নাই এই ভেবে যে, আমার দেশের জন্য কি করেছি আমি, একটি পয়সাও তো খরচ করি নাই; শুধু আপন বাঁচিয়ে চলেছি। ভদ্রলোক কতকক্ষণ পরে বিদায় নিলেন। আমি এবার ঠিক পথ ধরে দিগন্তের দিকে চক্ষু প্রসারিত করলাম।

অনেকদিন চলে গেছে। পথশ্রমে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তবুও পিকিন দূরে, অতি দূরে! পিকিনই যেন এখন আমার উপাস্য দেবতা। একটা বড় শহরে এসেছি। কোথায় উঠব ঠিক কর্‌তে পারছি না। টাকাও ফুরিয়ে গেছে। একটা বিরাট বাড়ীর সামনে এসে সাইকেল থামালাম। প্রকাণ্ড বড়বাড়ী, কলকাতার একটা বড়বাড়ী মনে কর্‌লে ভুল হবে, বোধ হয় এত বড় বাড়ী কলকাতায়ও নাই, লাট সাহেবেরও না। গেটে গণ্ডাকয়েক সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। এদের কাছে একখানা বিজ্ঞপ্তিপত্র দিলাম, পাঠ করল তারপর তারাই আমাকে ভিতরের একটা অফিসের সামনে নিয়ে গেল। অফিসে কয়জনা লোক বসে ছিলেন। একজনের কাছে গিয়ে তাঁকেও একখানা বিজ্ঞপ্তি পত্র দিলাম। তিনি তা মন দিয়ে পাঠ করে ইঙ্গিতে বস্‌তে বল্‌লেন। কয়েক মিনিট মাত্র বস্‌লাম, তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করে একটা আঙ্গিনা পার হয়ে অন্য একজন ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমার বিজ্ঞপ্তিপত্রখানা দিলেন। সেই বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠ করে ভদ্রলোকের

মনটা যেন খুশীতে ভরে উঠল। তিনি কোন কথা না বলে আবার একটা আঙ্গিনা পার হয়ে আর একজন ভদ্রলোক—সর্ব্বময় উপরওয়ালা নিশ্চয়—তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন মন দিয়ে একখানি মানচিত্র দেখছিলেন। পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলতেই আমি তাঁকে আমাদের প্রথায় নমস্কার করলাম। বিজ্ঞপ্তি পাঠান্তে বল্লেন "ব লুই"? অর্থাৎ পয়সা নাই? আমি বল্লাম, না, একটা পয়সাও নাই। তখন তিনি আমার অটোগ্রাফ বইয়ে কি লিখে তাতে একখানা নোট রেখে দিলেন। নমস্কার করে বাইরে এসে দেখলাম, নোটখানি একশত ডলারের! দেখে আমার ভয় হ'ল, বোধ হয় ভদ্রলোক ভুলে দশ ডলারের স্থলে একশত ডলার দিয়েছেন, ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চয় কর্ত্তব্য। তাই সঙ্গীকে দেখালাম। সঙ্গীও যেন একটু চমকে গেলেন। তাই ফের তাঁর কাছে গিয়ে কাগজে লিখে দিলাম, আমার পক্ষে দশ ডলারই বেশী, একশত ডলার দিয়ে কি করব! ভদ্রলোক আবার সেই নোটখানাই অটোগ্রাফ বইয়ে পূরে বেরিয়ে এলেন, বইটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একেবারে আমাকে নিয়ে সদর দরজায় হাজির হলেন, সাইকেলটা দেখলেন, তারপর ইঙ্গিতে চলে যেতে বল্লেন। একশত ডলারের নোট নিয়ে আমি রাজপথে নেমে পড়লাম। কিন্তু মাথাটা আমার ঘুরে গেল। একটা খাবারের দোকানে এসে বসে ভাবলাম, কি করে নোটটা ভাঙ্গাই। এর মাঝে কতকগুলি লোক জুটে গেল। নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। ওদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম যন্ত্রচালিত পুতুলের মত, কিন্তু মনটা আমার বিভোর ছিল একটি মাত্র চিন্তায়, আর তা হ'ল—নোট ভাঙ্গান হবে, খাওয়া হবে, কিন্তু এই যে নিঃস্বার্থ দান এমনটি ভারতে আছে কি? থাকতেও পারে, তবে এ রূপটি ভারতে আমার চোখে ধরা দেয় নাই, কিন্তু এটি হয় সদাসর্ব্বদা দিলদরিয়া চীনদেশে।

নোট ভাঙ্গান হ'ল, খাওয়া হ'ল, হোটেল পাওয়া গেল। তারপর আমি আবার সজাগ হয়ে পড়লাম—মনের বৈরাগ্য কেটে গেল। এখনও আমি পিকিন হতে অনেক দূরে—দেখতে হবে, জানতে হবে তার সব, তবে সাংহাইয়ে যে ভুল করেছি তা আর এখানে হতে দিব না। এই ভাবনা নিয়ে বিশ্রাম করবার জন্য কবাট বন্ধ করলাম। কিন্তু এর একটু পরেই

যে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটবে তা জানতাম না, জানলে বোধ হয় তার রসগ্রাহী দর্শক বনে যেতে পারতাম না।

লোকে বলে ভারতের লোক জন্ম হতেই দার্শনিক। কথাটা শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু যখন আমার প্রতি সে কথাটি আরোপিত হয়, তখন মুখটা যেন ঝলসে যায়। আমি তো চেষ্টা করেছি খুব দার্শনিক হয়ে টাকাকড়ির লোভ হতে রক্ষা পেতে, কিন্তু টাকাকড়ি হাতে পড়লেই লোভ এসে দেখা দেয়! ইচ্ছা হয় এমন করে লুকিয়ে রাখি যেন কেউ এসে না নিয়ে যেতে পারে। রিক্ত ও বঞ্চিত হবার ভয়টা যেন আপনা হতেই আসে। আজও আমার অন্তরে সেই ভয়, যদি কেউ আমার টাকা নিয়ে যায়। দূর ছাই, অতশত চিন্তার দরকার কি! সকল আপদ চুকিয়ে পকেট হতে নোটগুলি বের করে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। ইচ্ছা—টাকার জন্য আমার জীবন যেন কেউ বিপন্ন না করে। ফিরে গিয়ে শোবার পূর্ব্বেই দরজায় ধাক্কা—টিপ্-টিপ্-টিপ্। দরজা খুলে দিলাম। ঘরে যে চীনা ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, তিনি আমার পরিচিত। "এই যে, টাকার উপর শুয়ে নাকি?" কথাটা বলেই পকেট হতে একটা পিস্তল বের করে আমার মাথার উপর ধরলেন যেন এই ট্রিগার টিপলেন আর কি। নির্ভয়ে হেসে বললাম, "That's why I have kept this bloody thing on the table, take it." তাঁর চোখের সমুখেই টেবিলের উপর দশ ডলারের নয়খানা এবং পাঁচ ডলারের একখানা নোট পড়ে রয়েছে। আমি বললাম, 'নিয়ে বিদায় হও, আমাকে ঘুমাতে দাও, আমি পরিশ্রান্ত, চারটি ডলার আমার পকেটে আছে, তা নিলে দুঃখিত হব।' লোকটি রাগ করে বললেন, 'পিকিন কাছে নয়, বহুদূরে। এবার ফিরে যেতে শুধু অনুরোধ করছি না, করছি আদেশ—ফিরে যাও এপথ থেকে। বল. আদেশ মানবে কিনা!' কেন বাপু প্রলাপ বকছ? আঁধারের গা-ঢাকা থেকে এগিয়ে আলোয় এসে দাঁড়াল নতুন আরেক মূর্ত্তি। আরে! নানকিনের চোখের ডাক্তার যে! কি চাই বলুন তো? আমি পিকিন যাই কি জাহান্নামে যাই তাতে আপনাদের ক্ষতি কি? মানুষ হয়ে মানুষের এমন বাদ সাধা উচিত নয়।

এই ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে নানকিনে দেখা হয়েছিল। তিনি

আমার সঙ্গে সর্দ্দারজী যেমন মিশতেন তেমন অবশ্য মিশতেন না। তাঁর কোন্ ধর্ম্ম সঠিক জানতে পারি নাই, তবে মনে হয়েছিল লোকটি পাঞ্জাবী মুসলমান, কারণ সে দেশের মুসলমান এমন করেই কথা বলে থাকে। ডাক্তার বললেন, "এই চীনা ভদ্রলোক হলেন আমার বন্ধু মিঃ ওয়াং। মিঃ ওয়াং আমার কাছে তাঁর 'মডেল' গ্রাম হতে পত্র দিয়েছেন যেদিন আপনার সঙ্গে তাঁর সর্ব্বপ্রথম দেখা হয়। তারপরই আমি ছুটে এসেছি আপনাকে এ বিষম বে-পথের নেশা হতে রক্ষা করতে। মিঃ ওয়াং এবং আমি উভয়েই প্যারী নগরীতে একত্রে থাকৃতাম, নতুবা আপনার প্রতি এত দয়া তাঁর হ'ত কিনা জানি না, হয়ত তিনিই আপনার সর্ব্বনাশ করতেন।"

সত্যিকারের ভয় থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ মৃত্যু 'আস্‌ছি' বলে হাঁক দিয়ে দূরে অদৃশ্য থাকে। কিন্তু মৃত্যু এসে যখন মুখোমুখী দাঁড়ায় তখন ভয়-ভাবনা কিছুই থাকে না। আজ মৃত্যুর চটক নিয়ে চীনা এবং ভারতবাসী এক হয়ে বাদ সাধতে এসেছেন। নানকিনের ডাক্তার বললেন, আমার এক ভাই আছে মুকদেনে, আর তিন ভাই আছে আন্তং-এ। এদের সঙ্গে দেখা করবেন, এরা সাহায্য করবে। এখন আমি বিদায়। যদি সংহাইয়ের পথে ফিরে যান তবে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, নতুবা আপনার নসিবে কি আছে মিঃ ওয়াং জানেন, আর জানে আপনার একগুঁয়ে আত্মাপুরুষ। এই বলেই ডাক্তার বিদায় নিলেন। নানকিনের ডাক্তার যদিও বৃদ্ধ তবুও লোকটির শরীরে প্রচুর শক্তি আছে। সেদিন দেখে এলাম রোগে ভুগছে আর এরই মধ্যে আবার কাজে লেগেছে। ওদের বার্দ্ধক্য—বার্দ্ধক্য নয়! মিঃ ওয়াং আমার দিকে স্থির নিশ্চল অথচ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি এক মুহূর্ত্ত রেখেই অন্তর্দ্ধান করলেন নীরবে। দরজা বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম, 'ওদের আদেশ মান্‌ব কি? অনেকক্ষণ চিন্তা করে ঠিক করলাম আগামীকল্য প্রাতে উঠে সে শুভ মুহূর্ত্তের প্রেরণায় আমার পথ বেছে নিব।

রাত কেটে গেল। প্রভাত হ'ল। আলোয় আলোয় চারিদিক হাস্‌ছে! মনের সকল মেঘ—সকল ঝপসা ঝিলমিলি উধাও হয়ে গেল। পরিষ্কার পথরেখা তার শুভ্র অন্তর নগ্ন করে ডাক দিল—সাহসে বুক বাঁধ, আগে চল। আর কি চুপ থাকৃতে পারি। নোটগুলি পকেটে রেখে সাইকেলে বসে পথ ধরলাম

যেমন অন্যদিন করে থাকি। কিন্তু কোন্‌পথে চলেছি তার ঠিক ছিল না। মাথায় চিন্তা যেন আতিশয্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। সে প্রস্তরবৎ অসাড়তার ভিতরও বিদ্যুৎ চমকের মত চিন্তারেখা চিক্‌ মিকিয়ে ওঠে—মডেল গ্রাম আর অস্ত্র-কারখানা নিয়ন্তা মিঃ ওয়াং কি তবে সরকারী গোয়েন্দা, তারপর এই ডাক্তারই বা কে? চিন্তা হতে মুক্ত হবার জন্য পথের মাঝে বসে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতাম, তারা হাসত, আমিও হাস্‌তাম। সহসা হাসির মাঝে মৃত্যুদূতের কথা মনে হ'ত, অমনি মন দমে আস্‌ত।

সারাটা দিন কাটল পথে পথে। গ্রামে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু তা হ'ল না। একটা ছোট পথের পাশে সাইকেলটা দাঁড় করে ভাবছি এখানেই কোথায় শুয়ে থাকব, কিন্তু একটি কৃষক ছেলে এসে আমারই কাছে দাঁড়াল। সে হয়তো ভেবেছিল গ্রাম কোথায় জানি না তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সে কাছে এসে গায়ে পড়েই যেন গ্রাম দেখিয়ে দিল। তখন সন্ধ্যার গভীর ছায়া গ্রামের উপর পড়েছে। ছেলেটিকে ইঙ্গিতে বললাম, গ্রামে যাব না। ছেলেটি তবু যেতে চায় না। কতকক্ষণ দাঁড়াল, কত কি বলল, নেহাৎ বেপরোয়া দেখে বোধ হয় শেষটায় চলে গেল। ছেলেটি চলে যাবার পর আমার দুঃখ হ'ল কেন তার সঙ্গে গেলাম না। রাত কাটাবার জন্যে একটু ফাঁকা স্থান বেছে নিলাম। সাইকেলটি কাছেই রাখলাম, কম্বল বিছিয়ে বসে সঞ্চিত রুটি এবং জল খেয়ে আরামে একটা সিগারেট টানতে লাগলাম। ভাবছিলাম এখানে রাতটা কাটবে বেশ, কিন্তু তা হ'ল না। গ্রামের ভিতরই "জেন্দআর্ম" ছিল। ছেলেটি বোধ হয় গ্রামের লোককে গিয়ে বলেছিল, তাই "জেন্দআর্ম" এসে আমাকে গ্রামে গিয়ে থাকতে বলল। তাদের সঙ্গে গ্রামে গেলাম। ওরা তাদের অফিসারের কাছে আমায় নিয়ে গেল।

বিদ্রোহীর দেশ

রোজই ম্যাপ দেখতাম আর মনে হ'ত এগিয়ে চলেছি। যখনই ভাবতাম এই তো আর ক'দিন পরেই পিকিন পৌঁছব, এই সান্ত্বনাটুকুই মনটাকে চাঙ্গা করে তুল্‌ত, সাফল্যের স্বর্গ হাতের কাছে এই আশার আনন্দই আমাকে

বাঁচাত, নতুবা হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। একঘেয়ে দেখা অনেক দেখেছি। চীনদেশটা যেন বহু পুরাতন হয়ে গেছে, নতুন বলে চোখে আর কিছুই পড়ে না। আবার এদিকের লোকগুলি এখনও যেন সেই অতীতের মায়ায়ই ডুবে আছে। মাঝে মাঝে দু'একটা পাঠশালা পাওয়া যেত, সেখানে গ্রাম্য শিক্ষক টেবিলের উপর পা তুলে ঘুমাচ্ছেন, আর ছোট ছোট ছেলেগুলি নাকিস্বরে আপন মনে পাঠ মুখস্থ করছে। এরা বেশী কর্ম্মব্যস্ততা যেন তাদের নিষিদ্ধ। অনেক সময় মুদির দোকান হ'তে ইংরেজী পুরাতন সংবাদপত্র কিনে এনে পড়তাম। দেখতাম একই কাগজ, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। সংবাদপত্রটি বের হয় স্কটল্যাণ্ড থেকে, এ-কথা এখনও মনে আছে। মাঝে মাঝে পুরাতন ভারতীয় সংবাদপত্রও পাওয়া যেত। তাতেও একটা মৃদু স্পন্দন পরিবর্ত্তন এনে দিত।

একদিন একটা ছোট-খাট লাইব্রেরীতে গিয়েছি। সেখানে দেখলাম দু'খানা ছবি, একখানা সান-ইয়াৎ-সেন'এর, অন্যখানা যদিও সেই অনুকরণে বাঁধান এবং যদিও তার প্রতি প্রচুর সম্মান দেখান হয়, তথাপি ছবিখানা কার জানতাম না। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, কার ছবি এটি? লোকটি বললে "নিনিল" (লেনিন?)। এরূপ ছবি এ জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম দেখা হ'ল। লোকগুলা মন দিয়ে বসে বই পড়ছে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য হ'ল, দেখলেই মনে হবে এরা শিখবার জন্যই পাঠ করছে। লাইব্রেরী থেকে হোটেলে গেলাম। একজন লম্বা ইউরোপীয়ান বসে আছেন। ভাবছিলাম ইংরেজ হবেন, একটু মিতালী করব। কারণ সকল স্থানেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করেছি।

লম্বা ইউরোপীয়ান আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাছে গিয়ে বললাম, আপনার কোন সাহায্য করতে পারি, হুকুম তামিল করতে পারি? লোকটি মড়ার মত, তবু হাসলেন সে-যেন প্রেতের হাসি, তারপর পরিচয় দিলেন— সাদা রাশিয়ান, বিশেষ ক'রে কসাক, রুশদেশ হতে পালিয়ে এসেছেন। মনে কৌতূহল জাগ্‌ল, অনেক কথা হ'ল। সর্ব্বপ্রথম কথা হ'ল পথের। কসাক ভদ্রলোক বললেন, এ অঞ্চল বিদ্রোহীতে ভর্ত্তি, জাপানী গুপ্তচর, চীনা সরকারী গুপ্তচর যেখানে সেখানে, এই তিনটি দলকে সন্তুষ্ট করে পথ চলতে হবে।

কথাটা বলা যত সহজ, কাজে করা তত সুসাধ্য নয়, তা আমি জানতাম। কি করব না করব তা বললাম না। কথা শুনতে হয় সকলেরই, কিন্তু কাজ করতে হয় নীরবে নিজের ইচ্ছামত। ভদ্রলোকের সঙ্গে আসর জমিয়ে ফেললাম। তিনিও তাঁর দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে লাগলেন, আমিও আমার পথের সংবাদ বলতে লাগলাম। তবে তাঁর কষ্ট, আমার পথের কষ্ট হতে ভয়াবহ। ভদ্রলোক ছিলেন জারের আমলে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, কিন্তু যখন তাঁরই আপন ভাই জারের বিরুদ্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন হতে দুই ভাই দু'দিকে ঝুঁকে পড়লেন। একদিন যখন শুনলেন জারকে মেরে ফেলা হয়েছে, এমন কি বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখা হয় নাই, তখন তিনি পালিয়ে চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের দিকে রওনা হলেন। তাঁরই ছোট ভ্রাতার উপর তাঁর বধের ভার ছিল। পথে দুই ভ্রাতাতে দেখা হ'ল। ছোট ভাই বড় ভাইকে ছেড়ে দিয়েছে এই সর্ত্তে যে, যতদিন তিনি পূরাপূরি জারের প্রতি সহানুভূতি ভুলতে না পারবেন, ভগবানের নাম ভুলতে না পারবেন, ততদিন যেন দেশে ফিরে না যান। ভ্রাতৃস্নেহের কল্যাণে জীবন রক্ষা হয়েছে, নতুবা তাঁকে কবেই বিদায় নিতে হত পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে, আর এদেশে আসতে হ'ত না। তিনি পিকিংএ অনেকদিন থেকে ইংরেজী শিখেছেন, এখন এদেশেই সামান্য কারবারে লেগে গেছেন। তিনি মাঞ্চুরিয়ায় হারবিন নামক শহরে ছিলেন, সে শহর না কি জাপানীরা নিবে নিবে হয়েছে। তাঁর পিতা মারা যান রুশ-জাপান যুদ্ধে, তাই তিনি জাপানী এলাকায় থাকতে চান না বলেই চীনা প্রাচীর পার হয়ে খাঁটি চীনরাজ্যে এসে পড়েছেন।

চীনের সরকার-দ্রোহীদের কথা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "যাদের মৃত্যুদণ্ড মাথার উপর ঝুলছে, তা দেশের পক্ষ থেকেই হোক আর জাপানীদের পক্ষ থেকেই হোক, তাদের ভয় করে থাকলে চলে না। তাদের অনেকে কমিউনিষ্ট বলে থাকেন, কিন্তু আমি তা বলি না, বলি তারা প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে, বাধা পাচ্ছে অনবরত, কিন্তু এই বাধাপ্রদানের ফল ক্রমেই বিষময় হয়ে উঠ্‌ছে। এরা যদি একবার ক্ষমতা হাত করতে পারে, তবে চীন কাঁপবে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁপবে জগৎ। সিংকিয়াং দেখে এসেছি ; ব্যবসায়ের খাতিরে তিব্বতের এলাকায়ও গিয়েছি, কিন্তু মনে হয়

সবাই যেন মরণকামড় দিচ্ছে। তবে বলতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও চুরমার হয় নাই কেন? বর্ত্তমানে তা হতে পারে না। জাপানী যেমন শক্তি অর্জ্জন করছে, বিদ্রোহীর দলও তেম্‌নি শক্তি অর্জ্জন করতেই ব্যাপৃত। সিংকিয়াং হতে চীন সাগর পর্য্যন্ত তৈয়ারী হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নয়, জাপানের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এখনই ফুৎকারে চিরনির্ব্বাণ কর্‌তে পারে, কিন্তু যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার উঠে যাবে, হয় তো তার বদলে জাপানের কেউ বসবে সেই গদিতে। চীনের যুবকগণ ভাল করেই বোঝে, ইউরোপ কিম্বা আমেরিকার কেউ তাদের সহায় হবে না। চীনে যে ইউরোপীয়ান শক্তি তা যেন আজ জাপানের কাছে ম্রিয়মাণ বললেও ত্রুটি হয় না। সাংহাই তার প্রমাণ। সমগ্র চীনে কালিমা পড়েছিল সেদিন, যেদিন সাংহাই জাপানীরা দখল করেছিল।" বেশী আর শুনতে ইচ্ছা হ'ল না, কারণ এসব আমার কাছে নতুন কিছু নয়। আহারের ব্যবস্থা করে ভদ্রলোকের সঙ্গে সমুদ্রতীরে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করলেন বলতে হবে, নতুবা যেরূপ ব্যূহচক্রে পড়েছিলাম, হয় তো চীনদেশে সারা জীবন কাটাতে হ'ত। কত কষ্ট যে পেতে হয়েছিল, তার সমাচার যখন তামাম দুনিয়া ভ্রমণ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফির্‌ব তখন বলব।

ধন্য চীনদেশ, ধন্য চীনের লোক, যাদের আমরা অখাদ্য খায় বলে ঘৃণা করি। এরই মধ্যে যা দেখা হয়েছে তা কম নয়, তারপর আরও হয় তো দেখ্‌তে পাব। ফরাসীরা ব্যাঙ খায়, অতএব ব্যাঙ সবাই খায়; ইংরেজেরা কুম্ভীরের মাংসও খায়, তাই তা অখাদ্য নয়; আর চীনাদের দোষ তারা আরসোলা খায়। যদিও বিষয়টা মিথ্যা, অন্ততঃ আমি বলতে পারি, তথাপি ব্যাপারখানা হ'ল চীনাদের ঘৃণা করতেই হবে, তাই 'give the dog a bad name and hang it' এর ব্যবস্থা। যা হোক্ আমি এবার স্থলপথ ছেড়ে দিয়ে জলপথ ধর্‌ব। সেজন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাই—কারণ, আমি বলেছি আমি সাইকেলে ভ্রমণ করছি এবং করবও। কিন্তু ভ্রমণের উদ্দেশ্য "সূর্য্যের ব্রত নয়" যে সারাদিন দাঁড়িয়েই থাকব যে-পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্ত না যান। তাই দুদিনের জন্য জলপথ ধরলাম।

আমাদের দেশে জরুরি খবর পাঠাতে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। চীনেও

আছে। কিন্তু চীনদেশে 'তার' পাঠাবার দরকার বোধ হয় হামেশা হয় না। মানুষের মারফতেই অনেক সময় টেলিগ্রাফের কাজ হয়। আজ তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলাম। মডেল গ্রামে শুনেছি এরকম সংবাদ। তারপর নান্‌কিনের ডাক্তারের অযাচিত আগমনও তারই ফল। পথে আরো কত শত এমনই ইঙ্গিত মালুম হয়েছে। গোপন কানাকানিও লক্ষ্য করেছি। মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া ব্যাপারটাও যে এরই যোগসূত্র নয়, এমন কথাই বা কে হলফ করে বল্‌বে। তার উপর আজকার ঘটনা, তা পরে বল্‌ছি। আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হ'ল, কেউ যেন আমাকে ধরবার জন্য ভয়ানক এক বেড়াজাল ফেলেছে, সেই জালে আমি ধরা পড়তে চাই না। চীনে থেকে ভারতে টাকার জন্য পত্র লিখতেও চাই না, অথবা জাপানী অর্থপুষ্ট চীনা গুণ্ডার হাতে মরতেও চাই না। তাই আজ সমুদ্র-পথে বের হতে হ'ল।

টেকো-বন্দর

টেকো চীনের বন্দর বটে, কিন্তু জাহাজ চলে বিদেশীর। চীনা কুলি মাল ওঠায় আর নামায়। চীনা কেরানী তার হিসাব রাখে, মাইনে পায় বিদেশীর কাছ থেকে। পাইলট এখানে চীনা নাই, বিদেশী। চীন এখনও সাবালক হয় নাই, হবেও না যতদিন পূরাপূরি স্বাধীন না হয়। যে দিন স্বাধীন হবে, সেই দিন চীনাদের জ্ঞানের বিকাশ এক মুহূর্ত্তে হয়ে যাবে।

শহরে নেমে দেখলাম, লোকগুলি যেন কাঠের পুতুলের মত কাজ করে চলেছে, জ্ঞান নাই, গরিমা নাই, আছে কয়টি পয়সা নিয়ে কাড়াকাড়ি। অদূরে জাপানী দোকানী, জাপানী শান্ত্রী, গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয়, কখন কি করে ওদের সর্ব্বনাশ করতে পারে তাই দেখছে। ইংরেজ, আমেরিকান, রুশ ও অন্যান্য ঢের ইউরোপীয়ান আছে, কিন্তু সবাই যেন মনঃকষ্টে পথ চলতে পারছে না। যেন জাপানীরা তাদের উপহাস করছে। এ মাত্র টেকো, আরও দেখতে হবে।

ছোট একটা হোটেলে এসে আপদ-বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছি ভেবে হাঁপ ছাড়লাম। এসব স্থানে এত বিদেশী থাকে যে, হোটেলের ছড়াছড়ি। হোটেলে সন্ধ্যার পর আরামে বসে আছি, হঠাৎ মিঃ ওয়াং এসে উপস্থিত। তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলাম, "এটাও কি আমার দেখবার জো নাই?" তিনি হেসে বললেন, "চয়ফুঁ বন্দর মনে করে যেখানে জাহাজে উঠেছিলেন, সেই বন্দরটি চয়ফুঁ নয়, তাই বল্‌তে এসেছি।" "এই বুঝি আপনার বক্তব্য, এর বেশী নয়তো, তা চয়ফুঁ হোক আর কিয়াচো হোক তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। এখন বলুন তো আপনারা আমার পিছনে লেগে আছেন কেন?" "কেনর জবাব নাই, শুধু কেন কেন করে হায়রান হবেন না। আপনি একা, আপনার মন আমরা অনেকদিন পরীক্ষা করেছি, সেদিকের অবস্থা যেরূপ, হয়তো আপনি গোল্লায় যেতেন, তাই আপনাকে পার করে দিলাম। এদিকে বিদেশীরা বেশ থাকে, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।" "তারপরও কি আপনি আমার সঙ্গ ছাড়বেন না মনে করেছেন?" মিঃ ওয়াং বললেন, "আমি পিকিন যাব বলেছি, সেখানে যাবই; তারপর আর আপনার সংবাদ রাখব না। ওদিকটা জাপানী দখল করে নিয়েছে, আমাদের আর সেদিকে গতিবিধি নাই।" আমি একটু বিরক্তভাবেই বললাম, তবে এখন বিদায় নিন, আমি একটু বিশ্রাম করব। মিঃ ওয়াং আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না, তিনি বিদায় নিবার পূর্ব্বে বলে গেলেন, পিকিনে দেখা হবে। মনে মনে ভাবলাম তা না হওয়াই ভাল। সেখানেও যদি ওরা আমায় ছেঁকে ধরে, তবে আমার একদিকই দেখা হবে, তার বিরোধীদের খবর নিতে পার্‌ব না।

পরদিন প্রাতে উঠে সমুদয় শহরটা দেখে নিলাম। দেখবার মত কিছু নাই। কুলির দল কাজে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে একে অন্যকে গালি দিচ্ছে এই হ'ল দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য। সারাদিন কাটিয়ে পরদিন সাইকেলে বের হ'য়ে পড়লাম। টিয়েনসিন বেশ একটু দূরে। ইচ্ছা ছিল এক দিনেই চলে যাই, কিন্তু বিপরীত দিক হতে বাতাস বইছে, এক দিনে যাওয়া হ'ল না। রাত্রিটা কাটাতে হ'ল এক গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে। লোকটি ধর্ম্মে মুসলমান। তার দুটি নাম, মুসলমানী নাম ইব্রাহিম; কিন্তু সাধারণ লোকে সে নামে তাকে ডাকে না, চীনা নামেই ডাকে। ব্যবসা তাদের দুধ বিক্রি করা। ভারতীয় মতে জাতে সে হয় গয়লা। আমাকে তার বাড়ী খুঁজে বের করতে হয় নাই, সে-ই আমাকে পথ থেকে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। ইংরেজী বেশ ভাল বলতে পারে। আমাকে বাড়ীতে নিয়েই সে তার মা-বাপকে ডেকে আনলে এবং হিন্দুস্থানের

লোক এসেছে বলে পরিচয় দিলে। ছেলেটির মা-বাপ, ভাই-বোন তো আছেই, তারপর আছে তার ষোল বৎসরের স্ত্রী। তার স্ত্রী আমার কাছে এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এতে স্বামী-স্ত্রীতে বেশ ঝগড়া স্থরু হ'ল। বোনের জন্য দোভাষীর কাজ করবে—না, স্ত্রীর জন্য করবে, এই ছিল ঝগড়ার বিষয়। ঝগড়া যখন পেকে উঠল, তাদের মা এসে দুজনকে দুদিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বসতে দিলেন। গরম জল, নরম গামছা এল। হাত-পা ধুয়ে নিলাম, তারপর শরীরের সমুদয় কাপড় খুলে শরীরটা মুছে নিলাম এবং চা, দুধ বেশ করে খেয়ে একটি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ইব্রাহিম আমার কাছে এল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের বিয়ে কি অমুসলমান চীনাদের মতই হয়? সে ঘাড় নেড়ে বলল অনেকটা সেরূপই হয়, তবে একটু বেশী কাজ আছে মাত্র। সেটি হ'ল, একদিন স্বামী-স্ত্রীতে গিয়ে মসজিদে বসে একটা কাগজে নাম সই করতে হয়, এতে স্ত্রীকে কিছু জমি-জায়গা লিখে দিতে হয়, কিন্তু তাদের বড় কিছু নাই বলে, দুটি গাভী তার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে। তার স্ত্রী নাকি তাকে বলেছে, তার গাভীদ্বয়ের দুধ, দই, মাখন স্বামীর অতিথিকে কিছুই দিবে না। সে বললে, সেজন্য ভাবতে হবে না, পাশের বাড়ী হতে সব নিয়ে আসবে এবং তাদের আরও একটা গাই আছে, সেটি বেশ দুধ দেয়। এরই মাঝে তার স্ত্রী এবং দুটি বোন ঘরে প্রবেশ করল হাতে করে একটি বড় সর নিয়ে। আমাকে তা খেতে বলল। একা খাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নাই, আমি সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে নিজে কিছু খেয়ে নিলাম। ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করলে, আমার ধর্ম্ম কি ইস্‌লাম নয়? আমি বললাম, আমার ধর্ম্ম ইস্‌লাম নয়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই মত একটা। কথাটা শুনে যেন সে চমকে উঠল এবং বলল,—শূকর মাংস নিশ্চয়ই খান না? আমি তাতে সম্মতি দিলাম। তারপর পরীক্ষার্থে দই আনা হ'ল। তাও আমি খেয়ে নিলাম। দই চীনারা কখনও খায় না। যদি চীনা এবং জাপানীর অখাদ্য কিছু থাকে, তবে ঐ দই। যখন দইটা খেয়ে নিলাম এবং আর একটু চাইলাম, তখন ইব্রাহিম আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "নিশ্চয়ই কাফের নয়"। কে কাফের, কে ইস্‌লাম তার পরীক্ষা হ'ল দই। পরীক্ষার রকমটা দেখে আমার মনে এত আনন্দ হ'ল যে, সে দিনই একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখেছিলাম, আর একখানা লিখেছিলাম সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরের

পত্রখানা মলয় ট্রিবিউনে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বাড়ীর পত্রখানার লেপাফাটা পৌঁচেছিল, চিঠিটা পৌঁছে নাই !

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ইব্রাহিমকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। মাছের কথা উঠল। সে বললে, আমরা তো মাছ খাই না, তবে যদি চান তো চিংড়ি মাছ এনে দিতে পারি, রান্না করতে হবে আপনার নিজ হাতে। ইব্রাহিমের স্ত্রী কথাটা বুঝে নিয়েই বললে, একটা লোক আমাদের বাড়ীতে থাকত, সে মাছ, মুরগী, ছাগল খেত বটে, কিন্তু গরু এবং শূকর খেত না। এ কি সেই জাতীয় লোক, তবে সে লোকটা ছিল ফরসা, আর এই লোকটি কালো। ইব্রাহিমকে বুঝিয়ে দিলাম আমি বাঙ্গালী, ভারতের বাঙ্গালীরাই এরূপ খাদ্য খায়। বাঙ্গালী কথাটা শুনেই ইব্রাহিম বললে, তবে দাড়ি, গোঁফ আর পাগড়ী কোথায় ? বাঙ্গালী তো কখনও মানুষ হয় না, ওরা তো চীনের লোককে ধরে ধরে খায়, ওদের মাঝে আবার ইস্‌লামও আছে, কি রকম ইস্‌লাম বোঝা বড় কষ্ট, কত চীনা ইস্‌লামকে ধরে খেয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নাই। আপনি এই কথাটা বলবেন না, এতে আমার কচি ভাই-বোনেরা ভয় পাবে। আমার সঙ্গে একখানা ভারতের মানচিত্র ছিল, তা খুলে তার সামনে ধরলাম। পাঞ্জাব প্রদেশটা দেখিয়ে বললাম, "এই স্থানটুকুর নাম পড় তো ?" সে পড়লে "পাঞ্জাব"। তাকে বুঝিয়ে বললাম, "এই স্থানের লোক তোমাদের দেশে এসে সৈনিকের কাজ করে।" কলকাতা দেখিয়ে বললাম, "এস্থানের লোক তোমাদের দেশে আসে না।" সে জিজ্ঞাসা করলে, "গান্ধীর বাড়ী কোথায় ?" কাথিওয়ার দেখিয়ে দিলাম। তারপর "তেগুরা, অর্থাৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী কোথায় ?" কলকাতায় দেখিয়ে দিলাম। ইব্রাহিম অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল বটে, কিন্তু বুঝতে যেন তার কষ্ট হচ্ছিল। তার এই অবস্থা দেখে বল্‌লাম, যদি এখানে ভাল ইংরেজী জানা লোক থাকে তবে নিয়ে এস, সব বুঝিয়ে দিব। খুব আনন্দিত হয়ে ইব্রাহিম বাড়ীর বাইরে চলে গেল, আমি আরামে শুয়ে পড়লাম।

'কমরেড'

ঘুম থেকে উঠে দেখি, ইব্রাহিমের সঙ্গে তিনটি যুবক বসে কথা বলছে। তারা আমার কাছে এল, এবং আমাকে "কমরেড" বলে সম্ভাষণ করল। যখন

দেশে ছিলাম তখন 'কমরেড' নামে একটা ইংরেজী সংবাদপত্র দেখেছি, আমাদের গ্রামের একজন মুসলমান ভদ্রলোক তা পড়তেন। ইংরেজী-বাঙ্গলা অভিধান দেখে তার অর্থ বার করেছিলাম "সঙ্গী।" তবে এরাও কি আমার মত পর্য্যটক? আমি তাদের বললাম, "আপনারা কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমণ করেছেন?" তাদের একজন জাপানী, অন্য দু'জন চীনা, তারা ভ্রমণ কোন দিন করে নাই। "তবে বুঝি সঙ্গী হতে চান?" তিনজনই একসঙ্গে বলে উঠলে, "না না, আমরা সঙ্গী হতে চাই না, আপনার দেশ কোথায়?" "আমার দেশ হিন্দুস্থান।" ইব্রাহিম আমার কাছে এল। তাকে ঐ যুবক তিনটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, এই তিনজনাই তার বন্ধু। তবে বন্ধু তিনটি নতুন একটা ব্রত গ্রহণ করে বেশ বড় গোছের এক দল জুটিয়েছে—তাতে চীনা জাপানী সব জাতিগত প্রভেদ মিটিয়ে ফেলা হয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে সাম্যই হ'ল জীবনের উদ্দেশ্য। এখন বন্ধুরা মিলে তাকেও দলে টানছে। আমি বললাম, তুমি বাপু এত কথা বোঝ, আর বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীতে পার্থক্যটা বোঝ না? তারপর চীনা যুবকদের বললাম, যা কর তা কর বাপু, সর্ব্বপ্রথম মাঞ্চুরিয়া তোমার বন্ধু জাপানী-ভায়ার হাত হতে মুক্ত কর, তারপর লাল হও আর পীত হও ক্ষতি নাই। কথাটা শুনেই জাপানী যুবকটি একেবারে রেগে উঠল এবং দুর্ব্বোধ্য ইংরেজীতে মনের ঝাল ঝাড়তে লাগল। সাম্যের পূজারীই হোক আর চীনাদের সঙ্গে মিতালীই করুক, ভাবগতিক দেখে জাপানী যুবকের স্বরূপ চিনে নিলাম। তাতে যে ভুল করি নাই, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম যখন এই যুবকটির সঙ্গে আমার আবার মুকদেনে দেখা হয়। কারণ আমার মনে হয়, সেখানে সে-ই আমার জীবন বিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিল। এখানে আর একটু খুলে বলা উচিত। মুকদেনে আমার সাইকেল উধাও হয়, আমি অজ্ঞান হই, কোন চীনা ছেলে আমার সঙ্গে সেখানে দেখাও করে নাই, এমন কি, কোন চীনা যুবকের সঙ্গে আমি মিশিও নাই। মিশেছিলাম জাপানী যুবকদেরই সঙ্গে। যদিও একটি জাপানী যুবক আমাকে বিপন্ন করেছিল, তবু কিন্তু অনেক জাপানী যুবক আবার আমাকে সাহায্যও করেছিল। এতগুলি কথা শুধু একটি কারণে বলতে হ'ল। ভারতের, অবাঙ্গালী হয় তো আমার লেখা পাঠ করেন না, ইংরেজ হয় তো পাঠ করেন না,

কিন্তু আমি ভাল করে জানি, আমার এই বাঙ্গলা ভাষায় ‘চীন ভ্রমণও’ অনেক জাপানী পাঠ করে থাকেন। তাঁরা যেন আমায় ভুল না বোঝেন সে জন্য এতটুকু জের-টানতে হ’ল। ভুল বোঝার কথাই যখন উঠ্‌ল, তখন আর একটা কৌতুককর ব্যাপারের উল্লেখ না করে থাকৃতে পারলাম না। সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে যখন একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম, তাতে প্রেসের ভুলে চীনা শব্দের পরিবর্ত্তে জাপানী শব্দের উদয় হয়েছিল, তার জন্যে চীনা ও জাপানী বন্ধুদের কাছে দস্তুরমত কৈফিয়ৎও আমাকে নানা মতে দিতে হয়েছিল। সে সব প্রসঙ্গ যথাস্থানে প্রকাশ করা হবে।

জাপানী যুবক চলে গেল। চীনা যুবকদ্বয় আমারই কাছে বসল। কিন্তু এটা আমি ভাল করেই জানতাম, এই অঞ্চলে অনেক চীনা যুবক জাপানীদের অন্ন-দাস হয়ে দেশের ও দশের উপর বিষম অত্যাচার করছে। মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণ কালে এরূপ অনেক চীনা যুবকের দর্শন মিলেছে, যারা অর্থের জন্য, সামান্য বিলাসিতার মূল্যের বিনিময়ে মাতৃভূমিকে জাপানীর হাতে তুলে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এখানে আমি জাপান-বিদ্বেষ প্রচার করছি না। জেনে শুনেও অনেকে স্বদেশকে, স্বজাতিকে অপরের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট আছে। চীনেও যে তাই দেখেছি সে কথাই বল্‌ছি মাত্র। ইব্রাহিমকে বললাম, “আমার আর কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, আমার আবার বিশ্রামের দরকার; আগামী কাল আমি টিয়েনসিন যাব।” ইব্রাহিমকে দেখলাম কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়েছে—থম্‌থমে তার ভাব, মানুষের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে এলে যেমন হয়। আমি ওদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাছ খাওয়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। রাতে বেশ নিদ্রা হয়েছিল। পরদিন প্রাতে ইব্রাহিমের পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম।

আকাশ অপরিষ্কার, মনে হ’ল বৃষ্টি হবে, কিন্তু কিছুক্ষণ যাবার পরই পূর্ব্বাকাশের ধবল মেঘমালা অদৃশ্য হ’ল। সূর্য্যদেব মুক্ত হয়ে যেন আক্রোশের সঙ্গে আপন প্রাধান্য বিস্তারে অগ্নিবর্ষণ সুরু করলেন, অমনি মঙ্গোলিয়া হতে ধূলি-ঝঞ্ঝায় সমানীত পুঞ্জ পুঞ্জ স্বচ্ছ বালিরাশিও তাঁর তেজে তেতে আগুন হয়ে উঠল। লূ’র মত একটা তপ্ত বাতাস বইতে লাগল। মাঝে মাঝে

যখন 'কেতলীর' জল ফুরিয়ে যাচ্ছিল, নিকটস্থ গ্রাম হতে কেত্‌লী আবার পূর্ণ করে লতে লাগলাম। মন বেশ আনন্দে ছিল, কিন্তু মিঃ ওয়াং আবার কুলিবেশে সাইকেল নিয়ে আমার সঙ্গ নিলেন। বাহবা দিতে হয় চীনা ত্যাগব্রতী জাতীয়তাবাদীদের। মিঃ ওয়াং আমার কাছে এসে, গত রাতে যুবক তিনটির সঙ্গে আমার যে বচসা ঘটেছিল তা হুবহু আমায় বললেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন, চীনে কমিউনিষ্ট বলে কোন জীব নাই। 'কমরেড' বলে কোন কথা এখনও চীনে ব্যবহার হয় না। কাজেই যাদের মুখে কমরেড বুলি, তারা যে চীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, একথা আপনার বুঝা উচিত ছিল। আপনাকে আর কতবার বল্‌তে হবে যে, আপনার সরলতাই আপনাকে উচ্ছন্নে দিবে। যাক, আপনার সাহায্যার্থেই আমি টিয়েনসিন পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে চলেছি। মিঃ ওয়াঙের তৎপরতা দেখে আমার যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ হ'ল। মিঃ ওয়াং বললেন, সাংহাই-কোয়ান (Shanghai-Kwan) পর্য্যন্ত আমার কোন বিপদ আসবে না। টিয়েনসিন পর্য্যন্ত যেতে আমার কোন বেগ পেতে হ'ল না। সমুখেই একটা সেতু, তা পার হয়েই বৃটিশ কনসেশ্যন। কিন্তু মিঃ ওয়াং বলেছিলেন বৃটিশ কনসেশ্যনের হোটেলগুলিতে খরচা বেশী, তাই সেতুটার এপারেই আমাকে হোটেলের সন্ধান করতে হ'ল। একটা পথের মোড়ে সাইকেলটা ঘুরিয়ে যাই পেছন দিকে চেয়েছি মিঃ ওয়াং আমাকে ইঙ্গিতে বিদায় জানালেন। আমি দুঃখের সহিত তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম। কিন্তু পিকিনে ফের তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি এবং রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমাকে জীবিত বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

টিয়েনসিন

পৃথিবীর নরনারী আমাকে কতভাবে গ্রহণ করে তার অন্ত নাই। কেউ পথ দেখায়, কেউ পথ ভুলায়, কেউ হাতে টাকা গুঁজে দেয়, কেউ বা লুকানো টাকা কেড়ে নেয়, আমি এখন এ-সবে অভ্যস্ত—উদাসীন। মিঃ ওয়াং অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তা ব'লে কি আমি ঘাবড়ে যাব? যেমন পথিকে পথিকে পথের পরিচয়—তার বেশী আর কি, তবু ক্ষণিকের তরে মনে একটা বেদনার দাগ কাটল। ভেবে দেখলাম, সেটা মিঃ ওয়াঙের ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, সেটা

তাঁর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায়। একটা হোটেল খুঁজে ঘর ভাড়া নিলাম। হোটেলটা চীনা শহরে একটা প্রশস্ত পথের পাশেই ছিল। হোটেলটার ডানদিকে কতকগুলি রিক্সাওয়ালা বাস করে, বাঁদিকে একজন মাঞ্চুকো সেনানীর আবাস। স্থানটা অনেকটা নিরাপদ বলেই মনে হ'ল। জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে দিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিলাম, তারপর সামান্য জলযোগ সেরেই বের হয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য কোন হিন্দুর সঙ্গে দেখা হয় কি না। চীনা শহরটা পার হব-হব এমন সময় একজন পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। সাইকেল হতে নামলাম। লোকটি আমাকে আলিঙ্গন করল। নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বল্ল, "লোফার"। কানাবাবুকে দেখেছি, বব্‌কে দেখেছি, মিঃ দাসকে দেখেছি, এক হতে অন্য ধাপে ধাপে যেন বেশী বাহাদুরী পাবার যোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রামা, রামা-ই রয়ে গেল, একটুও যদি বদলাল। লোফার বললে, চলুন, কোথায় নিয়ে যেতে হবে! একটু ভেবে বললাম, এখানে তো একটা বৃটিশ কনসেশ্যন আছে, সেখানে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম দেখা করব কোন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। লোফারের মুখের উপর ঘন-কৃষ্ণবর্ণের একটা মসিরেখা আপনি ফুটে উঠল। লোফার বললে, তুমি তো দুনিয়া ঘুরছ, পুলিশের সঙ্গে কি সম্পর্ক হে? আমি বললাম, আমার ইচ্ছা মাত্র। লোফার মুখটায় ভ্রূকুটি করে বললে, তু জাহান্নামে যা। কথাটি বলেই লোফারও কোথায় চলে গেল।

যদিও আমার মনের গতি ভাল ছিল না, তবুও এই লোকটির এই আচরণে আমার একটা দুর্ভাবনা জেগে উঠল। কিন্তু নাচার হয়েই পথের খেই ধরলাম। একটু পরেই কালো দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়ীর কাছে এলাম। মনে হ'ল এটাই বৃটিশ কন্‌সালের বাড়ী এবং আশে পাশের স্থানটাই বৃটিশ কন্‌সেশ্যন। আর একটু দূরে যেয়েই পুলিশ ষ্টেশন পাওয়া গেল। পুলিশের সবচেয়ে বড় পদবীধারী যিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার সঙ্গে বেশ আলাপ করলেন, পথে কোন বিপদ হয়েছে কি-না জিজ্ঞাসা করলেন। মামুলীভাবে কথার জবাব দিলাম। কারণ ঠেকে শিখেছি, এই পুলিশ ষ্টেশন যদিও বৃটিশের, তথাপি তার অনেকগুলি কর্ণ আছে। আমি অনেক কথা চেপে যাচ্ছি দেখে পুলিশ অফিসার হাসলেন। আমি হাসলাম না, মুখ ফিরিয়ে নিলাম, যেন

তাঁর হাসি আমার চোখে পড়ে নাই। এই পুলিশ অফিসার আমার উপকার আদপেই করতে পারেন না তা আমি জানি। তাই তাঁর কাছ থেকে যতদূর পারা গেল দরকারী সংবাদ লিখে নিয়ে, তাঁর দস্তখতটা নিয়ে, পাচটা ডলার চেয়ে সম্বল বর্দ্ধিত করে বিদায় হয়ে পড়লাম। যে-সব সংবাদ টুকে নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল—কোন হিন্দু দোকানী এখানে আছেন কি-না। পুলিশ অফিসার বলে দিয়েছিলেন অনেকের ঠিকানা। তাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা আমাকে পেয়ে সুখী হলেন এবং আমাকে তাঁদেরই কাছে এসে থাকতে বল্‌লেন। কিন্তু এই কাজটি আমি করি নাই। চীন ভ্রমণ করতে এসেছি, থাক্‌ব চীনাদেরই মাঝে, দেখ্‌ব তাদের রীতি-নীতি, এই হ'ল আমার নিয়ম।

বিকাল বেলাটা আরামে কাটিয়ে বেশ করে দেশী খানা খেয়ে হোটেলে ফিরবার পথে দেখা হ'ল মিঃ ওয়াঙের সঙ্গে। সাইকেল হতে নামতে বল্‌লাম। নামবার পর বল্‌লেন, তিনি রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গেই আছেন। যদি দেখা হয় তবে যেন পরিচিত বলে গণ্য না করি। তিনি আরও বল্‌লেন, যতদিন আমি টিয়েনসিনে থাকব ততদিন তিনিও থাকবেন এবং রিক্সাওয়ালার কাজ করবেন। যদি রিক্সার দরকার হয় এবং তিনি হাজির হন, তবে যেন রিক্সাওয়ালারূপেই তাঁকে গ্রহণ করি। তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে হোটেলে ঢুকলাম। এসে দেখি হোটেলের আঙ্গিনায় একটা যুবককে বেদম প্রহার করা হচ্ছে। আমার তা দেখে সহ্য হ'ল না। যিনি প্রহার করছিলেন তাঁকে প্রহারকার্য্য হতে বিরত হতে বল্‌লাম। তিনি চোখ লাল ক'রে চীনা ভাষায় আমাকে সরে যেতে বল্‌লেন। আমি তাতে দমে গেলাম না। ইংরেজীতে চেঁচিয়ে বললাম, "You whip him, I whip you." অর্থাৎ যদি তুমি এই যুবককে চাবুক মার, তবে আমিও তোমার পিঠে সেই রকম চাবুক কস্‌ব। লোকটা আমার দিকে একটু তাকিয়েই চাবুকটা যেই আমার উপর তুলল, অমনি তার হাত হ'তে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে তাকেই এক ঘা বসিয়ে দিলাম। চারিদিক হতে হুইসেল বেজে উঠল। আমি বে-পরোয়াভাবে চাবুকসমেত ঘরে গিয়েই বয়কে ডাকলাম। বয় এল, ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালাম। ম্যানেজার যুবকের প্রতি অত্যাচার দাঁড়িয়ে দেখেছিল। এসেই বললে,

"You saved the boy, thank you." আমি তাকে বল্‌লাম, যদি পুলিশ আসে বলে দিও আমি বৃটিশ সাবজেক্ট। পিকিনে গিয়ে যেন বৃটিশ কন্সাল হতে সমন নিয়ে আসে। ম্যানেজার পাসপোর্ট দেখতে চাইল। সে আমার পাসপোর্ট দেখল, তারপর চেঁচিয়ে বললে, "ছিনচাইলা", অর্থাৎ 'য়া করেছ বেশ করেছ'।

ঘর বন্ধ করে দিলাম এবং যা ঘটেছে তার ডায়েরী লিখতে লাগলাম। এমন সময় মিঃ ওয়াং রিক্সাওয়ালাবেশে এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। মিঃ ওয়াং ম্যানেজারকে কি একটা অছিলা করে বলেছিলেন যে, টাকার চুক্তি হয় নাই, তাই আমার সঙ্গে টাকার চুক্তি করতে হবে, অতএব বিষয়টা গোপনীয়। মিঃ ওয়াং ঘরে প্রবেশ করেই ইঙ্গিতে বল্‌লেন চুপ করতে। তারপর কাছে এসে বসে বললেন, এ লোকটা জাপানীদের চাকর, যাকে মেরেছিল সে একজন চীনা সরকারী লোক, অতএব চীনা সরকার হতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তবে এখন হতে আপনার পক্ষে আমার সাহায্যের দরকার, আগামী কল্য ম্যানেজারকে বলব যে, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে তাই আমার রিক্সা আপনি ভাড়া করেছেন, মাঝে মাঝে উঠবেন তাতে আপনারও অপমান হবে না, আমারও মান যাবে না। শুনে হাসি, চীনাদেরই আমি ভয় করি না, তারপর জাপানীরা তো এদের চেয়েও আকৃতিতে ছোট, জাপানীদের ভয় করব কেন? দরজা বন্ধ করে ডায়েরী লিখে শুয়ে পড়লাম। গভীর নিদ্রা আমার চিন্তানলে বারি সিঞ্চন করল।

টিয়েন্‌সিনে আমার প্রথম রাত্রি কেটেছে—এসেছে প্রভাতের কর্ম্মমুখর ব্যস্ততা—পথে পথে যান-বাহন-পথচারীর সমারোহ। কুলির দল আপন আপন কাজে লেগে গেছে। দোকানী দোকান খুলে ভাবছে—কি ক'রে দু'পয়সা লাভ হয়। সারারাত সাধের অনিদ্রার পর চীনা বিলাসী নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। নিঃস্বের দল পূর্ব্বরাত্রিতে এক টুকরা রুটিরও যোগাড় না করতে পেরে এই ভোরের বেলায়ই কেউ ভিক্ষার জন্যে, কেউ কাজের জন্যে ছুটাছুটি করছে। জাপানী সেনা আলস্য ঝেড়ে ফেলে কুচকাওয়াজ করছে। বৃটিশ কনসেশ্যনে এখনও প্রভাতী জাগরণের সাড়া নাই, তাই পথের মাঝে কয়েকটা কুকুর একে অন্যকে তাড়া করে চক্রাকারে ঘুরছে। সারারাত চীনা গুপ্ত-পুলিশের দল কেউ

চীনা মুনিব, কেউ জাপানী মুনিবের আদেশ প্রতিপালন ক'রে এই ভোরবেলায়ই আপন আপন ডায়েরী লেখা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরছে। অভাব-অভিযোগ নিয়ে রক্তিম রবি ধীরে—অতি ধীরে জাপানদেশ উজ্জ্বল করে চীনদেশের দিকে যাত্রা করেছেন। এই প্রভাতে-আমার ঘুম ভাঙ্গল, উঠেই মুখ-হাত ধুয়ে ইচ্ছা হ'ল একবার দেখি মিঃ ওয়াং আস্তানায় আছেন—কি, রিক্সা, নিয়ে বের হয়েছেন। দরজার কাছেই হুজুর আমার অপেক্ষায় হাজির ছিলেন। চাবুকটা আমার হাতে ছিল, রিক্সাওয়ালাকে তা উপহার দিলাম। দাঁতগুলি বের করে হাসলে রিক্সাওয়ালা, তারপর আমাকে নিয়ে ছুট্‌ল বৃটিশ কনসেশ্যনের দিকে।

এদিককার চীনারা দক্ষিণী চীনাদের চেয়ে আকৃতিতে একটু বেশী লম্বা। খায় রুটি, খরচ অল্প। কিন্তু দক্ষিণী চীনা হতে এরা লোভী এবং পরশ্রীকাতর। "আপ কান্ট্রি" লোকদের সঙ্গে বাঙ্গালীর যে পার্থক্য, ক্যাণ্টনীর সঙ্গে পিকিন-বাসীদের প্রায় তেমনি পার্থক্য। চাবুকটা কেড়ে নিয়েছিলাম, এক ঘা কসিয়েও দিয়েছিলাম, তবু কিছুই হয় নাই। রিক্সা টানতে টানতে মিঃ ওয়াং বললেন, যতক্ষণ বৃটিশ কনসেশ্যনে থাকবেন ততক্ষণ ভয় নাই, এদিকে এলেই আমার সঙ্গ ছাড়া চলবেন না। তথাস্তু ব'লে চুপ করলাম।

সিন্ধী দোকানীর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল, মিঃ ওয়াংকে সে কথা বল্‌লাম। মিঃ ওয়াং আমাকে তথায় নিয়ে গেলেন। দ্বারেই তুর্ক যুবক-যুবতী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী, কাজ করেন সিন্ধী দোকানীর দোকানে। রাত্রিবাস নিজস্ব স্বতন্ত্র গৃহে করলেও কিন্তু প্রভাতী চা হতে আরম্ভ করে রাতের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দোকানেই থাকেন। এই তুর্ক দম্পতিকে দেখ্‌লে কেউ বল্‌তে পারবে না এরা ইংরেজ নয়। এঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে গত রাতের ঘটনা বল্‌লাম। ওঁরা বললেন, এরকম ঘটনা এখানে হবারই কথা। 'এমনভাবে চীনের যুবক-সম্প্রদায় নির্য্যাতিত হচ্ছে, তা ওরা সহ্য করতে পারে বটে, কিন্তু অন্যে তা পারে না। চীনের যুবকদের নির্জ্জীবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া উচিত নয়, তুর্ক ভদ্রলোক এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, চীনের যুবক-যুবতী দাঁড়িয়ে মার খাবে না তো আর খাবে কে? এদের সম্বন্ধে তিনি এই কথাটি নিয়ে একখানা বই লিখেছেন। বই এক কপি সঙ্গে সঙ্গে সব সময়ই রাখেন। যেখানি তাঁর হাতে

ছিল তা আমাকে উপহার দিলেন এবং বসে বসে পাঠ করতে বললেন। বইখানি আগাগোড়া পাঠ করেছিলাম। তাতে তিনি বলেছেন, চীনের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ চীনের নারী। নারীরা ছেলে এবং মেয়ে ঠেঙ্গান একটা ধর্ম্মের অঙ্গ করে নিয়েছে। তাই ছোটবেলা হতে চীনা ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে মার খায়, ধরা পড়লে পালায় না, মরণের অপেক্ষায় থাকে, ইত্যাদি। তা বলে এ কথা একেবারে গোটা চীনজাতির উপরই আরোপিত হতে পারে না। এই বইখানার কাট্‌তি চীনদেশে বেশ হয়েছে। এরই মধ্যে দশম সংস্করণ বের হয়েছে। চীনের বদনাম চীনের লোক কিনে পাঠ করছে। তার একমাত্র কারণ, চীনের বদনাম বের করবার জন্য বইখানা লেখা হয় নাই, বইখানা চীনের যুবক-যুবতীর নামেই উৎসর্গ করা হয়েছে এবং বার বার বলা হয়েছে, "যদি তুমি ধরা পড়, তবে পালাবার চেষ্টা কর"। আরও বলা হয়েছে, "সুবোধ ছেলের মত মার খেয়ে মরার চেয়ে, ধরা পড়বার পূর্ব্বেই বিষ খেয়ে মরাও ভাল" এবং এই সঙ্গে তিনি কয়টি বিষেরও নাম করে দিয়েছেন। তারপর বলেছেন, "তোমাদের অশিক্ষিত মা তোমাদের বাল্যকালে কুশিক্ষা দিয়েছে বলে সারাজীবন সে কুশিক্ষার দাস হয়ে থেক না, একটু চেষ্টা করলেই জীবন-প্রভাতের অর্জ্জিত দোষগুলি বর্জ্জন করে দেশের সেবা করতে পার।" এই বইখানার প্রচার আবার অনেক সরকারই নিষিদ্ধ বলে আদেশ জারী করেছেন, এমন কি মাঞ্চুরিয়াতেও এই বইয়ের বিক্রী দণ্ডনীয়। বইখানি ভাল ক'রে পাঠ ক'রে পিকিনে একটি চীনা ছেলেকে উপহার দিয়েছিলাম। সুখের বিষয়, আমাদের দেশের লোকের এই দোষটি নাই, অতএব এরূপ বইয়েরও দরকার নাই। অশিক্ষিত চীনাদের এ কুরীতি যদি প্রত্যক্ষ করতে চান, তবে যাবেন কলকাতার বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে, দেখবেন কত বেশী বয়সের ছেলেরা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে তাদের মায়েদের হাতে, একটু যদি পালিয়ে যায় তবেই অত্যাচার হতে রক্ষা পায়, কিন্তু তা তারা যাবে না। সরকার পক্ষ যখন কোন প্রগতিপন্থী যুবককে ধরবার চেষ্টা করেন, তখনও এরা ঠিক ঐরূপই করে। যুবক ভাল করে পালাতেও পারে না, তারপর যেরূপভাবে তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়, আমাদের দেশের সাধারণ চোর-ডাকাতও তা থেকে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে। তবে বর্ত্তমানে চীনে তেমন সুবোধ ছেলেমেয়ের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসছে।

রবিবার, বেলা তখন দশটা বাজে। দোকানের সমুখের দিকটা বন্ধ, ক্রেতা আসছে না। খানাপিনা ও গান সুরু হ'ল। আহার শেষ করে আমি আর দেরী করলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে চীনা শহরের দিকে পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হলাম। ছোট-বড় অনেক বাড়ী পথে পড়ল, একটাও আমার মন আকর্ষণ করল না। সাজানো দোকানগুলিতে ক্রেতারা ঢুকছে, সওদা নিয়ে এসে রিক্সায় বসছে। আমি শহরের সবচেয়ে যে বড় দোকানটা, তাতে প্রবেশ করলাম। মালিকের সন্ধানে অনেক অনুসন্ধান করে তবে সাক্ষাৎ মিলল। মামুলি ধরণের পোষাক পরে একটা চেয়ারে বসে চীনা কায়দায় আনমনে তামাক খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তাঁর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। আমি তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। তিনি তা শুনেও সুখী হলেন না। তাঁর মনটা একটা অজানিত ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে ছিল। আমাকে কয়েকটি কথা বললেন যার মানে কিছুই হয় না। ভদ্রলোক এত শঙ্কিত যে, ভাষায় তা প্রকাশ করা চলে না। তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বললাম, বুঝলাম ওঁরা জাপানীদের ভয়েই এত ভীত। জাপানীরা কখন টিয়েনসিন দখল করে নেবে তাই ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তাঁদের এত ভয়? ভদ্রলোক যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পেলেন। জবাব দিবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। আমিও সহজে ছাড়বার পাত্র নই। প্রশ্ন, সহানুভূতি, সমর্থন—এ তিনের সহায়তায় একটু একটু আভাষ পেলাম। তাঁদের অনুগ্রাহকরাও জাপানের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। ইংরেজ, আমেরিকান—এই দুটি জাতি যেন ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ইংরেজী ভাষা তাদের কাছে মধুর। শুধু তাই নয়, ইংরেজী ভাষা তাদের বন্ধু। ইংরেজ এবং আমেরিকান এই টিয়েনসিনবাসী চীনাদের পক্ষে অন্ধের যষ্টি—অকূল সাগরে নিমজ্জমানের তৃণ, একথা বললেও দোষ হয় না। বড় বড় চীনা ধনীরা এরই মধ্যে বৃটিশ কনসেশ্যনে বাড়ী ভাড়া করে নিয়েছেন, অনেকে কিনে নিয়েছেন। নিজ প্রাণ নিয়ে বিপদের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে বাঁচবার জন্যে সবাই আকুল।

আমার কথায় জাপানবিরোধী অনেক শব্দ ছিল, তাই বড় দোকানীর সেক্রেটারী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আসবার বেলা সে জন্য দক্ষিণার বন্দোবস্ত করেছিলেন। দক্ষিণা যা দিয়েছিলেন তা মোটা রকমেরই, তবে তা একটা

লেপাফাতে মোড়া ছিল। লেপাফাটি পকেটস্থ করে বাইরে এসে ভাবতে লাগলাম, আমিও জাপানের বিরুদ্ধে ভাবছি, আমার মত অনেকেই ভাবছে, তবে কেন বিদেশীরা চুপ ক'রে আছেন? কথাটার জবাব পেলাম না, কারণ আমার রাজনীতিতে কোন জ্ঞান নাই। পকেটে যে টাকা রেখেছি তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটা আমেরিকান সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে উপস্থিত। আমার মন তখন এই কথাই ভাবছিল, এই চীনাদের সাহায্য করবার মত কি কোন বীর ইউরোপীয়ান জাতি এখানে নাই?

অফিসে প্রবেশ করে সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমেরিকা হতে সবেমাত্র এসেছেন। আমার সঙ্গে বড়ই ধীরে কথা বলতে লাগলেন। আমি চীনে যা দেখেছি তার সংবাদ একটির পর একটি তিনি মনের পরতে পরতে গেঁথে নিলেন। আমার দেশের একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না। ভদ্রলোকের প্রশ্নের রকম দেখে বুঝলাম, তিনি যেন চীনের যাবতীয় সংবাদ আমার কাছ থেকেই পেতে চান। কথায় কথায় কি একটা প্রসঙ্গ উঠল, সেটা বোঝাতে আমার একটু কাগজের দরকার হতেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি, পকেট হতে নোটশুদ্ধ লেপাফা উধাও হয়েছে। এযে পকেট-কাটা হতেও চতুর! তখনকার মত ধৈর্য্য ধরতে বাধ্য হলাম এবং যা যা বলার ছিল বলে নিলাম। আমেরিকান সম্পাদক সংবাদ-দানের মূল্য স্বরূপ আমায় পাঁচটি ডলার দিলেন। এবার টাকাগুলি আর বাইরের পকেটে রাখলাম না, বুক-পকেটে পূরলাম। সংবাদপত্রের নাম এখন আর মনে নাই, তবে এই হ'ল টিয়েনসিনের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক। এই সংবাদপত্রখানি ভারতীয়দেরও ভালমন্দের আলোচনা যে একেবারেই করে না, এমন নয়। টাকা-চুরির ব্যাপারে আমার মনটা একটু দমে গিয়েছিল, সেজন্য সম্পাদকের সঙ্গে বেশী কথা বলতে ভাল লাগে নাই। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম সম্পাদকও জাপানী জুজুর ভয়ে কাবু, নতুবা এমন করে চীনের সংবাদ নেবেন কেন? সম্পাদকের ঘর হতে বাইরে এসেই একটা রিক্সার জন্য পথের পাশে দাঁড়িয়েছি। মিঃ ওয়াং রিক্সা নিয়ে এসে আমারই সামনে উপস্থিত। রিক্সায় বসেই বল্লাম, 'কি করে টাকার লেপাফাটা পকেট হতে চলে গেল একটুও বুঝতে পারলাম না। মিঃ ওয়াং

তার জবাব দিলেন না, মনে করলাম রিক্সা টানতেই ব্যস্ত, হয়তো আমার কথা শুনেন নাই। হোটেলে এসে তাঁকে একটি ডলার দিলাম তাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ। ডলারটি পেয়ে দাঁত বের করে আমার দিকে তাকিয়েই বিদায় নিলেন। এক ডলারে এত সন্তোষ হয় রিক্সা টানাই যাদের পেশা তাদের। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। কখন যে চোখের পাতা বুজে গিয়েছিল তা আর মনে নাই।

রাত তখন এগারটা। আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে বসেছি বাইরের ঘরে, এমন সময় মিঃ ওয়াং এমন একটা অভদ্রোচিত ইঙ্গিত করে আমাকে ডাকলেন যে আমার মাথা নত করতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসেই বল্লাম, বলুন তো ব্যাপার কি? মিঃ ওয়াং বল্লেন, আমি এনভেলাপের খোঁজে গিয়েছিলাম, লোক লাগিয়ে এসেছি, দেখা যাক পাওয়া যায় কি-না। আমি বললাম, আর কিছু নয় তো? "না, আর কিছু নয়, তবে রকম বড় লাভ দেখছি না, পারেন তো বৃটিশ কনসেশ্যনে চলে যান।" কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। ভাবলাম যা হবার তাই হবে, তা বলে অন্য কোথাও যাব না, থাকব এখানেই, যদি বিপদ আসে আসুক। জাপানী গুপ্ত-পুলিশের ভয়ে এত কাতর হলে আমার চলে না। বাইরে যেতে একেবারেই ইচ্ছা হয় নাই, তাই হোটেলেই বসে রইলাম। একটি সাদা রাশিয়ান এবং একটি জার্ম্মান দুজনে মিলে আমারই পাশের একটা ঘর ভাড়া করল। তাদের সঙ্গে সাইকেল ছিল। আমার সাইকেলটা তাদের নজরে পড়তেই গাড়ীর মালিকের সংবাদ ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞাসা করল। ম্যানেজার আমাকে দেখিয়ে দিলে। তারা আমার সঙ্গে সাগ্রহে কথা বল্ল। তারা বল্ল যে, তারা সাইকেলে পিকিনে যাবে। যদি আমি একসঙ্গে যাই তবে আনন্দিত হবে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হ'ল এরা প্রকৃতই 'য়্যাডভেঞ্চার' করতে বের হয়েছে। তাদের বল্লাম, যদি তাদের আগামী কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব না হয়, তবে তাদের সঙ্গে যেতে পারি। তারা বল্লে, এসেছে পিকিন হতে, থাকবে অন্তত তিন দিন তারপর পিকিন ফিরে যাবে। এতে আমার আরও আনন্দ হ'ল। যদি চুরির টাকাটা এর মধ্যে পাওয়া যায় তো ভালই। তিন দিন পর তাদের সঙ্গে পিকিন যাব ঠিক হ'ল। তারা

পরিশ্রান্ত ছিল বলে বিশ্রাম করতে আপন ঘরে চলে গেল। আমি একখা সংবাদ-পত্র পাঠ করে গভীর রজনীতে শুয়ে পড়লাম।

রাত বোধ হয় তখন চারটে। দরজার কাছে একটা গোলমাল শুনে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলাম হল্লাটা কিসের—আমার প্রতি কোন অত্যাচারের বন্দোবস্ত হচ্ছে নাকি! দরজা ভেজিয়ে ভাবতে লাগলাম, চাবুকটা তো চলে গেছে, কিন্তু চাবুকের মালিকের তো টিকিও দেখা যাচ্ছে না! গোটা দুটো দিন গত হতে চল্‌ল এখন চাবুকের সংবাদ আবার হঠাৎ মাথা উঁচিয়ে উঠ্‌ল কেন? কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার এসে বললে, মাঞ্চুকো সৈনিক হয় তো একটা গণ্ডগোল করবে আপনার সঙ্গে, আপনি বের হবেন না। যদি বলেন তো বৃটিশ কনসেশ্যনে সংবাদ দিতে পারি। বৃটিশ কনসেশ্যনে সংবাদ দেওয়া ভাল মনে করলাম না, ভাবলাম এ দুটি যুবকের যদি সাহায্য পাই তবেই বেঁটে বদ্‌মায়েসদের আবার দুঘা লাগাতে পারব। ম্যানেজারকে বল্‌লাম, দয়া করে এই দুজন সাদা লোককে ডেকে দিলেই হবে। ম্যানেজার তাদের ডেকে আনলে। তাদের সব কথা খুলে বল্‌লাম। জার্ম্মান যুবকটি হেসে বললে, ভয় পাবেন না। এদের কোন ক্ষমতা নাই আপনার উপর হাত তোলবার। আপনি বৃটিশ সাবজেক্ট। এদের কি capitulation আছে যে আপনাকে ধরতে পারবে? যাক না পিকিন, তারপর সমন নিয়ে আসুক। পিকিনে যাবেও না, সমনও আনতে পারবে না, তারপর চীন সরকার আপনার নামে সমন জারিও করবে না। এরা যে মাঞ্চুকোর গোয়েন্দা তা ম্যানেজার ভাল করেই জানে। যদি দাঙ্গা করে তবে আমরা তিনজন লড়্‌ব, ভয় কিসের? সাদা রাশিয়ানটি কিন্তু একটু ভড়্‌কে গিয়েছিল, কারণ তাদের অবস্থা এদেশে বড় ভাল নয়, তবুও সাদার সহকারী হয়ে সাহায্য করা তার উচিত ভেবে সেও একটু পরে সায় দিল। আমার আর ভাববার কিছুই রইল না। এখন আমরা তিনজনা একত্রে ভ্রমণ করতে লাগ্‌লাম। সেদিনই শহরটা তিনজনে মিলে বেশ বেড়িয়ে নিলাম। মিঃ ওয়াঙের দর্শন কোথাও পেলাম না। বিকালে ভারতীয় মহলে গিয়ে বল্‌লাম, "এবার সঙ্গী পেয়েছি, অনেক বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পাব।" ভারতীয় ভায়ারা কথাটা শুনে এবং সাদা

সঙ্গীদের দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন এবং রাত্রির খাবারের বন্দোবস্ত করলেন।

এখানে বিশেষ করে একটা কথা বলা ভাল। ইউরোপীয়ানরা নিজেদের মধ্যে সামান্য কারণেও মারামারি কম করে না, কিন্তু যেই এশিয়াবাসীদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন শত্রু-মিত্র একজোট হয়ে লড়ে যায়। জার্ম্মান যুবকটি আমাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছে, তাই এই সাদা রাশিয়ানটিও আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। একেই বলে বর্ণাভিমান। তবু স্বার্থ বড় বালাই, তাই ইউরোপীয়ানরা অনেক সময় আপোষে ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যায়, নতুবা সাদার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা এক।

তিনজনায় মিলে ভারতীয়দের আড্ডা ছেড়ে খোশ মেজাজেই হোটেলের দিকে ফিরছি, এমন সময় একজন কোরিয়ান এবং দুজন চীনা আমাদের দাঁড়াতে বল্‌ল। আমরা দাঁড়ালাম, আমি বুঝ্‌লাম কিছু একটা ঘটবে। শ্বেতকায় যুবক প্রত্যেকেই চীনা ভাষা বেশ ভাল বলতে পারে। ওদের সঙ্গে কথা হতে লাগল। জার্ম্মান ছেলেটি আমাকে বললে, ওরা জিজ্ঞাসা করছে, সে রাতে চীনা যুবককে যখন বেতের দ্বারা আঘাত করা হচ্ছিল তখন আপনি বেত কেড়ে নিয়ে গিয়ে অত্যাচারীকে একটা আঘাত করেছিলেন। আমি বললাম, ওদের বলুন, আমার দেশ হিন্দুস্থান, জাতে আমি হিন্দু, আমাদের অভ্যাস হ'ল অত্যাচারীকে প্রশ্রয় না দেওয়া, যেরূপভাবে লোকটা যুবককে আঘাত করছিল, যদি কোন হিন্দু হ'ত তবে মরে যেত, চীনা বলেই তখনও বেঁচে ছিল। এত বড় অত্যাচার দেখে চুপ করে থাকা মানুষের পক্ষে অন্যায়, তাই এ কাজটি করেছি এবং আরও বলে দিন এরূপ অত্যাচার দেখা আমাদের অভ্যাস নাই। যে কোন অবস্থায়ই থাকব আমার সমুখে এরূপ অত্যাচার হতে দেখলেই তার প্রতিবাদ শুধু মুখে করব না, হাতেও করব। আমার কথা শুনে তিনজনেই দাঁত বার করে সন্তোষ জানিয়ে বিদায় নিতে যাবে এমন সময় বল্‌লাম, ওদের দাঁড়াতে বলুন। জার্ম্মান যুবকটি ওদের দাঁড়াতে বলল। জার্ম্মান যুবকটিকে বল্‌লাম, বলুন ওদের আমার পকেট হতে কয়েকখানা চীনা নোটপূর্ণ একটা এন্‌ভেলাপ চুরি গেছে, তার অনুসন্ধানে আমি আছি, সত্বর পেলে বাধিত হব। জার্ম্মান যুবক আমার কথাটা অনুবাদ করে

বলবার সময় আমি ওদের মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম, এনভেলাপ উধাও হয়ে যাওয়ার ভিতরও নিশ্চয় ওদের কারসাজি আছে।

সাচ্চা বনাম ঝুটা

বালাই চুকে গেছে ভেবে মনটা শান্ত হ'ল। হোটেলে চলে এলাম, তারপর নানা গল্প ক'রে শুয়ে পড়লাম। মিঃ ওয়াং ফিরলেন এবং বললেন, লেপাফা মিলতে পারে, কিন্তু টাকাগুলি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। মিঃ ওয়াঙের মুখখানা আজ প্রসন্ন, অন্যদিন তাঁকে দেখলেই মনে হ'ত যেন কোন মনোবেদনা তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছে। তাঁর মুখের প্রসন্নতার বিষয় তাঁর কাছে বললাম। তিনি বললেন, আজ একটা বড় কাজ করেছেন এবং সেই কাজটি হ'ল, মাঞ্চুরিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য এখনও যারা মাঞ্চুদের সঙ্গে লড়ছে—তাদের জন্য অস্ত্র প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একজন লামা সত্বরই পিকিনে আসবেন, যাঁর দর্শন পাওয়া সকলের হয়ে ওঠে না। তবে আমার বরাতে যাতে লামার দর্শন মিলে, তার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। লামা দর্শনে কৃতকার্য্যও হয়েছিলাম। আপাততঃ মিঃ ওয়াং বিদায় নিলেন।

পরদিন তিনজনে মিলে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নিলাম। আমার চোখে এমন কিছু পড়ল না যার কথা দেশবাসীকে উল্লাসের সঙ্গে বলতে পারি। অনেকে বার্লিন, লণ্ডনের মত নামজাদা শহরে যায়, বড় বড় ইমারতের কথা লেখে, কিন্তু আমার সেদিকে নজর আদপেই যায় না এবং ইমারতগুলিকে দেখলেই মনে হয়, এ সব যেন কোন অপব্যয়ী বিলাসীর খোশ-খেয়ালের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। এই শহরে একটী শিখ-মন্দির আছে, সেখানে ভারতীয়দের থাকতে দেওয়া হয়, কিন্তু ধূমপান করতে দেওয়া হয় না। ফিরবার পথে চীনা দোকানীর সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানলাম, লেপাফায় পঁচিশটি ডলার ছিল। দুঃখ হ'ল না মোটেই। স্রোতের জলের মত কত আসছে, আবার ভাটার টানে চলে যাচ্ছে, তার জন্য আর চিন্তা করে লাভ কি?

টিয়েনসিন শহরবাসীদের আচার-ব্যবহার দেখে কেউ মনে করবে না— চীনের মাথা কাটতে উদ্যত হয়েছে জাপানী। পূর্ব্বেই বলেছি, চীনের ধনিক সম্প্রদায় চায় দিনেকের তরেও স্বস্তির নিশ্বাস। এদের টাকা আছে বলেই এরা এত ভয় পেয়েছে, কিন্তু চীনের অন্তরের স্পন্দন অন্য রূপ। কাজের সাড়া পড়ে গেছে। সমাজ-সংস্কার, লেখা-পড়ার বিস্তার, যতদূর সম্ভব উত্তর-চীনের পথঘাট বন্ধ করা, দলাদলি ভুলে যাওয়া, বৃথা ফিলসফি নিয়ে চর্চ্চা আর শব্দ মাহাত্ম্য নিয়ে বিচারে সময় নষ্ট না করা, শুধু কাজ আর কাজ। কাজের তোড়জোড় অনুভব করে মনে মনে খতিয়ে দেখলাম আমার টিয়েনসিন সম্বন্ধে আর কিছু কৌতূহল নাই, শুধু যে পঁচিশটি ডলার চলে গেছে, তা যদি মিলে যায় তবে তাই নিয়ে চলে যাওয়া। ভারতীয় ভাইদের সঙ্গে মিশলাম। ওদের ব্যবসাবুদ্ধি দেখে বেশী কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। কারণ এরা জানে শুধু অর্থ উপার্জ্জনের সন্ধান এবং অর্থকে নিজের জন্য পুঞ্জীকৃত করে রাখা। এদের আরাম-বিলাসের রকম অনেকটা কলকাতার বড়লোকদের মতই, কিন্তু এদের সাহসের দৌড় দেখলে লজ্জা হয়। জাপানীরা যখন মুকদেন রেল লাইন দখল করে, তখন এখানকারই এক ভদ্রলোক, হত্যার বহর দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তারপর কেউ তাঁকে একফোঁটা জলও দিল না, ভদ্রলোক গলা শুকিয়ে মারা গেলেন। যাদের প্রচুর অর্থ আছে, কষ্ট কাকে বলে জীবনে জান্‌তে পারে নাই, তারাই ভয়ে ভীত হয়ে গলা শুকিয়ে মরে। এই নিয়মটি শুধু ভারতীয় হিন্দু ব্যবসায়ী অথবা ইহুদী ব্যবসায়ীদের উপর আরোপ করতে পারা যায় বটে, কিন্তু অন্যের উপর নয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এ ভাবে গলা শুকিয়ে মরে না, কিম্বা পিপীলিকার পরিতোষের জন্য চিনিও ছড়ায় না পথে পথে গর্ত্ত খুঁজে। এই সব কারণেই এত দূর দেশে গিয়েও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমার মনের মিল হ'ত না।

জার্ম্মান ও সাদা রাশিয়ান যুবক দুটি তাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে গেছে, আমি হোটেলে ফিরে এসে দেখি মিঃ ওয়াং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ইঙ্গিত করা মাত্রই আমি তাঁর রিকসায় বসলাম। রিকসা এবার চলল চীনা পুলিশ ষ্টেশনের দিকে। পথে মিঃ ওয়াং বললেন, যদি পুলিশে জিজ্ঞাসা করে, লেপাফায় কত ডলার ছিল, তবে যেন মিথ্যা কথা না বলি। মিঃ ওয়াঙের

ধারণা ভারতবাসীরাও পয়সার লোভে মিথ্যা কথা বলে, নরহত্যা করে, কিন্তু তিনি জানতেন না ভারতে এমন লোকও আছেন, যাঁরা সারা তুনিয়ার সকল ধনরত্নের বিনিময়েও মিথ্যা কথা বলেন না। যাহোক যখন তুজনায় মিলে পুলিশ ষ্টেশনে গেলাম, আমাকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা হারিয়েছেন? আমি বললাম, পঁচিশ ডলার। তিনি আমার কথায় আনন্দিত হলেন এবং লেপাফাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, একখানা রসিদ দিন। আমিও তৎক্ষণাৎ রসিদ লিখে দিলাম এবং রিকস্বায় চড়ে পুনরায় হোটেলে ফিরলাম। এবার মিঃ ওয়াং বললেন, রাতে আবার তিনি আসবেন এবং আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

বিজলী বাতি প্রজ্জলিত হয়ে নগরীর রঙীন শোভার চটক আরও বৃদ্ধি করেছিল। দিনের বেলায় যে পথে ধূলিকণার ভয়ে লোক চলত না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে জলসিঞ্চনে সে-পথই বড় আরামের হয়েছে। বিপণিগুলি সারাদিনের অলসতার পর যেন অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁয় অবাধ খানাপিনা আর উচ্ছল আনন্দের লহর। আমি ভদ্রবেশী মিঃ ওয়াঙের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে জনাকীর্ণ একটা খাবারের দোকানে প্রবেশ করেই চীনা খাদ্যের আদেশ দিলাম। আমাদের খাওয়া হয়েছে; এবার একটা কিছু কাজ সারতে হবে নিশ্চয়, মিঃ ওয়াং নিরর্থক আমায় নিয়ে আসেন নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় আছি। ইঙ্গিত এল। মিঃ ওয়াং আমাকে নিয়ে একটা ছোট পথে এসে বললেন, চোর ধরা পড়েছে, তাকে শাস্তি দিতে হবে, তাই এখন আপনাকে নিয়ে চলেছি। আমার কিন্তু এ কথাটা ভাল লাগল না। কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানি, এদের হাতে চোরের চরম সাজাই হবে। আমি সামান্য পথিক, এত হত্যা দেখা আমার পেশা নয়। তবে মিঃ ওয়াং হয় তো ভাববেন আমি ভীরু কাপুরুষ, তাই তাঁর সঙ্গে চল্লাম।

পথেরই পাশে একটা ছোট দ্বিতল বাড়ী। কড়া নাড়তে হয় নাই। নীচতলায় বসে ক'জন লোক মাজাং খেলছিল। আমাদের দেখবামাত্র একজন লোক উঠে এসে আমাদের উপরে নিয়ে চলল। উপরতলায় ক'খানা ঘর। তারই একটিতে—একটি নয়, তুটি যুবক মুখ-বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। আমরা

ঘরে প্রবেশ করবামাত্র ভিতর হতে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। যে পুলিশ অফিসার আমাকে পঁচিশটি ডলার দিয়েছিলেন, তিনি একটু পরেই এসে হাজির হলেন। যুবক দুটির মুখ খুলে দেওয়া হ'ল। একটিকে আমি চিনলাম, সে ইব্রাহিমের বাড়ীতে আমায় 'কমরেড' সম্বোধনে আপ্যায়িত করে বড় বড় বুলি কপ্‌চেছিল। তাকে দেখেই শ্লেষের সঙ্গে বললাম "তুমি না··কমিউনিষ্ট ?" সে কথা বলল না। মিঃ ওয়াং বললেন, এরা দুজনায় মিলে আপনার পকেট হতে লেপাফা সরিয়েছিল, টাকা খরচ করেছে, লেপাফা পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে ইব্রাহিমের বাড়ী আপনার দেখা হয়। সে আপনার কাছে কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দেয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে কমিউনিষ্ট নাই, কোন কালে হবেও না, তবে এ সব বেশধারী কমিউনিষ্টদের দৌরাত্ম্য আর সহ্য হয় না। আপনার চোখের সমুখে এদের শাস্তি দেওয়া হবে না, আপনাকে আনা হয়েছিল শুধু এই লোকটাকে দেখবার জন্য— এদের দলের স্বরূপ চিনে রাখবার জন্য।

চিনবার অবশ্য দরকার ছিল না, ইব্রাহিমের বাড়ীতে জাপানী যুবকের বোলচালই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। সে কথা আর বললাম না, আমি চলে এলাম। আমার মনে একটুও দুঃখ হ'ল না এই কৃত্রিম কমিউনিষ্ট দুটির জন্য। যারা পরের পয়সা খেয়ে চীনাদের সর্ব্বনাশের কারণ হয় তাদের চীনারা শাস্তি দিবেই। হোটেলে ফিরে দরজা বন্ধ 'করে ভাবতে লাগলাম—এই তো চীনদেশ। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। কতকক্ষণ অবধি মাথা ব্যথা করল, তারপর ডায়েরী লিখতে লাগলাম! পরের দিনটা কাটিয়ে তিনজনায় মিলে আবার বেরিয়ে পড়লাম পিকিন উদ্দেশ করে।

চীনের প্রাচীর

সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই রওনা হলাম। এদের যে দুখানা সাইকেল তা জার্ম্মান দেশ হতে এসেছে, আমার সাইকেলের অনেক অংশ জাপানী, কিন্তু ফ্রি-হুইলটা ব্রিটিশ্। এদের সঙ্গে একটু রেস করা গেল, এদের শরীরে শক্তি বেশী থাকা সত্বেও হারতে বাধ্য হ'ল, কারণ আমার ফ্রি-হুইল ভাল থাকায়

গতি বেশ ক্ষিপ্র করতে পেরেছিলাম। ওদের তা ছিল না, তারপর পথের উপর মিহি বালি, আবার ওদের সাইকেলের পেছনে বোঝা নাই, কেবলই পিছলে যাচ্ছিল, আমি তা হতেও মুক্ত ছিলাম। কালোর কাছে সাদার যখন পরাজয় হ'ল, তখন তারিফের সুরেই ওরা আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলল।

পৃথিবী ভ্রমণ—তা আবার সাইকেলে—সে যে কি কঠোর ব্যাপার, যাঁ'রা এই কঠিন কাজটি করেন তাঁরাই বোঝেন, অন্যের পক্ষে অনুভব করা বড় শক্ত। উত্তরদিক হতে—মঙ্গোলিয়ার মরুপ্রান্তর হতে ঝড়ো হাওয়া ধূলিকণা বয়ে এনেছে, চীনাদের অতি পরিশ্রমের জমিগুলি ভর্ত্তি করে ফেলেছে। কৃষক প্রাতে উঠেই বালি সরিয়ে দিয়ে তার সাজানো বাগান মুক্ত করছে। প্রকৃতির সঙ্গে চীনাদের এই দুরন্ত সংগ্রাম দেখলে মনে হয়, এরাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। চাষী হ'ল জাতির মেরুদণ্ড, ওদের কর্ম্মক্ষমতা দেখেই অনুমান করা শক্ত নয়—জাতির গোড়ায় কত শক্তি আছে। সাদা রাশিয়ান ছেলেটি ক্রমাগত চীনাদের নিন্দা করছিল, তাও আবার অশ্লীল ইংরেজীতে। অনেকক্ষণ সহ্য করেছিলাম, পরে বললাম, "ভায়া, প্রাণ ভরে গালি তো দিচ্ছ, কিন্তু যদি এই চীনারাই তোমার মাথার উপর থেকে আশ্রয়ের কল্যাণ-হস্তটুকু গুটিয়ে নেয়—তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তবে দাঁড়াবে কোথা ?" জার্ম্মান ছেলেটির পাসপোর্ট ছিল, সে চীনাদের বিপক্ষে একটা কথাও বলে নাই। গালি দেওয়ার সূত্রপাত হয়েছিল মঙ্গোলিয়ার ধূলা নিয়েই। কারণ হাওয়ার তোড়ে তা আমাদের মুখেচোখে সূচের মত বিঁধছিল। সবাই যখন চুপ করল, তখন আমি আরামে প্রকৃতির নগ্ন খেয়ালী মূর্ত্তি দেখতে লাগলাম। কোন গ্রামের পাশে যাই গিয়েছি, অমনি চা চেয়ে খেয়েছি। গ্রামের লোক আমাকে আগ্রহ করে চা দিয়েছে, কারণ এবার আমার দোভাষী সঙ্গে আছে। অনেকে আবার হাত দিয়ে কি করে খায় তা দেখবার জন্য ভাত তরকারী হাজির করত, খেয়ে দেখিয়ে দিতাম হাতের সাহায্যে খাওয়া আদপেই অসুবিধাজনক নয়। আমাদের দেশে অনেকে বলেন, "যখন চীনারা খায়, তখন যেন একটা স্রোত চলে।" হাসি পায় একের সম্বন্ধে অন্যের অজ্ঞতা দেখে। যতই এগিয়ে চলেছি ততই ভাবছি আমার মাঝেও নতুনত্ব কিছু এসেছে।

আমাদের ধারণা ছিল, এক দিনেই পিকিন যাব, কিন্তু উল্টা বাতাস থাকায় তা আর ঘটে উঠল না। দুপুর বেলাটা একটা গ্রামে বিশ্রাম করতে হ'ল।

চীনের প্রাচীরের নাম কে না শুনেছে? এই গ্রামে কিন্তু সে প্রাচীর নাই। এলোমেলো কতকগুলি বাড়ী। তারই একটা বাড়ীতে গ্রাম্য হোটেল। চীনা খাবার তাতে বিক্রি হয়। ইংলিশ সিগারেট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। তিনটা "বেড" ভাড়া করা হ'ল, প্রত্যেকটির জন্য ত্রিশ পয়সা। গ্রামে দুধ পাওয়া যায়, কারণ কয়েক ঘর মুসলমানও তথায় বাস করে। আমরা দুধ কিনলাম, কিন্তু চিনি পাওয়া গেল না। খাবারের অর্ডার দেওয়া হ'ল, পরিষ্কার করে আমাদের পরিবেশন করা হ'ল। সঙ্গী দোভাষী বুঝিয়ে দিল আমি জাপানী নই, হিন্দু, দেশভ্রমণে বের হয়েছি। আমার পরিচয় পেয়ে ওদের খুব আনন্দ হ'ল। অনেকে জিজ্ঞাসা করল, "মরলে পরে তাদের কি অবস্থা হবে?" ভারতের লোক না কি বলতে পারে মৃত্যুর পর লোকের কি পরিণাম হয়। আমি ভাবছিলাম, "মরলে পরে অমর হব, পাব স্বর্গ অনুপম"— ছোট বেলায় একটা গান শুনেছিলাম, সে গানের শেষের পঙক্তি ছিল এই। মরণের পর কি হয়, সে সংবাদ অনেকেই চায়, কিন্তু আমার মতে চীনের লোকের সে সংবাদ নেবার সময় আজও হয় নাই। যখন দরকার হবে খুঁজে বের করতে পারবেই। যাদের এ জীবনেই থাকবার ঘর নাই, পেটে অন্ন নাই, পরপারের সংবাদ নেবার তাদের কোন অধিকার নাই, যদি তবু নিতে চায় তবে তা হবে পরম বাতুলতা মাত্র। এদের এই সংবাদ নেবার কারণ খুঁজতে লাগলাম, অনেক চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের গ্রামে কি তবে নানা রকম ধর্ম্মের লোক আছে?" যা ধারণা করেছিলাম তাই ঠিক, এখানে যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ—এই তিনজনেরই চেলা আছে। সেজন্য পরপারের সংবাদ, কার গাড়ী কত শীঘ্র স্বর্গে পৌঁছবে তাই নিয়ে তর্ক হয়। এদিকে জাপানী যে ঘাড়ের উপর পড়-পড় হয়েছে, এ বিপদও তাদের ভুলতে হয়েছে আমার মত পাপীকে দেখে। ওদের সঙ্গে আর কথা বলা প্রয়োজন মনে করলাম না।

রাতভোরের আর অপেক্ষা না করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। তখন রাত্রি চারটের কাছাকাছি। অন্ধকার কাটে নাই। একটু দূরে গিয়েই

দেখি একটা লোক টেলিগ্রাফের তার কাটছে। দৃশ্যটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। আমার ইচ্ছা ছিল লোকটাকে ধরে ফেলি; জার্ম্মান যুবক বাধা দিয়ে বলল, এটা আপনার দেশ নয়, আমরা পাবলিক সার্ভিস ভাল করে বুঝি, এদেশে বিপ্লব চলেছে কোন্ দলের লোক কোন্ উদ্দেশ্যে কাজটি করছে তা আমাদের জানা নাই। হয় মাঞ্চুকোর গুপ্তচর, নয় বিপ্লবী। আপনি যাবেন মাঞ্চুরিয়াতে, যদি লোকটি মাঞ্চুকোর তরফের হয় তবে আপনার বিপদ হবেই, বিপ্লবী যদি হয় তবেও খারাপ। এ যে হক্ কথা—তাতে আমারও সন্দেহ ছিল না। এ অবস্থায় নির্ব্বাকে পথ চলা ছাড়া আর উপায় কি! এতবড় অন্যায় কাজটা দেখেও হজম করতে হ'ল। যখনই কোন অন্যায় কাজ দেখি এবং তার প্রতিকারে বাধা পাই, তখনই আমার মন বিগড়ে যায়। জার্ম্মান যুবক আমার মুখের অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়েছিল। সে বলেছিল, যে দেশের রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা নাই সে দেশে শান্তি আনার জন্য দেশবাসী নানা পথ খোঁজে, সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক। যারা কিছুতেই লিপ্ত নয় তাদের চুপ করে থাকাই কর্ত্তব্য। সে সব কাজে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাওয়া অসঙ্গত।

সূর্য্যের প্রখর কিরণ মাঠের উপর পড়েছিল। মাঠে ছিল সাদা বালি, তার উপর আলো পড়ে ঝক্ মক্ করছিল, আর সে জেল্লা ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল আমাদের চোখ। কিন্তু আমরা আজ পিকিনে পৌঁছব। বালি আর রৌদ্র-তেজ আমাদের চোখকে নিষ্প্রভ করে ফেল্লেও মনটাকে দাবিয়ে রাখতে পারে নাই—এত বিরোধী আবেষ্টনী সত্ত্বেও প্রাণের ভিতর পুলক-মায়া—কখন পিকিন পৌঁছব। দেখতে দেখতে আমাদের অপ্রখর দৃষ্টির সমুখেও দূর-দিগন্তে একটা ধূসর রঙের সীমা-রেখা ফুটে উঠল। ক্রমে রেখাটি নানা আকারের স্পষ্টতর ছায়া নিয়ে রূপায়িত হলে সেটাই যে চীনের অতীতের রাজধানী তা বুঝতে বাকী রইল না। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা শহরের নিকটতর হতে লাগলাম। পথিক চলেছে শহরে। ক্রমশঃ পথিকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এক পথ ছিল, শাখা-প্রশাখা নিয়ে বহু পথরেখা অদূরে ভেসে উঠল। সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি নগরে প্রবেশ করতে চায়। আমি তাদের বললাম, পিকিন আমি দখল করতে যাচ্ছি না, চলেছি দেখতে। বাইরে থেকেই একবার

শহরটার বহির্দৃশ্য দেখে নেই, বুঝে নেই পিকিনের অতীতের গরিমা। যুবক দুটি আমার সঙ্গ ছাড়ল। কে আমার মত খাম-খেয়ালী লোকের সঙ্গী হতে চায়? এতক্ষণ যে ছিল তাই যথেষ্ট। একটা বালির ঢিবির উপর বসে সমগ্র পিকিনের উপর নজর বুলাতে লাগলাম।

সঙ্গী দু'জন দ্রুত সাইকেল চালিয়ে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করল। কারণ তাদের মাতাপিতা তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার জন্য কে অপেক্ষায় আছে? কেউ নয়। আমার আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে মনের মানুষ, তাদের সহানুভূতি অর্জ্জন করতে হবে, তারপর একদিন তাও আবার পরিহার করে যে পথের মায়া আমায় আকর্ষণ করছে সেই পথেই গিয়ে দাঁড়াব। আমার একজন আত্মীয় আছেন। তাঁর নাম সাংহাই নগরীতে শুনেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করব কি? তিনি সরকার-দ্রোহী বলে পরিচিত। বিদেশে যে কোন ভারতবাসীকে পেয়েছি, তাকেই আপন ভাই বলে গ্রহণ করেছি, অতএব তিনি আমার আপনজন, কিন্তু ইনি সরকারদ্রোহী। দেখা যাক কি করতে হবে। ভাবলে শুধু ভাবতেই হয়, কাজ হয় না। আমিও বসে আছি, এগিয়ে চলছি না। আমারই সমুখ দিয়ে জনস্রোত এগিয়ে চলেছে—কেউ সওদা কিন্‌তে, কেউ বিক্রয় করতে। গাধা, ঘোড়া, অশ্বতর, লরী, মোটর, রিক্সা সারবন্দী হয়ে ছুটেছে নগরীর দিকে। মোঙ্গল, তাতার, চীনা, কোরাই, জাপ্‌নুন—সবাই চলেছে আপন মনে আপন কাজে। তাদেরই ধাঁজ-ধরণ, তাদের গতি-চাঞ্চল্য আমি এই বালির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে দেখছি। বেশীক্ষণ বসে থাকতে হ'ল না, পিকিনের মোহ আমাকে টেনে তুলল। উঠে দাঁড়ালাম, সাইকেলে চড়লাম। একটু দূরে যেতেই রাস্তার পাশে একটা বাগান পড়ল। অনেকগুলি সর্ব্বহারা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র হতে রক্ষা পাবার জন্য, বাগানে গাছের ছায়ায় নগ্ন বালির উপর দেহ বিস্তার করে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তাদেরই কাছে বসে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম তাদের অবস্থা।

পা-জামা ছিঁড়ে গেছে, তাতে গ্রন্থি পড়েছে, গ্রন্থিও ছিঁড়েছে, তারপর আর গ্রন্থি দিবার যো নাই। কোট এবং জুতারও সেই একই দশা। কারো পঞ্জরের হাড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে, বুকটা ধুক ধুক করছে, গভীর নিশ্বাস

বইছে—হয়তো একটা পয়সা রোজগার করতে যে বিষম খাটুনি তারই তাড়নায়। শুধু প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া নয়, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকাও রয়েছে। যুবক-যুবতীদের অবস্থাও অনেকটা তেমনি, তবু তাদের মুখে এখনও লাবণ্য আছে। বয়স এখনও আছে, তাই প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুগ্রহে চিনতে পারা যায় আজও যে এরা যুবক-যুবতী। ভাগ্য ওদের খারাপ, হয়তো পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফলে ওরা খেতে পায় না, প্রকৃতি তবে কেন ওদের মুখে এ লাবণ্যটুকু ঢেলে দিল? সর্ব্বহারাদের অভিশপ্ত জীবনের অশ্রুজল কি দেশব্রতীদের চোখে পড়ে না? একদিকে অতীতের নিদর্শন চীনের প্রাচীর, অন্যদিকে ছায়ানিবিড় উদ্যানে বিংশশতাব্দীর এই দীন-দরিদ্রের মেলা। চক্ষু কিন্তু চিরপ্রসিদ্ধ মৃত-প্রাচীরের চেয়ে জীবন্মৃতের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখাল বেশী। তাকিয়ে রইলাম ওদের মুখের পানে। নগরের ভিতরে গিয়ে হোটেলের আরামে নিজেকে সমর্পণ করতে মন আর সরে না। কতকগুলি ইউরোপীয়ান ফৌজ বাগানটার পাশ দিয়ে মার্চ্চ করে যাচ্ছিল, তাদের বুটের শব্দ শুনে অনেকেরই ঘুম ভাঙল। দৃশ্যটি দেখেই অনেকে আবার লুটিয়ে দিল তাদের শরীর ধূলার মাঝে, যেন আর উঠতে পারছে না। মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এরা একদিন মানুষই ছিল, আজ নিষ্ঠুর মানুষের অত্যাচারে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এদের অভিযান—তাই দেখব, কি নগরীতে যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সর্ব্বহারাদের মূর্ত্তি আজ আর মানুষ বলে পরিচয় দিবার মত নাই। এমনটিই হয়। শান্তির সময়ের দশ বৎসরেও যে পরিবর্ত্তন আন্‌তে না পারে, অশান্তির সময়ের একটি দিনও তার চেয়ে বেশী দাগ কেটে বসে যায়। তেমন এক একটি দিনে বিশ বৎসরের কুহক লুকান থাকে, তাই বিশ বৎসরের প্রাণ-রসকে এক চুমুকে শুষে নেয়। এ সর্ব্বহারার দল তেমন কুহক-ঢাকা দিন পার করেছে হয় তো কত শত! এদের সঙ্গে তুলনা করা চলে শুধু তিন হাজার বছরেরও বেশী পুরাতন ঐ চীনের প্রাচীরের, আর তার চেয়েও চওড়া যে প্রাচীর পিকিন শহরকে ঘিরে আছে, তার। সে কথা পরে বল্‌ব। এখন পিকিন্ হতে ভেসে আসা মোহ-বাষ্প আমায় যেন কেমন অবচেতন আবেশে বিভোর করেছে।

আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এল। বলাকার সারি চোখে পড়ল না, শুধু ধূলা—আকাশে-বাতাসে শুধু ঘোলাটে ধূলা। তারপর অন্ধকার বাড়ল। ক্রমে অন্ধকার গভীর হ'ল, তারপর আকাশের এক প্রান্তে বিজলী চমকে উঠল। গরীবের দল যথাশক্তি চেষ্টা করে আপন আপন শরীরকে ধূলামুক্ত করে শহরের বিরাট তোরণতলে আশ্রয় নিতে রওনা হ'ল। আমি তাদের দীন দশা দেখতে দেখতে পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তাদের মধ্যে যারা পারল না উঠতে, তারা ঐ বালির উপরই শুয়ে রইল। কেউ তাদের উঠিয়ে দিলেও সুফল হত না কিছু, শরীরে তাদের এমন শক্তি নাই যে, নগরীর গেটের কাছে যেতে পারে কিম্বা নগরীর মাঝে এসে কোথাও স্থান খুঁজে নিতে পারে। এই সব গরীব-দুঃখীকে পুরোভাগে রেখে ভিজতে ভিজতে শহরের তোরণ-দ্বারে এসে বর্ষণ থেকে মাথা বাঁচালাম। প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে তোরণ-দ্বারের এক পাশে। আমাকে দেখল, কিছু বলল না। তোরণ দ্বারের আশ্রয়ে বুভুক্ষুদের সঙ্গে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আশা, বৃষ্টি বন্ধ হলে নগরীতে প্রবেশ করব।

মহানগরী পিকিন

লিখ্‌তে হাত কাঁপে, ভাবতে মনে ভয় আসে, দেখ্‌লে চোখ বুজে আসতে চায়। কারণ মুসলমানের কাছে যেমন মক্কা, হিন্দুর কাছে যেমন কাশীধাম, বৌদ্ধের কাছে যেমন বুদ্ধগয়া, আমার কাছেও তেমনই এই পিকিন মহানগরী একটা মহাতীর্থ বলে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এখানে এসে চোখে দেখলাম, কানে শুনলাম—মহাচীনের মহানগরী পিকিনে বিশ্বের জ্ঞানীদের আনন্দ মেলা। এখানে এসে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাষ্ট্রনীতি ভুলে গিয়ে আনন্দে মত্ত। পাঁচটি পয়সা তাঁর দৈনিক খরচ। নগ্ন, রুগ্ন, কঙ্কালসার তেরজন বিবাগী বৌদ্ধ এখানে এসে স্বর্ণমুকুট পরলেন, সিল্কের গৈরিক বস্ত্রে অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করলেন আর উৎফুল্ল হলেন মহাজ্ঞানে মত্ত হয়ে। এখানে স্বল্পবুদ্ধিও কুটনীতিক রাজনীতির চালবাজীর অধিকারী হয়। এমন স্থান-মাহাত্ম্য যে মহানগরীর, তার কথা বল্‌তে দেহ-মনে শিহরণ খেল্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য কি। শুধু কি জ্ঞানী-গুণীরই সমারোহ এখানে? তা নয়। ধনীর দলও এখানে এসে মুক্তহস্তে টাকা খরচ করে। আর একটু পূর্ব্বেই বলেছি, বুভুক্ষুর দল হাঁটতে পারে না, পায়ে শক্তি নাই বলে; পথে চলতে পারে না, পরণে বস্ত্র নাই বলে; কথা বলতে পারে না, ভাষা নাই বলে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপী, জ্ঞানী—সব কিছুকে স্নেহের কোলে স্থান দিতে পিকিন যেন বাহু বাড়িয়ে আছে।

আকাশ পরিষ্কার হ'ল। আমি গেট পার হয়ে হাটামন ষ্ট্রীটে এলাম। থাকবার স্থানের সন্ধান পেলাম না। হিন্দু দোকানীর খোঁজে মরিসন ষ্ট্রীটে গেলাম। একটি স্বল্পবয়স্ক সিন্ধী যুবক আমার সাহায্যার্থে হোটেলের খোঁজে বের হ'ল।

একটা বড় তেতলা বাড়ী। মালিক উপরতলার ঘরগুলির ভাড়া বলতে লাগলেন। কোনটার ভাড়া দৈনিক তিন ডলার, কোনটার ভাড়া আড়াই ডলার, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তা নেওয়া কি করে সম্ভব হবে? তারপর

মাটির নীচে একটা ঘর দেখালেন, ভাড়া তার দেড় ডলার। তাতেই রাজি হতাম, কিন্তু মনে হ'ল এই ঘরে যদি তিনটা লোক হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে তবে আমার শত চীৎকারও আকাশে-বাতাসে পৌঁছাবে না। পথে থাকা ভাল তবুও এরূপ ঘরে থাকা ভাল নয়। তাই বাড়ীওয়ালাকে হতাশ করে সেখান হ'তে যখন বেরিয়ে এলাম তখন মনে হ'ল যেন মুক্ত হয়েছি অন্ধ-কারা হ'তে। বেরিয়ে পড়লাম পথে। মিঃ ওয়াং এখানে একজন বাদ্য-যন্ত্রবাহীরূপে দেখা দিলেন। টমাস কুকের বাড়ীর কাছে আমারই অপেক্ষায় ছিলেন। দেখা হওয়ামাত্র চীনা ভাষায় বললেন, হুজুর যদি ভাল হোটেল চান তবে নিয়ে যেতে পারি। সঙ্গী হিন্দু ভায়াটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, হয়তো লোকটা বদমাস হবে, ওকে বিশ্বাস করবেন না। তাকে বললাম, নিয়ে চলুক না, দু-দুটি লোককে ফস্ করে সাবাড় করতে পারবে না। মিঃ ওয়াঙের নির্দ্দেশ মত চলে আবার হাটামন ষ্ট্রীটে এলাম। তিনিই বলে কয়ে একটা সাদা রাশিয়ান হোটেলে স্থান করে দিলেন। ঘরখানির মাসিক ভাড়া কুড়ি ডলার। তার মেঝেয় গালচে পাতা ছিল, গরম এবং ঠাণ্ডা জল কলে সব সময়ই পাওয়া যায়। এরূপ ঘরের ভাড়া লণ্ডনে সপ্তাহে একুশ শিলিং-এর কম না, ক'লকাতায় কম্‌সে কম পাঁচ টাকা। এর বেশী আর বলে দরকার নাই। ঘর ঠিক হ'ল, মিঃ ওয়াংকে পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল একটি হিন্দু পরিবার, যারা আমার আহার-ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে কৃতার্থ হলেন। এখন আমি আর নিরাশ্রয় নই। চিন্তা করতে পারব ইচ্ছামত, দেখতে পারব যেদিকে চোখ যায়। সবাইকে বিদায় করে দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

হাটামন ষ্ট্রীটের দু'দিকে লোক সারি দিয়ে চলেছে। আমিও সে জনস্রোতে মিশে গেলাম। সাধারণ লোক পায়ে হেঁটে চলেছে সত্য, কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালীতে তেমন শক্তি নাই, যাতে করে আর কোথাও না হলেও নেহাৎ পথের বুকেও সে শক্তির ছাপ এঁকে দিতে পারে। চল্‌তে হচ্ছে তাই নাচার হয়ে চল্‌ছে বলেই মনে হ'ল। সাংহাই-কোয়ানের উত্তর দিকে জাপানী এসে হানা দিয়েছে। পিকিন নগরীর লোকজনেরও আর শান্তি নাই, শান্তি না থাকার নানা কারণ বিদ্যমান। প্রথম কারণ হ'ল যখনই জাপানীরা বল্‌ছে,

"এটা ঘটেছে এর জন্য, একে শাস্তি দিতে হবে।" তখনই সে অভিযুক্তের শাস্তি হবে, সাধারণ লোক জান্‌তেও পারবে না সত্যি কি ঘটেছে। জাপানের আদেশ, শাস্তি কাউকে পেতেই হবে। আবার সে শাস্তি যেমন তেমন নয়, একেবারে মৃত্যুদণ্ড। চীন সরকারকে সেই শাস্তি ভোগ করবার জন্য কাউকে দাঁড় করাতেই হবে, নতুবা পিকিন নগরী নিয়েই টানাটানি। কাজেই সাজা দিবার জন্য কয়েকটা লোক চাই। কোথায় পাওয়া যাবে তাদের? তার জন্য চিন্তা কি! পরণে মলিন বসন, পেটে অন্ন নাই, শীতে কম্পমান ঐ তো রয়েছে সর্ব্বহারার দল পথের ধূলায় বুক পেতে। ব্যস্, সাজা হয়ে গেল, জাপানীও তখনকার মত ঠাণ্ডা হ'ল। এজন্য গরীবের দল আর শহরে আসে না, বাইরে বাইরে থাকতেই চেষ্টা করে। কিন্তু গরজ বড় বালাই, পেটের আগুন ক্ষণিকের তরে নিবাতে হলেও শহরে আসতে হয়। একবার বিষয়টা ভাল করে ভাবলে মাথা ঠিক রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তার উপর আবার রয়েছেন জেনারেল চ্যাং স্বয়ে লিয়াং, তিনি শহর হতে বের হন না। তাঁর যেমন গোপন সন্ধানী লোকজন আছে, মাঞ্চুকোরও ঠিক তেমনি আছে। দু'দলে বেশ টানাহেঁচড়া চল্‌ছে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের লোকও দেখছে সামরিক তোড়জোড়ের ব্যবস্থা। এতেও যদি সমস্যা শেষ হ'ত তবুও লোকে শান্তি পেত, কিন্তু তার উপরও আবার নতুন বিপ্লবী দল আছে। তারা এ-তিনের কারো নয়। এই তো হ'ল পিকিনের সাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা। এতে পিকিনবাসীর শান্তি অটুট থাকে কি করে অথবা আজ যে অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ করছি, তার জেরই বা সহসা মিটে যায় কোন্ যাদুমন্ত্রে!

পায়ে হাঁটতে হাঁটতে লিগেশন পাড়ার দিকে এগিয়ে চল্‌লাম। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ। দু'দিকে ছোট ছোট বৃক্ষরাজি, ফরাসী ধরণে কাটা-ছাঁটা। পথে লোকজন বড় নাই। মাঝে মাঝে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের বাড়ী, তাও ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। জাপানী সৈনিক, আমেরিকান সৈনিক, মাঝে মাঝে তারা মুখোমুখীও হচ্ছে। এরা যেন একে অন্যের মুখ দেখতে চায় না। ইংরেজ সেনারা আপন আপন খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত, মুখ প্রফুল্ল; হাসি এবং সিগারেট ওদের মুখে লেগেই আছে। মাঝে মাঝে টহলদার রক্ষী নিজের লোককে খুঁজতে হন্ হন্ করে চলেছে। যে দু'একজন চীনা পথচারী দেখতে

পেয়েছিলাম তাদের মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় যেন, কি এক অজ্ঞাত ভয়ে বুকটা তাদের দুর দুর করছে। তবে মাঝে মাঝে ফরাসী টুপী পরা দু'একজন লোক পেয়েছিলাম, তাদের কিন্তু অন্য রকম ভাব। ওরা বেশ চুরুট টেনে ফুর্তির আমেজে পথ চলেছে। ওদের দেখলেই মনে হয়, বিকালের নাওয়া-ধোওয়া শেষ করে ফিট্‌ফাট পরিপাটী বেশে শ্যামবাজার হ'তে কলেজ স্কোয়ার-গামী ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে বসা—আমার জাতভাই "বাঙ্গালীবাবু।" অনেক দূরে এসেও দেশের কথা মনে হয়, উপমার স্থল পেলে আপনি জেগে ওঠে হৃদযন্ত্রে সেই দূরদূরান্তের কথা। সামনে একটা বুরুজ দেখলাম, তারই পাশে একটা ছোট ছেলে কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটু অগ্রসর হতেই ব্রিটিশ লিগেশনের দ্বারে এলাম। দরজা বন্ধ। স্থানটা চিনে রাখলাম, পরে একদিন আসতে হবে এখানে। তারপর ব্রিটিশ লিগেশন বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চল্‌লাম। একটু দূরে এসে একটা বড় বাগান পেলাম। একদিন ঐ উদ্যানের সৌন্দর্য্য ছিল, যে-কেউ যখন তখন এখানে বেড়াতে পারত না, আজ এখানে সিনেমার স্যুটিং করা হয়। স্থানটি দেখে বেশ আনন্দ হ'ল, একটু বসলাম। কিন্তু একাকী আমি। কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়ে ফিরে এলাম।

যে ঘরটা পেয়েছি তা বড়ই আরামদায়ক। ঘরে বসে আরাম করছিলাম। হোটেলের মালিক খাতা নিয়ে হাজির হলেন। তাঁকে আমার চৌদ্দপুরুষের পরিচয় দিতে হল। তিনি বললেন, আমাকে সাহায্য করবেন নানা মতে। কিন্তু কচি যুবক, তাতে ব্যবসাদার, তারপর লোকটি সাদা রাশিয়ান! মনে মনে হাসলাম, বিশ্বাস করলাম না। ঘরের কাছেই একজন গ্রীক থাকেন, বয়স তাঁর পঁয়ষট্টি, রোগে ভুগছেন। গ্রীক, আরমেনিয়ান, সাদা রাশিয়ান, পলাতক ফরাসী, পলাতক জার্ম্মান্, নানা জাতির এখানে সমাবেশ। যে যা বলে পরিচয় দিতে সুবিধা পাচ্ছে সে তাই দিচ্ছে। তাই এখানে পাসপোর্ট চুরি হয়, তাই বেকায়দায় পড়লে নামও চুরি হয়। এই গ্রীক ভদ্রলোকের উপর আমার কোনরূপ খারাপ ধারণা হ'ল না, তবে মনে হ'ল তিনি গ্রীক নন, সাদা রাশিয়ান, হয়তো বিশেষ কোন কারণে নিজেকে গ্রীক বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এই গ্রীক ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে চীনের নানা সংবাদ দিতে

লাগলেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বলে যেতে লাগলেন, এমন কি, রকফেলার যে পিকিনে একটি হাসপাতাল খুলেছেন তাও বাদ গেল না। আমার ভাববার কথা ছিল এখানকার হিন্দুদের নিয়ে—যাদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছি ওরা কিন্তু একদম নির্ব্বাক। তার কারণ বোধ হয়, ওদের শুধু কারবারেই মন। তবে মাঝে মাঝে ভজন-পূজনের ব্যবস্থাটা আছে, সে সংবাদ পেয়েছিলাম এবং রবিবারে যে ভজন হবে তাতে আমার নিমন্ত্রণও ছিল। সারাদিনের পরিশ্রম, অল্পেই নিদ্রা এল।

টাওয়ার

ভোরে উঠেই চীনের একখানা পোষ্ট্যাল ম্যাপ খুললাম, দেখলাম পথ আর নাই। যে দু'একটা ছোট ছোট পথের চিহ্ন আছে তা-ও একটার সঙ্গে অন্যটার কোন সম্বন্ধ নাই। তারপর রিলিফ ম্যাপ খুলে দেখলাম, পথ না থাকার নানা কারণ রয়েছে। পাহাড় তো আছেই তারপর মাঝে মাঝে ছোট খাট মরুভূমিও। অতএব আর সাইকেলে চলা সম্ভব হবে না। ম্যাপ দুটো রেখে দিয়ে চা তৈরী করছি এমন সময় একটি চীনা যুবক এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করলেন। পরিচয় দিলেন, তিনি সংবাদপত্রের রিপোর্টার, অনেক আধ্যাত্মিক দিকপালের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাঁর আছে, ইংরেজী বেশ জানেন এবং বর্ত্তমানে তিনি আইন পাঠ করছেন। আমার ভ্রমণের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিলেন। রাজনৈতিক সংবাদের তিনি বড় ধার ধারেন না, ভগবৎ তত্ত্ব নিয়েই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কথা প্রসঙ্গে রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, যদি দরকার মনে করি তবে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে তাঁর মনের যে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাও বুঝিয়ে দিতে পারবেন। যুবককে দেখেই মনে হয়েছিল তিনি একজন ব্রহ্মচারী এবং অনেক লোকের সন্ধান অবগত আছেন। আমার মন কিন্তু এ সবের মধ্যে নাই। আমার মন চাইছিল সর্ব্বপ্রথম পিকিন শহরটা ঘুরে ফিরে দেখতে; রাজবাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, আরো যে সব নতুন পুরানো স্মৃতিচিহ্ন আছে সেগুলা আগে দেখি। তারপর ও-সব লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা

হবে। যুবককে সাতদিন পরে এসে দেখা করতে বললাম, কারণ এই সাতদিন আমি শুধু শহরটিই দেখব। পিকিন তো আর ছোটখাট শহর নয় যে, একদিনেই সব দেখা হয়ে যাবে। যুবককে বিদায় দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সর্ব্বপ্রথম গেলাম কুক কোম্পানীর বাড়ীতে, সে অফিস্ হতে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির একটা তালিকা নিলাম। তারপর গেলাম জাপানী টুরিষ্ট ব্যুরোতে। ওঁরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বেশ একটা জাঁকালো ফিরিস্তি দিলেন। কিন্তু ও-সব দিলেই কি হবে? প্রত্যেক স্থানের সম্বন্ধেই ইংরেজীতে লেখা ইতিহাস আছে, কাজেই আমার ইচ্ছামত দর্শনীয় স্থান বেছে নিতে কোন অসুবিধাই নাই। তবে কোন্ পথে যেতে হবে, চীনা ভাষায় স্থানটির নাম কি—এ-সব তাঁরা ব'লে দেন নাই। তাই কাগজগুলি নিয়ে হোটেলে এলাম এবং হোটেলের একটি বয়কে ডেকে এনে প্রত্যেকটি স্থানের ইংরেজী নামের পরিবর্ত্তে চীনা নাম এবং শহরের কোন অংশে অবস্থিত, কোন্ পথে যেতে হবে তা লিখে দিতে বললাম। সে দশটি স্থানের নাম ও অবস্থিতি আমায় লিখে দিলে।

চীনা টাওয়ারের দিকে রওনা হলাম। অনুমানেই কিছু দূরে গিয়ে, পথের পুলিশকে টাওয়ার কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা না করে, সে কাগজখানায় লিখিত টাওয়ারের অবস্থিতি পড়তে দিলাম। পুলিশ একটু ভেবে-চিন্তে আমায় পথের সন্ধান জানিয়ে দিল। এই টাওয়ারে পৌছতে আমাকে অন্ততঃ সাতজন পথের পুলিশকে কাগজখানা দেখাতে হয়েছিল, তবে টাওয়ারে পৌছতে পেরেছিলাম। তবে কিনা পুলিশের আচরণ লক্ষ্য করাও আমার এক উদ্দেশ্য ছিল। তারা বীরের মত দাঁড়িয়ে পথের নির্দ্দেশ দিচ্ছিল। মুখমণ্ডল তাদের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, কর্ম্মতৎপর। সাগ্রহে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য করাই যেন তাদের কর্ত্তব্য। আমার ধারণা ছিল না, চীনদেশে পুলিশ-ব্যবস্থা এত সুন্দর কোথাও থাকতে পারে। বুঝলাম, জাপানের পুলিশকে অনুকরণ করেই যেন এই মহানগরীতে চীনা পুলিশবাহিনী গঠন করা হয়েছে।

টাওয়ারটি শহর হতে একটু দূরে বললেও দোষ হয় না। আমার কাছে ক্যামেরা ছিল না, যাতে করে তার ফটো তুলতে পারি, কিন্তু তারই পাদদেশে দাঁড়িয়ে একটা লোক টাওয়ারের ফটো বিক্রী করছিল। দশ সেণ্ট দিয়ে একখানা

ফটো কিনে নিলাম। টাওয়ারটির চারিদিকে ঘুরে দেখলাম। দেখলাম পাথর, ইট, সুরকী ইত্যাদি আর তার গায়ে অদৃশ্য অক্ষরে রয়েছে অতীতের কথা।

টাওয়ার দেখে ফিরছি, মনটা ছিল আমার ফাঁকা। ফাঁকা মনে একে একে ভাবনা আসছিল আর চলে যাচ্ছিল, দাগ তার পড়ছিল না। পথেরই পাশে একটী ছোট বাড়ী। দরজার সামনে দুটী ছোট্ট ছেলে খেলা করছে। আমি গিয়ে বসে পড়লাম তাদেরই পাশে। ছেলে দুটী খেলা বন্ধ করে হাত ধরাধরি করে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। বুঝলাম বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নাই, এরাই দুটি মাত্র প্রাণী। বসা দরকার মনে করলাম না, ভাবলাম ওদের কি কেউ নাই? হয় তো বাপ-মা দুজনেই নিয়মিত কাজে বেরিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, ওদের মা নাই, বাপ তাই ওদের অসহায় রেখেই কাজে যেতে বাধ্য হয়েছে। ঠিক করলাম অন্য দিন বিকালে এসে দেখে যাব—ঐ ছেলে দুটীর কে আছে। কিন্তু যখন অন্য একদিন সংবাদ নিতে গেলাম, দেখলাম ছেলে দুটী মেজের উপর পড়ে আছে। তাদের শরীর নেতিয়ে গেছে, অসুখে নয়, পেটের ক্ষুধায়। তাদের মা-বাপ ছিল, ঘরে দুপয়সা প্রত্যহ আসত, কিন্তু সব গিয়েছে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে। চীন সরকার ছেলে দুটীর মাতাপিতার শিরশ্ছেদ করেছেন কমিউনিষ্ট বলে, কিন্তু এই দুটীর কোন বন্দোবস্ত করা দরকার মনে করেন নাই। মিঃ ওয়াং এবং মিঃ তাং'কে বললাম, এ দুটীর কোন বন্দোবস্ত করতেই হবে; ভয়ে তাঁদের মুখ শুকিয়ে গেল। আমার আর সইল না, বলতে বাধ্য হ'লাম, ভগবান ভগবান, ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে মিঃ তাং তো খুব কাঁদতে পার, কিন্তু এখন কোথায় তোমার ভগবৎ-প্রীতি? কমিউনিষ্টের অবোধ শিশু-পুত্রও কি মানুষ নয়? সেও কি অস্পৃশ্য? একটা রিক্সা ঐ পথে দেখে ডাকলাম, তারপর দুটী ছেলেকে রিক্সায় তুলে একটা দোকান হতে সামান্য একটু ভাতের জল এনে ওদের মুখে দিতে লাগলাম। ছেলে দুটীর চেতনা হ'ল, অতি দুর্ব্বল থাকার জন্য কথা বলে নাই, বলতে দেইও নাই। হোটেলে এনে তাদের দুটীকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ওদের ঘুম ভাঙ্গল। আমি জানতাম চীনা ছেলে দুধ খায় না, তাই ভাতের ফেন, ভাত, মূলা সিদ্ধ এনে রেখে দিয়েছিলাম।

ওদের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তাদের পিতামাতাকে দেখতে পেল না, যেমনটি রোজ রোজ দেখে থাকে; তার বদলে দেখল আমাকে, একটি অপরিচিত বিদেশী মুখ, যাকে জীবনে একবার মাত্র নিমেষের তরে দেখেছিল। খাবারগুলি তাদের সামনে ধরে দিলাম। তারা পেট ভরে খেল, কিন্তু কোন্ ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলবে? আবার তাদের শুইয়ে দিলাম। তারা বুঝতে পেরেছিল এইটুকুমাত্র যে, তাদের মা-বাপ আর এ সংসারে নাই, কে বা কাহারা ধরে নিয়ে গেছে, আর ফিরে আসবে না। আপন বল্‌তে মাত্র তারা দুটী ভাই রয়েছে। হয়তো তাদের মা-বাপের চলে যাওয়ার পর হাঁড়ি খুঁজে যা পেয়েছিল তা খেয়ে, যখন কিছুই আর পায় নাই, তখন নিরুপায় হয়ে ঐ পৈতৃক ভিটায়ই শুকিয়ে মরতে বসেছিল, কারু কাছে খাবার চাইবে এ বুদ্ধি হবার মত বয়স তাদের হয় নাই। কোথাও দেখেছি পিপীলিকাকে চিনি খাইয়ে পুণ্য অর্জ্জন করা হয়; কিন্তু তাদের মন কাঁপে না এরূপ শিশু ছেলেকেও পৈতৃক বাড়ী হতে বঞ্চিত করতে। ছেলে দুটী আমার কাছে এল, আমাকে আঁকড়ে ধরল, কেমন করে যেন এঁচে নিয়েছে আমি তাদের আপন। একবার তাকাল আমার দিকে আকুতিভরা সিক্ত চোখে, তারপর আমার কোলেই শুয়ে পড়ল পরম নির্ভরতায়। রাত্রি প্রভাত হ'ল। তাদের সর্ব্বপ্রথম গরম জলে স্নান করালাম, তারপর সামান্য খেতে দিলাম, ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা তাদের কাপড় জামা জুতা কিনে দিলাম। মনে হ'ল যেন আমিই তাদের মাতা, আমিই তাদের পিতা, যুগ-যুগ ধরে যেন বিচ্ছিন্ন থেকে আজ এসে আমার কাছে স্নেহের দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কি পাগল-করা মায়া! বেশীক্ষণ তাদের ভার আর সইতে পারলাম না। মিঃ ওয়াং তাদের নিয়ে তাঁরই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে এলেন। সঙ্গে আমাকে যেতে হয়েছিল, কারণ আমাকে ছেড়ে ছেলে দুটি যেতে চায় নাই। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম। যখনই গিয়েছি আমার কাছে এসে বসত আর কাঁদত। আমি ভাবতাম, ধনের পরিণাম এই; যাদের ধন আছে তাদের হৃদয় নাই। যখনই ছেলে দুটীকে দেখতাম তখনই ভাবিত হয়ে পড়তাম। ইচ্ছা হ'ত সঞ্চিত টাকাগুলি পথে ছুড়ে ফেলে দেই, কিন্তু তা করতে পারতাম না। কারণ, বেঁচে থাকতে হলে অর্থের মর্য্যাদা মানতেই হবে, অর্থকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, নতুবা যে এ পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় না।

নিষিদ্ধ পুরী

পিকিন শহরটি তিনভাগে বিভক্ত, কিন্তু তারপরও আর একটি শহর আছে। সেখানে পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কারণ ওখানে সম্রাট থাকতেন। সেকালে ইউরোপীয়ানরা এটিকে Forbidden city বল্‌ত। পরদিন ঐ শহরটি দেখতে গেলাম। দেখার মত অনেক জিনিষ সেখানে আছে। সর্ব্বপ্রথম বলতে হবে তার আয়তন। আগ্রা দুর্গ এবং দিল্লীতে মোগল সম্রাটের বাড়ী দেখেছি। যখন ওঁদের দুর্গের সঙ্গে পিকিনের সম্রাট-প্রাসাদের তুলনা করি, তখন মনে হয়, মোগলগণ যদিও ভারতে এসে বড় বড় ইমারত করেছিলেন, তথাপি চীনের সম্রাটের বাড়ীর কাছে তা সামান্য কুঁড়েঘর মাত্র।

লোকে ভাবে, যা বলা হয়েছে, যা করা হয়েছে, যা লেখা হয়েছে, তা আর বদলাবে না। যখনই দেখে বদলে গেছে, তখনই 'কলিযুগ' ইত্যাদি বলে ক্রমবিকাশকে চাপা দিতে চায়; কিন্তু তা বলে কি আগুন চাপা দিয়ে বেশীদিন ঢাকা যায়? একদিন ছিল, যেদিন রাজা ছিলেন রাজ্যের মালিক; তারপর তাঁর মালিকানা গেল, রাজ্য গেল। রাজা আর কেউ চায় না। যারা চায় তারা নিজের দরকারের জন্য মাত্র। যে রাজাকে পূজা করা হ'ত, অথবা যিনি জোর ক'রে পূজা গ্রহণ করতেন, লোকে যখন তাঁর স্বেচ্ছাচার বুঝল তখন অনেকদিন দাঁড়িয়ে রইল সুযোগের অপেক্ষায়; তারপর সুযোগ যখন এল, তাড়াল তাঁকে, তাঁর যে ঐশ্বর্য্য তা তাঁকে সঙ্গে নিতে দিল না; রেখে দিল তাঁর যথাসর্ব্বস্ব তাঁরই নিষিদ্ধ নগরীতে, শুদ্ধ করে, গণতান্ত্রিকজল দিয়ে ধৌত করে। একে বলে সময়ের পরিবর্ত্তন এবং জাতির ক্রমবিকাশ। চীনসম্রাটও তা হতে বাদ পড়েন নাই। এ জীবনে কখনও ভাবি নাই, বিশাল চীনের মহানগরী পিকিন একদিন দেখব। এখন তাও দেখছি সহজসাধ্য হয়ে গেছে। বাধা-প্রতিবন্ধক আছে—থাকবেও, কিন্তু যেরূপ তোড়জোড় করে ক্রমবিকাশ সুরু হয়েছে, হয় তো এমনদিন সত্বরই আসবে যখন আর এসব দেখাশুনা করতে সময়ও বেশী থাকবে না; বাধা-প্রতিবন্ধক উঠে যাবে।

যে নগরীতে একদিন বাইরের দ্বারবানরাও প্রবেশ করতে পারত না,

আজ দ্বারবান কেন যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। তবে তাকে একটা নামমাত্র দর্শনী দিতে হয়। হয় তো যেদিন চীন সরকার প্রকৃত স্বাধীন হবে সেদিন এই নামমাত্র দক্ষিণাও উঠে যাবে। আমারই সামনে দাঁড়িয়ে কয়টি কলেজের ছাত্র বলা-কওয়া করছিল, 'এই দর্শনীটা ভাই ওঠাতে হবে।' অন্যটি বলছিল, 'তোর মাথার যদি কদর না থাকে তবে তা এখানে কেটে আহুতি দে, আমি দিতে রাজি নই, হয় তো জাপানী সে আহুতির ফল পাবে।' ছেলে কয়টী কথা বলছিল ইংরেজীতে, বোধ হয় আমাকে বোঝাবার জন্যে। পিকিন নগরীতে ইংরেজী ভাষার নাম বদলে গিয়ে 'আমেরিকানে' রূপান্তরিত হয়েছে। আমার প্রবেশ-দর্শনী দিতে হ'ল না, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করা হয়েছে। তোরণদ্বারের সামনেই কতকগুলি লোক ভিতরকার দৃশ্যের ফটো বিক্রী করছিল। পছন্দ করে তিনখানি ফটো কিনে নিলাম। প্রত্যেক খানার দাম দশ সেণ্ট। তোরণদ্বার পার হতে হতে ভাবছিলাম, ভারতের রাজা-মহারাজেরও একদিন ঐ দ্বারে প্রবেশ নিষেধ ছিল; কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে, মানুষের মনের বিবর্ত্তনে আজ আমার মত নগণ্য জীবও ঐ দ্বার দিয়ে চলেছে মাথা উঁচু করে। তোরণদ্বার পার হয়েই একটা ময়দান। ময়দানের এক পাশে মিঃ হেনরী পুই একস্থানে চীনা ভাষায় লিখে রেখেছেন, "আমি সাধারণ মানুষ, লোকে আমাকে অসাধারণ করেছিল, আজ এই লোকই আবার আমায় সাধারণ করেছে।" আমি কিন্তু এই কথাটি নিজে পাঠ করি নাই। গাইড বলল, এখানে এই লেখা আছে। মিঃ হেনরী পুই হয় তো দুঃখ করেই কথাটা বলেছেন, আর বলবেন না কেন? কে এমন ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দিতে চায়? যার হাতে দু'হাজার টাকা আছে, সে লোকটি পর্য্যন্ত তার টাকার রক্ষার্থে কত অঘটন ঘটায় তার ঠিক নাই! সিঙ্গাপুরে একটি লোককে বিচারার্থ হাজির করা হয় এবং তাকে কমিউনিষ্ট বলা হয়। উত্তরে সে বলে, টাকা হাতে হলেই সে আবার মতিগতি বদলাবে। টাকায় মানুষের মতিগতি বদলায়; চীনসম্রাটও মতি বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছিলেন সম্রাট পুই, হয়ে গেলেন হেনরী পুই। হেনরী নামক একজন ইউরোপীয়ান তাঁকে নাকি অনেক শিক্ষা দেন। ভারতবর্ষে গুরুদক্ষিণার নানারূপ প্রথা ছিল, চীনসম্রাটও তেমনি কিছুই করে গেছেন। আজও ভারতে

মিশনারী সাহেবেরা তাঁদের ভক্তদের নামের পূর্ব্বে যেমন নিজের নাম জুড়ে দেন, তেমনি চীনের সম্রাটও নিজের প্রাইভেট টিউটরের নাম নিজের নামের পূর্ব্বে জুড়ে দিয়েছেন।

সিংহাসন-গৃহ

পূর্ব্বেই বলেছি, আমাদের দেশের সম্রাটের প্রাসাদ হতে চীনের সম্রাটের বাড়ী অনেক বড়। তাই অনেকে অনেক কথা এখানে বুঝতে পারে না বলে 'গাইড' বই পাওয়া যায়, 'গাইড' মানুষও পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে গাইড ছিল, তবুও কয়েকখানা ছবি কিনে নিলাম, কারণ দেখতে সে ছবিগুলি বেশ সুন্দর। এখন এই নিষিদ্ধ নগরীর ছবি তুলতেও কোন বাধা-নিষেধ নাই, তাই ফটো বিক্রী হচ্ছে। আমরা দরজা পার হয়ে গিয়ে একটু ঘুরেই সিংহাসন-গৃহ দেখতে পেলাম। দূর হতে সে গৃহ বেশ সুন্দর দেখায়। কাছে গিয়ে যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম, তখন আমার চোখে তত সুন্দর বোধ হ'ল না। তবে বাড়ীটা ভাল করেই দেখলাম। পাথর, চুন, বৃক্ষ, মর্ম্মর-প্রস্তর বিস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। এসব কোথা হতে এসেছে? দেখে বুঝলাম, এ সব মাল-মশলা বিদেশ হতে আসে নাই। দেখে মনে শান্তি হ'ল। সিংহাসন-গৃহ দেখবার পর গাইডকে নিয়ে ফিরে এলাম। গাইড বলল যে, আমি অনেক ভারতবাসী দেখেছি, যারা এখানে এসে ঐ খালি সিংহাসনে মাথা নত করে, তুমি তা কর নাই কেন? আমি বললাম, আমি ওসব পছন্দ করি না। এর বেশী কথা আর মুখে এল না। মনে মনে ভাবছিলাম, যে দেশে ভক্তের ভগবান বর্ত্তমান, ভক্তির আবরণে ঢাকা দিয়ে সে দেশের লোক না করতে পারে এমন কাজ নাই।

তারপর গেলাম সেই গৃহে যেখানে সম্রাট প্রজাদের কাছ হতে ভেট পেতেন। তাকে ইংরেজীতে "Banquet Hall" বলা হয়। সে গৃহও কয়েক মিনিটে ঘুরে ফিরে দেখে নিলাম। এ গৃহেরও বিশেষত্ব বেশী কিছু নাই। এই হলটিতে যে মর্ম্মর-প্রস্তর ব্যবহার করা হয়েছে, তার রকম সকম কলকাতার চা-য়ের দোকানেও অভাব নাই। তবে কি চীন দেশে মর্ম্মর পাথর ছিল না, কিম্বা চীনসম্রাট ভারতের জয়পুর হতে ভাল পাথর নিতে পারতেন

না? পারতেন, নেন নাই, জানতেন চীনারা এসে নিবে না, নানা অছিলা করে শুধু সময় কাটাবে মাত্র। এ তুটি স্থান দেখতেই অনেক সময় কাটল। তারপর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় হোটেলে ফিরে গেলাম। শরীরের পক্ষে একটু বিশ্রামও দরকার।

পদ্মবন

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধূলা তখনও উড়ছে, তখনও দোকানী ঝিমাচ্ছে, তখনও পথিক বের হয় নাই। গরীবের দল অবশ্য এক টুকরা রুটির জন্য পথে চলেছে। আবার ঐ তোরণদ্বারে গেলাম। কিন্তু এবার আমার গতি অন্যদিকে। মর্ম্মর নৌকা দেখবার ইচ্ছা।

আমি একা ঐ মর্ম্মর নৌকার উপরে বসে। তখনও বেশ গরম লাগছে। সামনে সরোবর। সরোবরে পদ্ম হেলে পড়েছে। নদীর যেমন ঘাট, মর্ম্মর নৌকাও তেমনি একটি ঘাটবিশেষ। ঘাটের গড়নটা একখানা নৌকার মত। একটা ছোট সেতু পার হয়ে নৌকায় যেতে হয়। দক্ষিণ চীনের যুবক-যুবতী তারই অনুকরণে বোধ হয় এখনও নৌকায় বসে আকাশ দেখে, আকাশের চাঁদ দেখে, আরও দেখে কত সুখের স্বপ্ন। পাশে বাঁদিকে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের গাভী মর্ম্মর নৌকার দিকে চেয়ে আছে। দেখলে মনে হয় গাভীটা সজীব। ঐ মর্ম্মর নৌকায় বসে হয়তো চীনের বাদশা হাওয়া খেতেন। সামনে স্বচ্ছ জল। মাঝে মাঝে তু'একটা মাছ চলে যাচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিকে। যারা ঐ নগরীর বাইরে থাকে তারা এক ফোঁটা জলের জন্য কষ্ট পাচ্ছে, আর এখানকার সরোবরের স্বচ্ছ জল হাজার হাজার লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। অনেকক্ষণ বসলাম, ভাবলাম, কি ভাবলাম তা আর মনে নাই, মনটা বড় অপরিসর, যা ভাবি তারও বেশীক্ষণ সেখানে স্থান হয় না।

চীনের সম্রাট! একা ভোগ কর, শান্তি পাও কি? খামখেয়ালীর বশে কাজ করাও, ভাবে শান্তি পাবে, কিন্তু শান্তি ততক্ষণ যতক্ষণ পরের রক্ত শোষণ করে, পরকে অত্যাচার করে কাজের সমাপ্তির দিকে চল, তারপরই তোমাদের মানসিক অবস্থা আর সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা এক স্তরেই এসে পড়ে, তখন অশান্তির দাবানলে পুড়ে মর। সেজন্যই একটার পর অন্যটার

দিকে ঝুঁকে পড়; কিন্তু এই সরোবর যদি তখন সর্ব্বসাধারণকে খুলে দেওয়া হ'ত তা হলে বোধ হয় এত অশান্তির সৃষ্টি হ'ত না, লোকে এত কষ্ট পেত না। আমার শান্তিলাভ হয়েছে, অনেক দূর হতে অনেক কষ্ট করে এসে বুঝলাম লোভীদের মানস-মরু সর্ব্বদেশেই সমান। অত্যাচারীর অত্যাচার সর্ব্বদেশে সমভাবে প্রকটিত। যদিও আমি নিষিদ্ধ শহরের কথাই বলছি তবুও আমার বলা উচিত ছিল, ঐ গোমাতা এবং মর্ম্মর নৌকা সম্রাটের গ্রীষ্মকালের প্রাসাদে পদ্ম-সরোবরের পাশেই দেখতে পাওয়া যাবে। শুধু মর্ম্মর নৌকাই নয়, পদ্ম-সরোবরে চলাচলের জন্য সুদৃশ্য নৌকাও আছে। তবে চীন সম্রাটের ব্যবহৃত রাজকীয় নৌকা হয় তো আর নাই।

'গীতাঞ্জলি'

বিকাল বেলা ফেরবার সময় পথ হারিয়ে বসেছি। আমার অভ্যাস পথ হারালে দমে না যাওয়া। আমি পিকিন শহরের বাইরে নই যে, চিন্তা করতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পথেঘাটে লোক চলাচল বাড়ছে। আমার মনের আনন্দ আজ অটুট আছে, কারণ শরীর দুর্ব্বল নয়। দেশী খানা খেয়ে, দুধ খেয়ে শরীরে শক্তি হয়েছে। দেখতে লাগলাম যেদিকে চোখ যায়। সামনেই একটা বড় তোরণদ্বার, তারই সামনে বসে কতকগুলি যুবক কি কথা বলছিল। আমাকে দেখে তারা এগিয়ে এসে দাঁড়াতে বলল। এদের মাঝে অনেকে জার্ম্মান ভাষা বলতে লাগল। তখন জার্ম্মান ভাষার একটা কথাও বুঝতাম না, আমি তাদের ইংরেজীতে বললাম, "কি বলছ বুঝতে পারছি না।" ইংরেজী জানা লোক এল। লোকটি বুঝিয়ে বললে, এটা হ'ল মেডিক্যাল স্কুল। অনেকগুলি ছাত্র সেখানে থাকে এবং শিক্ষা করে। আমাকে পেয়ে তাদের বেশ আনন্দ হ'ল। এরা অতি কমই ভারতবাসী দেখেছে। যা দেখেছে তা শুধু শিখ আর পাঠান। সর্ব্বপ্রথম আমার পরিচয় দিলাম। আমাদের দেশে পরিচয় হয় পিতার নাম দিয়ে, গ্রামের, জেলার এবং প্রদেশের নাম বলে। এখানে তা হ'ল না। এখানে বলতে হ'ল, 'দেশ আমার হিন্দুস্থান, অতএব হিন্দু।' ভারতের মানচিত্র আনা হ'ল, চীনের মানচিত্র, তারপর সমুদয় এশিয়ারও কথা চলল অনবরত। অনেক সময় তাদের

মাঝেই ঝগড়া আরম্ভ হতে লাগল। বইয়ের পর বই আসতে লাগল, তারপর আমার উপর বড় একটা ধাক্কা এল। আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম, আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা, এ সবই দ্রাবিড় এবং মিশ্র মঙ্গলদের সন্তান। তবে কেন "থেগোরা" (ঠাকুর) সাদা হয়, নাক লম্বা হয়, দাড়ি লম্বা হয়, নিশ্চয়ই "থেগোরা" বাঙ্গালী। বাঙ্গালী মানে শিখ এবং পাঠান। আমি যে বাঙ্গালী নই, তার প্রমাণ আমার মুখে। এখন এই "থেগোরা"কে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়লাম। মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালী নন, তার প্রমাণ চীনের সর্ব্বত্র তাঁর ফোটো আছে, গোঁফ দাড়ি নাই। তখন আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, দেখ ভায়ারা, ইংরেজ দেখেছ? যদি দেখে থাক তবে এখন হতে জানা উচিত আমাদের ভারতেও আর্য্য বলে এক জাত লোক এসেছিল, তাদের কিছু কিছু এখনও দেখতে পাওয়া যায়। 'থেগোরা' তাদেরই রক্তের একবিন্দু মাত্র, অন্য কিছু নয়। 'থেগোরা' বাঙ্গালী নন তা আমি আপনাদের বার বার বলছি। তিনি যে ভাষায় গীতাঞ্জলি লিখেছেন আমারও সেই ভাষা। তৎক্ষণাৎ একটি ছাত্র একখানা ইংরেজী গীতাঞ্জলি নিয়ে এল, দু'একটা কথা তাতে বাংলাও ছিল, কারণ যিনি বইখানা অনুবাদ করেছেন, মাঝে মাঝে দু'একটা বাংলা শব্দও রেখে দিয়েছেন নীচের দিকে (Foot note)। ঐ বাংলাগুলি পাঠ করতে বলল ঐ ছেলের দল, তারা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙ্গালী বলে দেখতে চায় না। আমি এ জীবনে গীতাঞ্জলি দেখি নাই, সর্ব্বপ্রথম দেখলাম ইংরেজী গীতাঞ্জলি। বাঙ্গলা শব্দ ক'টা পাঠ করে দেওয়াতে আমার মানরক্ষা হ'ল, নতুবা মহাবিপদে পড়তে হ'ত।

আমার মনে তখন ভয়ানক দুঃখ হ'ল, বাঙ্গালী হ'য়ে গীতাঞ্জলি পাঠ করি নাই, এমন কি দেখিও নাই, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে? ইংরেজী গীতাঞ্জলিখানা চেয়ে আনলাম পাঠ করতে, কিন্তু বুঝলাম না তার বিন্দুবির্সর্গও, যদিও ইংরেজীতে যা লেখা হয়েছে তা বুঝতে অভিধান খুলতে হয় না। মনে মনে রাগ হ'ল, বাংলা বইটা পেলে হয় তো বুঝতে পারতাম তাতে কি লেখা হয়েছে। কিন্তু পিকিন এবং কলকাতা অনেক দিনের পথ। বিশ্বকবিকে কখনও দেখি নাই বলে বড় কষ্ট হ'ল, কিন্তু উপায়

নাই। কোনমতে প্রমাণ করেছিলাম তিনিও একজন হিন্দু, পাঠান কিম্বা শিখ নন, 'বাঙ্গালী' নন। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হ'ল। তাদের সামান্য ভোজ্য আমাকেও দিল। তারপর একজন সঙ্গে করে নিয়ে এল হাটামন ষ্ট্রীটে। কথা রইল পরদিন প্রাতে নিয়ে যাবে পিকিন বিশ্ববিত্থালয়ে।

ভারতীয়ের অপকীর্ত্তি

ন'টার ভিতরই মেডিক্যাল স্কুলের তিনজন যুবক এল। তাদেরে নিয়ে পাইপিং বিশ্ববিত্থালয় দেখতে গেলাম। স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইউরোপীয়ান কায়দায় বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছে। হোষ্টেল আছে। কতকগুলি ছেলে সিল্ক কিনছিল মিঃ ওয়াঙের নিকট হতে, সিল্কের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও কিছু বিক্রী করছিলেন, সেটি হ'ল নিষিদ্ধ বই। আমাকে দেখে এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন তাঁর সঙ্গে এ জীবনে দেখা হয় নাই। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা আমাকে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিল। তারপর আমাকে নিয়ে "বাঙ্গালী"র কীর্ত্তি দেখাতে এরা বের হ'ল। একটি কবর দেখিয়ে বললে, "এখানে এক বীরাঙ্গনার শরীর সমাহিত করা হয়েছে। সেই বীরাঙ্গনাকে বাঙ্গালীরা বধ করেছিল।" কথাটা শুনে আমার মুখ লুকাতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু সান্ত্বনা এল। এক জাপানী যুবক চীনা পল্টনে ভর্ত্তি হয়। তাকে তার জাপানী ভাইদের বিপক্ষে লড়াই করতে পাঠান হয়। যেই সে নিজের দেশের পতাকা অন্য পক্ষে দেখল, অমনি ভরা বন্দুকের গুলী তার নিজের মস্তক ভেদ করল। সে মরল, কিন্তু আপন ভাইকে মারতে পারল না, আর আমি দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীদের দুর্নাম শুনলাম, শুনতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমাদের নাম বিদেশে অন্য লোকে ভাঙ্গিয়ে খেয়েছে। একে একে বারটি কবর দেখলাম। প্রত্যেকটি বাঙ্গালী নামের তথা ভারতের সিপাইদের কু-কীর্ত্তির পরিচয় দিচ্ছে। এসব দেখা হয়ে গেলে আমরা একটা পুরাতন ধরণের হোটেলে খেতে গেলাম। কলকাতায় যেমন বাগবাজারের রসগোল্লার নাম আছে, এখানেও কোন কোন ভোজনালয়ের কোন কোন জিনিষের সুনাম আছে। আমরা যে হোটেলে গেলাম তার খ্যাতি ছিল

নানারূপ আচারের জন্য। খাবার খেতে বসেছি, কোথায় আসবে ভাত তরকারী, তা না হয়ে আসতে লাগল নানারূপ আচার। হিসাব করে দেখলাম, সাতাশ রকমের আচার এল। কোনটা টক, কোনটা একটু মিষ্টি, নোন্তা ইত্যাদি। খাওয়ার পরই ফের তাদের স্কুলে গেলাম।

স্কুলে যাবার পর একটা সভা করা হ'ল। তাতে কথা উঠল কোন জাতীয় লোক চীনা যুবকদের সত্বর সাধারণ মেডিক্যাল জ্ঞান দিতে সক্ষম হবে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করি। জানা ছিল ভারতবাসীর মত রক্ষণশীল দুনিয়ায় নাই, তবুও নিজ জাতভাইয়ের নাম বলতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মাইনের যখন কথা উঠল—তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, একশত পঁচিশ ডলারে ভারতীয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এদিকে এরা পাচ্ছে জার্ম্মান পঁচাত্তর ডলারে। বেতনের নিম্নহার দিয়ে এবং আসা-যাওয়ার বিনাব্যয়ে জার্ম্মানরা যত সত্বর এগিয়ে আসছে আর কেউ তেমন আসছে না। তবে বেলজিয়ান্ এবং নরউইজিয়ানরাও আসছে। যদি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক ঠিক ঠিকই নেবার সঙ্কল্প করা হয়, তবে বোধ হয় কেউ যাবে না, আর গেলেও ডালভাতের মায়ায় তিনদিন পর চলে আসবে। ইউরোপীয়ানরা যেমন দু'হাতে টাকা খরচ করতে পারে, তেমন বিনা পয়সার চীনা খাদ্য খেয়েও থাকতে পারে। জার্ম্মান ডাক্তাররা নিজের জাতের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সামান্য বেতনে কাজ করতেও রাজি হয়। চীনা যুবক-ডাক্তারদের যে-সব পেটেণ্ট ঔষধের নাম শিখান হচ্ছে সবই জার্ম্মান, আবার ওরা ঔষধের ব্যবস্থা দিতে হলেই জার্ম্মান ঔষধের নাম বলে, এতে জার্ম্মান ঔষধের চাহিদা চীনদেশে দিন দিন বেড়ে চল্‌ছে। জাপানী ভাষায় অনেক ভেষজতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, এতে চীনাদের সুবিধা অনেক বেশী। কিন্তু চীনা যুবকদের মধ্যে এত জাপান-বিদ্বেষ জেগে উঠেছে যে, তারা জাপানী ভাষাতে কিছুই শিখতে চায় না। যারা একটু নরমপন্থী তারাই জাপানী ভাষার ডাক্তারী বই রাখে এবং তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। জাপানী ভাষায় এবং চীন ভাষায় প্রভেদ খুব কম। জাপানীরা ভাতকে বলে "কমে" (Kome), চীনারা বলে "শিক্‌পান" (Shikpan)। কিন্তু লেখার বেলায় ভাত শব্দটাকে একটি অক্ষরেই উভয়ে লেখে। মাত্র উচ্চারণ করার বেলায় যার যেরূপ

ইচ্ছা সে সেরূপ উচ্চারণ করে। আমাদের দেশে কিভাবে ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হয় সে কথা উঠেছিল। বলেছিলাম, কেউ শিখে ইংরেজীর মারফতে, কেউ শিখে নিজের ভাষার মারফতে। একজন যুবক বলেছিল, "যারা ইংরেজীর মারফতে শিখে তারা হয় তো বিষয়টা ভাল করে শিখতে পারে না।" এখানে আর তাদের সঙ্গে তর্ক করে বুঝাই নাই যে, আমাদের দেশে ইংরেজী কথা না বললে পেটের ভাতই হজম হয় না। মুসলমানী প্রকট হয় আরবী ভাষার মারফতে, আর বাবুয়ানা হয় বিশুদ্ধ ইংরেজীতে, ভারতের বৈশিষ্ট্য যদি থাকত, তবে পরের ধন দিয়ে কখনও পোদ্দারী করতে চাইত না। যাদের মেরুদণ্ডে প্রবেশ করেছে নানারূপ দাস্য-ভাব, তাদের আবার নিজের ভাষার প্রতি দরদ রেখে লাভ কি? যাতে ভাষার মারফতে দাস্য-ভাব জাতের মাঝে না প্রবেশ করতে পারে সেজন্য কামাল এবং পহ্লবী আজ উঠে পড়ে লেগেছেন। আতাতুর্ক 'আল্লা' শব্দের বিনিময়ে 'তান্দ্রে' শব্দ সৃষ্টি করেছেন, পহ্লবী এখনও কিছু বের করেন নাই, হয় তো একদিন আসবে, ইরাণের লোক আর 'আল্লা' শব্দ মুখেই আনবে না।

আমাদের স্কুল-কলেজগুলির কর্ত্তা-ব্যক্তিরা পর্য্যটকদের অনেক সময়ই অবজ্ঞার চোখে দেখেন। চীনারা কিন্তু পর্য্যটকের কথা শুনতে চায়। পর্য্যটকের ভ্রমণ কাহিনী আবার তারা অন্যরূপে শুনে। পর্য্যটককে দাঁড়িয়ে বলতে দেওয়া হয় না, বসে ধীরে বলতে হয় পর্য্যটন-কথা। তারা চায় না শুনতে বাঘের গল্প, তারা এমন কিছু শুনতে চায় যাতে জ্ঞান বাড়ে। তারপর আরম্ভ করে প্রশ্ন করতে। আমাকে প্রশ্ন করেছিল, "ভারতে কি এমন কোন লোক নাই যে ঔষধের অভাবে রোগে মারা গেছে?" প্রশ্নের জবাব যা দেবার তা দিয়েছি। সেদিনও ছাত্র ভায়াদের সন্তুষ্ট করে হোটেলে ফিরতে গভীর রাত হয়েছিল।

ধর্ম্মজগত

আজ রবিবার, ভাবলাম বিশ্রাম করব সারাটা দিন। তাই প্রাতে উঠে কোথাও যাই নাই। বসে বসেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। হিন্দু ভায়াদের কাছ হ'তে লোক এল প্রার্থনায় যোগদানের জন্য। লোকটির সঙ্গে সঙ্গেই

চল্‌লাম প্রার্থনা মন্দিরে। গিয়ে দেখি চারজন লোকমাত্র। একজন দোকানের ম্যানেজার, দ্বিতীয়জন দোকানের কেশিয়ার, তৃতীয়জন দ্বারওয়ান, চতুর্থজন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। রাজার মাথায় ইংরেজী কুলি-টুপি, পরণে চীনা পোষাক, পায়ে চীনা জুতা। সকলের সঙ্গেই পরিচয় আদান-প্রদান হ'ল। প্রার্থনা হবে গুরু নানকের ধর্ম্মের গ্রন্থসাহেব পাঠ ক'রে। পাঠ করেছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। বেশীক্ষণ লাগল না সে জ্ঞান-গানে। রাজাসাহেব চটপট করে বিদায় নিলেন, কারণ তাঁর বাড়ীতেও ভজন হয়। আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন। তিনি চলে গেলেন রিক্‌সায়। আমি দ্বিপ্রহরের খাবার খেয়ে সাইকেল নিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম।

পৌছে দেখি, কতকগুলি সর্ব্বহারা তাঁরই দরজার কাছে ভিড় করে ব'সে। ভিতরে গেলাম। একজন পাঞ্জাবী মুসলমান চীনা ভাষায় কথা বলছিলেন। তাঁর কথা হয়ে গেলে মিঃ তান্ মহারাজ যীশুর লম্বা মোটা কেতাব হতে বিড় বিড় করে কি বলতে লাগলেন। তারপর রাজা নিজে গীতার কয়টা শ্লোক বলেই গ্রন্থসাহেব হতে কিছু পড়লেন, তারপর পড়লেন কোরান হতে। রাজা তাঁর প্রার্থানা শেষ করে বললেন "ধর্ম্ম, জ্ঞান, তেজ অর্জ্জন করতে হলে কাজ করা দরকার।" ভজন শেষে মুঠা মুঠা পয়সা গরীবদের দান করা হ'ল। চীনা বাদাম, পিষ্টক ছেলেদের দেওয়া হ'ল। আমাকে দেওয়া হ'ল, তার সঙ্গে এক পেয়ালা চা। আমার মনোরাজ্যের উপর এ ব্যাপার একটা বিদ্রোহের ভাব এনেছিল। তখনও কিন্তু জানতাম না যে, রাজা প্রেম মহাবিদ্যালয়ে যথাসর্ব্বস্ব দান করে আমার সমশ্রেণীতে এসেছেন।

একে একে সবাই বিদায় নিল। মিঃ তানও বিদায় নিতে উদ্যত। রাজাসাহেব আমার মনোভাব যেন বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু কিছুই বলেন নাই। তাঁর প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমণ করেছি। আমার কথা শেষ হয়ে গেলে আমাকে তাঁরই প্রকাশিত একখানি মাসিকপত্রিকা দিলেন। তিনি সে পত্রে বলেছেন কি করে বিশ্বের শান্তি হবে। পড়লাম সে পত্রিকা তারপর ফিরিয়ে দিলাম, কারণ আমার সব সময়ই ধারণা আছে এবং থাকবেও যে, "আকুতি দ্বারা, উপদেশ দ্বারা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারকে দমন করা যায় না। যদি অত্যাচারীকে

নিরস্ত করতে হয়, তবে অত্যাচারিতকে শক্তিমান হতে হবে। ধর্ম্মের কাহিনী বাজে কথামাত্র।" আমার কথা শুনে রাজা একেবারে দম বন্ধ করলেন, বোধ হয় তাঁর ধর্ম্মে এবং মর্ম্মে আঘাত লেগেছিল। মিঃ তান্-এর সঙ্গে রাজার বাড়ী হতে বিদায় নিলাম। রাজার খানসামা নাই, চাকুর নাই দেখে ভাল লেগেছিল। রাজা স্বহস্তে সব কাজ করেন।

এখানে এসে বুঝলাম ধর্ম্ম তিন রকমের। একটি হ'ল শুনা কথা আবৃত্তি করা, দল পাকান এবং অপরের অনিষ্ট করা। দ্বিতীয় হ'ল, যোগ সাধন করা এবং তার ফলে নিজেরই উন্নতি করা। তৃতীয়টি হ'ল, যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ নিজের নিজত্ব বজায় রাখা।

এই প্রথম শ্রেণীতেই জগতের প্রায় সমুদয় লোক অবস্থিতি করছে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলের লোকসংখ্যা যা আছে, তুলনায় তা অতি কম, এমন কি অনুপাত ধরলে সমুদ্রে বিন্দুবৎ। ভ্রমণকালে এই দুই দলের লোকের সঙ্গে আমার মেলা-মেশা অনেক হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে, দিনের পর দিন কেটেছে, অন্তরঙ্গত্ব জন্মেছে। কিন্তু যখনই জিজ্ঞাসা করেছি, "তারপর"? জবাব পেয়েছি, "ভাই জানি না বলব কি করে?" এই গোছের "জানি না" বলার মত লোক চীনে অনেক পেয়েছি, নানারূপে নানাভাবে বিরাজিত। আমার কথা আমি বলতাম, তাঁদের কথা তাঁরা বলতেন, তারপর যার যার পথ ধরতাম। এখন এই গোছের কতকগুলি লোকের কথা বলব।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে কেন দেখা করেছি, কি রকমে দেখা হয়েছে তার কৈফিয়ৎ অনেক স্থানে দিতে হয়েছে। এবার নতুন করে পুরানো কথা বলছি। সাংহাই'এ এঁর নাম প্রথম শুনি। তবে তিনি যে কি পদার্থ, তা অবগত হতে পারি নাই। আমার ধারণা ছিল, একটা দুশ্চরিত্র লোক হয়তো নিজের জমিদারী ছারেখারে দিতে বসেছিল, ভারতের ইংরেজ সরকার দয়া করে তাকে পেন্সন দিয়ে বিদায় করেছেন এবং রাজ্য চালাবার ভার রেসিডেন্ট কিম্বা অন্য কারও হাতে দিয়েছেন। ভারতে এরূপই হয় সাধারণতঃ। পিকিনে পৌঁছেও ওঁর সঙ্গে দেখা করি নাই। আমি ভারতীয় রাজাদের ভাল করেই জানি।

যদিও ক্ষমতা মোটেই নাই, তবুও উৎকট বড়াই প্রায়ই আছে, প্রাইভেট সেক্রেটারী আর সেক্রেটারীদের দ্বারা খোঁড়া হয়ে এঁরা বসে থাকেন। দর্শন পাওয়া বড় কষ্টকর। চীনদেশে ভারতীয় রাজার যে সম্মান আমারও সেই সম্মান, অতএব দেখা করতে যাব কেন? চীনদেশে কেন, ইউরোপের সর্ব্বত্রই দেখেছি, ভারতীয় রাজাদের কেউ সম্মান দেয় না, ভারতীয় রাজারা টাকার মারফতে সম্মান কিনেন। যে দোকানীর বাড়ীতে রোজ ভোজন করতাম, তিনি সংবাদ পাঠালেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁদের বাড়ীতে আসবেন। দোকানীর বাড়ীতে রাজার আসা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাই দোকানীর বাড়ীতে অবিলম্বে হাজির হলাম। একখানা চেয়ারে বসা একজনা লম্বা লোক, তাঁর পরণে মামুলী চীনা পোষাক, মাথায় ইংরেজী কুলিটুপি, পায়ে চীনা পাদুকা, দাড়ী ফরাসী ধরণে ছাঁটা, মুখখানাতে হাসি লেগেই আছে, চোখ দুটো বক্র, কপালের সামনের দিকে একটা কুণ্ডলী; দেখলেই মনে হয় সাদাসিধে লোকটি, কিন্তু গম্ভীর এবং মুখে ভাব-তরঙ্গের লহর বয়ে যাচ্ছে। রাজা আমার সঙ্গে কথা বললেন না, তখন ধর্ম্মকথায় ব্যস্ত ছিলেন। আমার তাতে মন বিগড়ে গেল। সাক্ষাৎ ভগবানের যিনি আদর করেন না, কল্পিত ভগবানের রূপকে নিয়েই যাঁর লীলা খেলা, তাঁর মাঝে কতদূর সত্য আছে তিনিই অবগত আছেন। যখন কল্পিত ভগবানের ব্যাখ্যা হয়ে গেল, তখন মিঃ ভেরুমল আমার সঙ্গে রাজার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজা খাসা লক্ষ্ণৌ নগরীর উর্দ্দু আমাকে শুনাতে লাগলেন, আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবগতিক দেখে রাজা বুঝলেন, তাঁর একটা কথাও বুঝতে পারি নাই। "আপ্‌কা নাম" এই কথাটার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করলেন, "ইস্‌মে শরীফ"। কি করে বুঝব আমি সে কথা? তারপর চলেছিল কথাবার্ত্তা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে। রাজা আমাকে তাঁর বাড়ীতে সেদিনই একটার সময় যে ধর্ম্ম-সভা হবে তাতে যেতে বললেন। হাজার হোক রাজা, কথাটা মানতে হ'ল।

রোদ বেশ কড়া হয়ে উঠেছে, তবুও রাজ আজ্ঞা পালন করতে চললাম। পথে পথে অনেক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম ২০নং বাড়ীটা কোথায়? অতি কষ্টে শেষটায় পৌছলাম রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ী দেখেই বুঝলাম। দীন-

দরিদ্রের দলে গলিটা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। কলকাতায় সেরূপ দৃশ্য দেখা যায়। কারও শরীরে ঘা হয়ে গেছে, কারও বস্ত্র নাই, কেউ অন্ধ, কেউ খঞ্জ, কেউ সাতদিন পর্য্যন্ত এক টুকরা রুটির সংস্থান করতে পারে নাই—তাতে ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা। কোনরূপে গরীবদের ঠেলে রাজ দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। মিঃ তান্ তন্ময় হয়ে যীশুর মরণ কথা শুনছিলেন। তারপর ভারতের একটি মুসলমান মহম্মদ সম্বন্ধে কিছু বললেন। শেষটায় রাজা সাহেব সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন।

আমাকে প্রসাদ দেওয়া হ'ল। খানিকটা খেয়ে বাকিটুকু ফেলে দিলাম। রাজার দিন কাটে সতর পয়সায়। অর্দ্ধেকটা ফেলে দেওয়াতে রাজার বোধ হয় রাগ হ'ল। তিনি এখন বোধ হয় অপরের মনের কথা বোঝেন। রাজা আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "যৌবনের উদ্দীপনা যখন অনেকটা নিষ্পন্দ হয়, তখন একটা কিছু অজানা জিনিষকে কল্পনা করতে হয়, সেরূপ কল্পনা করেছেন অনেকেই। সত্যের সন্ধানই বল, আর মিথ্যার কল্পনাই বল, অনেকেই তাতে ঢেলে দিয়েছেন জীবনের সব সাধনা, শুধু লালসার লক্ষ্যকে ভুলতে। আমিও আজ সে অবস্থায় উপনীত হয়েছি, তা বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।" ইংরেজীতে বলেছিলেন সেই কথাগুলি, কিন্তু তাতে এত বড় বড় শব্দ ছিল যে, আমার বুঝা কষ্টকর হয়েছিল। তাই মামুলী হিন্দীতে ফের বলতে বললাম। দয়া করে বলেছিলেন তাঁর দুঃখের কথা। তারপর মিঃ তান্‌কে বললেন, "একে নিয়ে যেও তো বড় লামার কাছে, একটু দেখুক, শিখুক।" মিঃ তান্ আমাকে বড় লামার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক কথা বুঝেছিলাম তা একটু পরে বলছি।

আমার নিমন্ত্রণ ছিল সেদিন সিনেমা দেখবার। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ঘরে ফিরে এসে দেখি মিঃ ওয়াং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে মিঃ ওয়াং বললেন, একটি সাধু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে, তাই আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চললাম সাধুর বাড়ী। একটা গলির মধ্যে ভাঙ্গা বাড়ী, তারই ভিতর চীনা সাধু বসে মালা টপকাচ্ছেন। সাধুকে নমস্কার করলাম না। এতে তাঁর রাগ হ'ল বলে মনে হ'ল না। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন মিঃ ওয়াঙের মারফতে,

"আজ একজনা খবর দিল তুমি এসেছ, তাই তোমার সহায়ককে ডেকে এনেছি, তাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে ডাকতে, এসেছ ভাল করেছ, এখন চলে যেতে পার।" আরও কিছুক্ষণ বসলাম। সাধু রক্তচক্ষু করে বললেন, "যে জাত যত অধঃপাতে যায় তাকে তত কষ্ট পেতে হয়, কষ্টের ভিতর দিয়েই জাতের গড়ন, চীন জাত গড়ছে, ভাঙ্গছে না। বলে দাও এই লোকটাকে, আজ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে সে যেভাবে তাচ্ছিল্য করেছে, তার উচিত হয় নাই সেরূপ করা; ভবিষ্যতে যেন সেরূপ না করে।" মিঃ ওয়াং আমাকে সে কথা বুঝিয়ে দিলেন, তারপরই আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। রাত্রি আড়াইটায় হোটেলে পৌঁছে মিঃ ওয়াংকে বললাম, এরূপ সাধুর কাছে আর নিয়ে যাবেন না।

একজন বিখ্যাত সাধু সন্দর্শনে আজ আমি চলেছি, পঞ্চানন লামা যাঁর পায়ে পড়ে, দলাই লামা যাঁর কাছে মাথা নত করে এমন সাধু দর্শনে।

বড় একটা চেয়ারে বসা সে সন্ন্যাসী, দেখতে রং তার কাঁচা সোনার মত, চুলগুলি এখনও পাকে নাই, সদাই হাস্যমুখ। ললাট তার তিব্বতীদের মত, বাহু আজানুলম্বিত, চুলগুলি ছাঁটা চীনাদের চুলের মত। দর্শনমাত্রই জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে তিনি শূন্যে বিচরণ করেন। তিনি আমার প্রশ্ন শুনেই অবাক। মানুষ হয়ে আকাশে পাখীর মত বিচরণ করতে হলে বিমানের দরকার! আকাশযান তাঁর নাই, কি করে অন্য উপায়ে ওড়া যায়? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতে কি এরূপ লোক আছে, যারা আকাশযানের বিনা সাহায্যে পাখীর মত আকাশে বেড়াতে পারে? আমি বল্‌লাম, সেরূপ লোক দেখি নাই। একটু হেসে বল্‌লেন, তিনি আকাশে বাতাসের আগেও চল্‌তে পারেন। তাঁর এরূপ কথা শুনে আমার মনে ভয়ানক খট্‌কা বাধল। আমি যখন তাঁরই কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিলাম, তখন তিনি বল্‌লেন, বলতো তোমার বাড়ীতে ক'খানা ঘর আছে? আমি বল্‌লাম, কয়েকখানা ছিল বটে তবে এখন আছে কিনা জানি না। বল্‌তে পার তোমার বাবা কোন ঘরে বসে কাজ করতেন? নিশ্চয়, বল্‌তে পারি।

জীবিত বুদ্ধ হেসে বল্‌লেন, তোমার মন এরই মাঝে তোমার বাড়ী চলে গিয়েছিল, না? আমি বল্‌লাম, হাঁ লামা। লামা আরও একটু হেসে বল্‌লেন, পৃথিবীর লোক রটিয়েছে আমি আকাশে বিমানের সাহায্য ব্যতিরেকেও পাখীর মত উড়ে বেড়াই, কিন্তু তারা জানে না আমার মন পাখীর চেয়েও শীঘ্র চলে। কথার হেঁয়ালি না বুঝতে পারলেই মানুষ এরূপ বিপাকে পড়ে। এটা ওদের দোষ নয়, এটা ওদের অভ্যাস। এখন বুঝেছ আমি কি করে আকাশে চড়ি। আমার আহাম্মোকী বুঝ্‌তে পেরে মনে বড়ই দুঃখ হ'ল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এরূপ করে আর ভুল করব না।

চীনদেশে চৌদ্দ জন জীবিত বুদ্ধ আছেন। আমাদের দেশে যেমন শঙ্করাচার্য্যের চারটী মঠ আছে, চীনদেশেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের চৌদ্দটা বিশিষ্ট মঠ আছে। এ-সব মঠের অধ্যক্ষকে বলা হয় জীবিত বুদ্ধ। লাসা এবং কাকোনরের মঠ দুটি বিখ্যাত। দলাই লামা হলেন লাসার মঠাধ্যক্ষ, কাকোনরের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গেই আমি কথা বল্‌ছিলাম। ওঁদের সম্বন্ধে তাঁদের ভক্তরা নানারূপ গুজব রটিয়ে থাকে, তার ভিতর বিশেষ গুজব হ'ল, জীবিত বুদ্ধরা আকাশে উড়তে পারেন। কিন্তু গুজব যে গুজবই কাকোনরের লামা আমাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

মহাকালী

এতগুলি বড়লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন গ্যাঁট হয়ে বসে আছি, তখন মিঃ ওয়াং এসে বললেন, একবার যেন পিকিনের মিউজিয়ম দেখতে যাই।

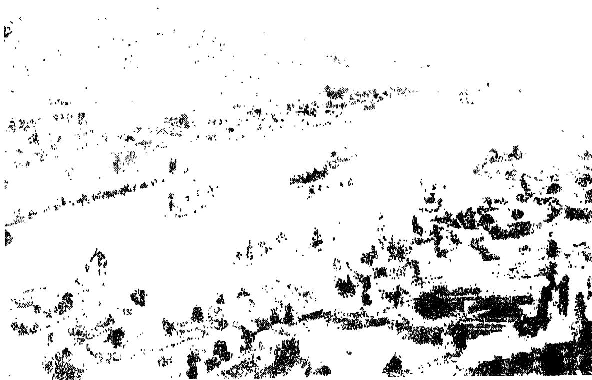
মিঃ ওয়াঙের সঙ্গে মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। তিনি কতকগুলি চিত্র দেখালেন, তাতে ছিল দশভুজা কালীমূর্ত্তি সাতখানা। অন্যান্য অনেক ছবি ছিল, যাদের সঙ্গে অনেক ভারতীয় দেব-দেবীর বেশ মিল আছে। মহাকাল মূর্ত্তিটি কিন্তু আমার কাছে বেশ লাগল। হাতে ডমরু ডিম ডিম বাজছে, পা দুখানা নৃত্য-রত, আর সেই নৃত্যে পৃথিবী কাঁপছে। সঙ্গিনী তাতে হয়েছেন শ্মশানবাসিনী মহাকালী। তারই সামনে ম্রিয়মাণ জীবগণ থর থর করে কাঁপছে। মিঃ ওয়াং বললেন, "জগতের সকল সভ্যতা হতে আমাদের সভ্যতার এখানেই প্রভেদ। আমাদের অক্ষর নাই, প্রত্যেকটি চিত্র এক একটি শব্দ।

কিন্তু ঐ শব্দগুলির আবিষ্কার কি করে হ'ল এবং তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তাও আজ আপনাকে বুঝাব, বুঝতে পারবেন কি না জানি না; তবে সেই চেষ্টা করব প্রাণপণ।" আর কয়খানা ছবি দেখিয়েই মিঃ ওয়াং বললেন, "চলুন এখন সম্রাটের বাড়ী।" আমার যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, কারণ কাছেই আরও এত সুন্দর সুন্দর দ্রষ্টব্য জিনিষ পড়ে ছিল, তা না দেখে যাওয়া উচিত নয়। তবুও চললাম তাঁর সঙ্গে।

রাজবাড়ীর কাছেই একটা ছোট পথ, তার এক পাশে একটা ছোট পাথরের খুপরি, তাকে বাড়ী কিম্বা ঘর কোনমতেই বলা চলে না। তার মাঝে একটি পুরাতন দশভুজা কালীমূর্ত্তি। তবে আমাদের দেশের কালী যেমন জিভ্ কাট্‌ছেন তেমনটি নয়, মুখখানি যেন হাঁ ক'রে আছে গ্রাস করবার উদ্দেশ্যে। জিভ্‌খানা লাল পাথরের তৈরী, টক টক করছে, দেখতে বেশ সুন্দর। মিঃ ওয়াং বললেন, "এই মূর্ত্তিটি দেখে কি মনে হয়?"

কি মনে হয় তার জবাব আমি কি করে দেই? মা কালীর মূর্ত্তি বইতো নয়? চিরদিন যে মূর্ত্তি পূজা করে এসেছি, তাকে নিয়ে খেলা করব কি করে? চুপ করে রইলাম। মিঃ ওয়াং আবার আমাকে মিউজিয়মে টেনে নিলেন। এবার মিউজিয়ম লোকে ভর্ত্তি, ওদের সমুখে দাঁড়িয়ে মিঃ ওয়াং আমাকে চীনা শব্দ-মাহাত্ম্য বলতে পারছিলেন না। এতে আমার অনেকটা স্বস্তি হয়েছিল। চুপ করে আপন মনে মিউজিয়ম দেখলাম। একটি মানুষের ছবি দেখলাম। কাছে থেকেও মনে হয় নানারূপ কালি দিয়ে তুলির সাহায্যে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে। কিন্তু এতে রং মোটেই নাই, ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে কাগজের উপর বসান হয়েছে এবং তাতেই ফুটে উঠেছে একটি মানুষের সুঠাম অঙ্গ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিল্পীকে ধন্যবাদ দিলাম। মিউজিয়ম দেখা হয়ে গেলে চললাম মার্শ্যাল 'ইউ পে ফো'র বাড়ীতে। তাঁর বাড়ীতে যাবার আমার উদ্দেশ্য তাঁর দর্শন লাভ এবং বড় রকমের কিছু দান নিয়ে আসা।

এই মার্শ্যাল এখন মহাশয়ে পরিণত হয়েছেন। তিনি চ্যাং কাইসেকের অভিযান প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু জেনারেল চ্যাং কাইসেক অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত এসে চলে গেলেন। মার্শ্যাল আর শেষটায় সহ্য করতে পারলেন না। নিজেই নবীন চীনের পতাকা বহন করে মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু বেশী দূর



নৌকায় চীনা বেদে



ইন্‌টার-ন্যাশনেল সেটেলমেণ্ট এবং চাপাই এরিয়ার বৃটিশ ও জাপানী সৈনিক আপন আপন এলাকায় পাহারা-রত

এগিয়ে যেতে পারেন নাই, কারণ রাজধানী পিকিন হতে উঠে যাবে নান্‌কিনে। চালটা আর কেউ না বুঝুক ইউ পে ফো বুঝে নিয়েছিলেন হাড়ে হাড়ে। তিনি তখনই বুঝেছিলেন মাঞ্চুরিয়া যাবে। তাঁর কথা কেউ শোনে নাই তখন, কিন্তু আজ মাঞ্চুরিয়া গিয়েছে তাই আজ লোকে বুঝতে পেরেছে সেই চালবাজী। কিন্তু এখনও কেউ বোঝে নাই, কোন দেবতা চ্যং কাইসেকের ঘাড়ে বসেছিলেন। ইউ পে ফো জানতেন সেই দেবতাকে ভাল করেই, তাই তাঁর অবস্থা হয়েছে আজ এই রকম। চালবাজী যিনিই করে থাকুন না কেন, ফল তার নিশ্চয়ই ভাল হবে না। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়া ভ্রমণের সময় তা বুঝেছি।

ইউ পে ফো দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে, পরণে তাঁর মামুলী বস্ত্র। মুখখানা কালিমায় ডেকে গেছে। টাকা পয়সার লোভ তাঁর ছিল না, কিন্তু চীনের লোকের অপরাধে তাঁর আজ বুক ফেটে যাচ্ছে। কারও সঙ্গে দেখা তিনি করেন না বললেও দোষ হয় না। কিন্তু আমি ভারতের লোক, তারপর পরিব্রাজক, তাই তিনি বেরিয়ে এসেছেন চুপে চুপে আমারই সমুখে। তাঁরই সেক্রেটারী কথা বলছে আমার সঙ্গে, আমি ভাবছি সেক্রেটারীই হবে ইউ পে ফো। কিন্তু মিঃ ওয়াং আমার সঙ্গে আছেন, দেখিয়ে দিলেন আমাকে সেই মুখখানা। কিন্তু দুঃখের বিষয় একের মনোভাব অন্যের কাছে দুর্বোধ্য। ইউ পে ফো আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বিদায় নিলেন। বৃদ্ধের কাছ হতে চলে আসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, এর একমাত্র কারণ তিনি বৃদ্ধ হয়েও এখনও যুবক। এখনও তাঁর ধমনীতে রক্ত টগবগ করে ওঠে, যখনই তাঁর মনে হয় মাঞ্চুরিয়ার কথা। পিকিনের লোক এখন ইউ পে ফো'কে দেবতার মতই দেখে।

সেকালের আশ্চর্য্য

ঊর্দ্ধগগনে ঠেলে উঠেছে পাহাড়টি যেন চীনের জয়গান গাইতে। আমি তারই চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে—একা। উত্তরে তার দিগন্তব্যাপী মাঞ্চুরিয়ার শস্যশ্যামল সমতলভূমি, দক্ষিণ হতে ভেসে আসছে তরুণ চীনের নবীন ভাব-তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে চীনের গরিমা, চীনের প্রাচীর।

পূর্ব্বদিক হ'তে উদ্বেল সাগর এসে ধাক্কা খাচ্ছে চীনের গায়ে। পশ্চিম দিকে ধূলিসমুদ্র মন্থন করে এ প্রাচীর চলেছে কালঘান সীমান্তে। আমি দাঁড়িয়ে একা, দোসর নাই, ভাবছি চীনের অতি প্রাচীন এ প্রাচীরের কথা। যার নাম ভারতবাসী শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখে নাই।

সেকালের আশ্চর্য্য চীনের এ প্রাচীর আমি দেখ্‌ছি বলে আমার অহঙ্কার হয় নাই। বরং একবার ভাবছি ভারতের কথা। ভারতের লোক স্বর্গ-নরকের কথা যেমনটি কল্পনা করতে পারে, তেমনটি যদি ভারতের বাইরের কথা চিন্তা করতে পারত, তবে কত আনন্দের বিষয় হ'ত। চীনের বদনাম পরের মুখে শুনে শুনে অনেকে এর উপর বীতরাগ হয়েছে, কিন্তু কখনও ভাবে নাই একবার চীনের প্রাচীরটা দেখে আসি। কেন চীনজাতি শরীরের রক্ত ঢেলে এত বড় একটা প্রাচীর গড়ল ? চীনের লোক কখনও গড়বে না মোগলের হয়ে আটকের দুর্গ, তারা গড়েছিল ঐ প্রাচীর চীনের স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য, এতে চীনের রাজার হুকুম নাই, ধনীদের চালাকি নাই, আছে তাতে শুধু জাতির গরিমা।

পাঠশালার গুরু মহাশয়ের কাছ থেকে, শুনেছিলাম চীনের প্রাচীরের উপর দিয়ে সাতটা ঘোড়া পাশাপাশি দৌড়াতে পারে। তখন ভাবতাম, যে প্রাচীরের উপর সাতটা ঘোড়া দৌড়ায়, নিশ্চয়ই তা খুব চওড়া হবে। বাল্যজীবনের সে কথা আজ আবার মনে হ'ল।

একজন মোগল আমার নিকট উপস্থিত। আমাকে সে চীনের সম্রাট হতে ভারতের মোগল সম্রাটদের অনেকের হাতের লেখা কাগজ দেখালে। কোনটার দাম দশহাজার ডলার, কোনটার দাম পনর হাজার। আমি এগিয়ে চলেছি চীনের প্রাচীরের পরে কি আছে দেখবার জন্যে। সিঁড়িগুলি ভাঙ্গতে খুব পরিশ্রম হচ্ছিল। কিন্তু লোকটা গয়ালী পাণ্ডাদের মত আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি ভারতের লোক কিনা তাই আমার কাছে সাজাহানের লেখা একখানা কাগজ বেচ্‌বেই। অধিকার তার আছে নিশ্চয়ই।

লোকটীকে বললাম, "দেখ, আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হাঁপিয়ে পড়েছি, আমাকে বিরক্ত করা না।" লোকটি অমনি বল্‌লে, "Mr Mogul, you must buy." আমার আর মাথার ঠিক রইল না। লোকটার হাত হতে

কাগজ তাড়া নিয়ে দূর করে ফেলে দিলাম, তারপর দাঁড়ালাম তারই সাম্‌নে। সে দেখলে তার কাগজগুলি বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, তবু সে কুড়াল না, সে আমার পিছন নিল। কতকক্ষণ এগিয়ে যাবার পর প্রাচীরটা মাপতে ইচ্ছা হল। কাছেই একটুকরা বাঁশ পড়েছিল যাই তা উঠাতে যাচ্ছি, অমনি মোগলটা বাধা দিয়ে বললে, "এটা আমার, উঠিওনা।" মনে মনে ভাবলাম, ভারতে হয় তো এ নিয়ম চল্‌তে পারে, কিন্তু এটা চীনদেশ। কঞ্চিখানা তুলে আমার হাতের মাপমত মেপে বাকিটুকু ভেঙ্গে ফেলে দিলাম, তারপর প্রাচীর মাপলাম। দেখলাম এটা মাত্র আমার হাতের নয় হাত চওড়া, তুদিকে যে কার্ণিশ আছে তা আমার হাতের তিন-পোয়া হাত হতে কিছু বেশী। অন্যদিক হতে চৌদ্দজন আমেরিকান পর্য্যটকও আমার মতই প্রাচীর দেখতে এসেছিল। আমাকে পেয়েই জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এই মোগলের কাছ হতে ভারতীয় রাজাদের দলিল কিনেছেন? আমি বল্‌লাম, কিনি নাই, তবে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, যাবার বেলা পথে পাবেন। একজনা ঐ লোকটির কাছ থেকে এক ডলার দিয়ে একখানা কিনেছিলেন, তিনি তা আমাকে উপহার দিলেন। আমি তারই সাম্‌নে কাগজখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেল্‌লাম। তখন সবাই মিলে আমাকে ভারতের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। আমরা সবাই গিয়ে একটা শান্ত্রি-ঘরে বস্‌লাম। বোধ হয় তু'ঘণ্টা তাদের কাছে ভারতের কথা বলেছিলাম। ওদের সঙ্গে টিফিন কেরিয়ার ছিল, বেশ খাওয়া দাওয়া হল। তারপর আমরা সবাই মিলে পিকিনের দিকে রওনা হলাম, আমাদের মোগল মহাশয় শুধু একটী আমেরিকানকেই ঠকাতে পেরেছিলেন মাত্র, সেদিন আর কাউকে ঠকাতে পারেন নাই।

পিকিন হতে রেলগাড়ীতে করে কিছুটা দূর গেলেই চীনের প্রাচীর দেখা যায়। ফিরে আসবার বেলা আমেরিকানরা গাধায় চড়ে পিকিনের দিকে রওনা হলেন। আমি পায়ে হেঁটেই চল্‌লাম। প্রাচীর পার হয়েই একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটাতে মোগল, তাতার, চীনা, কোরিয়ান, জাপানী সবাই আছে। যে যার ইচ্ছামত কাজ করে চলেছে। চীনারা মাথা নত করে আপন কাজে ব্যস্ত। একটি কৃষক আপন মনে উষর জমিতে কোদাল

দিচ্ছিল, আমি গিয়ে তার পাশে বস্‌লাম, তার কাজ দেখবার জন্য। এরূপ পাথুরে জমিতে যে কিছু গজাবে আমার ধারণাই হ'ল না, তবে কি লোকটা কোন গুপ্তধনের অন্বেষণ করছে? কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ধাঁধা কেটে গেল, দেখলাম লোকটা মাটি খুঁড়ে পাথর বেছে ফেলে দিচ্ছে, চাষের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছে জমিখানা। লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলল না, শুধু চেয়ে রইল কতকক্ষণ আমার দিকে। অনেকক্ষণ বসে থেকে শহরের দিকে ফিরলাম।

পিকিন-প্রাচীর

চীনের প্রাচীর দেখে এসে মনে হ'ল পিকিন নগরী যে প্রাচীরে ঘেরা তাও একবার দেখি। এখানেও ওঠবার সিঁড়ি আছে। প্রাচীরের উপরে উঠে দেখি, আমার পাঠশালার গুরুমহাশয় যা বলেছেন তা সত্য কথা। মেপে দেখলাম, আমার হাতের পঞ্চাশ হাত প্রশস্ত। সাতটা ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়াতে পারে। উঁচু-নীচু ধাপ নাই সমান চলে গেছে। ঘিরে ফেলেছে সমুদায় পিকিন শহরটাকে। অনেকক্ষণ বেড়ালাম এর উপর। অনেকটা হায়রান্ হয়েই নেবে এলাম।

চীনের প্রাচীর হতে আরম্ভ করে পিকিনের অনেক জিনিষ দেখেছি। একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল পিকিন নগরী দেখব, সে সাধ মিটেছে। তবু পিকিন ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রাতে ঘুম হতে উঠে একটা বাগানে যাব বলে বের হয়েছি। কিছুদূরে গিয়েই দেখা হ'ল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে। তিনিও বাগানে বেড়াতে চলেছেন। আমাকে পেয়ে তিনি বেশ আনন্দিত হলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, আর্য্যদের অনেক জয়গান করলেন। কিন্তু আমি তাঁর অনেক কথায়ই সায় দিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আমার সঙ্গ ছাড়লেন। প্রাতভ্রমণ সমাপ্ত করে হোটেলে এসে বসেছি। ভাবছি, এবার এখান হতে যাবার বন্দোবস্ত করব, এমন সময় একজন সাদা রাশিয়ান উপযাচক হয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে এলেন। বস্‌লেন, তারপর রুশদেশের বিশেষ করে লেনিনের নীতির উপর একটানা মন্তব্য করতে লাগলেন। আগ্রহের সহিত তাকে বসালাম, কফি খেতে দিলাম,

চুরুট দিলাম। কোনদিন আমি লেনিনের লেখা বই পাঠ করি নাই। তাঁর নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁর নীতিই-বা কি এবং তাঁর কার্য্য-তালিকাই বা কি, তার বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। অভ্যাগত মহাশয় একটি একটি করে লেনিনের নীতি বলতে লাগলেন, আর তার খণ্ডনও করতে লাগলেন। যখন তাঁর গলা শুকিয়ে গেল এবং নিজেই বিদায় নিতে চাইলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কখন আসবেন? বিকালে আসবেন বললেন, বিকালের জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলাম। তিনি যথাসময়ে এলেন। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত লাল রাশিয়ানদের মুণ্ডপাত করলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলাম, এতক্ষণ যে তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে কাটিয়েছেন তার জন্যে কোন ফি চাই কিনা? ভদ্রলোক যেন আকাশ হতে পড়লেন! আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, দশটা বই পড়ে যে জ্ঞান না হ'ত—তা আজ তাঁর মারফতে হয়ে গেল, কারণ বোলসেভিজম কাকে বলে, সোসিয়ালিজম কাকে বলে—তা আমি মোটেই জানতাম না। ভদ্রলোক নিদারুণ ক্ষোভে বিদায় নিলেন।

পিকিন নগরীতে কয়েকটি স্থান দেখবার বাকি ছিল, তাই আর কালবিলম্ব না করে সাইকেল নিয়েই দেখবার জন্যে বের হয়ে পড়লাম।

এখানে একটি ঝরণা আছে; এর জলে নাকি অনেক ধাতব দ্রব্য রয়েছে। ঝরণাটি একটি পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে একটা গভীর জঙ্গলের বুক চিরে। ঝরণার জল খানিকটা পান করে বিশ্রামার্থে পাহাড়ের কাছে বসেছি, এমন সময় কয়েকজন জাপানী আমার কাছে এল। আকারে-ইঙ্গিতে বুঝলাম তারা যেন বলতে চায় বেঞ্চটা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়। হিন্দুস্থান হলে হয় তো ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এটা চীন দেশ, এখানে সবাই সমান। বিশ্রামান্তে সান-ইয়াৎ-সেনের পুরাতন কবর দেখতে চললাম।

সান-ইয়াৎ-সেনের 'উইল'

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে অতিকষ্টে পৌঁছলাম সেই স্মৃতিমন্দিরে। মন্দিরটি মর্ম্মর প্রস্তর দিয়ে নির্ম্মিত। অনেকগুলি ছোট-বড় বস্তি আছে তারই কাছে। জল পিপাসা পেয়েছিল খুবই বেশী, একটি গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে জল চাইলাম। এক প্রৌঢ়া এসে আমাকে জলের পরিবর্ত্তে চীনা চা দিলেন।

আনন্দের সহিত সেই অমৃতবৎ চীনা চা পান করলাম। পরে চলে যাব এমন সময় প্রৌঢ়া ইঙ্গিতে ডাকলেন। বললেন, তিনিও কবরটি দেখতে যাবেন। একটু পরেই কোথা হতে কতকগুলি লোক এসে জড়ো হ'ল, এর মাঝে অনেকে আবার আমেরিকান ইংরেজীও বলতে পারে। একটি বৃহৎ দল তৈরী হ'ল। তারপর চললাম আমরা সেই পুণ্য তীর্থ প্রদক্ষিণ করতে। এখানেও অনেক ক্যাণ্টনী যুবক ছিল। তারা একটির পর একটি করে আমাদের সমুদায় বাড়ীটা দেখালে; তারপর বললে, এই বাড়ীটি ছিল মাঞ্চুরিয়ার Life Line। এটাকে জেনারেল চ্যং কাইসেক ভেঙ্গেছেন, মাঞ্চুরিয়া কেন, চীনের ভাগ্যকেও নিয়ে গেছেন অনেক দূরে সরিয়ে। জাপানী আর কাউকে ভয় করে না, ভয় করে ক্যাণ্টনীদেরকে। ক্যাণ্টনীদের একটি ছোটখাট পল্টন এখানে থাকত। তাদের কাজই ছিল দরিদ্রের সহায় হয়ে অত্যাচারীকে দণ্ড দেওয়া। কিন্তু যে দিন হতে সান ইয়াৎ সেনের হাড় ক'খানা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেদিন হতে তারাও চলে গেছে। এখন যারা আছে, তারা হয় শিক্ষক, নয় ব্যবসায়ী। এদের হাতে কোন ক্ষমতা নাই। এখনও কিন্তু যদি এরা দেখে অত্যাচার চলছে, তবে তার প্রতিকার করতে ছুটে যায়। যাদের মৃত্যুভয় নাই তাদেরে ভয় করে সবাই, তাই মুষ্টিমেয় ক্যাণ্টনী আজ পিকিনের ক্ষুদ্র পল্লীতে থেকেও অনেকের ভয়ের কারণ হয়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ বস্‌লাম তাদের সঙ্গে। মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হয় তা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাইলাম। অনেকেই এ বিষয়টা পছন্দ করল না। তারা বললে, "যাদের জীবিত অবস্থাই মরণ হতে শোচনীয়, সুখশান্তি হতে চির-বঞ্চিত যারা, নিজ দেশে থেকেও 'পরবাসী', তাদের পক্ষে পরপারের কথা চিন্তা করা মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" আমি তর্ক করি নাই, কারণ তাদের দেশের এক অংশ আজ জাপান কেড়ে নিয়েছে, তারা বুঝেছে ক্ষতি তাদের কত হয়েছে, আমার চুপ করে থাকাই ভাল।

স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। অনেকক্ষণ বসে সে সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। তারপর সঙ্গীদের উপরোধে আবার ঐ গ্রামে যেতে হয়েছিল—সান ইয়াৎ সেনের উইল শুনবার জন্যে। এরাই বললে, এই

বইখানি নাকি সকল দেশে প্রবেশ করতে পারে না। তাই আরও আগ্রহ হ'ল, শুনে যাই সে উইল। দেখলাম, সে এক প্রকাণ্ড বই। তারা সে উইলের মর্ম্ম আমায় পড়িয়ে শুনাল, হৃদয়ে শান্তি পেলাম। দেশবাসীর প্রতি সানের দায়িত্ববোধ দেখে বিমোহিত হলাম। চীনের যুবক-যুবতী এখনও তাঁর বাণী মনঃপ্রাণ দিয়ে শুনছে।

উইল পাঠ শেষ হ'ল। ইংরেজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায় ভাল বুঝলাম না। দুঃখ হ'ল কেন শৈশবে ভাল করে ইংরেজী শিখি নাই। মানবতার পূজারীর মুক্তির বাণী পাঠ শেষ হবার পর অন্য নানা কথা চল্‌ল। এক সময় আফিঙের কথাও উঠল। কি করে আফিং চীনদেশে প্রবেশ করল তার কথা এরা বল্‌লে। ইচ্ছা করে চীনের লোক আফিং খেতে শিখে নাই, তাদেরকে শিখান হয়েছে। তার দু'একটা উদাহরণও দিল তারা। যে-সব উদাহরণ দিয়েছিল তার ভিতর ছিল চীনের উপর বৈদেশিকদের অত্যাচার কাহিনী। আমি ইতিহাস পাঠ করি নাই, কাজেই এ সম্বন্ধে আমার নির্ব্বাক থাকাই ভাল। কিন্তু কথা হ'ল—যা মন্দ, যাতে জাতির ধ্বংস হয় তা লোকে দীর্ঘকাল ধরে থাকে কি করে? ওরা বলছিল চীনের কথা, আমি ভাবছিলাম ভারতের কথা। চীনে আফিং পরদেশের লোক জোর করে প্রবেশ করিয়েছে; আর ভারতে দেশের লোকই স্বার্থের বশীভূত হয়ে কত পাপ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে. তার কি অন্ত আছে!

একজন বল্‌লে, "সকল বালাইয়ের মূলে আছে টাকা, এই টাকা যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে থাকে, তবেই এ-সব পাপের সৃষ্টি হবে। তারপর টাকার ধর্ম্মই হ'ল পুঞ্জীভূত হয়ে একজনের কাছে, কিম্বা জনকয়েকের কাছে থাকা। এই কয়েকজনাই যদি নিজের কথা, নিজের দলের কথা ভুলে গিয়ে সর্ব্বসাধারণের উপর চাপায় সে টাকা রক্ষণাবেক্ষণের ভার, তার ফলে হয় জাতীয় ভাবের সৃষ্টি, কিন্তু তার ফলে আবার হয় জাতে জাতে লড়াই ইত্যাদি। যদি এ-সব বিপদ হতে রক্ষা পেতে হয়, তবে এই অর্থকে সর্ব্বসাধারণের সমান ভোগ্য করতে হবে, দেখবে শান্তি আপনা হতে এসেছে, যত বাজে সম্প্রদায় তা লোপ পেয়েছে, অধর্ম্ম চিরতরে বিদায় নিয়েছে।"

ভদ্রলোকের কথাটা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় তো লিখে দিলাম, কিন্তু এখনও বুঝতে পারি নাই তা হয় কিসে এবং কি করে।

চীনদেশ হ'তে আফিং দূর করে দেওয়া অতি সোজা কথা, একজন বল্‌লেন। কিন্তু তারপরই আবার বল্‌লেন, যতদিন এই চীনদেশে ধর্ম্মযাজক থাকবে এবং কন্‌সেশ্যন থাকবে, ততদিন চীন হতে আফিং খাওয়া বন্ধ হবে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি টিয়েনসিনে জাপানী কনসেশ্যন এবং দক্ষিণ চীনে মাকাও নামক পর্ত্তুগীজ অধিকৃত স্থানে আফিং ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের কত কাট্‌তি হয়। হংকং এবং ক্যাণ্টন হতে লোক চলে যায় মাকাও নগরীতে শুধু আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করবার জন্য। তারপর হলেন বৈদেশিক ধর্ম্মযাজক। চীনদেশের লোক ধর্ম্ম বেশ ভাল বোঝে। তবে এই সব ধর্ম্মপ্রচারের অন্য মানে আছে। ধর্ম্মের নামে বেইমানী যত চালান যায়, জগতে আর কিছুতে তেমনটি হতে পারে না। এক-একটি পাদ্রিই বল, আর বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীই বল তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধি মাত্র। শুধু তারা দেখে কোন্ দিকে চীনের লোক এগিয়ে গেল, তারা সেদিকে প্রতিবন্ধক জন্মায়। পূর্ব্বে জাপানীরা বৌদ্ধ মিশনারী পাঠাত না, বর্ত্তমানে ইউরোপীয়ান ধরণে তারাও মিশনারী পাঠাতে আরম্ভ করেছে! যুবকগণ দুঃখ করে অনেক কথাই বল্‌লেন, সকল কথা এখন মনে নাই। তাঁদের সঙ্গে রাতও কাটাতে হ'ল, কারণ এই অন্ধকারে পথ ভোলার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এবং তাঁর সঙ্গী কয়েকজন চীনা সন্ন্যাসীকে প্রাতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ভোর বেলা উঠেই রওনা হলাম এবং তাড়াতাড়ি চলে এসে দেখি রাজা এবং গৈরিক বস্ত্রধারী চীনারা আসেন নাই। কিছুক্ষণ পরে রাজা এলেন, চীনা সন্ন্যাসীরা এলেন, দু'একজনা লামাও এলেন। আহারান্তে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা সুরু করলেন। সে আবার টাকা পয়সার নয়, ভগবানের নয়, এক বেখাপ্পা আলোচনা। যোগসাধনা যাদের জীবনের লক্ষ্য, ভগবান, ইহকাল, পরকাল তারা ভাবে না। তারা ভাবে কর্ম্ম; ফল ভালই হোক, আর মন্দই হোক, বয়ে গেল তাতে। যোগের ফলে অনেকের জীবন-মরণ সমান হয়, তাদের ভাবনা আবার কিসের? তাঁরা

অনেকক্ষণ বসে কথা বল্‌লেন, তারপর বিদায় নিলেন। যে রাজা ভারতের হয়ে এতকাল কাজ করছিলেন, তিনি আজ একজন যোগী। মনে মনে হাসলাম—যোগী হওয়া সোজা, ভগবান লাভ করাও সোজা, কিন্তু দেশসেবা বড় কঠিন কাজ।

দেশ বনাম পিতা

মিঃ তাং ধর্ম্মযাজক, মিঃ ওয়াং যে কি পদার্থ এখনও ঠিক ঠাউরে উঠতে পারি নাই। রাজা এবং ধর্ম্মব্রতীরা বিদায় হবার পর মিঃ তাং এবং মিঃ ওয়াং একের পর অন্যে হাজির হলেন। তাঁদের একে অন্যে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মিঃ তাং মিঃ ওয়াংকে দেখেই মাথা নত করলেন। কারণ আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, মিঃ তাং নিজেই বল্‌তে লাগলেন। যা বলেছিলেন তা এখনই বলছি। কিন্তু আমার তাক লেগে গেল, চীনের লোক এত তাড়াতাড়ি নিজের দোষ কি করে স্বীকার করতে পারে, তারপর বল্‌তে পারে আরও কি করে মনে দুর্ব্বলতা আসে।

মিঃ তাং বলছিলেন,—তাঁর পিতা পশ্চিমের কোনও প্রদেশের সহকারী গবর্ণর। মিঃ তাং আইন ভাল করে পাঠ করে যখন বুঝলেন, দেশের সাধারণ লোকের উপর তাঁর পিতা নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করছেন, তখন তিনি ঠিক থাকতে পারেন নাই। কোন এক গুপ্ত-সমিতিতে যোগ দেন এবং পিতার নিধনের জন্য চেষ্টা করেন। পিতাকে হত্যা করার জন্য তিনি তাঁর পিতার কর্ম্মস্থলে যান এবং তাঁরই মাতার দ্বারা তাঁর অভিপ্রায়ের কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। পিতা তাঁর পুত্রের যেদিন শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, সেদিন এক ইংরেজ পাদ্রী মিঃ তাং-এর পিতার কাছে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান এবং সেদিন হতে তিনি ঐ পাদ্রীকেই পিতা বলে গণ্য করেন। ইচ্ছা ছিল পাদ্রী-পিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পিকিনে এসে সামান্য জ্বরে পাদ্রীর মৃত্যু হয়। অতঃপর মিঃ তাং ভগবৎ তথ্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। যখন মিঃ তাং তাঁর পূর্ব্ব-কথা বলছিলেন, তখন তাঁর চোখের জল ঝরছিল।

সেই দিনই মিঃ ওয়াং বললেন, যেন চ্যাং সুয়ে লিয়াঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। সময় ক্ষেপণ না করে তাঁর বাড়ীর দিকে চল্‌লাম। পথে কতকগুলি

সংবাদপত্রসেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরা আমাকে চীনেরই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি উল্টা তাঁদেরই কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তার জবাব পথে দাঁড়িয়ে তাঁরা আমাকে দিলেন না, নিয়ে গেলেন তাঁদের নির্জ্জন কক্ষে। আমার প্রশ্ন ছিল, প্রেস আইন কেমন তাঁদের দেশে? তাঁরা বলেছিলেন, প্রেস আইন বলে একটা আইন আছে বটে, কিন্তু তার মূল্য নাই। কর্ত্তাদের ইচ্ছামত চলতে হয়। তারপর মজার কথা, কর্ত্তাদের মত বদলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কাল যে মত ছিল আজই তা বদলে গেছে। হয় তো সম্পাদকীয় স্তম্ভে বের হ'ল, মাঞ্চুরিয়াতে জাপানীরা অত্যাচার করছে, সেজন্য সংবাদপত্রখানাকে চিরতরে মুছে ফেলা হ'ল, সম্পাদককে জেলে পাঠান হ'ল, ইত্যাদি। চীনদেশে সম্পাদকীয় কাজ করা আর বিপদের জন্য তৈরী হয়ে থাকা একই কথা। অনেক সময় সম্পাদককে তাঁর আপন ঘরে বেঁধে রেখে নানারূপ নির্য্যাতনও করা হয় শুনলাম। মনে হ'ল, এই কি চীনের স্বাধীনতা? শুন্‌লাম আর ভাবলাম এও বরদাস্ত করছে এরা? সহকারী সম্পাদক, রিপোর্টার, কম্পোজিটার—এরা কাজ করেন নামমাত্র বেতনে। তাঁরা এক ভোজনালয়ে খান, একঘরে শুয়ে থাকেন যেন সবাই এক পরিবারের লোক। এঁরা আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না। খেতে বসে দেখি ভাত আর মূলাপাতা সিদ্ধ সেদিনের খাদ্য। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, প্রত্যেকটি লোক এক-একটি মাণিক, চোখ-মুখে যেমন সরলতা ফুটে উঠছে, অন্য দিকে তাদের কঠোরতা এবং কর্ম্মতৎপরতাও বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ওঁদের বিছানার প্রতি আমার নজর পড়েছিল। পরীক্ষা করে দেখলাম, নীচে গদী, তার উপর বিছান ধবধবে সাদা চাদর, সুন্দর তূলার বালিশ, উপরে মশারি খাটান। পায়ের কাছে প্রত্যেকের এক-একখানা লাল কম্বল। জিজ্ঞাসা করলাম বিছানার এত পারিপাট্য কেন? একটি লোক হেসে বললেন, এটি আমার কর্ম্ম মশাই, আমি বিদেশ ঘুরে এসেছি। আমার ইচ্ছা, আমার ভায়ারা অন্ততঃ রাতে নিদ্রা হতে বঞ্চিত না হন। খাওয়াটা যেমন, তেমন যদি রাতে ঘুম না হয়, তবে অবশ্য মৃত্যু। কর্ম্মক্ষমতা লোপ, আর মৃত্যু তো একই কথা।

ঘরটার মাঝে যত জিনিষপত্র দেখলাম, তা সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বড় বড় অক্ষরে চীনা ভাষায় লেখা রয়েছে "থুথু ফেলবেন না"। এই লেখাট

দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেন একটা লোক থুথু ফেলতে যাচ্ছে এবং অপর একটা লোক তার মুখে হাত চাপা দিয়েছে তা বন্ধ করবার জন্য। কথাটা আমি ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছি কি-না, একজন চীনাকে ডেকে এনে এই কয়টি কথা লেখালেই বোঝা যাবে। ঘরের মাঝে এক কোণে কতকগুলি বই তাও অতি যত্নে সাজান। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওঁদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে চ্যাং স্যুয়ে লিয়াঙের বাড়ীর দরজার কাছে এলাম। একটা প্রহরী বাড়ীর সামনে কাজে ব্যস্ত ছিল।

চ্যাং স্যুয়ে লিয়াং যদিও মাঞ্চুরিয়া হারিয়েছেন নিজের দোষেই অনেকটা, তবুও তাঁর মেজাজ ও চালচলন পূর্ব্বের মতই রয়েছে। প্রথম আঙ্গিনাটা পার হয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আঙ্গিনাতে পৌঁছে শুনলাম তিনি বাড়ীতে নাই। তাঁর সেক্রেটারী বেশ ইংরেজী বল্‌তে পারেন। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন, আমি যেন আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না আসি। মন তাঁর ভীষণ খারাপ, তারপর মাঞ্চুরিয়াতে যে-সব নতুন ঘটনা ঘটছে তার জন্য চ্যাং কাইসেক চ্যাং স্যুয়ে লিয়াংকেই দোষী করছেন। এইরূপ বিপদ যাঁর সামনে তিনি পর্য্যটকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন? আর যাই নাই সেখানে।

ফিরবার মুখে একটা ছোট গলি দিয়ে চলেছি। গলির উপরটা পাতার চাটাই দিয়ে আবৃত করা হয়েছে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র যাতে গলিতে প্রবেশ না করতে পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। পথ চলে অনেকটা অবসাদ এসেছিল, তাই ভাবলাম একটা দোকানে বসে একটু চা খেয়ে নিয়ে তৃষ্ণা মিটাই। ঘরে অনেক লোক বসেছিল। আমার প্রবেশে যেন অনেকের শান্তি ভঙ্গ হ'ল। এরূপ শান্তিভঙ্গের কারণ আমি সর্ব্বদাই হয়ে থাকি। অনেকে এসে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কথা জমল না, কারণ ভাঙ্গা চীনা ভাষায় বড় বড় ভাব প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন। একজন বেশ ইংরেজী জানা লোক দয়া করে প্রশ্নকর্ত্তাদের সাহায্যকারী হলেন। শেষটায় তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। আমি মাঞ্চুরিয়ায় যাব কথাটা শুনে তাঁর চমক লাগল। তিনি বল্‌লেন, যদিও সংবাদপত্রে মাঞ্চুরিয়াতে শান্তি স্থাপিত হয়েছে বলে শুনা যায়, তার এক বিন্দুও সত্য নয়। সন্ধ্যার পরই 'স্নাইপিং' সুরু হয়, থাকে রাত চারটে পর্য্যন্ত। তারপর পথঘাট মোটেই নাই বললেও

চলে। তাঁকে অভয় দিয়ে বল্লাম, মৃত্যুর ভয় করি না, অতএব স্নাইপিংএর ভয়ের কথা বলে আর দরকার নাই। অন্য কোন সংবাদ আছে কি-না বলে দিন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে এক টুকরা শক্ত কাগজে কি লিখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, যে কেউ আমাকে ডানহাত মুঠা করে কিল বা ঘুষি দেখাবে তাকেই যেন আমি এই কাগজখানা দেখাই, তা হলে সে-ই হবে আমার সাহায্যকারী এবং আমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু যদি কোন জাপানী অফিসার সে কাগজখানা পায়, তবেই আমার বিপদ হবে, এমন কি মেরেও ফেল্‌তে পারে। চীন সরকারের লোকও যেন কেউ না দেখে। কাগজখানা মুড়ে নিয়ে মানিব্যাগে রাখলাম এবং কাগজখানা দিবার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

পিকিনে ছিলাম প্রায় একুশ দিন। দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল এক-একটি ঘণ্টার মত। অনেকসময় বসে ভাবতাম আর বুঝি দেখার কিছুই নাই। তারপরই আবার যখন নতুন কিছু সামনে এসে যেত তাই নিয়ে কাটত বেশ। মিঃ ওয়াং কোন্ দলের লোক এখনও আমি বুঝতে পারি নাই, তাই যখন বিকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এ কাগজখানা তাঁকে দেখাই নাই। কিন্তু তিনি ছাড়ার পাত্র নন্। ফস্ করে বলে ফেললেন, একটা লোক আপনাকে এক টুকরা কাগজ দিয়েছে তা দেখালেন না? আমি যেন আকাশ হতে পড়লাম। আমি যা করছি সবই ইনি জানছেন কি করে? তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি সব সময়ই আমার পিছনে থাকেন। দেখলাম লোকটির মনে রাগের সঞ্চার হয়েছে, তারপর সামলে নিয়ে বললেন, দেখলেন আমি রিক্‌সা টেনেছি, ভদ্রলোক সেজেছি, তাং আমার সামনে বসে তার দুঃখের কথা বল্‌লে, এতেও বুঝতে পারলেন না আমার এখানে আধিপত্য কত? ভারতবাসী কি-না তাই আক্কেলের অভাব। আর কথা বাড়তে দিলাম না, বুঝলাম ইনি একজন সরকারদ্রোহী, বিশেষ করে চ্যং কাইসেকের শত্রু। কিন্তু এটা আমার ধারণা হচ্ছিল না এরা একে অন্যে এত তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠায় কি করে? মিঃ ওয়াং আমার দেশ তুলে কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইলেন, কারণ তাঁদের মতে দেশ এবং জাত তুলে গালি দিলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য অনুতপ্ত হতে হয় এবং ক্ষমা চাইতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়

দু'জনে মিলে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের দিকে চল্‌লাম। ছাত্রাবাস দেখা আমার একটা বাতিক। সুরম্য অট্টালিকা, ছাত্রদলের কলরব দূর হ'তেই শুনা যাচ্ছিল। আমরা একটা বড় হলঘরে গিয়ে বসেই ছাত্রদের সেক্রেটারীকে ডাকলাম। তিনি তখন ঘরে ছিলেন না, কিছুক্ষণ পরে এলেন। আমাদের পরিচয় হয়েছিল পূর্ব্বেই তাই আর বেশী কথা না বলে চল্‌লাম ছাত্রদের ঘরগুলি দেখতে। অনেকগুলি ঘর দেখা হ'ল। প্রায় ঘরেই তিন হতে চারটী সিট আছে। ছাত্র-জীবন হোষ্টেলে কেমন ওদের কাট্‌ছে জিজ্ঞাসা করলাম। ছাত্রেরা অনেক রকম কথা বল্‌লেন, তা হতে সাধারণ এক কথায় বুঝেছিলাম, ছাত্র-জীবন শুধু বই ঘাঁটা নয়, এ জীবনে অনেক কাজ আছে। খেলা-ধূলা বাদ দিলে আরও অনেক করবার আছে। অনেকে আবার খেলা-ধূলা ছেড়েই দিয়েছেন কাজের জন্য। যে-সব যুবক কাজের জন্য খেলা-ধূলা করতে পারেন না, তাঁরা রাতে চারটের সময় উঠে পাঠ অভ্যাস করেন এবং ছ'টায় ব্যায়াম করেন। সাতটা হতে কাজ সুরু হয়। তাঁদের অনেকে আবার নামকা-ওয়াস্তে হোষ্টেলে থাকেন, বাইরেই তাদের সারাদিন কাটে। এ-সব কাজের সারমর্ম্ম এক কথায় বুঝেছিলাম, তাঁরা মাতৃভূমির মুক্তির জন্যই কাজ করেন, তা ভালর পথেই হোক কি মন্দের পথেই হোক। লক্ষ্য করেছিলাম, প্রত্যেকটি যুবক যেন এক একটি ব্রহ্মচারী। গোলাপী গালগুলি যেন বলে দেয়, তাঁরা সুখ-শান্তি ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের দেশের মুক্তির দিকেই। তাঁদের ব্রীজ খেলবার সময় নাই, সিনেমা যাবারও অবসর নাই। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি এ বৎসরে ক'খানা সিনেমা ছবি তাঁরা দেখেছেন? কেউ দুই, কেউ এক, পাঁচের বেশী কেউ দেখেন নাই। অর্থের অভাব এর কারণ হতে পারে, কিন্তু কাজ চুকিয়ে যারা উঠতে পারে না, তারা আবার সিনেমা দেখবে কি করে?

কচি কণ্ঠের কলরব শুনছি, এরা কে? ছোট ছোট ছেলেগুলি গান গাইছে, পাঠ শিখছে, শব্দের অর্থ নিয়ে ঝগড়া করছে, কে কাকে মেরেছে তার বিচার চলেছে, কে ক'খানা মাংসের টুকরা বেশী খেয়েছে তা নিয়ে অঙ্কপাত

চলেছে, কার মার্বেলের গুলিটা কোন গর্ত্তে পড়ে গিয়েছে তা ওঠাবার চেষ্টা হচ্ছে। এই হ'ল কলরবের কারণ। কিন্তু যারাই সতর-আঠার বৎসরে পড়েছে, চিন্তায় তাদের মুখ গম্ভীর। জাপানী তাদের দ্বারে, তারা ভাবছে কি করে জাপানী তাড়াবে, মাঞ্চুরিয়া ফিরে পাবে, তারপর তাদের শান্তি। ছাত্রদের একটি ফেডারেশন বা সমিতি আছে, তার ক্ষমতাও প্রচুর। বেলা অধিক হচ্ছিল ফের আস্‌ব বলে এদের নিকট হতে বিদায় নিলাম।

পরদিন প্রাতে ফের বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না করে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে একটা দেশলাইয়ের কারখানায় গেলাম। দেখ্‌লাম, অনেকগুলি গরীব ছেলে বসে নিজ হাতে কাঠিতে বারুদ লাগিয়ে দিয়ে শুকাচ্ছে, কতকগুলি ছেলে প্যাকেট তৈরী করছে, আর কতকগুলি ছেলে তা ভর্ত্তি করছে। আয় তাতে অল্পই হয় বটে, কিন্তু গরীব ছেলেদের তাতেই বেশ দিন চলে যায়। এখানে একটা দেখবার বিষয় ছিল, তা হ'ল জাপানী ধরণের একটি স্নানাগার। এই স্নানাগারটি থাকাতে ছেলেদের শরীর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং কাপড়গুলিও বেশ ঝক্‌ঝক্ করছে, পবিত্রতা ফুটে উঠছে। আমাকে দেখে অনেকগুলি ছেলে আমার কাছে এল, আত্মীয়তা দেখাল, তারপর চলে গেল নিজ নিজ কাজে।

চীনদেশে একটি মজার নিয়ম আছে। সেটি হ'ল অপরের ছেলে-মেয়েকে আদর-না-করা। এখনও চীনে অনেক ছেলে-মেয়ে চুরি হয়। ছেলে-মেয়ে চুরি করে তাদের মেরে ফেলা হয় না, পোষা হয়, আপন করা হয়, তারপর জীবনের সঙ্গী করা হয় পুত্রকন্যারূপে। এতে অনেক ধনীর ছেলে গরীবের বাড়ী চলে যায়, অনেক গরীবের ছেলে ধনীর বাড়ীতে চলে আসে। ধনী ভাবে যদি গরীবের ছেলে তার বাড়ীতে থাকে তবে উন্নতি হবে, কারণ গরীবের ছেলের শরীর আপনা হতেই মজবুত হয়, ফলে তার বংশধররাও মজবুত হবে। এতে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হবে। গরীব ভাবে পরিবারের সংখ্যা বাড়লেই দুটা পয়সা বেশী আসবে। ছেলে-মেয়ে চুরি করতে হলেই তাদের লোভে ফেলতে হয়। যাতে কেউ কারো ছেলে-মেয়েকে কোনরূপ লোভ দেখিয়ে চুরি করতে না পারে, সেজন্য এখন একটা সামাজিক নিয়ম হয়েছে

কোন আত্মীয় কোন আত্মীয়ের ছেলে-মেয়েকে আদর করে না। কিন্তু প্রগতিপন্থীদের মধ্যে এই নিয়মটির চলন হয় নাই।

দেশলাইয়ের কারখানা হতে আমরা চললাম একটি ছোট বিদ্যালয়ে। তথায় অনেকগুলি কচি ছেলে-মেয়ে আনন্দে খেলছে। এখানে তিনজন শিক্ষয়ত্রী, একজন শিক্ষক। শিক্ষয়ত্রীগণ সেলাইয়ের কাজে মত্ত। ছেয়ে-মেয়েগুলি কখন বই পড়ছে, কখন বা খেলা করছে, চীৎকার করছে, হাসছে কাঁদছে, একজনকে অন্যজন মারছে, ইত্যাদি। এরূপ কেন করা হয় জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, শৈশব থেকেই ছেলে-মেয়েদের ভিতর ঐক্য স্থাপন করা এর একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, গরীবের ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃই ধনীর ছেলে-মেয়েকে ভয় করে। এর প্রতিকার না হলে ভবিষ্যৎ জীবনে গরীবের ছেলে-মেয়ের ভীতি থেকে যাবে। এ-সব বালাই যাতে দূর হয় সেজন্যই এরূপ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব কম এবং এতে উঁচুঘরের ছেলে-মেয়ে নাই বললেও চলে। বিদ্যালয়টি দেখে বেশ আনন্দ হ'ল।

রেলগাড়ী না, যমের বাড়ী

রেলষ্টেশন দেখাও একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে আমি ধরে নেই। রেলষ্টেশনে গিয়ে দেখলাম অনেকটা আমাদের দেশের মতই, তবে প্রভেদ এই, এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটু বেশী। নোংরা লোককে ষ্টেশনের মাঝে যেতেই দেওয়া হয় না। লাগেজ অফিসে ভয়ানক ভীড়। গাড়ীতে সাধারণতঃ এটাচি-কেস ছাড়া আর কিছু নিতে দেওয়া হয় না, অন্যান্য সবই লাগেজে দিতে হয়। একের পর এক আপন আপন লাগেজ দিয়ে তার রসিদ নিয়েই সরে পড়ছে। আমি লক্ষ্য করছিলাম, ঘুষ দেওয়ার কোন প্রথা আছে কি-না। সে দোষটি মোটেই নাই দেখে বেশ আনন্দ হ'ল। প্রত্যেকের সঙ্গেই কেরানী সদ্ব্যবহার করছেন দেখলাম। ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হ'ল। তিনি বললেন, অতি সত্বরই তাঁরা আপন লাইন বাড়াবার চেষ্টা করবেন। জাপানী আইন-কানুন যাতে সত্বর প্রবর্ত্তিত হয় তাঁরা তারও চেষ্টায় আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জাপান তো আপনাদের শত্রু, তবে তাদের আইন-কানুন

প্রচলনের চেষ্টা করছেন কেন? তিনি বললেন, "যা ভাল তা শত্রুরই হোক আর মিত্রেরই হোক, আয়ত্ত করতে ক্ষতি নাই।"

আমাদের দেশে রেলগাড়ীর শত্রু নাই। যা দু'একটা ধাক্কাধাক্কি হয় তাও অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু চীনদেশে রেলগাড়ী নয় যেন যমের বাড়ী। গাড়ীতে বসে কেউ বলতে পারে না, গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে কি-না! এক নানকিনের সরকারী লোক ছাড়া চীনে যত দল আছে সবাই রেল-লাইন ধ্বংসে ব্যস্ত। শুনলাম, এতে নিকটস্থ বৈদেশিক সরকারও অনেক চতুরতা করেন। এতে লাভও আছে, ক্ষতিও আছে। ক্ষতির পরিমাণই বেশী। চ্যাং সুয়ে লিয়াং মারা গেলেন গাড়ীতে চড়েই। অনেক রাজনৈতিক চাল রেলগাড়ীর মারফতে চল্‌ছে। অথচ এমন সোজাভাবে কাজ সারা হয় যে সে কাজ করতে মাথা ঘামাতে হয় না মোটেই। বোমার সাহায্যে সেতু উড়িয়ে দেওয়া, লাইন কেটে ফেলা, লাইনচ্যুতি করা, ইঞ্জিন এবং প্যাসেঞ্জার সমেত গাড়ীকে গাড়ী ঘায়েল করে দেওয়া ইত্যাদি। হারবিনের কাছে সিঙ্গোরী নদীর উপর যে পুলটি আছে তা নিয়ে রুশ, জাপান, মাঞ্চুকো এবং মা-চান্দ সান কম চেষ্টা করেন নাই। একে রক্ষা করতে চেয়েছেন, অন্যে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। রেল লাইন বজায় রাখতে চীন সরকারকে বড়ই বেগ পেতে হচ্ছে। বিপ্লবীরা সুবিধা পেলেই লাইন কেটে দিয়ে মাঞ্চুকো, চীনা, জাপানী—সবাইকে নাকাল করছে। যে গ্রামের কাছে রেল লাইন নষ্ট হয়, সেই গ্রামের লোকের উপর সাধারণতঃ সরকার চাপ দেন। কিন্তু সে গ্রামের লোক জানে না কে করেছে। তবু তাদের উপর অত্যাচার হয়, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গী হয়ে পড়ে। এই রেল লাইন চীনের বুকে বিপ্লবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ষ্টেশনমাষ্টার প্রত্যেকটি কথার পর এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিলেন, এখনও যেন তাঁর সেই দীর্ঘনিশ্বাস আমার কানে বাজছে।

বিপ্লবী কিম্বা কমিউনিষ্ট বলে যাদের চীন সরকার বলেন, তারা অনেক সময় চীন সরকারের সাহায্য করতেও ত্রুটি করে না। তাদের লক্ষ্য হ'ল চীনদেশকে স্বাধীন করা, আইন-কানুন দুরস্ত করা। যে-সব লোক বিদেশী সরকারের বেতন খেয়ে চীনের রেল লাইনের উপর অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়, তাদের বিপ্লবীরা

পেলে ছাড়ে না, পাঠিয়ে দেয় যমের বাড়ী। জাপানী ধ্বংসের জন্যই রেল দুর্ঘটনা ঘটায়। যদি কোন মতে জাপানীর মৃত্যু হয়, অমনি জাপান সরকার চীনের উপর হুমকী চালান শৃঙ্খলার জন্য, শান্তির জন্য, ধনজন রক্ষার জন্য। অনেক সময় আবার বিপ্লবীদের এবং ভাড়াটে বিপ্লবীদের মধ্যে বেশ লড়াই বাধে, এতে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তখন এ-সব বিপ্লবীদের ডাকাত বলে আখ্যা দেন।

রেললাইনের উপর আরও কতকগুলি বিপদ আসে, তা হ'ল যখন এক জেনারেল অন্য জেনারেলের সঙ্গে লড়াই বাধান। সর্ব্বপ্রথমই চেষ্টা হয় রেল লাইন দখল করতে, অনেক সময় বহু মাইল ব্যাপিয়া লাইন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। মামুলী খণ্ডযুদ্ধে এই কাজটি বড়ই মারাত্মক। যারা লাইন ভেঙ্গে দেয়, তারাই অনেক সময় লড়াইয়ে কৃতকার্য্য হয়, কারণ অন্য পক্ষ সত্বর সৈন্য নিয়ে হাজির হতে পারে না। রেললাইনের বিপদের কথা ষ্টেশন মাষ্টারের মুখে শুনে মনটা দমে গেল। মনে মনে ভাবলাম এমন রেললাইনের উপর দিয়ে যে গাড়ী চলাফেরা করে তাতে না ওঠাই ভাল। কিন্তু আমাকে এরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল গাড়ীতেও চাপ্‌তে হয়েছিল।

দেশের ডাকে

ব্রিটিশ কনসালের বাড়ীর দিকে চলেছি এমন সময় মিঃ তাং‌এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি বল্‌লেন, "South Sea Islands হতে কতকগুলি লোক এসেছে, তারা যাবে চাঁহার। তাদের কাছে আমি আপনার কথা বলেছিলাম, তারা আপনাকে দেখতে চায়, দয়া করে চলুন।" মিঃ তাং এরই মাঝে তাঁর পাদ্রির পোষাক বদল করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা ফটো তোলা হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলাম, এখন আর লম্বা কোট পরবার দরকার নাই, যদি ধর্ম্মের দিক্ দিয়েই দেশকে সেবা করতে চান, তবে খাঁটি ভারতীয় প্রথা ধরুন। তাঁকে আমার একখানা বিবেকানন্দের চার আনা দামের চটি বাঙ্গলা উপদেশ বই দিয়েছিলাম। বাঙ্গলা হতে আমি মুখে মুখে ইংরেজী বলি, তিনি তা চীন ভাষায় তরজমা করেন। আমার ইংরেজী জ্ঞান চলনসই রকমেরও নয়, তবুও যা পেরেছিলাম তাই বলেছিলাম। এই উপদেশ বই আমার কাছে

পেয়ে তিনি যেন নবজীবন লাভ করলেন। আমার তখনকার একমাত্র উপদেশ বই তিনি না গ্রহণ করে ছাড়লেন না। আমার মনে হয়, এই ছোট বইখানা ইংরেজীতে অনুবাদ করে যদি চীনদেশে পাঠান হয়, তবে অনেক কাজ হয়। চীনা যুবক বিবেকানন্দকে পছন্দ করবে, অন্তরে স্থান দিবে।

মিঃ তাং-এর অবস্থা দেখে আমার বেশ আনন্দ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিনি ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটা ছোট স্কুল খুলেছেন। তারই বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলেন। মিঃ তাং অনেকবার বিবেকানন্দ মিশনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বিপরীত পথে চললাম। পথে চল্‌তে চল্‌তে কথা বলার অভ্যাস নাই। বড় রাস্তা ধরে গিয়ে আমরা ঢুকলাম একটা গলিতে। একটা ঘরের দরজায় আমরা ধাক্কা দিলাম। দরজা খোলা হ'ল। ঘরে প্রবেশ করেই দেখি তিনটি ছেলে বসে মানচিত্র দেখ্‌ছে। মলয় ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বললাম। তারা কত আনন্দিত হ'ল আমার মলয় কথা শুনে তা আর বলবার নয়। "আবাং আবাং" করে আমাকে অস্থির করল। তাদেরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তারা যাবে চাঁহার, জাপানীদের সঙ্গে লড়তে। চাঁহার নাকি জাপানীরা নিবেই। আমি তাদের বললাম, "আমাকে যেরূপভাবে তোমরা আবাং আবাং (বড় দাদা) বলে অস্থির করে তুলেছ, তাতে মনে হয়, তোমরা চাঁহারে গিয়ে কোন কাজ করতে পারবে না।" কথাটা শুনে তিনজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুঝিয়ে বল্‌লাম, "চলেছ মরতে এবং মারতে, কিন্তু তোমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা প্রচুর রয়েছে, আমি তোমাদের ফিরে যেতে বলছি না, যাও সম্মুখ সমরে, কিন্তু এর পূর্ব্বে কেন মরতে চলেছ তা বুঝে নেওয়া উচিত। চীন সরকার তোমাদের মা-বাপকে পেনসন দিবেন না, তোমরা পঙ্গু হলে কেউ কাছে এসে দাঁড়াবে না, তারপর যে চ্যাং স্যুয়ে লিয়াং তোমাদের তৈরী করেছেন চাঁহারে পাঠাতে, তাঁরই বা ক্ষমতা কত তা ভেবে নাও।" ওদের মুখ গম্ভীর হ'ল, দেখে আমার দুঃখ হ'ল। তারপর তাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য ফের বল্‌লাম, "পঙ্গু হও, মৃত্যু হয়, চ্যাং স্যুয়ে লিয়াং যে কেউ হোক তোমাদের উদ্দেশ্য দেশ-মাতৃকার সাহায্য করা, করা উচিত তা, কিন্তু তোমাদের মন যেরূপ দুর্ব্বল, সেরূপ হওয়া উচিত নয়। নিষ্কামভাবে

দেশসেবাই হ'ল সকলের কর্ত্তব্য।" কথাগুলি যদিও বল্‌লাম, আমার প্রাণ কিন্তু কাঁদছিল এই যুবকগুলির জন্য। আমার এখন বয়স হয়েছে, যুবক দেখলেই মনে হয়, এদের এই পৃথিবীতে অনেক কিছু উপভোগ করবার আছে, এরা মরবে কেন? মিঃ তাংকে তা বলেছিলাম। মিঃ তাং বলেছিলেন, তা হবার জো নাই; জাপানীদের সাম্রাজ্য-লিপ্সা দিন দিন যেরূপ বেড়ে চলেছে, এখন হতে সাবধান না হলে হয় তো সমুদায় চীনটাকেই গ্রাস করবে।

দ্বিতীয় বাড়ীতে আরও দশজন ছিল। তারাও যেন মরণমুখী হয়েই এসেছে। এদের মরণের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখে আমার মনে হ'ল এরূপ করে যদি সমুদায় চীনারা মেতে ওঠে মরতে, তবে জাপানীরা তিন দিনে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া খালি করে দিয়ে চলে যাবে। ওরা আমাকে না খাইয়ে ছাড়ল না। তাদের সঞ্চিত অর্থের কতকটা আমার ভোজনের তরে খরচ করল। এরা মাত্র ভলাণ্টিয়ার, ভলাণ্টিয়ার কোন মাইনে পায় না। বিদায়ের বেলা কেউ মুখ কালো করল না, সবাই হেসে হেসেই আমাকে বিদায় দিলে। একটি ছেলে বল্‌লে, বিকালে সে আসবে আমার হোটেলে। সে এসেছিল; সে অনেক কথা বলেছিল; একবার বল্‌লে, যদি এ জীবনের পর অন্য জীবন হয়, তবে যেন পরাধীন দেশে সে জন্মগ্রহণ করে, আর প্রাণ দেয় তাদের স্বাধীনতার জন্য। আমার সঙ্গে কথা বলে সে আরাম পেয়েছিল, কারণ সে ম্যাণ্ডারিন জানত না, তার মাতৃভাষা ছিল হেকেইন। সে ছিল মলয় ভাষায় একেবারে ওস্তাদ।

পিকিন দেখা আমার হয়েছে। অনেক স্থানে গিয়েছি, অনেক কথা শুনেছি। এখন আর ভাল লাগছে না পিকিনে। যবদ্বীপের ছেলেরা আর আমাকে হোটেলের বাইরে যেতেই দেয় না, নানা কথা, নানা গল্প, তারপর তাদেরই অর্থের সৎকার ক্রমাগত চল্‌ল দুদিন। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র, ইউনিভার্সিটির ছাত্র—এরাও আসত। আমার ঘরটা এখন একটা আড্ডাতে পরিণত হয়েছে। মিঃ তাং এবং ওয়াং উভয়ই আসেন। ঘরে বসে এখন পিকিনের সব খবর পাই। কয়টা দিন বেশ আনন্দেই কাটল।

মাঞ্চুকো-যাত্রা

একদিন প্রাতে তল্পী বেঁধে, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথেই রওনা হলাম। টিয়েনসিন গিয়ে আর থাকতে ইচ্ছা হ'ল না, এগিয়ে চল্লাম সাংহাই-কোয়ানের দিকে। মিঃ ওয়াং বিদায় দিতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু এখন যেন তাঁর সঙ্গ হারিয়ে অনেকটা ফাঁকা অনুভব করছি। এদিকে গরম বেশ জেঁকে উঠেছে। কিন্তু আমার দেশী-ভাইদের বাড়ীতে খেয়ে শরীরে খুব শক্তি হয়েছে বলে আর গরম, গরমই লাগে নাই। দেড় দিনের পথ একদিনে পাড়ি দিতে পেরেছিলাম। শরীরে এবং মনে ভরপূর আনন্দই ছিল। টিয়েনসিন ছাড়িয়ে আমি এগিয়ে চল্লাম সাংহাই-কোয়ানের দিকে। টিয়েনসিনে এসে আবার নতুন বিপদে না পড়তে হয়, সেজন্য ব্রিটিশ কনসেশ্যনেই ছিলাম। একবার শুধু জাপানী কনসেশ্যনে গিয়ে আফিং বিক্রির নমুনা দেখে এসেছিলাম।

জাপানের ছল-কৌশল

এক জাত কি করে অন্য জাতকে জাহান্নামে পাঠায়, তা যদি কেউ দেখতে চান, তবে একবার টিয়েনসিনে জাপানী কন্‌সেশ্যনে এসে দেখে যাবেন। যারা ব্যক্তিবিশেষের দয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটা জাতের সম্বন্ধে একটা বড় ধারণা করে বসেন, তাঁরা যে নিতান্ত ভ্রান্ত এই স্থানটি তার নিদর্শন।

মাকাও নামক স্থানের কথা বলেছি। এখানেও অনেকটা তাই। তবে এখানে আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মাকাওতে, হংকং এবং ক্যাণ্টন হতে লোক আনন্দ করতে যায় মাত্র, অবশ্য তাকে আনন্দ বললে ঠিক বলা হয় না। "আসাই" বিয়ার হতে যত রকম জাপানী পানীয় সবই মজুত। যখন যুবক-যুবতী নেশায় বিভোর হয়, তখন কত কিছু বকে তার ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আফিংএর পাইপও তাদের সামনে হাজির করা হয়। সোনায়-সোহাগা।

তারপর যখন অবসন্ন হয়ে, হাই তুলে চোখের পাতা খুলল, তখন একজন এসে বললে, এই নিন্ গরম জল, এই নিন খাবার। তারপর বলা হয়, আপনজনের মত, এটি তোমাকে করতে হবে, যদি এর পরও এরূপ আনন্দ পেতে চাও। যুবক-যুবতী তাতেই রাজি হয়। চলে যায় নিজের জাতের সর্ব্বনাশ করতে, আপন ভাই-বোনদের ধরিয়ে দেয় জাপানীদের কাছে, আপন দেশের সর্ব্বনাশ করে মাদকতার বিনিময়ে।

তারপর যখন পাকা আফিংখোর হ'ল, তখন সে একটি কেনা গোলাম। চীনদেশের ভিতর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চ্যং কাইসেক হতে আরম্ভ করে ক্ষুদে কমিউনিষ্ট বলে যাদেরে আখ্যাত করা হয় তাদের সংবাদ নিতে। গরুকে মাঠে ছেড়ে দাও, সারাদিন ঘাস খেয়ে রাতে আসবেই বাচ্চাটার মায়ায়। ঠিক সেরূপ সেই আফিংখোর আসবেই যখন তার টাকা ফুরিয়ে যায় তখনই। আপন দেশের সংবাদ যতদূর পারে নিয়ে পৌঁছায় বিদেশীর কাছে। সংবাদ যদি ভাল আন্‌ল, তবে তার কতই আদর-যত্ন। তারপর কতকগুলি লোক আছে, তারা আফিং খায়, আর কারবার করে। টাকা না হলে আফিং আসে না। জাপানী সিল্ক সস্তা, এদিকে চীনে তার উপর অনেক শুল্ক রয়েছে, তা হতে রেহাই পাবার জন্যে রাতারাতি এই আফিংখোরের দল জাপানী সিল্ক চীনের মাঝে পৌঁছে দেয়। তারা একেই বলে ব্যবসা।

প্রথম প্রথম এরূপ কাজ করতে এদের যে খট্‌কা না লাগে তা নয়, কিন্তু আফিঙের কৃপায় যখন একেবারে পোষ মেনে যায়, তখন দেখতে পাওয়া যায় সেই লোকটাই জাপানী হয়ে গেছে অন্তরে অন্তরে, বাইরে যদিও সে চীনাই থাকে। জাপানীদের যত বদগুণ সবই সে নিয়ে নেয়, কিন্তু ভাল গুণগুলি মোটেই গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তারও চোখ খোলে একদিন, যখন তার ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। সে তখন হয় পথের ভিখারী, কেউ তার কথা শোনে না। আমি এ-সব লোকের কথা তাদের কাছে বসে মন দিয়ে শুনেছি বলেই আজ বলতে সক্ষম হচ্ছি।

টিয়েনসিনে এসে একটা চীনা চায়ের দোকানে বসে ধীরে ধীরে এক পেয়ালা চা খাচ্ছিলাম, একটা লোক তা বড় বড় চোখ করে দেখছিল। বুঝলাম লোকটার হাতে পয়সা নাই, তাই চা খেতে পারছে না। তাকেও আমার

পয়সায় এক পেয়ালা চা দিতে বল্‌লাম। সে খুব খুশী হল তা পেয়ে। তারপর কথা জমে উঠল, ধীরে ধীরে সে তার জীবনের কাহিনী আমাকে শুনাতে লাগ্‌ল। আমি শুনতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম, এই করেই একটি জাত অন্য আর একটি জাতকে খেয়ে ফেলে, একদম হজম করে ফেলে। জাপানও আজ চীনের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে নানা ছলে আফিঙের ভিতর দিয়ে। চীনা আর জাপানীতে প্রভেদ অতি অল্পই, কিন্তু জাপানীর জাতীয়তাবোধ সরল বিশ্বপ্রেমকে একেবারে চূরমার করে দিয়েছে।

টেকো নামক ছোট শহরটি ডাইনে রেখে, পার্ব্বত্যভূমি বাঁয়ে রেখে, সমুদ্রতট ধরে চলেছি। ছোট-বড় অনেক গ্রাম পার হয়ে গিয়েছি, কারো দিকে তাকাই নাই, উদ্দেশ্য বর্ত্তমান চীনরাজ্যের সীমানা হতে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া। নতুন মাঞ্চুকো দেখতে হবে। তবে এই যে স্থানটুকু টেকো হতে সাংহাই-কোয়ান, এখানেও সবই আমার কাছে নতুন লাগছে। যদি কোন গ্রামের কাছে একটি ব্যাঘ্র বসে থাকে এবং একটির পর একটি করে সেই গ্রামের লোককে ভক্ষণ করে, তবে সেই গ্রামের যে অবস্থা হয়, এদিকের লোকেরও সেই অবস্থা। গ্রামের পর গ্রাম দেখছি, কোথাও শান্তি নাই, সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। এমন কি গ্রামের পর্ণ-কুটীরের যারা মালিক তারাও ঠিক করতে পারছে না পুরাতন গৃহ নতুন করে গড়বে, কি একেবারেই ছেড়ে দিবে। একেই বলে রাষ্ট্রবিপ্লব। তাদের অন্য কথা ভাববার ফুরসৎ নাই। শুধু নিয়ত ভাবছে ঐ বুঝি দাসখত লিখে নিয়ে জাপানী এল তাদের হাত দিয়ে দস্তখত করাতে। কিন্তু এই দাসখতে দস্তখত করা আর মরে যাওয়া একই কথা। সাধারণে বোধ হয় এর মর্ম্ম বুঝবে না। তারা হয় তো বোঝে, এক রাজা গেল আর এক রাজা এল তাতে আমাদের কি, যাকে হোক আমরা ন্যায্য ট্যাক্স দিয়েই খালাস। রাজায় রাজায় তো চিরদিনই ঝগড়া চল্‌ছে।

কিন্তু চীনের চাষী সেরূপ নয়। তার ভাবনা তার জাতির স্বাধীনতা। আমি হাসতাম আর পথ চল্‌তাম। জাতীয় স্বাধীনতা আবার কি? তৃতীয় দিনে মিঃ ওয়াং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আমি ছিলাম একটি ছোট শহরের পথেরই পাশে একটি ছোট হোটেলে। মিঃ ওয়াং ঘাস বিক্রী করছিলেন।

ইঙ্গিতে জানালেন রাত্রিতে আসবেন। এলেন অনেক রাতে। আমি তাঁকে বললাম, "এই দেখুন জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে আপনার জাত কত কষ্ট করছে। আমাদের দেশের কবি, এখন তিনি বিশ্বকবি—তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বোধ হয় তাঁর নাম শুনেছেন?" তৎক্ষণাৎ বললেন, "হাঁ তিনি বিশ্বপ্রেমের কথা বলে থাকেন তা জানি। বিশ্বপ্রেম আসতে পারে না যতক্ষণ জাতীয়তার ভাব থাকবে। আবার যাদের জাতীয়তার ভাব থাকে না তারা বিশ্বপ্রেমিকও হতে পারে না।" আমি রাগ করে বল্‌লাম, এত পরিশ্রম করে এসে আপনার ফিলসফি শুনতে চাই না, এখন ঘুমাব। মিঃ ওয়াং হেসে বল্‌লেন, "যার কিছু আছে সে-ই দান করে কৃতার্থ হয়, কিন্তু যার কিছুই নাই, সে কোথা হতে দান করবে? আপনাদের দেশের বিশ্বকবি বিশ্বকবিই, বিশ্বপ্রেমিক নন, তাঁর স্বাধীনতা নাই, অতএব দিবার মত কিছুই নাই।" এসব বড় কথা শুনতে ভাল লাগ্‌ল না, আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। মিঃ ওয়াং আরও বল্‌লেন, "জাতীয় ভাব কতদূর নিম্নস্তরের জিনিষ তা বুঝবেন একদিন, তবে তা ছাড়তে পারা যায় না। যেদিন এই ভাবটি পৃথিবী হতে বিদায় নিবে, হয় পৃথিবী হতে মানুষ চলে যাবে, নয় পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে।"

ব্রতচারিণী

চতুর্থ দিন দ্বিপ্রহরে একটা ঝাউ জাতীয় গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছি। আমার ছোট সান্‌-গ্লাসটা বালির উপর পড়ে রয়েছে। জলের কেৎলীটি মাথায় দিয়ে বেশ আরাম করছি। সেই পথ দিয়েই কতকগুলি যুবক চলেছিল আনন্দ করে। আমাকে দেখেই তারা কাছে এল, সাইকেলটা দেখল, তারপর আমার পরিচয় চাইল। আমি তাদেরে আমার বিজ্ঞপ্তি পত্র দিলাম। সবাই মন দিয়ে দেখল আমার ছবি। তারা যেন সন্দিহান হ'ল আমাকে দেখে। কয়েকটা ছেলে আমারই কাছে বসে রইল, আর কয়েকটা গ্রামে দৌড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে আমাকে গ্রামে যেতে বলল। গ্রামে গিয়ে দেখি পূর্ব্বপরিচিত এক তরুণী আমার সামনে হাসতে হাসতে হাজির। তিনিই পাঁচ ডলার দিয়েছিলেন সাংহাইএর এক হোটেলে। আমাকে

কাছে নিয়ে বললেন, তুমি বড় শুকিয়ে গেছ, হবারই তো কথা, আমরা না থাকলে সে যাত্রায় তোমার মরণ নিশ্চয় ছিল। এখন বল পিকিন টিয়েনসিন কেমন দেখলে? তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বল্লাম, একটা চীনা পা-জামা নিয়ে আস্থন আগে স্নান করি, তারপর কথা হবে। স্নান করে আহার করলাম, তারপর আমার ভ্রমণ কথা তাঁর কাছে বল্লাম। শুনে বেশ আনন্দিত হলেন। তবে মিঃ ওয়াং লোকটি কে তিনি জানবার জন্য উদগ্রীব হলেন। কিন্তু ঠিক করে কিছুই বলতে পারলাম না। যুবতী বললেন, "সেই ছেলেটি এখন আছে সাংহাই-কোয়ানে, তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তবে সেদিকে বড়ই বিপদ জেনে নিও। একটা গ্রীকের হোটেল আছে, তাতেই গিয়ে থেক, তাতেই স্থবিধা হবে।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এখন সেই তরুণীর ঠোঁটে লিপষ্টিকের দাগ নাই, পরণে নাই সেই জমকালো পোষাক। এখন মামুলী ধরণের চীনা পোষাক তাঁর পরণে, তবুও তাঁর শরীর হতে স্বর্ণাভ জ্যোতি বের হয়ে আসছে। আমরা যখন কথা বলছিলাম, আপন বাড়ীর মত স্নান করতে খালি গায়ে বের হয়েছিলাম, এসেও ছিলাম এইভাবে, আবার হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন তা দেখে যুবকের দল যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে পাঁচটি ডলার দিতে পার হে?" তাঁর হাতে পাঁচটি নয়, দশটি ডলার দিয়ে ধন্য হয়েছিলাম। আমি জানতাম এই দশটি ডলার চীন জাতের মুক্তির জন্য খরচ হবে, এর চেয়ে পুণ্য আর কি হতে পারে? তরুণী তৎক্ষণাৎ দশটি ডলার একটি যুবকের হাতে দিয়ে কি বলে তাকে বিদায় করে দিলেন। আমরা মনের আনন্দে নানা কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম। অনেক কথা। তবে তার ভিতর বিশেষ কথা ছিল কিরূপে মেয়েদের মহলে সেবার ভাব আনা যায় এবং কাজে চটপট নিযুক্ত করা যায়। এই মিশন নিয়েই এই বিপদসঙ্কুল স্থানে সাংহাইয়ের পরিচিত তরুণী এসেছেন। তাঁর হাতে টাকা ছিল না বলে আমার কাছ হতে চেয়ে নিলেন।

রাত্রিতে অনেকগুলি তরুণ-তরুণী এল। পরিচিত তরুণী একটি টেবিল সামনে রেখে চীনা ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টা অনর্গল বলে গেলেন, তারপর সবাই তাঁকে নমস্কার করে বিদায় নিল।

এর পর আমরা আবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম একটা সামান্য বিছানার ওপর। রাত কাটল মহা আনন্দে। তারপর দিন প্রাতে আবার সেই পথে। বিদায়ের বেলা তরুণী বল্‌লেন, "আমরা মিশতে পারতাম না এরূপভাবে যদি আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার বজায় থাকত।" পূর্ব্ব সংস্কার মানে, চীনের মেয়েরা ভারতীয়দেরে এখনও কালোভূত বলেই নির্দ্দেশ করে। তবে যাঁরা নতুনভাবে জগতকে দেখেছেন, তাঁরাই এখন পরিবর্ত্তনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আমাদের দেশে যে-সব চীনা মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা পুরাতনপন্থী, তাঁরা কখনও বিদেশীদের তাঁদের বাড়ীতে স্থান দিবেন না।

সাংহাই-কোয়ান

ব্রতচারিণী চীনা-তরুণীর কাছ থেকে বিদায় যেন চীনের উদার আশ্রয় ত্যাগ, তাই বিদায়ের বেলা মনে একটু দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু এ সব দুঃখকে স্থান দিতে নাই। আরও পাঁচদিন চলে সাংহাই-কোয়ান শহরে পৌছি। গ্রীক হোটেল খুঁজে বার করতে মোটেই সময় লাগে নাই। যত লোক বিদেশ হতে আসেন তাঁরা সবাই এই গ্রীক হোটেলে থাকেন। গ্রীক ভদ্রলোক আমাকে খুব সমাদরে থাকতে দিলেন। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারেন নাই। সন্ধ্যার পর আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমার ভ্রমণ-কথার কতকটা শুনে তৃপ্ত হলেন। তিনি জাপানী ঘোল ও অন্যান্য পানীয় রাখেন এবং তাঁরই দোকানে বসে বসে খেতে দেন। জাপানী ঘোল খাবার আমার ইচ্ছা হ'ল। তিনি একটি ছোট বোতল বার করে তা হতে কতকটা একটি গ্লাসে ঢেলে দিয়ে তাতে জল মিশালেন এবং আমাকে খেতে দিলেন। খেয়ে দেখলাম অবিকল ঘোলই তো বটে! কিন্তু কৃত্রিম, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা প্রস্তুত হয় এবং অনেকদিন রাখতে পারা যায়।

আমি যখন ঘোল খাচ্ছিলাম তখন দুজন মাঞ্চুকো সৈনিক এসে জাপানী আসাই বিয়ার চাইল। গ্রীক দোকানী দুটি বোতল হাজির করলেন। তারা সে বোতল দুটি খুলে গ্লাসে ঢেলে পান করল। একটু বসেই চলে যেতে চাইল। দোকানী বিল হাজির করলেন, কিন্তু তারা দাম দিবে না বল্‌ল।

এর একমাত্র কারণ, তারা মাঞ্চুকো সেনা, পয়সা দিয়ে তারা কিছু খায় না। গ্রীক দোকানীও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি একজনকে ধরে ফেললেন। অন্য লোকটি তৎক্ষণাৎ একটি খালি বোতল দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল। আমি লাফ দিয়ে উঠ্তেই সৈনিক দুটা পালাল। অতি কষ্টে দোকানীর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। মাথায় আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু ভাঙ্গা কাচ গিয়ে ডান হাতে পড়েছিল, তাতে ডান হাতটা বেশ কেটে গিয়েছিল। এসে না বসতে বসতেই একটা ঘটনা ঘটল দেখে আমার মনটা দমে গেল। ভাবছিলাম, এই তো মাত্র স্বরু মাঞ্চুরিয়ার, এরই মধ্যে এতটা। দোকানী দোকানের ভিতর চলে গেলেন।

অন্য কামরায় তিনটি সাদা রাশিয়ান ছিল। তারা সাংহাই হতে এসেছে, যাবে হারবিন। আমার সাইকেলটি নজরে পড়ল এবং আমি কি তার মালিক —জিজ্ঞাসা করল। তাদের কাছে পরিচয় দিবার পর যা ঘটেছে তা বললাম। আমার কথা শুনে সবাই দোকানীকে দেখতে গেল। আমি বাইরেই বসে রইলাম। কতকক্ষণ পরে একটি লোক বার হয়ে এসে আমাকে বলল, সে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চীনা না জাপানী ডাক্তার আনবেন? যুবক বল্ল, এখনও এই এলাকা চীনেরই, চীনা ডাক্তারই ডাকা হবে। কিছুক্ষণ পর একজন চীনা ডাক্তার এলেন ঔষধ নিয়ে। যুবক তিনটি ফিরে এসে আমাকে বল্লে, এ মাত্র স্বরু হয়েছে, কত লোকের প্রাণ যাবে তার কি ঠিক আছে? আমি তাদের কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হারবিন যেতে ক'দিন লাগবে? তারা কেউ বলতে পারল না ক'দিন লাগবে, কারণ রেলে নয় সাইকেলে তারা যাবে। আমার উদ্দেশ্যও তাই তাদের বললাম। তারা আনন্দিত হল বটে, কিন্তু তার পরক্ষণেই তাদের মুখের রং বদলে গেল। বুঝলাম, পথ নিরাপদ নয়। সাহস দিয়ে বল্লাম, যদি তারা আমার সঙ্গী হয় তবে ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। তারা অনেকক্ষণ রুশ-ভাষায় কি বল্ল, তারপর আমায় বললে, কয়েকদিন থাকার পর আমাকে বলবে তারা কি করবে। তাদের বিদায় দিয়ে সেদিনের মত বিশ্রাম করলাম।

প্রাতে রেল-ষ্টেশনে গিয়ে দেখলাম, এদিকে চীন ওদিকে মাঞ্চুকো রাজত্ব

করছে। সাংহাই-কোয়ান চীনের প্রাচীরের ভিতর দিকে। ষ্টেশনের কাছে দাঁড়িয়েছি এমন সময় একটি জাপানী যুবক এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলে, রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করলে খরচ বেশী লাগে, না—সাইকেল চড়ে ভ্রমণ করলে খরচ বেশী লাগে? তার এই আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনে আমি দমলাম না। তাকে বললাম, বোধ হয় সাইকেলে চড়ে ভ্রমণ করলেই বেশী খরচ লাগে। সে-ও আর বিশেষ করে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। তারপরই কেল্লার দিকে রওনা হলাম যেখানে বসে জেনারেল হো পাহারা দিচ্ছেন জাপানীদের। অনেকক্ষণ বসে রইলাম তাঁর দরজায় দেখা করবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাঁর দর্শন পাওয়া গেল না, দেখা পাওয়া গেল সেই ছেলেটির যে আমাকে সাংহাই এনেছিল। আমাকে দেখেই সে কাছে এল। ইঙ্গিতে বল্‌লে তার সঙ্গে যেতে। সে হেঁটে চলেছিল, আর আমি ধীরে সাইকেল চালিয়ে তারই পিছু পিছু গিয়েছিলাম। কতকক্ষণ যাবার পর একটা সেনা-লাইনে গিয়ে প্রবেশ করলাম। একদল সৈনিক আমাকে ঘেরাও করে দাঁড়াল। পূর্ব্ব-পরিচিত যুবক আমার পরিচয় দিল। তারপর সবাই আমার শরীর দেখতে চাইল। সার্ট খুলে তাদের দেখালাম। ভাল হয়ে গেছি দেখে অনেকে আনন্দ প্রকাশ করল। অনেকে বল্‌ল, 'এই যে দেখ্‌ছ কেল্লাটা, এরই উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। যেদিন শুনবে এই কেল্লাটা জাপানীরা দখল করেছে, সেদিন জানবে আমরা আর কেউ ইহ-জগতে নাই।' এই কেল্লাটি পরে জাপানীরা ভেঙ্গে দিয়েছিল একেবারে। মনে হয় সেই যুবক-দলের একটিও বেঁচে নাই।

অনেক কামান, গুলী, বারুদ তারা দেখাল আমাকে, কিন্তু সবাই বল্‌লে, তাদের এরোপ্লেন নাই, বিষাক্ত গ্যাস নাই, সে জন্যে তারা হয়তো পরাস্ত হবে, কিন্তু মারবে আর মরবে, এর বেশী তারা আশা করতে পারে না। জেনারেল হো লাইন দেখতে গিয়েছিলেন। আমাকে ঘেরাও-করা অবস্থায় দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল। তিনি হয় তো মনে করেছিলেন, কোন জাপানীকে সৈনিকেরা ঘেরাও করে রেখেছে, কিন্তু কাছে এসে তাঁর সে ভয় দূর হ'ল। মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন তিনি।

ওদের কাছ থেকে ফিরে আসার পথে মিঃ ওয়াঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

তিনি তখন কুলিবেশে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে এলেন। অনেকক্ষণ বসার পর গ্রীক হোটেল-রক্ষকের চীনা স্ত্রী আমাদের ইউরোপীয় খাদ্য খেতে দিয়ে বাঁচালেন। চীনা খাওয়া খেয়ে খেয়ে আমার মুখে অরুচি ধরেছিল।

মিঃ ওয়াং অনেকক্ষণ বসে রইলেন আমার কাছে, তারপর বড় দুঃখ করে বলেছিলেন, এই হ'ল বর্ত্তমান চীনের সীমা, আমাদের মাঞ্চুরিয়া একরূপ চলে গিয়েছে জাপানীর হাতে। এখানে হয় তো কোন বিপদ হবে না, কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় চলেছেন, সাবধানে থাকবেন। যার সাধারণ জ্ঞান আছে এমন কোন চীনা আপনার সর্ব্বনাশ করবে না। আপনার পথের কাঁটা হবে এই মাঞ্চুকো দলের চীনারা। সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হয়ে যারা নিজের দেশকে পরের হাতে তুলে দিতে পারে, তাদেরই পরস্বাপহরণ করবার প্রবৃত্তি থাকে, তারাই মিথ্যা বলতে কোনরূপ দ্বিধা করে না। কথাগুলি বিষাদ-ক্লিষ্ট, মিঃ ওয়াংও বিচলিত, নীরবেই সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

চীন এবং জাপানের এই নতুন সীমানা আবার দেখতে বের হ'লাম। যতই দেখছিলাম ততই দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কত নতুন ভাব আসছিল, কিন্তু কোনটাই মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। আবার কেল্লার ভিতর গেলাম। পথচারী লোকগুলি আমার দিকে তাকিয়ে দেখত, কেউ কিছু বলত না। বলবেই বা কি করে, এযে তাদের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। তবুও চীনের লোক অনেকে মৌখিক ভাব দেখিয়েছে। অন্যত্র হয় তো এটুকুও পাওয়া যেত না। সাইকেলটা না চালিয়ে পথে হেঁটেই চলতে লাগলাম। বাহির হতে লোক আসছে, আর একটু বেড়িয়েই চলে যাচ্ছে, যেন তাদের ভয়—কোন্ সময় জাপানী বিমান এসে বোমা ফেলতে আরম্ভ করে। অনেকক্ষণ ঐ কেল্লার মাঝে কাটালাম। অনেক দোকানে বসে চা এবং নানারূপ পিষ্টক খেলাম। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেলাম না। রাত আটটার সময় হোটেলে ফিরে এলাম। সাদা রাশিয়ান যুবক তিনটিও ফিরে এসেছে। তারা সাইকেলের সন্ধানে গিয়েছিল, একজন একখানা সাইকেল যোগাড় করেছে। অন্য দুজনা কিছুই করে উঠতে পারে নাই। একটি যুবক আমার ঘরে এসে কাছে বসল এবং নানা-কথার পর আমার শরীরটা একটু টিপে দিল। তার টেপার রকম দেখে মনে হ'ল তার ব্যবসাই এই। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রুশদেশে

কি শরীর টেপার নিয়ম এখনও আছে? যুবকটি বললে, যখন জারের রাজত্ব ছিল তখন এ সব চল্‌ত, এখন আর নাই। এখন হারবিন, মাঞ্চুলি, সিতসিহার এবং অন্যান্য স্থানে চলে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্‌লাম, আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমাকে বিশেষ কিছু অর্থ-সাহায্য করতে পারি, এই নাও অর্দ্ধ ডলার। হাত পেতে সে অর্দ্ধ-ডলার নিল এবং বারবার ধন্যবাদ দিল। সে ভাঙ্গা ইংরেজীতে বুঝিয়ে বল্‌ল, যদিও তার প্রবল ইচ্ছা দেশে ফিরে যাবার, তবু কতকগুলি কারণে সে যেতে পারছে না, এদিকে অভাব-অনটনে চীনদেশে তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে; তার দেশে ফিরে যাওয়া কেন হয় না তার কারণ কিন্তু কিছুতেই বল্‌লে না।

প্রাতে উঠে গ্রীক ভদ্রলোকের সংবাদ নিয়ে জানলাম, রাত্রিতে তাঁর জর হয় নাই, শরীর বেশ ভালই আছে। হোটেলের সামনের দিকটা বন্ধ থাকায় নতুন কোন লোকই আসছিল না। যে ক'জন ছিলাম সবাই বিদেশী, তাই মিলামিশা শীঘ্রই হয়েছিল। রুশ-ভাষায় যারা ধনী এবং আভিজাত্য-মোহে মত্ত তাদের বুর্‌জোয়া বলে। অনেক রাশিয়ান আমাকে বুর্‌জোয়া পর্য্যটক বলতে লাগলেন। আমি ভাবছিলাম, হয় তো এরা এইকথাটা বলে আমার সম্মান করছে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করছে। কেউ আমাকে সামান্য সাহায্য করলেও বিনিময়ে কিছু দিয়া থাকি। এরূপ দান নাকি বড় বড় বুরজোয়াদের মধ্যেই আছে।

রেল-ষ্টেশনে আবার গেলাম। দেখলেই বুঝা যায়, এখানে দুটি সরকারের হুকুম চলেছে। একদিকে পাঁচ রঙের একটি পতাকা, অন্যদিকে চীনের পতাকা উড়ছে। মাঞ্চুকো ষ্টেশনমাষ্টার বড়ই মজার লোক, সে যেন প্রহসনের অভিনেতা। যদি কেউ কিছু তাকে জিজ্ঞাসা করে অমনি দৌড়ে গিয়ে একটি ছোটঘরে প্রবেশ করে, তারপর বের হয়ে এসে কথার জবাব দেয়। যেন সাধারণ বুদ্ধিও তার নাই। সেই ছোট ঘরটিতে একজন জাপানী এডভাইসর বসে' আছেন। তাঁরই কথামত লোকটি চল্‌ছে। সে প্রহসন দেখে অনেকেই হাস্‌ছিল। চীনা ষ্টেশনে গেলাম, সেখানে ব্যস্ততা মোটেই নাই, প্রায় জনশূন্য। যারা আছে দরকারী কাজগুলি মাথা নত করে করছে।

এখানে কথা বলার স্থযোগ মোটেই হ'ল না, তাই শহর ত্যাগ করে যেখানে চীনের প্রাচীর সাগরের কাছে এসে মিশেছে তা দেখবার পথে রওনা হলাম।

অনেকগুলি ছোট গ্রাম পথে পড়ল। অনেকেই আমাকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিতে নিষেধ করল, কিন্তু কারো কথা না শুনে আমি আমার গন্তব্য স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একদিকে সাগরের জল কলরোলে বয়ে চলেছে আর অপরদিকে পাহাড়ের উপর চীনের প্রাচীর পশ্চিমদিগন্তে মিলেছে। সাগরতীরে অনেকক্ষণ বসলাম। তারপর কতকদূর এগিয়ে গিয়ে উত্তরদিকে চেয়ে দেখি বড় বড় তাঁবু খাটান রয়েছে, তাতে অনেক সেনা আছে। একটি সিগনেলার আমাকে সিগনেল দিয়ে বললে নেমে যেতে। আমি অপেক্ষা না করে নেমে এলাম। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এ স্থানে আসা আমার ঠিক হয় নাই বুঝলাম। ইচ্ছা করলেই গুলী করতে পারত, ছিলামও আমি বন্দুকের পাল্লার মধ্যে। এতক্ষণে বুঝলাম, গ্রামের লোক কেন আমায় নিষেধ করেছিল এদিকে আসতে। শহরে ফিরে আসতে বেশীক্ষণ লাগল না, এসে দেখি সেই যুবকটি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে আরও তিনজন চীনা ছেলে নিয়ে। সে আমাকে জানাল, একজন চীনা পর্য্যটক আমার সঙ্গে দ্বিপ্রহরে দেখা করতে আসবেন, তিনি এই ক'দিন হ'ল মুকদেন হতে ফিরে এসেছেন। দ্বিতীয় কথা, তার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা না-ও হতে পারে তাই সে বিদায় নিতে এসেছে। এরূপ হাজার হাজার চীনা যুবকের নাম বলতে পারি যারা আমাকে অন্তরের সহিত ভালবেসেছে। বিদায়ের বেলা সে আমাকে পঁচিশটি সেণ্ট দিয়ে বলেছিল, তা দিয়ে যেন চীনের মঙ্গলার্থ চা-পান করি। আমি তা করেছিলাম। এখনও বলি, চীনের মঙ্গল হউক। চীন পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বর্গ হউক।

আমার চীন-ভ্রমণ এখানেই সমাপ্ত হ'ল। তবে মাঞ্চুরিয়া তো চীনেরই একটি অংশ। যদি ডোভারকে ইংলণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে ইংলণ্ডের যে অবস্থা হবে, মাঞ্চুরিয়া হারিয়ে চীনেরও আজ সেই অবস্থা।

মুকদেনের পথে

কি করে একটা জাতি পরাধীন হচ্ছে তা দেখা বড়ই সহজ, কিন্তু গুছিয়ে বলা বড়ই কঠিন। চীনের তিনটি প্রদেশ আমারই সাম্‌নে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'ল, বোধ হয় আরও হবে। সাংহাই-কোয়ান হতে বিদায়ের বেলা মিঃ ওয়াং বলেছিলেন, "বিদায় আপনাকে দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে বল্‌ছি, চোখ এবং কান উভয়ই ব্যবহার করবেন। আবার এটাও মনে রাখবেন যেন কোন ফাঁদে না পড়েন।" উপদেশ শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মানসিক শক্তি অনেক সময় দমে যেত, তাই আর উপদেশ শুন্‌তে ভাল লাগত না। মিঃ ওয়াঙের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনেকটা সুখী হয়েছিলাম। আবার দুঃখিতও হতে হয়েছিল, কারণ তিনি আমাকে অনেক বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন। কেন যে আমার জন্য এত শ্রমস্বীকার করেছিলেন তিনিই অবগত আছেন, এখনও আমি তার মীমাংসা করতে পারি নাই, তবে অনেক সময় তাঁর কথা মনে হয়।

তিন জনে মিলে সাংহাই-কোয়ান পরিত্যাগ করে মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লাম। বার বার গ্রামের লোক সেদিকে যেতে নিষেধ করছিল। কিন্তু উপায় নাই, আমাদেরে এগিয়ে যেতেই হবে। বেলা এগারটার সময় আমাদের সামনে জাপানী এবং মাঞ্চুকো সেনাদের ছাউনী পড়ল। এই ছাউনী এড়িয়ে যাবার জন্য আমার সঙ্গী সাদা রাশিয়ানরা চেষ্টা কর্‌তে লাগল, কিন্তু পথ সেদিকেই আমাদের টেনে নিল। আদেশের অপেক্ষা না করেই আমরা সাইকেল হতে নেমে পড়লাম, এবং আমি তাদের ভদ্রতার অপেক্ষা না করে বেঞ্চে বসে পড়লাম। সাদা রাশিয়ান যুবকদ্বয় কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। বুঝতে বাকি রইল না, এরা ভয় পেয়েছে। কাছেই কতকগুলি চীনা সৈনিক দাঁড়িয়েছিল। তারা আমার সঙ্গে কথা বলল না। বলবার তাদের ইচ্ছা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু যে সাহসের দ্বারা ইচ্ছা পূর্ণ হয় সে সাহস তারা জাপানীদের কাছে বিক্রি করেছে বলে মনে হ'ল। অনেকক্ষণ পর তিনটি

জাপানী সৈন্য এল, কথা বল্‌ল, কিন্তু একটা কথাও বুঝলাম না। নিকটে যে মাঞ্চু সৈনিক ছিল তাদের একজন দোভাষীর কাজ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। তার সাহায্য নিলাম কিন্তু মনে মনে তার প্রতি ঘৃণা হ'ল। যার নিজে কথা বল্‌বার সাহস নাই অপরকে বুঝাবার বেলা তার বেশ বিদ্যাবুদ্ধি আছে দেখলে ঘৃণা হয়, দুঃখ হয় তাদের এত অবনতিতে। আমিও মাঞ্চু সৈনিকটির প্রতি কোনরূপ সম্মান না দেখিয়ে জাপানীদের বুঝিয়ে বল্‌লাম, তারা যেন আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে। মাছ ভাত খেতে ভালবাসি শুনে জাপানী সেনারা তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে তাদের বড়দরের একজন অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। অফিসার সামান্য ইংরেজী জানেন, কিন্তু ভূগোলের জ্ঞান অসাধারণ। আমার পরিচয় পেয়েই তিনি বল্‌লেন, "You eat fish rice Calcutta, I know". জাপানী স্যামন মাছ আর জাপানী ভাত আমাদের খেতে দেওয়া হ'ল, আমি খেয়ে নিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গী দু'জনা কিছুই খেতে পারল না। সেজন্য অফিসার মোটেই দুঃখিত হলেন না। যাদের দেশ নাই, নৈতিক বিরোধে দেশ পরিত্যাগ করে, তাদেরে কেউ সম্মান দেখান তো দূরের কথা, দেখ্‌তেও পারে না। যদি এই দুটি যুবকই আজ লাল রাশিয়ান হ'ত তবে জাপানী অফিসার তাদের জন্য মাখন রুটির নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতেন। সাদা রাশিয়ান দুটি তা বেশ করে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বুঝেও যারা বুঝতে চায় না, তাদেরে বুঝান বড় কঠিন কাজ। যদি বোঝাতেই হয় তাহলে বোঝাতে হবে যেমন আতাতুর্ক তাঁর দেশে বুঝিয়েছেন মোল্লাদেরে।

একটু ঘুরে দেখলাম ক্যাম্পটা। মাঞ্চু সেনাদের থাকবার ব্যবস্থা জাপানীদের থেকে পৃথক নয়। তারা একই সঙ্গে থাকে, খায়ও একসঙ্গে, কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল শাসক এবং শাসিত একস্থানে যতক্ষণ জরুরী দরকার, এর বেশী নয়। আমার কথাবার্ত্তা শুনে জাপানী সৈন্যরা বোধ হয় সুখীই হয়েছিল, নতুবা বিদায়ের বেলা ঝোলা ভর্ত্তি করে বিস্কুট দিয়ে দিত না। আমরা বিকালে আবার পথে এলাম এবং কখনও রেললাইন ধরে কখনও গ্রাম্য পথ ধরে চল্‌তে লাগলাম। গ্রাম্যপথগুলি ধূলায় ভর্ত্তি। সাইকেল চালান বড়ই কষ্টকর। ধুপ ধাপ করে আমরা আছাড় খেতে লাগলাম। লজ্জার বিষয়

এতে কিছুই নাই, কিন্তু আমার ভাবনা হ'ল, যারা এ পথে পায়ে হেঁটে চলেছে তারাও আমাদের পিছনে রেখে যাচ্ছে। এরূপ করে যদি সারা মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণ করতে হয় তবে আমার দ্বারা ভ্রমণ শেষ করা সম্ভবপর হবে কি-না, তাই বিবেচ্য।

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, আমরা একটা গ্রামে এলাম। গ্রামে সামান্য লোকজন আছে, যারা আছে তারাও আমাদের কাছে আস্‌তে চায় না। বহু কষ্টে একটা খালি ঘর পাওয়া গেল, তাতেই থাকবার ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গীদ্বয় গ্রাম হতে চীনা রুটি আর সামান্য সব্‌জি নিয়ে এসে আহারের বন্দোবস্ত করল। আহারান্তে আপন আপন বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি তখন দশটা হবে, গ্রাম যেন লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেছে মনে হ'ল। আমাদের ঘরটার আশে-পাশেও যেন লোক চল্‌ছে। সঙ্গীদ্বয় তা বুঝেই ঘরটার এক পাশে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বস্‌ল। আমি তা করা ভাল মনে করলাম না। একটা মোমবাতি জালিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম এবং সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম। একবার কয়টি যুবক আমার কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি তাদের ডাক্‌লাম। তারা কাছে এল। রাশিয়ান দুটিকে ডেকে এনে বল্‌লাম, "বুঝিয়ে দাও ওদের, আমি হিন্দুস্থানের লোক, এদেশে পর্য্যটন করতে এসেছি, এবং তোমরা দুজনা আমার সঙ্গী সাংহাই থেকে আসছ।" আমার কথাগুলি বুঝিয়ে দিল। সর্ব্বপ্রথমেই চীনারা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার সঙ্গীদুটি লাল না সাদা। যখন শুন্‌ল ওরা সাদা তখন চীনারা যেন সন্দিগ্ধ হ'ল। আমি তখন আর গম্ভীর হয়ে বসে থাক্‌তে পারলাম না। ওদের চীৎকার করে বল্‌লাম, "বল তোমরা সাদা রাশিয়ানের ছেলে, পলিটিক্‌সে কোন মতামত নাই এবং দেশে ফিরে যাচ্ছ আমার সঙ্গে।" কথাটা বুঝিয়ে দিল বটে, কিন্তু এদের প্রতি চীনাদের চোখ-মুখ যেন লালই হয়ে রইল। তারপর আমার অটোগ্রাফ বই বের করে তাদের ক্যাম্পের এবং অন্যান্য স্থানের লেখা দেখালাম, তা দেখে তারা বড়ই আনন্দিত হ'ল এবং নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকতে বল্‌ল। গভীর রাতে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজও পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু কে কাকে হত্যা করল তার সন্ধান নেবার আমাদের কৌতূহল হয় নাই। যে গ্রাম রাতে লোকে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল প্রাতে উঠে দেখি সেই গ্রাম আবার নিরালা।

এরূপ করে আমরা তিনদিন চলে গিয়ে একটা বড় গ্রামে পৌছই। পথ খারাপ থাকায় আমার ইচ্ছা হয় নাই যে, আর সাইকেলে চলি। সঙ্গী দুটির সঙ্গে পরামর্শ করলাম কি করা যায়। তারা বল্‌লে এই অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, যদি ভাড়া করতে চাই তবে সস্তাও হবে, সুবিধাও হবে। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক হ'ল, তিনদিন চলে আমাদের একশত পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে দিবে।

টাকা আমার কাছে ছিল, তৎক্ষণাৎ পকেট হতে বের করে দিতে পারতাম, কিন্তু তা করলাম না; কারণ, এই গ্রামের লোক জাপানী আগমনে সন্তুষ্ট। যারা স্বেচ্ছায় গোলামী বরণ করে নেয়, তারাই আমার মত পথিকের উপর অত্যাচার করতে পারে, তা আমার জানা ছিল। গ্রামে প্রথম ভিক্ষা করলাম তাতে আড়াই ডলারের মত হ'ল, তারপর একটা সার্ট বিক্রয় করে দিলাম দেড় ডলার নিয়ে। মোট আদায় হ'ল চার ডলার, পকেট হতে বার করলাম ছয়, দশটি ডলার গাড়োয়ানকে দিয়ে বললাম, "এর বেশী নাই।" গাড়োয়ান তাতেই রাজী হয়ে আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল। দেড়শত মাইল পথ দুদিনে পেরতে সক্ষম হয় নাই, আমাদের সাড়ে তিন দিন লেগেছিল। তারপরই সামনে ভাল পথ। রেললাইন নিকটে আছে। ইচ্ছা হলেই গাড়ীতে আমরা সাইকেল রেখে একদম মুকদেন যেতে পারব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা চিন-চো-ফোঁ না পৌছই সে পর্য্যন্ত আমরা কোন সুবিধাই পেতে পারব না। আরও চারদিন চলে আমরা চিন্‌-চো-ফোঁ শহরের কাছে এলাম এবং আর চল্‌তে অক্ষম হওয়ায় রাতটা গ্রামেই কাটাব মনস্থ করলাম। গ্রামে গিয়ে দেখি জন-মানুষ নাই। গ্রামের ঘরগুলি আগুনে পোড়ান। বুঝতে বাকি রইল না, এই গ্রামের লোক বিদ্রোহ করেছিল। ফলে গ্রামকে গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে উজাড় করা হয়েছে। আমার কাছে এরূপ গ্রাম পবিত্র স্থান বলে মনে হয়, কারণ এই গ্রামের লোক আপন স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় জাপানীদের কাছে বিলিয়ে দেয় নাই। বুকের রক্ত ঢেলে স্বাধীনতার বেদী-মূলে অর্ঘ্য দিয়েছে। তাই গ্রামখানি শ্মশানে পরিণত। রাতেই আমাদের পথ চল্‌তে হ'ল, প্রাতে গিয়ে আমরা চিন-চো-ফোঁ শহরে উপস্থিত হলাম।

চিন চো ফোঁ

চীনা সৈনিককে সামনে রেখে জাপানী সৈনিক আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পরীক্ষা করত। যখন দেখত আমাদের কাছে সন্দেহজনক কিছুই নাই তখন ছেড়ে দিত। কিন্তু এই 'ব'কলমে কাজটা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগল না। দখল করেছ মাঞ্চুরিয়া, রাজ্য কর, এই শিখণ্ডীর দলকে সাম্‌নে রেখে কাজ সারবার দরকার কি ? হাঁ, চালবাজি করতে হলেই পিছনে থাকৃতে হয়, সাম্‌নে থাকৃতে গেলে অনেক সময় বিপদ ঘনিয়ে আসে।

আমরা হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করলাম। স্নানের তাতে বেশ বন্দোবস্ত ছিল। স্নান না করে আমি থাকৃতে পারি না। স্নান করে কিছু খেয়ে বিশ্রাম করতে বসেছি, অম্‌নি রকম রকম লোক এসে উপস্থিত। কিন্তু দুজনা সাদা রাশিয়ানকে দেখে যেন কেউই সন্তুষ্ট নয় বুঝলাম। আমার কালোমুখের উপর সকলের নজর পড়েছিল। বিকালে সাদা রাশিয়ানদের ঘরে রেখে বেড়াতে বের হয়ে পড়লাম। এখানে দুজনা শিক্ষিত মুসলমান চীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তারা বেশ ভাল করে ইংরেজী বল্‌তে পারে। নিজেরা এসেই আমার পরিচয় চাইল। আমার পরিচয় যতটুকু দরকার তার বেশী বল্‌লাম না, কিন্তু ভাবে বুঝলাম তারা আমার কোন্ ধর্ম্ম তাই জিজ্ঞাসা করতে চায়। অনেকক্ষণ নীরব থাকৃলাম সে বিষয়ে। পরে বল্‌লাম, আমার ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই মত একটা। মুসলমান যুবকদ্বয় আমার অমুসলমানত্ব শুনে সুখী হ'ল। তারা ভাল করেই জানে ভারতীয় মুসলমানরা আজ পর্য্যন্ত দেশের কোন কাজে তেমন যোগ দেয় নাই। সে জন্য ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি এদের কোন সহানুভূতি নাই। মা-চান্দ সানের নাম উচ্চারণ করে বার বার বল্‌তে লাগল, "দেখুন, আমাদের মাঝে ধর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া নাই সত্য, কিন্তু অন্য একটা জিনিষ নিয়ে ঝগড়া, যার জন্য আজ আমরা জাপানীদের পদানত। যদিও মিঃ হেনরী পুই চিরস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট বলে প্রচারিত হয়েছেন, কিন্তু তা নামে মাত্র। তিনি জাপানীদের হাতের পুতুল।" আমার ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করে জানি, কেন মাঞ্চুরিয়া জাপানীরা দখল করল ? কিন্তু আমাকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে হয় নাই, তারা নিজেরাই বলতে লাগল—"যেখানে

সর্ব্বসাধারণকে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা হয়, কতকগুলি লোকমাত্র সর্ব্বসাধারণকে শোষণ করে সুখী হতে চায়, সেখানে এরূপ পতন আসে।” কথাটা বড় সংক্ষেপে বলেছিল বটে, কিন্তু আমার মনে লাগ্‌ল। মাঞ্চুরিয়াতে তার প্রমাণ দেখ্‌ছি। কথা বাড়ালাম না, কারণ আমাকে স্থানীয় মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে হবে। জাপানী অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপর এই সব লোকের কাছে অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললে জাপানীরা হয় তো আমার পিছনে লাগতে পারে, শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার নামে মাঞ্চুরিয়া হতে তাড়িয়েও দিতে পারে।

কে যে মেয়র, কোথায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, ঠিক করা বড়ই কঠিন, কারণ কেউ কোন কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। সবাই ভয়ে অস্থির। ভয়ের আর কোন কারণ নাই, কোন্ কথায় জাপানী অফিসার দুঃখিত হবেন, এবং সে দুঃখ মোচন করতে কার সর্ব্বনাশ হবে তার ঠিক কি। যাতে জাপানী অফিসারদের দুঃখের কোন কারণ না থাকে তার চিন্তায়ই সবাই ব্যস্ত। জাপানী অফিসারদের জন্য মাঞ্চুকো অফিসারদের যেরূপ হৃদয় কাঁপে, তাদের পরাধীনতার স্বরূপ দেখে অন্যের হৃদয়ও কম্পিত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে চীনারা নবনামে আপ্যায়িত হয়ে নিজেদের মাঞ্চুকো বলে গর্ব্ব অনুভব করেন, অথচ বুঝতে পেরেছেন পরের বোঝা বহন করা, পরের আদেশ মানা, পরের তাঁবেদারী করা কত বড় কঠিন কাজ। এই ভাব অনেকদিন থাকবে না, কারণ মাঞ্চুরিয়ার লোক এখনই “ধর্ম্মের” মদিরা পান করতে সুরু করেছে।

চীনে যে-ই আফিং চালিয়ে থাকুক, একদিন চীন হতে আফিং বিদায় নিবেই। কিন্তু এই সামান্য সময়ের ভিতর জাপানী মাঞ্চুরিয়ায় যে ধর্ম্মের মাদকতা ছড়িয়ে দিয়েছে তার ফল মাঞ্চুরিয়া অনেক দিন ভুগবে। মদ যেমন মানুষের পক্ষে ঔষধ রূপেও ব্যবহার হয়, আবার অত্যধিক ব্যবহারে বিষের চেয়েও অধম হয়, ধর্ম্মও তেমনি যতদিন জ্ঞানদায়ী থাকে ততদিনই ভাল, যেই সাম্প্রদায়িক হয় অমনি তা হতে এমন হলাহল উৎপন্ন হয় যে, জাতি সে বিষে বিষাক্ত হয়ে মরে। মাঞ্চুরিয়ার এই ছোট্ট শহরটিতে এসেই বুঝলাম ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করবার চেষ্টা চল্‌ছে, এবং তারই অজুহাতে জাপানী মিঃ হেনরী পুইকে লোকের সামনে রেখে দেশ শাসন চালাচ্ছে।

ছোট্ট শহরটিতে একাকী অনেকক্ষণ বেড়িয়ে শান্তি মোটেই পাই নাই। চুন, সুরকী, পথর, ইঁট, পাটকেল, পথঘাট, বিপণিরাজির নয়নাভিরাম সন্নিবেশ, এ কোথায় নাই? সর্ব্বত্র কম-বেশী আছে, কিন্তু মানুষ চায় মানুষের সঙ্গে মিলতে, কিন্তু এখানে এসে মনে হ'ল মানুষ নাই, মিশবার লোক নাই। হয়তো মানুষ যারা ছিল, জাপানীদের সঙ্গে, খাল কেটে কুমীর আনার পক্ষপাতীদের সঙ্গে লড়েছে এবং মরেছে। যাদের একটুও স্বাধীনতার জন্য লড়বার ইচ্ছা ছিল তাদের হয় তো মাঞ্চুকো সেনারা আটক করে রেখেছে। আমি দেখব কি? কার সঙ্গে কথা বলব? আমার মন হাঁপিয়ে উঠল, আমি হোটেলে ফিরে এলাম। এখানেও কথা বলার যো নাই। যে দুটি রাশিয়ান আমার সঙ্গে আছে তারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মদিরা এত পান করেছে যে, এদের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে গাছের পাতার সঙ্গে কথা বলাই ভাল। এরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এদের নাম ধরে আমি ডাকতাম না, কারণ ওদের নাম উচ্চারণ করতে আমার বড়ই কষ্ট হ'ত। তাদের নাম দিয়েছিলাম মিঃ এক এবং দুই। বাংলা সংখ্যায় নাম দিবার একটি কারণ ছিল। যদি বলতাম, মিঃ ওয়ান এবং মিঃ টু তবে এরা ভাবতো হয়তো এদের রাশিয়ান প্রথায় মজুর বলে গণ্য করেছি এবং তদনুযায়ী নাম দিয়েছি। এই প্রথাটি নিশ্চয়ই তারা পছন্দ করত না, কারণ দুই জনাই সোভিয়েট বিদ্রোহী। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-মদিরা যারা পান করে তারা শব্দের অর্থ নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল করে এবং একটু প্রাধান্য পেলেই কত বড় হয়ে গেছে ভেবে পায় না। মিঃ এক ও দুই উভয়ই মোটরচালক, কিন্তু মজুর বলে নিজেকে পরিচয় দিতে রাজী নয়। বৈকালিক আহার কি হবে তাই নিয়ে এরা ব্যস্ত হয়েছিল। আমি আহারের বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফের স্নান করে বের হয়ে পড়লাম।

এবার পোষাক বদলান হ'ল। এদের ফেলট হ্যাট, এবং লম্বা প্যাণ্ট পরে পথে বের হয়ে পড়লাম। এবার লোকের চোখ আমার প্রতি অতি কমই পড়তে লাগল। কখনও রিকসায়, কখনও পায়ে হেঁটে চললাম, পরে একটা অপরিষ্কার অন্ধকার হোটেলে গিয়ে বসলাম। কতকগুলি লোক খেতে বসেছে, এঁদের পোষাক জঘন্য, কিন্তু চোখ-মুখ এবং আচার-ব্যবহার দেখেই বুঝলাম এরা ভদ্রশ্রেণীর লোক, বিপাকে পড়ে এই জঘন্য স্থানে খেতে এসেছে। এদের

কাছে আমার পোষ্টকার্ডগুলি বিলিয়ে দিলাম। অনেকে তা পাঠ করল, কারও চোখ ঝলসে উঠল, কারও মুখ প্রফুল্ল হ'ল, কারও স্তম্ভিত ভাব। লক্ষ্য করলাম সবই, কিন্তু কেউ কথা বলল না, যে যা পারল সাহায্য করে চলে গেল মাত্র। বুঝলাম এরা মজুর নয়, দেশমাতৃকার পূজারী। এক পেয়ালা চা খেয়ে আমিও বিদায় নিলাম। অনেক রাত রাজপথে ভ্রমণ করলাম। লোক একদিকে যেমন চলেছে, অপরদিক হতে তেমনি আসছে। সবাই ব্যস্ত, আমার মনের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না বলে হোটেলে এসে শুয়ে পড়লাম।

চেন চো ফোঁ ছোট্ট শহর বটে, কিন্তু তার গলিগুলি দেখবার যোগ্য। প্রাতে উঠেই আমি গলি-পথে নানা স্থান দেখলাম। এত ছোট গলি যে, দু'জনা একসঙ্গে চলা মুস্কিল। মাঝে মাঝে দু'একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকান দেখলাম, প্রত্যেকটির সামনেই দু' একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ;—দেখলেই মনে হয় গুপ্ত-পুলিশ। এই শ্রেণীর জীব এই দোকানগুলির আশে-পাশে ঘুরছিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দোকানগুলি খোলা অথচ লোক যায় না কেন? সে বল্লে, "ইস্লাম কমিউনিষ্ট"। যা হোক, আমি একটাতে প্রবেশ করে কিছু খাবার দিতে বল্লাম। বেশ আরামের সে খাদ্য। তিলের সঙ্গে চালের গুঁড়া মিশ্রিত ক'রে একরকম পিষ্টক তৈরী হয়েছে, তাতে সামান্য গুড়ের সংযোগ থাকায় এক এক করে অনেকগুলি খেয়ে ফেল্লাম। আমার তৃপ্তিতে দোকানী সন্তুষ্ট হ'ল। হিন্দু কি-না—দোকানী আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি ইঙ্গিতে বল্লাম—'হিন্দু'। রুশ, জার্ম্মান, ফরাসী—এ সব ভাষা আমার জিহ্বা উচ্চারণ করতে অক্ষম। বল্লে, বিকালে যেন যাই। দোকানী নিজেই পরিচয় দিল, সে ইসলাম-চীন। ইসলাম-চীন মাঞ্চুরিয়া যাতে জাপানীর হাতে না যায়, তার জন্যে পুরাপুরি লড়ছে, তাই তারা 'কমিউনিষ্ট' বলে পরিচিত, তাই তাদের দোকানে কেন, এর আশে-পাশেও গুপ্ত-পুলিশ আড্ডা গেড়েছে। কিন্তু ইস্লাম-চীন তাতে ভীত মোটেই নয়। তারা ক্রমাগত লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হ'ল, শুধু ইস্লাম-চীন যদি জাপানীর সঙ্গে লড়ে তবে কিছুই করে উঠতে পারবে না, অন্যেরাও যদি যোগ দেয় তবু কিছুটা করতে পারবে। তা হলেও শেষটায় ঠিক থাকা মুস্কিল হবে, কারণ মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বত্র লোভীরা ভোগের জন্য বড়ই লালায়িত হয়ে পড়েছে।

বিকালে দোকানে গিয়ে যখন বস্‌লাম, তখন একজন মক্কা-ফেরত চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তিনি হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছিলেন সে জন্য ভাঙ্গা হিন্দীও বল্‌তে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ কথা বলতে চেষ্টা করলাম লোকটীর সঙ্গে, কিন্তু কি বলতে চান কিছুই বুঝতে পারলাম না। সবই যেন তাঁর এলোমেলো হয়ে গেছে। মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলাম। যে প্রশ্নটার উত্তর হবে 'হাঁ', তার উত্তর 'না' বলতে লাগলেন। মনে হ'ল ভয় পেয়েছেন। তাঁর ভীত হওয়ার কারণও ছিল। দরজার কাছেই একটি চীনা ডিটেকটিভ দাঁড়িয়েছিল আমাদের কথা শুন্‌বার জন্যে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চীনা ভাষায় আমাকে উদ্দেশ করে যে কথাগুলি বলতে লাগলেন, তার একটা কথাও বুঝলাম না। যদিও তার মুখটি ছিল আমারই দিকে, কিন্তু তার স্বর এত উচ্চ ছিল যে, বাইরের লোকও তার কথা শুনতে পায়। গতিক বড় সঙ্গীন দেখে সরে পড়াই ঠিক করলাম; কারণ, যে ভীত সে অন্যকে ফ্যাসাদে ফেলতে কুণ্ঠিত হয় না। দোকানীর পয়সা দিয়ে চলে এলাম আবার পথে। মনে হ'ল—দরজার কাছে দাঁড়ান লোকটী আমার পিছন নিয়েছে। জানা পথ ধরে হোটেলে চলে এলাম। ঘরে এসে দেখি—আমার সঙ্গী দু'জনা আপন-আপন জিনিষপত্র বেঁধে তৈরী হয়ে আছে। তারা বলল, তাদের এক আত্মীয় টাকা দিয়েছেন, তাতে তারা চাং চুং পর্য্যন্ত যেতে পারবে। শুনে সুখী হলাম। এবার একা হয়েছি। সঙ্গী থাকলে অনেক সময় সুবিধাও আছে—অসুবিধাও আছে। এরা পথিক নয়, আমার মতই বিপাকে পড়ে সঙ্গ নিয়েছিল মাত্র। তাদের গাড়ীর সময় এখনও হয় নাই, আগামী কল্য প্রাতে যাবে। তবুও তারা এত তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র বাঁধল কেন জিজ্ঞাসা করায় একজন স্পষ্ট করে বলল যে, কোন পুলিশ-অফিসার নাকি তাদের বলেছে তারা যেন আমার সঙ্গে না থাকে, যদি থাকে তবে তাদের ক্ষতি হবে। রাত্রিতে তারা আমার ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। আমি একা ঘরে রইলাম।

চেন-চো-ফোঁ ছোট্ট শহর হলেও আর একদিন থাকতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গী রাশিয়ান যুবক দুটি চলে যাওয়ায় আমার আর ইচ্ছা হ'ল না এখানে দ্বিতীয় রাত কাটাই। প্রাতে সামান্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে গ্রাম্যপথ ধরে চলতে লাগলাম। যে সব গ্রাম পথে পড়ল তাতে মুসলমান অধিবাসী প্রচুর।

খাদ্য কিনে এনে ঠিক করি নাই ; কারণ প্রত্যেক গ্রামেই ঘিয়ে ভাজা গজা, দই, ভাত প্রচুর পেতে লাগলাম। তারপর এই মুসলমান চীনাদের আন্তরিকতাও যথেষ্ট। কিন্তু এটা লক্ষ্য করে দেখেছি এরা প্রত্যেকবারই যেন জিজ্ঞাসা কর্‌তে চায় আমি ভারতীয় মুসলমান কি না। যখনই শুনেছে আমি ভারতীয় বৌদ্ধ তখনই দুঃখের পরিবর্ত্তে তাদের আনন্দ হয়েছে। কিন্তু তারা অবগত নয় ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে নিরক্ষর এবং দরিদ্র বেশী তাই তারা "মহা গান্ধীর" সাহায্য করছে না। হিন্দুস্থানের মুসলমানদের উপর মাঞ্চু মুসলমান সন্তুষ্ট নয়।

দ্বিপ্রহরে একটা গ্রামে পৌচেছি। গ্রামখানা ছোট। পনরখানা ঘরের বেশী নাই। আমি গিয়ে বসেছি একটা চীনা ধর্ম্মমন্দিরের বারান্দায়। পূজারী আছেন তার মধ্যে একজনা জাপানী। চীনা এবং জাপানী মিলে জাপানী প্রথামতে মাটির মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের পূজা করছেন। পাড়াতে যে কয়টি পরিবার আছে, তাদের ছেলেপিলেরা মন্দিরের কাছেই পাঠশালায় পাঠ করে। পাঠশালাটার কাছেই একটি গৃহস্থের বাড়ী। দুজনা পুরোহিত মিলে আমার অটোগ্রাফ বইটা ভাল করে দেখলেন, তার পর যেন পুলিশের কায়দামাফিক বিদায় হতে অনুমতি দিলেন। মন্দিরের দরজা হতে যারা বিদায় করে দেয় তাদের মন্দিরের দরজায় বসা ভাল মনে করলাম না। গ্রামের মাঝে বেড়াতে বেড়াতে একটা বাড়ীতে গিয়ে পৌছলাম। গৃহস্বামী গৃহে নাই, শুধু একজন স্ত্রীলোক আর একটি দুবৎসরের ছেলে। স্ত্রীলোকটি আমার মত বিদেশীকে দেখে কিছু ভয় না করে আমার কাছে এলেন এবং কথা বললেন, কিন্তু বুঝলাম না তাঁর একটি কথাও। এ-সব বিপদ হতে উদ্ধার পাবার আমার একটি সুন্দর অস্ত্র আছে, তা'হল চীনা-ভাষায় আমার বিজ্ঞপ্তি-পত্র, তাঁকেও একখানা তাই দিলাম। মহিলাটী বিজ্ঞপ্তিখানা পাঠ করে আমাকে কিছু দই ও ভাত খেতে দিলেন। তাঁরই সামনে খেতে আরম্ভ করলাম হাত দিয়ে; আমার হাতে খাওয়া দেখে তাঁর কত আনন্দ হ'ল তা বলার নয়, কিন্তু আনন্দের মাঝেই নিরানন্দ এসে জুট্‌ল।

একটা চীনা কোথা হতে এসেই আমাকে বলল, "পাসপোর্ট, পাসপোর্ট"। বুঝলাম, লোকটা আমার পাসপোর্ট চায়, কিন্তু হুকুম তামিল করতে

এখন আর তাড়াতাড়ি করি না। খেয়ে, হাত ধুয়ে, একটা সিগারেট ধরালাম। এদিকে লোকটার যে ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছিল তা আমি বুঝলাম। আবার মেয়েমানুষটির মুখখানা কালো হয়ে গেল। বুঝলাম এরা আর কেউ নয়, চীনা মুসলমান পরিবার, নতুবা দই কোথা হতে এল। আরও বুঝলাম, এই পরিবারটিও মার্কা-করা, কারণ এদিককার চীনা মুসলমানরা প্রাণপণে লড়ছে জাপানীদের সঙ্গে, তাই এদের অবস্থা কাহিল। মনে মনে ভাবলাম, ফের মন্দিরে যাওয়া চাই, কারণ মন্দিরের পুরোহিত অটোগ্রাফ বই দেখেছে। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম মন্দিরে। যাবার পরই লোকটা কি বল্‌লে, তারপর ওরা আমাকে কি বল্‌লে একবিন্দুও বুঝলাম না। পূজারীও শেষটায় পাসপোর্ট চেয়ে বসল। পাসপোর্ট দেখালাম। তখন এদের মাঝে যে-সব কথা হয়েছিল তার দুটি কথা মাত্র বুঝেছিলাম—একটি হ'ল "হিন্দু" আর একটি হ'ল "ইংলিছি"। আমাকে ফের চলে যেতে বল্‌ল। কিন্তু কোথায় যাই, একে তো উদর ভারাক্রান্ত, দ্বিতীয়তঃ পরিশ্রান্ত, তাই একটু দূরে গিয়েই বসে পড়লাম। এরই মাঝে লোকটি গিয়ে আমার অন্নদাত্রী মুসলমান মহিলাকে ধরে এনে আমারই সামনে বেশ দু'ঘা লাগালে, দেখে আমার দুঃখ হ'ল, কিন্তু সাহায্য করলাম না। বুঝলাম যারা দেশের সেবা করে তাদের ধর্ম্ম নাই এবং এরূপ করেই অত্যাচারিত হয়। বেশীক্ষণ বসে থাকলাম না, কারণ স্ত্রীলোকের উপর এরূপ অত্যাচার করে যারা তারা কাপুরুষ এবং নীরবে সহ্য করে যারা তারাও কাপুরুষ।

সাইকেলে বেড়ান বড়ই আনন্দদায়ক, কিন্তু যদি শরীরে শক্তি না থাকে তবেই গ্রামে যেতে হয় এবং এরূপ অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা দেখতে হয়। এইমাত্র যে দুর্ঘটনা দেখলাম তাতে আমার মনে একটা বড় দাগ লাগল। চীনা মুসলমান হয়ে চীনের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, লড়ছে আবার স্বদেশবাসী এবং বিদেশী জাপানী যারা বিশেষ শক্তিমন্ত তাদের সঙ্গে। না লড়ে রক্ষা নাই, বিবেক আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আবার গ্রামে যাই। বিকালে একটা মাঠেই থাকা মনে মনে ঠিক করছিলাম, কিন্তু এই ফাঁকা মাঠে রাত্রিযাপন করা কঠিন। সয়াবীন এবং মাঝে মাঝে যবজাতীয় এক রকম শস্যের চাষ হয়েছে। মাঠের একদিকে দাঁড়ালে অন্যদিক কোথায় শেষ হয়েছে তা মালুম করতে পারা

যায় না। রাত্রি এগারটার পর হতেই বেশ ঠাণ্ডা আরম্ভ হয়। সঙ্গে যে শীতবস্ত্র আছে তা এর পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর, কাজেই বাধ্য হয়ে গ্রামে যেতে হ'ল। কিন্তু ভয় পাছে আবার বীভৎস দৃশ্য দেখতে হয়। গ্রামে ঢুকে কারও বাড়ীতে না গিয়ে গ্রাম্য হোটেলে গেলাম এবং কুড়ি সেণ্টে একখানা লেপ ভাড়া করলাম।

সন্ধ্যার পর একটা ছোট হোটেলে খেতে বসেছি। হোটেলটি মন্দ নয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছি এমন সময় দুটি মাঞ্চু সৈনিক এসে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করল এবং যখন দেখল তাদের কথা বুঝছি না তখন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, রাতে গ্রামে থাকলে বিপদ হতে পারে। তাদের কথা বুঝেছি, বুঝিয়ে দিয়ে হোটেলে এসে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি তখন বোধ হয় ৯টা। অমনি চারিদিক হতে বন্দুকের গুলী সুরু হ'ল। কাছেও শব্দ হ'ল। এরূপ অবস্থায় নির্ব্বিকার ছিলাম যদি বলি, তবে মিথ্যা কথা বলা হবে। সব ছেড়ে গ্রাম হতে ত্বরায় বের হয়ে অনেক দূরে চলে গেলাম। অনেকক্ষণ গুলী চল্‌ল, তারপর যখন গুলী চলা বন্ধ হ'ল তখন ভাবতে লাগলাম, গ্রামে ফিরে এসে লেপটা নিয়ে যাব কি-না, কিন্তু সাহস হ'ল না। আমি একা পালাই নাই, অনেকেই আমার মত পালিয়েছিল এবং আমার কাছেই বসে বসে হাঁপাচ্ছিল। ওদের বোধ হয় এরূপ পালান অভ্যাস হয়ে গেছে, তারপর ওদের আরও অভ্যাস হয়েছে ফাঁকা মাঠে মাটির উপর শোয়া। কিন্তু আমার ঘুম এল না। সারারাত অনিদ্রার পর প্রাতে হোটেলে এসে দেখি, যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনটিই আমার খাতাপত্র পড়ে আছে। খাতাপত্র গুছিয়ে, জল দিয়ে গা'টা বেশ করে ধুয়ে বের হয়ে দেখি পথেরই পাশে রাত্রির সংঘর্ষের স্মৃতিচিহ্ন, কতকগুলি লোক পড়ে আছে, একটিও জীবিত নাই। তার ভিতর নিরস্ত্র লোকও আছে। তবে আমার জানতে ইচ্ছা হ'ল সব আহতই তো মরতে পারে না, কারও হয় তো হাতে লেগেছে, কারও হয় তো পায়ে লেগেছে, তারা গেল কোথায়? এরই মাঝে দোকানী দোকান খুলেছে, কিন্তু সে লোকটি নয়, অন্য আর একজন। তারই কাছ হতে পাঁচিশখানা চীনা পিঠা কিনে গ্রাম হতে বের হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এখন হতে দিনে ঘুমাব রাতে পথ চলব, আর দূর হতে দেখ্‌ব বন্দুকের জ্বলন্ত জিহ্বা।

বেয়নেট-আলিঙ্গন

সারাটি রাত অনিদ্রাহেতু মাথা ঘুরছিল, তাই মাইল দশেক গিয়ে সড়কের পাশে একটি বৃক্ষের নীচে ছোট কম্বলখানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নাই, হঠাৎ মনে হ'ল বুকের উপর যেন পিঁপড়া কামড়াচ্ছে। চোখ বুজেই হাতটা পিঁপড়া মারবার জন্য বুকের উপর বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু পিঁপড়ার পরিবর্ত্তে ছুরি বলে মনে হ'ল। চোখ খুলে গেল। চেয়ে দেখি, তিনটি সৈনিক আমার বুকের উপর বেয়নেট ঠেকিয়ে রেখেছে। চোখ খোলামাত্র ওরা আমাকে সজোরে সার্টের কলার ধরে ওঠালে। তারপর গালটাতে একজন ঘর্ষণ করতে লাগল। মনে হ'ল গালের ছাল ছাড়িয়ে নিবে। নীরবে সহ্য করা গেল সে অত্যাচার। তারপর ছুরি দিয়ে আমার ব্রিচেজটা কেটে উরুতের দিকটার কি রং দেখ্‌ল। তারপর এতেও যখন হ'ল না, আমাকে টান্‌তে টান্‌তে তাদের তাঁবুর দিকে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক জাপানী অফিসার ছিলেন। তাঁরা আমাকে "ইন্দোজীন" বলে সম্বোধন করলেন, কিন্তু 'ইন্দোজীন' যে কি পদার্থ তা আমার জানা ছিল না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং যে-কোন শাস্তির অপেক্ষা করছিলাম। ভাবছিলাম যদি আজকে বাঁচি, তবে ভাল করে একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব এবং দেশে পাঠাব। দেশের লোক পাঠ করে গর্ব্ব অনুভব না করুক, অন্ততঃ আমার যারা আত্মীয় তারা দুঃখ করবে।

আমার কাছ হতে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন একটা সৈনিক এবং দুজন কুলি আমার সাইকেল আনতে গেল। আমার মন এবং শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল, আর দাঁড়াতেও ইচ্ছা হ'ল না, মাটিতে বসে পড়লাম। যখন সাইকেল এবং ঝোলা আনা হ'ল, তখন তা তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করা হ'ল। অটোগ্রাফ বইটা দেখা হ'ল, তারপর ফের ঐ "ইন্দোজীন" বলে আমাকে বলা হ'ল। আমি "ইন্দো" হতে পারি, কিন্তু "জীন" হতে রাজী নই। জীন মানে আমি বুঝেছিলাম ভূত অথবা ঘোড়ার জিন। আমার কাছ হতে যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন জাপানী অফিসার "আহো,"

"আহো" বলে চীৎকার করে উঠলেন। পাঞ্জাবী ভাষায় 'আহো' মানে "হাঁ"। আমি ভাবলাম বোধ হয় লোকটা রেগেছে এবং বলছে "আচ্ছা, এখন তোমাকে দেখাব!" নিরুপায় হয়ে বসে আছি। যত রাজ্যের চীনা এবং জাপানী সেনা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কতকক্ষণ পর একজন চীনা সৈনিক এসে ইংরেজীতে বলল, "You Hindu?" আমি বল্‌লাম, "হাঁ মশাই, আমি হিন্দু, 'ইন্দোজীন' নই।" চীনা সেনা বললে, "Manchu say Hindu, Nippon say Indojin, same meaning." কথাটা শুনে শান্তি হ'ল। আমি তখন বললাম, যদি তাই হয় তবে আমি "ইন্দোজীন"। জাপানী অফিসার ফের চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন, "আহো", "আহো"। চীনা সেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আহো' মানে কি? সে বললে, 'আহো' মানে "আহাম্মোক"। জাপানী অফিসারের এরূপ অপমানজনক কথা ভাল লাগল না। মুখের অবস্থা দেখে জাপানী অফিসার বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই চীনা অফিসারকে দিয়ে ফের বলালেন, তিনি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন। তারপর আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি জানালাম, একটু ভাল করে শুতে চাই। আমাকে একখানা পরিষ্কার বিছানা দেওয়া হ'ল। বিছানার গুণে কিম্বা অনিদ্রার দোষে লম্বা এক ঘুম দিলাম, উঠলাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে। জাপানী অফিসার "আহো", "আহো" বলে ফের চীৎকার করতে লাগলেন। সেই ইংরেজী-জানা সেনাই আমার কাছে এল এবং স্নান করতে বল্‌ল। ভাল করে স্নান করাতে একটু সময় লেগেছে, ব্রিচেজটা রেখে গিয়েছিলাম, এসে দেখি তা বিছানায় নাই। একটামাত্র পা-জামা, পর্‌ব কি? বসে রইলাম। কতকক্ষণ পরে দরজী পা-জামাটা সেলাই করে আমাকে দিল, আমি পা-জামা পরেই খেতে গেলাম। অফিসার আমার পিঠ চাপড়ালেন, তারপর খেতে দিলেন। সৈনিকরা যে অন্যায় করেছে তার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করলেন না। পরদিন প্রাতে আবার তাঁবুর সকলের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বের হলাম মাঞ্চুরিয়ার পথে।

এত দুঃখ, এত কষ্ট করছি কিসের জন্য কিছুই বুঝছি না। কখন মনে হ'ত এত কষ্ট করে কি হবে? কিন্তু যখনই মনে হ'ত "কর্ত্তব্য" তখনই অত্যাচার-অবিচারের কথা ভুলে যেতাম, শক্তি আস্‌ত, এমন কি মরণের শক্তিও

আস্ত। এরূপ করে অনেকদিন ভ্রমণ করেছি। আমি যে দিনলিপি রাখতাম তাতে তারিখের তো ভুল হ'তই, এমন কি যেদিন দিনলিপি লিখ্ছি সেদিন যে কি বার তাও মনে হ'ত না। তাই তারিখ এবং দিন ছেড়ে দিয়েই অনেক সময় যা আমার দরকারী তাই লিখতাম। একদিন পথের পাশে বসে সেরূপ একটা কি লিখছি, এমন সময় একটা ছেলে এল। তাকে সরে যেতে বল্লাম, সে সর্ল না দেখে তাকে বাঁ হাতে কিল দেখালাম। ছেলেটা অমনি আমার কাছে এসে বসে পড়ল। পেন্সিলটা রেখে দিয়ে সে কি চায় জিজ্ঞাসা করলাম। সে জবাব দিল না, শুধু আমাকে ইঙ্গিতে জানালে তার বাড়ীর দিকে যেতে। সন্ন্যাসীর যেমন গৃহস্থের বাড়ী যেতে ইচ্ছা করে না, আমারও আজ সেই অবস্থা। আমার খাবার আছে, কারও সঙ্গে কথা না বল্লেও চলে, মাঠে শুতে পারি, স্নান না করে থাকতে পারি, গ্রামে গিয়ে বিপদ কিনব কেন? তারপর যে আশ্চর্য্য ব্যাপার সব ঘটেছে তা আমি কখন কারও কাছে বলব না ঠিক করেছি। যদি বলি কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই ছেলেটার মায়া আমাকে আজ এত আবদ্ধ করছে কেন? জলের কেৎলীটা দিয়ে বল্লাম, "ছুই লাইলা," জল নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ জল তো নিয়ে এলই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এল কয়েকখানা পিষ্টক এবং তার বাবাকে। তার বাবা এসে আমাকে ভাল করে দেখলেন তারপর তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন। আমি নড়লাম না। রাতের বেলা একটু এগিয়ে গিয়ে একটা নালার কাছে বসলাম, কারণ আমি এখন আর রাতে ঘুমাই না, অনেক সময় বসে বসেই কাটাই। প্রভাত হতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত যতটুকু যেতে পারি যেয়ে তারপর শুয়ে পড়ি।

বসে বসে ভাবছি, যা কারও কাছে বল্ব না ঠিক করেছি তা কতদিন বজায় রাখতে পারব? মাথায় চিন্তা আসছে আর চলে যাচ্ছে। কিছুই ঠিক করে বুঝ্তে পারছি না। তবে কি এরই মাঝে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল? মাথা খারাপ হওয়ার কথাটা যে ভাবতে পারে তার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয় নাই। বেশ হাসতে লাগলাম। পাগলের হাসি নয়, বেশ ভাল-মানুষেরই হাসি, তবে এর কোন মানে নাই। এরূপ হাসতে হয়, এরূপ ভাবতে হয়, এরূপ দুঃখ পেতে হয় যদি বিদেশে চলতে হয় একাকী। যে

একাকী আমার মত বিদেশে চলেছে, সে-ই নিশ্চয় বুঝতে পারবে আমি কি বলছি। রাত তখন বোধ হয় দশটা হবে। কয়েকটি লোক আমার কাছে এল। তারপর নানা কথা বল্‌ল, একটা কথাও বুঝলাম না। একটি যুবক একটি ইঙ্গিত কর্‌ল, বুঝলাম এরা মাঞ্চুকো নয়, জাপানীদের শত্রু। কিন্তু এই শত্রু-মিত্রতে আমার কি আসে যায়? অনেকক্ষণ এরা আমার কাছে বস্‌ল, যখন কোন কথাই আমায় বুঝাতে পারল না, তখন একজন একটি চীনা লাল পতাকা সামনে রেখে আমাকে বল্‌ল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে। ক্ষতি কি তাতে আমার? আমি তার গোড়ায় গিয়ে বেশ ভাল করে পণ্টনী-মাফিক নয়, একদম গড় করলাম। তা দেখে সবাই হাস্‌ল এবং আমাকে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল। বুঝ্‌লাম এদের মাঝে নতুন ভাবের আমদানী হয়েছে।

রুশদের ন্যায় মাঞ্চুরিয়াতে চীনেরও লাল পতাকা আছে। দুটির মাঝে কিন্তু বেশ প্রভেদ আছে। রুশের রক্ত-পতাকায় ঈগল পাখীর চিহ্ন আছে, আর চীনের রক্ত-পতাকায় শ্বেত-সূর্য্যের চিহ্ন আছে। উভয় পতাকার উদ্দেশ্য এক, কিন্তু একে অন্যের উপর খবরদারী করতে নারাজ তাই বৈশিষ্ট্য রাখা হয়েছে। রাত্রি বেশ আরামেই কাটাতে পেরেছিলাম, কারণ বারটার পরই হঠাৎ যে ঘুম এল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তা আর ভাঙ্গে নাই। প্রাতে উঠেই পথ ধরলাম, উদ্দেশ্য একটা ছোটখাট শহর কিম্বা কোন বড় গ্রামে যেখানে ভাল হোটেল পাব সেখানে গিয়ে কিছুটা আরাম করব। সেদিন আর বড় গ্রাম পাওয়া গেল না, বাইরেই থাকতে হ'ল। পরদিন পেলাম একটি গ্রাম। একেবারে মুসলমান পল্লী। এতে অন্য লোকের আর বসতি নাই। গ্রাম পরিষ্কার। শূকর একটিও নাই। কিন্তু গ্রামের অবস্থা শোচনীয়। যুবক নাই বল্‌লেও চলে। অনেক যুবক নাকি লড়াই করে মরেছে, বাকি যারা আছে তারাও বুক বেঁধে বসে আছে, যখন সুযোগ পাবে তখনই মরবে। কয়েকজন লোক এখানে পেয়েছিলাম যারা নানা দেশ ঘুরে এসেছে। কিন্তু বড় দুঃখে বলছি এরা একেবারে মরতে প্রস্তুত। গ্রামের কাছেই থানা। তার পাশে কোরিয়ানরা এসে আড্ডা গেড়েছে বসবাস করতে। তাদের সাহায্য করতে মাঞ্চু সেনা সব সময়ই ব্যস্ত। আমি থানায় না থেকে গ্রামে

থাকব জানালাম। ওরা বললে, "আপনিও বৌদ্ধ, আমরাও বৌদ্ধ, তবে মুসলমান গ্রামে কেন?" আমি বললাম "দুধ দই আরাম করে খাব তাই গ্রামে থাকতে চাই। খাওয়া প্রথম তারপর ধর্ম্ম।" আপত্তি করল না চীনা সেনারা, কিন্তু আমাকে যেতে হ'ল এক বাড়ীতে তাদের নির্দ্দেশ মত। ভদ্রলোক শিক্ষিত এবং বিবাহিত, ছেলেপিলেও আছে। পুলিশ সমেত আমাকে দেখেই তাঁর কি মনে হ'ল বল্‌তে পারি না, কিন্তু তাঁর দুটী ছেলেই একসঙ্গে কান্না সুরু করে দিল। শুনেছি অনেক, তাই এই কান্নার কারণ আগেই বলছি। গ্রামকে গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, স্ত্রীপুত্রের সামনে গৃহস্বামীর মাথা কেটে ফেলা, পনর বৎসরের নাবালক নবীনদের শ্রেণীবদ্ধ করে গুলী করা, এ হ'ল এ রাজ্যের রেওয়াজ। তাই পুলিশ দেখে ছেলে দুটি কি হাসবে? যখন রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তখনই এরূপ হয়ে থাকে, যারা এসব অত্যাচার পরোয়া না করে এগিয়ে চলে তারাই বাঁচে, আর যারা সহ্য করতে পারে না তাদেরই অস্তিত্ব লোপ হয়। আজ মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের মাঝে এরূপই পরিবর্ত্তন আসছে, কেউ অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে খাঁটি ধার্ম্মিক সেজেছে, কেউ প্রাণপণ লড়ছে। চীনের মুসলমান সমাজ যেন স্বাধীনতার জন্যই প্রাণ দিচ্ছে, কারণ মাথা অবনত করতে মাত্র কয়েকটি লোককে দেখেছি।

পুলিশ আমাকে রেখেই চলে গেল। ভদ্রলোকের মনে শান্তি দিবার জন্য আমার অটোগ্রাফ খুলে দেখাতে লাগলাম। তাতে তাঁর মন বেশ পরিষ্কার হ'ল। ছেলে দুটিকে ডেকে আনলেন, স্ত্রী তাঁর কাছেই ছিলেন। অনেকক্ষণ অটোগ্রাফ দেখে যখন মনে হ'ল নবাগতকে কিছুই খেতে দেওয়া হয় নাই তখন লজ্জাভরে গৃহিণী গিয়ে পাকঘরে ঢুকলেন। মাঞ্চুরিয়াতে উনুনে আগুন ধরাতে বেশ বেগ পেতে হয়, তাই আধ ঘণ্টার পর চা খেতে হয়েছিল। গ্রামের অনেক লোকই নবাগতকে দেখতে এসেছিল বটে, কিন্তু বসে কথা বলে নাই, শুধু পাশ কাটিয়ে যেতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ পর্য্যন্ত। দুঃখের বিষয়, গৃহের মালিক চীনা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। আমিও কোন কথা বলতে চাই নাই। গৃহের মালিক দুবার পুলিশ ষ্টেশনে গিয়েছিলেন তা লক্ষ্য করেছিলাম। রাতে খাবারের বেলা দেখলাম আরও তিনজন নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন। একজন সাংহাই হতে এসেছেন, ইংরেজী মন্দ

জানেন না। তিনি কথায় কথায় বল্‌লেন, "যেরূপভাবে জাপানীরা ঘিরে বসেছে তাতে মনে হয় না বাঁচব, কিন্তু আপনি তো অনেক দেখেছেন, কি মনে করেন?" আমার বলার কিছুই ছিল না, শিক্ষানবীশ মাত্র। তিনি আরও বললেন যে, হয় তো চীনা মুসলমানরা একেবারে বাজি উল্টাবে, অন্যান্য-দের দলে টানবে। এরই মাঝে যে সব কাফের মুসলমান জেনারেলদের সঙ্গে থেকে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদের জন্য শূকর-মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে। শূকরটাকে ওজন করে যতটুকু হয় মুসলমান সেনাদের তত ওজনের সব্‌জি দেওয়া হয়। ভাত একসঙ্গেই পাক হয় মুসলমান পাচকের দ্বারা, উভয় দলের সেনাই আপন আপন তরকারী নিয়ে চলে আসে ভাত কিম্বা রুটি নিতে। এতে মুসলমান পাচক কোনরূপ ঘৃণার ভাব দেখায় না। এমনটি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, শুধু মা-চান্দ সান এবং তাঁর মতাবলম্বী উদার জেনারেলরাই দেখিয়েছেন। এতেই বৌদ্ধ ও কনফিউসিয়ান চীনারা মুসলমান চীনাদের ভালবাসতে আরম্ভ করছে। কথাগুলি চটপট করে শেষ করেই ভদ্রলোক মৌনব্রত অবলম্বন করলেন, কারণ আমাদের খাবার দেখতে একটি চীনা সৈনিক এসেছিল। এসে যখন দেখল দইয়ের সঙ্গে ভাত মিশিয়ে আমি খাচ্ছি তখনই সে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাল এবং একটু দূরে গিয়ে বমি করতে লাগল। চীনারা অনেকে দই দুধ খাওয়া এমন কি দেখতেও পারে না। বিদেশী আচার-ব্যবহার দেখতে যে আমি বের হয়েছি তা অনেকটা সার্থক হ'ল।

রাতে আমাদের আর কথা হ'ল না, আরাম করে ভদ্রলোকের বাড়ী শুয়ে পড়লাম। তবে আগামী কল্য থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্য সাইকেলের একটি "নাট" খুলে রেখে দিতে হয়েছিল, কারণ এই নাটটি না হলে সাইকেল চালাতে পারব না, এবং তা তৈরী করতে হলে কামারের অনেক সময় লাগবে। কামারও বোধ হয় একটু উপদেশ পেয়েছিল সাংহাই-ফেরতা ভদ্রলোক হতে, তাই সে "নাট"টা বেলা ১১টার সময় দিয়েছিল। বিকালবেলা কোথাও আমি চলি না, তাই পরদিনও পুলিশের অনুগ্রহে থাকতে পেরেছিলাম সেই অভিশপ্ত গ্রামে, যে গ্রামের অনেক বিধবা এখনও বোধ হয় তাঁদের স্বামীর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস আর চোখের জল ফেলছেন।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে লোকের সোরগোল শুন্‌তে পাওয়া গেল। কেন গণ্ডগোল হচ্ছে জান্‌বার জন্য বের হচ্ছি এমন সময় বাড়ীর মালিক এসে আমার হাত ধরলেন। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে সোজা থানার দিকে গিয়ে দেখি, কতকগুলি লোক পাগলের মত হাত নাড়ছে আর এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে। বুঝলাম না ব্যাপারখানা কি। কতকক্ষণ পরে দেখলাম কতকগুলি যুবককে ধরে আনা হয়েছে, তাদের হাত-পা বেঁধে দাঁড় করান হ'ল। তারপর এরা বসে পড়ল। তারপর যেমন হয় তেমনি আপন আপন দেহ রেখে স্বর্গধামে চলে গেল। চট্‌পট ফিরে এসে যে "নাট"টি খুলে রেখেছিলাম তাই লাগিয়ে গ্রাম ছেড়ে চললাম। পথে যেতে যেতে একবার পিছন দিকে তাকাই আবার এগিয়ে চলি। এতগুলি লোক হত্যা করতে দেখা ধাতে সয় না। কিন্তু ভাবতে লাগলাম, এরা ম'রল কেন? এদের জ্ঞানই হয়েছে এদের মৃত্যুর কারণ। যদি "আল্লা আল্লা" করত, পবিত্র কোরাণ পাঠ করত, তবে হয় তো অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারত। এ সব ঝামেলার মধ্যে থাকা ভাল নয় ভেবে এগিয়ে চললাম।

কিন্তু বললেই কি হয়? ক্ষণেকের তরে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া মাত্র। যদি সাথী থাকত তবে কথা বলে মনটাকে ভুলান চলত, কিন্তু একা যা চোখে পড়ে, তা নিয়েই ভাবতে হয়। সেদিনটা কাটল, পরদিন পথে একটা নদী পড়ল। তাতে অনেকগুলি নৌকা ছিল। একটা নৌকাতে গিয়ে বসলাম। তারপর মানচিত্রটা খুলে মুকদেন দেখালাম। তারা বললে—"ফেংটিং"। মুকদেনের অন্য নাম ফেংটিং। ইঙ্গিতে ঠিক হ'ল তারা আমাকে কতক দূর নিয়ে যাবে, তারপর নামিয়ে দিবে, কারণ এ নদী মুকদেনের দিকে যায় না। সাইকেল নৌকাতে তুলে বিছানা পেতে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। বিশ্রাম চায় শরীর, তাই বিশ্রামের কথা বার বার বল্‌তে হচ্ছে। পরিশ্রম কর, দেখবে বিশ্রামের কথা বলতে ও শুন্‌তে কত ভাল লাগবে। অম্ল, ডিস্‌পেপসিয়ার কথা মনেও আসবে না।

নৌকার মাঝিরা সবাই দক্ষিণে। দক্ষিণের লোক উত্তরে এসে বেশ নৌকার মাঝির কাজ একচেটে করে নিয়েছে। এরা আমার মত বিদেশীর উপর বড়ই দয়ালু। কোন ধর্ম্মের নাম এরা শুনতে পছন্দ করে না। ধর্ম্ম-

সম্পর্কিত কথা এদের কাছে কাহিনীর মতই। অনেক মিশনারী আসেন এদের কাছে ধর্ম্মের কথা শুনাতে, তারা শোনে এবং বিনে পয়সায় বই নিয়ে কেউ উনুন ধরায়, কেউ বাণ্ডিল বাঁধে। এরা নৌকা চালাতে বেশ দক্ষ, বড় বড় নৌকা তিন জনে উজানে চালাতেও সক্ষম হয়। লক্ষ্য করে দেখেছি, নৌকা চালনায় এরা শুধু শক্তির ব্যবহার করে না, মস্তিষ্কও চালনা করে। আমার সঙ্গে এরা আরাম করে বসে মানচিত্র দেখত এবং কত কিছু বল্‌ত তার ইয়ত্তা নাই। আমাকে যে খাবার দিত তাও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে। যে লোকটি রান্না করত সে পাকে যাবার পূর্ব্বে প্রথম হাত-মুখ ধুত, তারপর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে পাকে বসত এবং আমায় কাছে বসতে বলত। এদের এই আশাতীত ভালবাসার একমাত্র কারণ হ'ল, এরা অনেক দুঃখকষ্ট সয়ে অবশেষে একখানা নৌকার মালিক হয়েছে। তারা তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে মুকদেনের পথে এনে আমাকে নামিয়ে দিল। যার সঙ্গে দু একদিন থাকি সে-ই যেন আপন হয়ে যায়, তাই তাদের কাছ হতে বিদায় নিতে কষ্ট হয়েছিল। নৌকা হতে নেমে একটি ছোট বাজারে এলাম। এখানকার লোকেরা পথ দেখিয়ে দিলে তবে একটি হোটেলে যেতে পেরেছিলাম।

বাজারে বড় বড় চিংড়ী মাছ সিদ্ধ করা রয়েছে, খাবারের দোকানী তা সাজিয়ে রেখেছে। দেখে আমার লোভ হল বটে, কিন্তু এত দাম হাঁকলে যে তা ক্রয় করা আমার সম্ভব হ'ল না। এই একমাত্র দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখেই সেদিনকার মত সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। পরদিন ফের বের হয়ে পড়লাম। পথ মন্দ নয়, তবে এসব পথে লোক-চলাচল বড় নাই। যেখানেই পথটা বিভক্ত হয়ে দুদিকে প্রসারিত, সেখানেই দাঁড়াতে হ'ত। কাঁচা পথ কোনদিকে গিয়েছে কে জানে? লোকের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ত। যখনই লোক পেতাম তাদের জিজ্ঞাসা করে পথ ঠিক করে নিতাম। এ কম কষ্ট নয়, ধৈর্য্য ধরে পথে বসে থাকতে হ'ত। মুকদেনের পথে আমার বড় বেশী আর সাইকেলে চলতে হয় নাই, কারণ প্রত্যেক দশ মাইল অন্তর হয় জাপানদ্রোহী চীনা যোদ্ধা, নয় মাঞ্চুকো ফৌজ পেতে লাগলাম। একে অন্যের সংহারের অপেক্ষায় বসে আছে।

একদিন এক জাপানদ্রোহী চীনা পল্টনের তাঁবুতে অতর্কিতে পৌঁছি। তারা তখন খেতে বসেছে। আমাকে দেখে তারা হয় তো ভেবেছিল জাপানী, কিন্তু হিন্দু হিন্দু বলে চীৎকার করাতে তাদের শান্তিভঙ্গ হয় নাই। একজন এসে আমাকে তাদের কাছে বসে খেতে বল্‌লে। আমি ভারতীয় প্রথা মতে হাতে খেতে লাগলাম। হাসির রোল পড়ল, তারপর কি একটি আদেশ হ'ল, সবাই চুপ। খাওয়া শেষ হলে এত তাড়াতাড়ি তাদের জিনিষপত্র তারা গুছিয়ে নিল যে, আমার পক্ষে তা ধারণা করাও একরূপ অসম্ভব। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাই চলে গেল, আমি তাদের পরিত্যক্ত তাঁবুতে পড়ে রইলাম। বুঝলাম এরূপ ভাবে এ অঞ্চলে বেড়ান মোটেই নিরাপদ নয়, তাই সেদিনই বিকালে একটা রেল ষ্টেশনে গিয়ে টিকেট কিনে মুকদেনের দিকে রওনা হলাম।

লাল রুশ

মুকদেন কাছেই, সেজন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট না কিনে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনলাম। এদিকে জাপানী গাড়ী চলাফেরা করে। জাপানী দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসার স্থানের সঙ্গে আমাদের দেশের কোন গাড়ীর তুলনা হতে পারে না! ভেলভেট দিয়ে মোড়া নরম স্প্রিংএর গদি, বস্‌লেই শরীরটা যেন ডুবে যায়। আরামের সঙ্গে আনন্দ এসে দেখা দেয়। সিটে বসে বড়ই আনন্দ হ'ল, আমার আশে-পাশের সিটগুলি প্রায়ই খালি। পাশের সিটে বসে রয়েছেন একজন শ্বেতকায়, পোষাক দেখেই মনে হ'ল, তিনি রাশিয়ান ছাড়া অন্য জাতীয় নন। একটু দূরে একজন চীনা আর একজন রাশিয়ান। এই লোকগুলিকে একটু লক্ষ্য করেই বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখের সামনে আসছিল আর সরে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ তা দেখে একটা সিগারেট ধরালাম এবং পাশের বসা লোকটিকে একটি সিগারেট দিতে চাইলাম। ভদ্রলোক বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললেন, তিনি সিগারেট খান না। তিনি তাঁর পরিচয়ও তেমনি দিলেন, বললেন—লাল রাশিয়ান। লাল রাশিয়ান কথাটা কিন্তু বড় ভাল নয়, তারপর তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা আরও মারাত্মক। কিন্তু আমি তা জেনে শুনেও কথা বলতে লাগলাম। সর্ব্বপ্রথম

আমি যে পর্য্যটক, ভদ্রলোক তা মানতে চাইলেন না। কিন্তু যখন আমার অটোগ্রাফ বই দেখতে পেলেন তখন পর্য্যটক বলে মেনে নিলেন এবং আমার বইটা আগাগোড়া দেখতে চাইলেন। বইটা তাঁকে দেখতে দিলাম। তিনি তাঁর কাছ হতে আমাকে একটা press cutting বই দিলেন। তাতে রাশিয়া সম্বন্ধে নানা দেশের সংবাদপত্রের মন্তব্য রয়েছে। 'লণ্ডন টাইমস' ও 'নিউজ ক্রনিক্‌ল'-এর অনেক প্রবন্ধ দেখলাম। আমি খুঁজতে লাগলাম আমাদের দেশের কোন প্রসঙ্গ আছে কি না। অনেকগুলি পাতা ওলটাবার পর দেখি—'অমৃতবাজার পত্রিকা'র একটি বৃহৎ প্রবন্ধ তাতে আছে। তারপরই একটি প্রবন্ধ 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র রয়েছে। দুটি প্রবন্ধ একেবারে বিভিন্ন মতের। "হিন্দু" পত্রিকারও কাটিং রয়েছে, ভদ্রলোকের সংগ্রহ ভাল। 'হিন্দু' একটি ছোট প্রবন্ধে লিখছেন—"যদি বিদ্বান এবং মূর্খের একই দর হয় তবে সংসার চলবে কি করে?" ভদ্রলোকের বই দেখা হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব প্রবন্ধ কোথা হতে যোগাড় করেছেন? ভদ্রলোক বললেন, অনেকস্থান হতে, এটা তাঁর খেয়াল। রুশ দেশ সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্বসাধারণের কিরূপ ধারণা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন? জবাব দিবার মত আমার কিছুই জানা ছিল না, অল্পের মধ্যে সেরে নিলাম; ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বসলেন। কতকক্ষণ পর আমাকে তাঁদের দেশে যেতে বললেন; তারপরই বললেন, "যাবেন না, গেলে বিপদে পড়বেন।" কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনলাম, যারা রুশ দেশে যায় তাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের নজর পড়ে। যেরূপ গম্ভীরভাবে কথা বলছিলেন তাতে আমায় চুপ করেই থাকতে হ'ল। রাত সাড়ে নয়টার সময় আমি গাড়ী হতে নেমে পড়লাম। ভদ্রলোক আমাকে গম্ভীরভাবেই বিদায় দিলেন।

মুকদেনে

ষ্টেশন হতে বেরিয়ে আমাকে হোটেল খুঁজে বের করতে হ'ল না। ষ্টেশনে একজন সিন্ধী ভদ্রলোক একজন চীনার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলছিলেন। আমাকে দেখেই কথা বন্ধ করলেন এবং সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দোকানে গেলাম এবং সেখানেই থাকবার বন্দোবস্ত করে নিলাম। প্রাতে উঠে চ্যাং স্যুয়ে লিয়াঙের পরিত্যক্ত বাড়ী দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, এখন জাপানী পল্টনের আড্ডা। যে সব অস্ত্রের কারখানা জার্ম্মান কারিগর দিয়ে পরিচালিত হ'ত তাতে জাপানী কারিগর পূরাদমে কাজ চালাচ্ছে। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই এই সব দেখে ফিরে এলাম। দোকানের ভিতরে এসে দেখি কতকগুলি জাপানী সিল্কের উপর, Made in India (ভারতে প্রস্তুত) সিল মারা হচ্ছে, এরূপ কেন করা হচ্ছে তা আগেই বলেছি, তাই প্রতিবাদ আমি করি নাই। আমি যেন এসব কিছুতে নাই এরূপ ভাব দেখালাম, কিন্তু সিন্ধী ভায়ার তাতে আরও রাগ হ'ল আমার উপর। উপরে এসে আমাকে বললেন, আপনি এমন করে দাঁড়াবেন না যখন আমরা কাজ করি। আমার বেপরোয়া ভাব। তাঁকে কিছু না বলেই বাইরে চলে গেলাম এবং একটা হোটেল ঠিক করে এসেই জিনিষপত্র নিয়ে বের হলাম। এতে দোকানী একটু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। আমিও রক্ষা পেলাম, কারণ এরূপ চোরের মত থাকা আমার রীতি নয়।

হোটেল চীনার, কিন্তু রক্ষক জাপানী। এখানে প্রত্যেক চীনা হোটেলে এক একটী জাপানী আত্মগোপন করে আছে। চীনা হোটেলে আমাকে স্থান দেওয়া বা না-দেওয়াও যেন জাপানীর উপর নির্ভর করছিল। জিনিষপত্র রেখে ফের বের হয়ে পড়লাম। জাপানী মেয়েরা এরই মধ্যে নানা স্থানে দোকান খুলে বসেছে এবং জাপানী পণ্যে সমুদয় মুকদেন শহর ছেয়ে ফেলেছে। জাপানী দোকানগুলিতে এক একটি রেডিও রয়েছে, তাতে অবিশ্রান্ত বেতার বক্তৃতা চলেছে। মাঝে মাঝে কোরিয়ান সঙ্গীতও হচ্ছে, কারণ জাপানী গান

শুনতে মোটেই মধুর নয়। চীনা এবং জাপানী গানে মানুষের প্রাণ চমকে ওঠে। বিকাল বেলা একটি দোকানে বসে কতকগুলি কোরিয়ান গান শুনলাম, মনে হ'ল ভারতের গানের সঙ্গে এই গানের অন্ততঃ সুরে অনেকটা মিল আছে।

জাপানে ইংরেজী শিখান হয় বোধ হয়, কারণ যত জাপানী ব্যবসায়ী প্রায়ই মনের ভাব ইংরেজীতে প্রকাশ করতে পারে। কয়েকজনের সঙ্গে কথাও হ'ল। কিন্তু একটু কথা হলেই জিজ্ঞাসা করত আমি কমিউনিষ্ট কি না? কথাটার দুটী অর্থ হতে পারে। হয় তো তারা কমিউনিষ্ট, আমি তাদের দলের লোক কি না জানতে চায়, অথবা তারা কমিউনিষ্ট নয়, আমাকে শুধু পরীক্ষা করতে চাইছিল। কথাটা যে ভাবেই পাড়া হ'ত না কেন, তাতে দুটী অর্থই বুঝাত। কি করে কথাটা আরম্ভ করত এখন মনে পড়ছে না। এদের সঙ্গে কথা না বললেও চলত না, কারণ চীনারা আর কথা বলে না, মাথা নত করে শুধু কাজ নিয়েই থাকে। যে সব কথা না বললে নয় তারা তাই মাত্র বলে। চীনাদের দোকানে জিনিষ কেনার অছিলা করে ঢুকতাম। বড় বড় দোকানে এক একজন জাপানী চীনা পোষাক পরে বসে আছে দেখতাম, আর ফিরে আসতাম। ছোট দোকানগুলিতে যেতাম, কিন্তু কোন সাড়া পেতাম না। আমি লক্ষ্য করতাম কি করে একটা জাত ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র অন্য জাতের দাসত্ব গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই মাঞ্চুরিয়ায় ভ্রমণ করেছি। চীনা আচার-ব্যবহার অনেক দেখেছি, আর সেদিকে নজর রাখবার দরকার বোধ করি নাই।

একটী চীনা দোকানে সাইকেল মেরামত করতে গিয়েছি। দোকানটী একটী গলিতে। দোকানে মালিক ছাড়া আর কেউ নাই। আমাকে পেয়ে দোকানী বড়ই আনন্দিত হ'ল এবং অটোগ্রাফ বইটা দেখতে লাগল। দুঃখ করে বলল, তারা চীনদেশ হতে প্রকাশিত কোন সংবাদপত্র পাঠ করতে পায় না। কিন্তু একদিন তাদের দুঃখেরও অবসান হবে আশা করে আছে।

এখানে এসে ইউরোপীয়ানদের বেশ সাহায্য পেতে লাগলাম। 'হেরাল্ড' বলে একখানা ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্র জাপানী আদেশ মেনে চলতে পারে নাই বলে বন্ধ হয়েছিল। সম্পাদক বৃটিশ কন্‌সালের অফিসে কয়েকদিন আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। এ মুল্লুকে জাপানীরা যা করছে

সবই গায়ের জোরে। প্রথমতঃ 'হের‍্যাল্ড' পত্রিকার সম্পাদককে তাদের দলে টানতে চেয়েছিল। যখন তিনি তাদের কথায় সাড়া দেন নাই, জোর করে তাঁর অফিস বন্ধ ক'রে তাঁকে মাঞ্চুরিয়া হতে চলে যেতে বলা হয়। তিনি মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে যেতে রাজী হন নাই, জোর ছিল আইনের মারপ্যাঁচ। মাঞ্চুকোকে স্বাধীন রাজ্য বলে কেউ স্বীকার করে নাই, অতএব মাঞ্চুরিয়া চীনের অংশ এবং Non-capitulated country. না বিচার করে কি করে তাড়ান যাবে? বিচার করতে হলেও বৃটিশ কন্‌সাল করবেন। কিন্তু জাপান যে জোর করে সবই করছে তা আইনজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের মনে ছিল না বলেই এত তর্ক করেছিলেন। শেষটায় যখন জাপানীরা তাঁকে পাকড়াও করতে এসেছিল, তখন তিনি বৃটিশ কন্‌সালের অফিসে পালিয়ে যান। ডানলপ কোম্পানীর ম্যানেজার মনের দুঃখে অনেক কথা বলেছিলেন এবং পরে আমাকে একখানা সাইকেলও দিয়েছিলেন যখন আমার সাইকেলখানা উধাও হয়েছিল। এসব কথা পরে আসবে।

একটি সিন্ধী দোকান হতে তাড়িত হয়ে অন্য কোন সিন্ধীর দোকানে গেলাম না, আর মাত্র একখানি দোকান। বেচারীর ভাই মরেছে কয়েক সপ্তাহ হ'ল। তাঁর অন্য ভাইয়ের ছেলেপিলে আছে হারবিনে। যদি আমি হারবিন হতে ফিরে এদিকে আসি, তবে যেন ছেলেপিলেদের সঙ্গে আনি এই অনুরোধ জানালেন, কারণ রেলগাড়ীতে চড়ে তিনি নিজের প্রাণ হারাতে রাজী নন। নিজে বেঁচে থাকলে ছেলেপিলে আরও পাওয়া যাবে—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাঁকে অভয় দিয়ে বললাম, যদি এদিকে ফিরে আসি তবে ছেলেপিলেদের তাঁর ভাইয়ের দোকান হতে নিয়ে আসব।

এখানে চোখের ডাক্তার আছেন একজন হিন্দুস্থানী। তিনি মামুলী হিন্দী বলতে পারেন। আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। বিবাহ করেছেন চীনা মুসলমানের মেয়ে। চীনা মুসলমানরা প্রায়ই মাছ মাংস খায় না, যদিও বা খায় তবে ঐ শূকর মাংস ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ এই মাংস তাদের দেবতার পূজায় লাগে। পাঠান ডাক্তার খাঁটি মুসলমান। বিবাহ করেছেন মুসলিম চীনা বটে, তবে শান্তিতে নাই। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, বুদ্ধদেবের জন্মদিন, কনফিউসিয়াসের জন্মদিন এবং দ্বাররক্ষক দেবতার পূজার

দিন তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে টাকা নেন এবং শূকরের পরিবর্ত্তে হাঁসের মাংস দেবতার নামে উৎসর্গ করেন তার উপর দেশী মদ ছড়িয়ে দিয়ে। খাবার খেতে বসে দেখি যা পাক হয়েছে সবই নিরামিষ। পাঠান কি করে নিরামিষাশী হলেন তা জিজ্ঞাসা করলাম। বেচারী বড় দুঃখ করে বল্‌লেন, 'চীনা মেয়ে আপন বৈশিষ্ট্য ছাড়বে না মরলেও, কোন মতেই আমার পথে আনতে পারছি না, হয় তো আমাকেই তার পথ ধরতে হবে। এ তো আর ভারতবর্ষ নয়। এ যে চীনের মেয়ে, জীবন্ত কাফের, তবে এরা এদের বৈশিষ্ট্য রাখতে পেরেছে দেখে দুঃখিত নই, বরং আনন্দিত।'

কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলাম, কিছু বলি নাই। বিদায়ের বেলা আমার পাঠান ভাই পঞ্চাশটি ডলার দিলেন এবং আলিঙ্গন করে বললেন, "আমার তিন ভাই আছে আন্তং-এ, তাদের সঙ্গে দেখা করবেন, বেশ সাহায্য পাবেন। চিঠি লিখে দিব, আপনি তাদের কাছে যাচ্ছেন।"

মুকদেনও চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা শহর। এরই মাঝে জাপানীদের একটি কন্‌সেশ্যন ছিল। এই কন্‌সেশ্যনই মুকদেনের পতনের কারণ। এখান হতেই নানাকার্য্য সিদ্ধ হ'ত বলে শুনা গেল। শহরটা বেশ ভাল করে ঘুরে এলাম। লক্ষ্য করলাম কারবার চলছে বটে, কিন্তু তা অনিচ্ছায়, সবাই যেন কিছুর অপেক্ষায় আছে। ঘুরতে ঘুরতে একজন জেনারেলের বাড়ী গেলাম। এই জেনারেলের বাড়ীর সামনে প্রহরী নাই, একজন জাপানী গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তাকে কিছু না বলেই আমি যেমন ভিতরে প্রবেশ করেছি, অমনি দুটী রক্ষী আমাকে ধরে জাপানী ভদ্রলোকের সামনে নিয়ে গেল। ভদ্রলোকটি আমার বইটা এবং আমাকে দেখলেন, তারপর একটা বোর্ডে চক দিয়ে কি লিখলেন। লেখা পড়ে রক্ষী দুজন আমাকে তাড়িয়ে দিল। বুঝলাম এ বড় সুবিধার জায়গা নয়। জেনারেল এখন আর জেনারেল নয়, এখন আদেশ মানতে হয় এই গম্ভীর প্রকৃতির জাপানীটির। অভ্যাসমত একটা চীনা স্কুলে গেলাম, সেখানে আমাকে আপ্যায়ন দূরের কথা কেউ একটি কথাও বললে না। অটোগ্রাফ বই দেখাতে গেলাম, কেউ দেখল না। বুঝলাম স্বাধীনতার যবনিকা পতন হয়েছে, এবং সুরু হয়েছে নতুন শাসনতন্ত্র। অনুসন্ধান করে জানলাম, শিক্ষকরা পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তা হবার

যো নাই। নাচতে হবে, গাইতে হবে—যেমনটি বলা হয়, যেমনটি মহলা হয়; নতুবা বরখাস্ত নয়, পৃথিবী হতে একেবারে বিদায়। যারা পৃথিবী হতে চিরবিদায় নিতে চেয়েছিল তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, এখন রয়েছে আজ্ঞাবাহী অন্নদাসের দল। দ্বিপ্রহরে যখন ছুটী হয় তখন মাঞ্চু-পতাকা সেলাম করতে হয়। যে সব বালক তা করে নাই, তারা দণ্ডিত হয়েছে, 'মা মা' বলে কেঁদেছে, কিন্তু মা কাছে থেকেও ছেলেকে দণ্ড হতে রেহাই দিতে পারে নাই। শুনা কথা বলছি দু'একটা। একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ছেলেরা তাদের পূর্ব্ব কায়দা মত "Long live Chinese Republic, Long live Revolution" বলে চীৎকার করে ওঠে। জাপানীরা সেজন্য ছেলেদের সাজা দেয় নাই, শুধু সমুদয় বিকাল বেলা "Long Live Manchukuo" বলে চীৎকার করতে বাধ্য করেছিল।

লোকমুখে আরও শুনলাম, যেদিন জাপানীরা কেল্লা আক্রমণ করে সেদিন চ্যাং স্যুয়ে লিয়াং পিকিনে ছিলেন, এমন কি যিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত তিনিও পিকিনে ছিলেন। এই অনুপস্থিতির জন্য অনেকে জেনারেল চ্যাং কাইসেককে দায়ী করে। যাঁরা শহরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের এমন কারও ক্ষমতা ছিল না যে, লড়ায়ের আদেশ দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিনা বাধায় জাপানীরা মুকদেন অধিকার করে। কেল্লার ভিতর চ্যাং স্যুয়ে লিয়াঙের অনেক স্বর্ণ জমা ছিল। তাও নাকি জাপানীদের হাতে পড়েছে। এই স্বর্ণ যদি জাপানীদের হাতে পড়ে থাকে, তাতেও বড় বেশী আসে যায় না। কারণ মাঞ্চুরিয়ায় যে সব স্বর্ণখনি আছে, তা যদি জাপানীরা হাত করে—আর লৌহ খনিতে কাজ করতে তো স্বচক্ষেই দেখে এসেছি—তবে একদিন এশিয়া কাঁপবে। জাপানের যত জাহাজ দেখেছি, তাতে যত লৌহ নিৰ্ম্মিত যন্ত্রপাতি রয়েছে সবই ইংলণ্ডে তৈরী। তারপর গমের ক্ষেত্র এবং সয়াবীনের সীমাহীন ক্ষেত্রগুলি জাপানী ও কোরিয়ানদের একটী বড় অবলম্বন। যিনি যাই বলুন না কেন, যদি দশটি বৎসর জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া শান্তির সহিত ভোগ করতে পারে, তবে এই প্রাচ্যখণ্ডে তার আর কারুকে ভয় করবার কারণ থাকবে না।

সারাটা দিন ভ্রমণ করে হোটেলে ফিরে এলাম। সিন্ধী ভায়া এসে

বললেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, হারবিন হতে ফিরে এসে যেন তাঁরই বাড়ীতে থাকি। হারবিন যাব ঠিক করেছি সাইকেলে নয়, ঘোড়ার গাড়ীতে নয়, ঘোড়ায় চড়ে, কারণ এখান হতে মোটেই আর পথ নাই। সিন্ধী ভায়াকে বললাম, "সাইকেলটা আপনারই ঘরে রেখে যাব। অন্ততঃ সাইকেলের মায়ায়ও আপনার গৃহে আসব। তবে চট্ করে আপনাদের কথা আমি মানব না, আগামী কল্য সাইকেল নিয়ে চলব, দেখব পথ পাই কিনা। না পাই, তখন নাচার হয়ে আপনাদের কথা মেনে নিব।" দোকানী আমার কথায় সন্তুষ্ট হলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁরই দোকানে কিছু খাওয়ার জন্য। তাঁর বাড়ী হতে ফিরবার পথে একটি জাপানীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে নিজেই আমার সঙ্গে কথা সুরু করে দিলে। কথা বলতে বলতে আমার হোটেলে সে এল। আমার মনে হ'ল মিঃ ওয়াঙের উপদেশ। লোকটি বলতে লাগল, "চীনারা এত আহাম্মোক যে, আমাদের ভাল না বেসে ইউরোপীয়ানদের ভালবাসে। আমেরিকানরা যেন তাদের নিকট আত্মীয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন পাশ্চাত্য বা আমেরিকান্ জাতি চীনাদেরে সমভাবে দেখছে না। মাঞ্চুকো সেদিন জন্মেছে, এরই মাঝে মাঞ্চুকো স্বাধীন হয়েছে, তা কি আপনার ভাল লাগে না?" মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাওয়া মাত্র। জাপানী যত মিত্রই হোক না কেন তার রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের বিপক্ষে কোন কথা বললেই সে রেগে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করে। এখানেই তাদের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ইউরোপীয়ান জাতি ধীরে ধীরে তার প্রতিকার করে। সেই লোকটি যতগুলি কথা বলল একটীতেও তর্ক করলাম না, কারণ ভাল করে জানি তর্ক করলেই মাঞ্চুরিয়া হতে তাড়িত হব, বৃটিশ কনসাল শত চেষ্টা করেও আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। যে open door policy সবাইকে জয়ঢাক বাজিয়ে জাপানীরা শুনিয়েছিল, এরই মাঝে তা বন্ধ করতে আরম্ভ করেছে। সবাই তো চেয়ে দেখছেন, প্রতিকার কেউ করছেন না। আমার ক্ষেত্রেও তাই হবে। সুবোধ ছেলের মত সবই শুনে যেতে লাগলাম। লোকটি কথায় কথায় বৃটিশ সরকারের বিপক্ষেও কিছু বলল, ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। তার উত্তরে আমি বললাম, বৃটিশ এবং ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিচার করবার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে আর ভারতবাসী ডাকবে

না। অন্য নবাগতকে ভারতবাসী তো চায় না, উপরন্তু কোন সাহায্যও কারও কাছ থেকে চায় না। মুকদেনের নিদর্শন আর দিলাম না, শুধু চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক ম্লানমুখে আমার কাছ হতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মনে মনে ভাবলাম এখানে বৃটিশ কনসালের বাড়ীতে যাব না, কি জানি যদি জাপানী ভাবে আমি ব্রিটিশ স্পাই, কিন্তু পরদিন প্রাতে দেখে এলাম বাড়ীটা, যদি কোন দরকার হয়। বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে গিয়ে পড়লাম। শহরে থেকে অবনত-মস্তক চীনাদের মুখ দেখতে আর ভাল লাগছিল না। শহরের বাইরে এসে একটা বাগানে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কয়টি লোককে আমারই সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মাঞ্চু সৈনিকরা। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাদের দিকে তাকাই নাই, শুধু মলিন মুখে তাদের দিকে চেয়ে ছিলাম। হুকুমদার হাবিলদারের আমার কালো মুখের প্রতি নজর পড়ল। অমনি পাকড়াও করবার আদেশ দিল। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের কাছে গেলাম। সর্ব্বপ্রথম সমুদায় শরীর পরীক্ষা হ'ল, তারপর বের হ'ল পাসপোর্ট এবং অটোগ্রাফ বইটা। সাইকেলে চীনা ভাষায় যে 'পৃথিবী পর্য্যটক' লেখা রয়েছে তা হাবিলদারের চোখে পড়ে নাই, না পড়বারই কথা। যারা পরের দাসত্ব ক'রে নিজের ভাইবোনদের সর্ব্বনাশ করতে পারে, তারা আমার মত পথিকের উপর অত্যাচার নিশ্চয়ই করবে। পরীক্ষা করেও শান্তি নাই, তারপর কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একজন জাপানী অফিসার আমাকে পরীক্ষা করলেন এবং আমার অটোগ্রাফ বইয়ে নামও লিখে দিলেন। এই টানা-হেঁচড়ার জন্য পাঁচটি মাঞ্চুকো ডলার বকশিস দিয়েছিলেন। মুকদেনে এসে এই সর্ব্বপ্রথম "ডোনেশন" পাই। টানা-হেঁচড়ার কষ্ট পঞ্চমুদ্রার মুখ দেখে অনেকটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু মাঞ্চুকো সৈনিকদের উপর রাগ ও ঘৃণা ছিল অনেকদিন।

প্রাতে উঠেই চলে যাব বলে ঠিক করেছিলাম, এর কারণ অনেকটা আগেই বলেছি। কিন্তু আমার মনে হ'ল এখানে আরও কয়দিন থাকা উচিত। এত বড় শহরটার কিছুই দেখা হয় নাই। এখনও এমন অনেক কিছু রয়ে গেছে—যা' দেখার যোগ্য। এ জীবনে হয় তো আর এ শহরে আসব না। তাই বাঁধা

কম্বল খুলে ফেললাম, হোটেলওয়ালাকে বললাম, আজ যাব না, কখন যাব—জানাব। হোটেলওয়ালা বলল, সে পুলিশে সংবাদ দিয়েছে--আজই আমি যাব, আবার তাঁকে সংবাদ দিতে হবে—যাব না ; এটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। আমি বললাম, "বল না বাপু জাপানী ম্যানেজারকে, সে-ই তো সব দেখছে, তুমি তো নামকা-ওয়াস্তে মালিক।" জাপানী এসে বলল, "You not go?" আমি বললাম, 'না আজ যাব না, কখন যাব ঠিক নাই, শরীর ভাল নয়।' চুপ করে রইল জাপানী। কতকক্ষণ বসে থেকে পরে হেঁটে চললাম। সাইকেল ছেড়ে পায়ে হাঁটলে আরও বেশী দেখা যায়। আমার ইচ্ছা এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে মিশি এবং ভাল করে বুঝি এরা কি চায়? কিন্তু তা বলে কি সহজে মেশা যায়? যারা লড়ে এবং মরে, তাদের গতিবিধি অন্য রকমের হয়। তারা বেশী কথা বলে না, আবার যখন দরকার হয় তখন পাগলের মত বকে। তারা প্রয়োজনের অধীন।

পাঠান 'হিন্দু'র বাড়ী গেলাম। তাঁকে আমার মনের কথা বললাম। তিনি আমাকে বললেন বৃটিশ কন্‌সালের বাড়ী যেতে। তাতে আমি রাজী হলাম না, বুঝিয়ে দিলাম, বৃটিশ কন্‌সালের বাড়ী যাতায়াত করলে জাপানীদের চোখে পড়তে পারি। তখন তিনি বললেন "এমন করে তো হবে না, আমাকে বুঝতে হবে, দেখতে হবে, 'মাঞ্চুলী' হতে কোন লোক হালে এসেছে কিনা, তার কাছ হতে ঠিক সংবাদ পাব, মা-চান্দ সান করছেন কি?" মুসলমান বললেই যেন মা-চান্দ সানকে বুঝায়? আমি বললাম, তা নয় মুকদেনের মুসলমান। ভদ্রলোকের তখন চৈতন্য হ'ল। কিন্তু তাতে যেন তিনি সম্মত হচ্ছিলেন না। তার একমাত্র কারণ হ'ল ভারতে গিয়ে চীনের মুসলমানদের স্বরূপ বলে দিতে পারি। হিন্দুরা যেমন চীনের বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে গর্ব্ব করেন, মুসলমানরাও চীনের মুসলমান নিয়ে সেরূপ গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু চীনা যে চীনাই, হিন্দু-মুসলমান নয়—এ সংবাদ কে রাখেন? যাঁরা রাখেন তাঁরাও আপন মনে আপন ভাব গোপন করে যান। কিন্তু আমি তা চাই না, আমি চাই ঠিক সংবাদ। অতিকষ্টে পাঠান হিন্দু স্বীকার পেলেন বিকালে তাঁর শ্যালকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন। নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিকালের অপেক্ষায় রইলাম।

ধর্ম্মহীন 'ইসলাম'

সন্ধ্যার পর হিন্দু পাঠানের বাড়ী গিয়ে দেখি দু'জনা লোক বসে আছেন, একজন ডাক্তারের শ্যালক, অন্য জন তার সঙ্গী। উভয়ই বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। ডাক্তারের শ্যালকের নাম মা তান ইয়ান্। আমাকে পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমই আমার ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করলেন। তাঁকে আমি বুঝিয়ে দিলাম—বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মের পিছনে আছে টাকা এবং দল পাকান, এমন ধর্ম্মে আমার আস্থা নাই, অতএব ধর্ম্মের কথা বলে লাভ নাই, তবে আমি হিন্দুধর্ম্মেই বিশ্বাস করি। সর্ব্বপ্রথম আমাকে হিন্দুধর্ম্মের মামুলী কথা বুঝাতে হ'ল, তারপর ভারতের মেয়েদের ধর্ম্মের কথা উঠল। যখন শুনলেন, নারীরা তাদের পতির ধর্ম্ম অনুযায়ী চলে, তখন যেন তাঁদের চমক লেগে গেল। আমারও শুনে চমক লাগল যে, চীনা মেয়েরা তাদের পতির ধর্ম্ম মেনে চলে না। মা তান ইয়ান্ বললেন, "মাঞ্চুরিয়াতে প্রবলভাবে ভণ্ডামির বন্যা এসেছিল, তারই ফলে হয়েছে মাঞ্চুরিয়ার বন্ধন। এই বন্ধন হতে মুক্ত হতে হলে—বৃহত্তর কর্ম্মের সংস্থান করতে হবে, আর সে বৃহত্তর কর্ম্ম হ'ল —প্রাচীন কৃষ্টির বিসর্জ্জন। চীনারা আপন কৃষ্টিতে এত আসক্ত যে তা ছাড়তেই যেন চায় না!" প্রতিবাদ করে বললাম—দক্ষিণ চীনের লোক তবে কি করে পরিবর্ত্তন করে নিচ্ছে? দক্ষিণ চীনের লোক ভীরু নয়, মরতে মোটেই ভয় করে না। যারা কাপুরুষ তারাই আপন কৃষ্টি, আপন ধর্ম্ম এসব নিয়ে পড়ে থাকে, পরিবর্ত্তন করতে চায় না। মাঞ্চুরিয়ার লোক মরতে ভয় করে তাই আপন ধর্ম্ম, আপন কৃষ্টির কথা উত্থাপন করে এবং যা তা বকে। আমার দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, "বোধ হয় আপনি এবং ডাক্তার এক-ধর্ম্মের নন! ডাক্তার তো দেখছি, ইস্‌লাম ধর্ম্মের খোলস নিয়েই মত্ত, তাই তাঁর অবস্থাও কাহিল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় একদিন আসবে—যেদিন সকল ধর্ম্ম বিদায় দিয়ে স্বাধীনতা-ধর্ম্মই হবে জীবনের কাম্য। যারা এরই মধ্যে বুঝেছে, ধর্ম্ম মানে না, তারাই লড়ছে জাপানীদের সঙ্গে, তাদের ভাড়া-করা মাঞ্চুদের সঙ্গে, আর মরছে। এক মিনিটের তরে ভগবানের কথা ভাবে না, ভাবে মাঞ্চুরিয়ার কথা। মাঞ্চুরিয়ার উপর হতে কলঙ্ক

অপসারণ করতে তারা প্রাণপণ করে লড়ছে। যদি আগে বুঝা যেত যে, জেনারেল চ্যং কাইসেক সত্যই জাপানীদের কাছে মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দিবে—ইউরোপীয়ান শক্তির চাপে পড়ে, তবে মাঞ্চুরিয়াতে যুবক দল তৈরী হ'ত, হয় তো জাপানীরা আস্‌ত না, কিন্তু কে জানত এমন হবে!"

"জাপানীরা পরকে আপন দলে নিতে এক নম্বরের ওস্তাদ। এরই মাঝে শিক্ষার স্রোত বদলে দিয়েছে। এই ছোট ছোট ছেলেরা হয় তো একদিন জাপানী হয়ে যাবে। মাঞ্চুরিয়ার উদ্ধারকামী যুবকদের ডবল কাজ করতে হচ্ছে তারই জন্যে। গোপনে সৎসাহিত্য প্রচার করে যুবক-যুবতীদের প্রাণে জাপান-বিদ্বেষ আনয়ন করা, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থী ধনীদের বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্ম্ম নিয়ে যেন মাথা না ঘামায়, স্বাধীনতারূপ ধর্ম্মের জন্য যেন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। যখন স্বাধীনতা আসবে, তখন ধর্ম্মের কথা ভাববার ঢের সুযোগ পাবে। কাপুরুষদের কোন ধর্ম্ম নাই, ভগবান কাপুরুষদের প্রার্থনা শোনেন না। এতগুলি কার্য্য চালাতে অর্থের দরকার। চ্যাং সুয়ে লিয়াং বোধ হয় কেন্দ্রীয় সরকার হতে কোন সাহায্য পান না, তাই তিনিও কিছু করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু তা বলে কি মাঞ্চুরিয়ার যুবক-যুবতী শুয়ে শুয়ে দিন কাটাবে? কখনও না, কাজ করে যাচ্ছে। কাজের পুরস্কার কি পাচ্ছে? হয় তো চিরজীবনের তরে নির্ব্বাসন, নয় মৃত্যু। তাতেও সন্তুষ্ট, তবু দাস হয়ে বেঁচে থাকতে নারাজ।"

নিঃসাড়ে কথা শুন্‌লাম। পরে আমি বললাম, "আপনারা ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী, চীনা রাজত্ব বাড়ুক আর জাপানী রাজত্ব বাড়ুক তাতে আপনাদের কি আসে যায়?" একেবারে ভীমরুলের চাকে হাত দিলাম। লোকটার চোখ হতে অগ্নি যেন ধক্ ধক্ করে বের হচ্ছিল। আমাকে কতকগুলি কথা একসঙ্গে বলে গেলেন। কখন কখন চীনা ভাষা এসে তাঁকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দিচ্ছিল। আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, তারপর আমাকে গালি দেওয়ার জন্য মোটেই ক্ষমা চাইলেন না লোকটি। কেনই বা চাইবেন, যার মাঝে এতটুকুও সাম্প্রদায়িক ভাব রয়ে গেছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়াও যে পাপ। যারা সাম্প্রদায়িক ভাবে মত্ত হয়ে বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে তর্ক তুলতে পারে তারা কি মানুষ?

মা তান ইয়ানের সঙ্গে এখানেই কথাবার্ত্তার সমাপন হ'ল। ডাক্তার এরই মাঝে এসে গিয়েছেন, আমাকে বললেন, এদের সঙ্গে আমাদের মোটেই খাপ খায় না, এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ কি? এই তো দেখলেন, মুসলমান হয়েও নামাজ পড়ে না, শুধু 'জাপানকে মার জাপানকে মার' এই কথাই বলে। আপনি দয়া করে কিন্তু এসব কথা কাউকে বলবেন না, জাপানীরা যদি জানে আমার আত্মীয় এরূপ লোক, তবে আমাকেও এদেশ হতে তাড়িয়ে দিবে। ডাক্তারকে বললাম, আমি কখনও এরূপ কথা জাপানীদের সঙ্গে বলি না, কারণ জাপানীদের প্রকৃতি ভাল করেই জানি। রাতে ডাক্তারের বাড়ীতে খেয়ে এসে দেখি পুলিশ আমার অপেক্ষায় বসে আছে। সর্ব্বপ্রথমই জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলাম। যখন জানল ডাক্তারের বাড়ীতে খেতে গিয়েছিলাম তখনই ডাক্তারের জন্য লোক পাঠালে। ডাক্তার তো একেবারে ভ্রু'চক্ষু কপালের উপর তুলে এসে উপস্থিত। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল আমি তাঁর বাড়ীতে ছিলাম কিনা? ডাক্তার যখন বললেন আমি তাঁরই বাড়ীতে ছিলাম, তখন পুলিশ আমাকে রেহাই দিয়ে বিদায় নিল।

পুলিশের এত বাড়াবাড়িতে মন বিষিয়ে উঠ্‌ল। পরদিন কোথাও গেলাম না, শুধু বিশ্রামই করলাম! তার পরদিন প্রাতে সাইকেল খানা সিন্ধী ভাইয়ের বাড়ীতে রেখে পায়ে হেঁটে একটা গ্রামে গেলাম এবং গ্রামেই আরাম করে রাত কাটালাম। পরদিন প্রাতে দেখি আমার খোঁজে আবার পুলিশ এসেছে। এদিকে পুলিশের দৌরাত্ম্য বড় বেশী, তাছাড়া হোটেলের জাপানীটির অদৃশ্য হস্তও নিশ্চল নয়, মনে হ'ল, তাই আর দ্বিধা না করে ষ্টেশনে গিয়ে হারবিনের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনলাম। বেলা বারটার সময় একখানা গাড়ী এল, তাতেই চাপলাম। যে সাইকেলে বেড়ায় সে যদি রেলগাড়ীতে বসে, তবে তার আর মুখ থাকে না। কিন্তু আমাকে সেজন্য চিন্তা করতে হয় নাই। জাপানী যাত্রীরা বলতে লাগলেন, চীনারা বদ্‌মাস ডাকু, এদের দেশে কি পর্য্যটক বেড়াতে পারে! এদেশে ডাকাতের জুলুম হতে যে পুলিশের আক্রোশ বেশী তা আর বললাম না। রাতে গাড়ী এল চাংচুং বর্ত্তমান মাঞ্চুকোর রাজধানী। চাংচুং শব্দটাকে বদ্‌লী করে "হাইসেনকিয়াং" করা হয়েছে।

রুশ-প্রভাব

লাল রাশিয়ানরা যখন তাদের রাজ্য স্থাপন করেছিল, তখন হতেই চীনের প্রতি তারা সদয়, তাই নতুন চুক্তি মতে চীনা কর্ম্মচারীও রাখা হ'ত। এ চুক্তি যদি লাল রাশিয়ানরা না রাখ্‌ত তবে চীনারা কিম্বা জাপানীরা তাদের কিছুই করতে পারত না। তবে লাল রাশিয়ানরা কোন জাতিকে গোলাম করে রাখা কিম্বা কোন জাতির দেশ দখল করা নীতিবিরুদ্ধ মনে করে বলেই চীনাদেরে সমান সমান চাকরী দিয়েছে। চাংচুং হতে আরম্ভ করে মাঞ্চুলি পর্য্যন্ত যে লাইন তা-ই সাইবেরিয়ার মাঝে প্রবেশ করেছে। এখানে কতকটা লাল রাশিয়ানদের চালচলন দেখা যায়। রাত্রিতে গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ী পুরাতন ধরণের। কামরায় বসবার পরই টিকেট চেকার এলেন—একজন চীনা, তার পিছনে একজন লাল রাশিয়ান। টিকেট চেক হবার পরই দৃষ্টি গেল দুটি ছেলের উপর। একটি লাল অন্যটি সাদা রাশিয়ান। সাদাটি এসেছিল তার মা-বাপের সঙ্গে, এবার দেশে ফিরে যাচ্ছে লাল ছেলেটির সঙ্গে। সাদা ছেলেটি আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করল আমার শরীরের রং দেখে। সে বললে, আমার মত কালো লোক এ জীবনে দেখে নাই। কথা বলে ছেলেটি বেশ আনন্দ অনুভব করছিল, কিন্তু লাল ছেলেটি বিনীতভাবে বাধা দিয়ে বললে, এখন তাদের শোবার সময়, কথা বললে ঘুমাতে পারবে না, শরীর অসুস্থ হবে। বুঝলাম, এই ছোট বয়স হতেই রুশ বালক-বালিকা কি রকম সুশিক্ষা ও পরিপাটী শৃঙ্খলায় লালিত হচ্ছে। সোভিয়েট সরকার কি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ফুটিয়ে তুলছে। দুখানা ছোট বিছানা পেতে ছেলে দুটি শুয়ে পড়ল। এত ছোট বয়সে যাদের এত কর্ত্তব্য জ্ঞান, তাদের বিরুদ্ধে যারা মিথ্যাকথা প্রচার করে তারা নিশ্চয়ই পাপী। কিন্তু যাদের স্বার্থই বড় তাদের আবার পাপ-পুণ্যের দরকার কি? প্রাতে আটটা কি নয়টার সময় গাড়ী গিয়ে লাগল ষ্টেশনে। তিনদিন পূর্ব্বে মা-চান্দ সান ষ্টেশন আক্রমণ করে জাপানীদের কাবু করে চলে গিয়েছেন, তাই ষ্টেশনের আশে পাশে বড় বড় কামান পাতা রয়েছে দেখলাম।

হারবিন

ষ্টেশন হতে নেমেই একটা হোটেলের খোঁজে বের হলাম। রাশিয়ান হোটেল ভাড়া করলাম এক ডলার করে। শোবার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত। স্নান করেই কিতাইস্কি রোডে গেলাম, কারণ সেখানে সিন্ধী ভায়ার দোকান। তার দোকানে পৌছবার পূর্ব্বেই পথের আশে পাশে দেখলাম রাশিয়ানদের ঘোল দই এবং দুধের দোকান। পাঁচ সেণ্ট মূল্য দিয়ে এখানে কিছু খেলাম, পরে পথে চল্‌তে লাগলাম। কিতাইস্কি রোড হারবিনের সব চেয়ে সুন্দর রাস্তা। এখানকার দোকানী প্রায়ই রাশিয়ান। এই রাশিয়ানরা সবাই বলশেভিক উত্থানের সময় চীনদেশে পালিয়ে আসে। সমুদায় কিতাইস্কি রোডটি দেখার পর সিঙ্গরী নদী দেখতে গেলাম। নদীর তীর পাথর দিয়ে বাঁধান। জল ছুঁয়ে দেখলাম ভয়ানক ঠাণ্ডা, তারপর একটি ভাল স্থান বেছে বসলাম তার সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে। নদীর তুলনা নদীই, এ সম্বন্ধে বিশেষণ যোগ দিয়ে কোন লাভ নাই। বেশীক্ষণ বসলাম না, চলে এলাম শহরে। সিন্ধী ভায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি বললেন, এখানে তাঁকে নিয়ে মাত্র বারো জন হিন্দু আছেন। চারদিন পূর্ব্বে তাঁদের একজনার একটি ছেলে চুরি হয়েছে, তার খোঁজে তাঁরা এখন ব্যস্ত আছেন। আমি তাঁদের কোনরূপ সাহায্য করতে পারি কি জানতে চাইলেন, সম্মতি দিলাম। তখন তিনি আমাকে একজন পাঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন। আমি রওনা হলাম। কিতাইস্কি রোডটা পার হয়ে গিয়ে আর একটা বড় পথে পড়েছি, এমন সময় হের মূলার এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। এই দম্পতির সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। হংকং, ক্যাণ্টন, সাংহাই নগরীতে এই দম্পতি আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চেষ্টা করতেন কেন আমি ভ্রমণ করছি, এতে কি লাভ হবে? তাঁদের অন্তরের কথা ছিল অন্য কিছু। যখনই ভারতবাসী আমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরে পেত, দানের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিত আমার দিকেই বেশী; এতে তাঁদের ঈর্ষা হত এবং আমাকে সেজন্য এরূপ উপদেশ দিতেন। মূলার দম্পতি ভারতবর্ষ হতে নির্ব্বাসিত হন, সংবাদপত্রে পাঠ করেছি। তিনজনে মিলে যখন পথে এগিয়ে

চলেছি, অমনি কতকগুলি সৈনিক দৌড়ে চলতে চলতে শহরবাসীদের বিপদের বার্ত্তা দিচ্ছিল। আমরা আর সেদিকে গেলাম না, মূলার দম্পতি একদিকে চলে গেলেন, আমি অন্য দিকে চলে গেলাম। এই শেষ দেখা মূলার দম্পতির সঙ্গে। চেকোশ্লাভাকিয়ায় গিয়ে তাঁদের সন্ধান করেছি, কিন্তু দেখা হয় নাই। মূলার দম্পতি ভারত হতে নির্ব্বাসিত, ভারত সম্বন্ধে তাঁরা বোধ হয় বিরূপ কিছুই লিখবেন। কিন্তু বিদেশে ভারতবাসী হতে তাঁরা যেরূপ সাহায্য পেয়েছেন, সেজন্য তাঁদের ভারতবাসীর প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ছেলে চুরির কথা ভুলে গিয়ে একেবারে হোটেলে এলাম, কারণ হোটেলে আমার কিছু টাকা জমা ছিল। যদি লড়াই বাধে, তবে হোটেলই বা যাবে কোথায়, আর আমিই বা যাব কোথায়! হোটেলে এসে দেখি মেয়েতে হোটেল ভর্ত্তি হয়ে গেছে। এদের মনে যদিও ভয় তথাপি চেঁচাচ্ছে না, দেখে আমার আনন্দ হ'ল। মেয়ে হলেই যে ভয়ার্ত্ত হয়ে শুধু চেঁচাবে তার কোন অর্থ নাই। টাকাগুলি ফেরত নিয়ে কি করে লড়াই হয় দেখতে বের হয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় লড়াই? একজন চীনা মুসলমানের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বললেন, লড়াই হবে না, মা-চান্দ সানের লোক ক'টি ধরা পড়েছে মাত্র, চলুন দেখে আসি এদের কি গতি হয়। একটু দূর গিয়েই ট্রাম লাইন পাওয়া গেল। টিকেট কিনে বসলাম। ট্রাম চলল সাদা রাশিয়ান বসতির ভিতর দিয়ে। কিছুক্ষণ আসার পরই ট্রামের বাঁদিকে একটা পার্কের মত পড়ল, তাতে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। আমরা ট্রাম হতে নেমে পার্কের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম সেই জনসমুদ্র ভেদ করে। আমার দিকে সবাই তাকাতে লাগল। আশে পাশে রব উঠল এই কালো লোকটা কে? আমার এখানে আসার সংবাদ বোধ হয় সাদা রাশিয়ানরাই দিয়েছিল জাপানীদের কাছে, কারণ আমার সঙ্গের চীনা লোকটি ছাড়া আর কোন চীনা তো সে দৃশ্য দেখতে আসে নাই। সাদা রাশিয়ানদেরে চীনা সরকার প্রকৃত পক্ষে হারবিন ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু সাদা রাশিয়ানরা আজ মাঞ্চুকোর ভক্ত হয়ে গিয়ে চীনাদের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে দেখে আমার ঘৃণা হ'ল। যখন বধ্যভূমির কাছে গেলাম, তখন একজন জাপানী এসে জিজ্ঞাসা

করলেন, "You journalist"? হাঁ, আমি ভারতের সংবাদপত্রসেবী। লোকটার শরীরে যেন তড়িৎ বয়ে গেল। ভারতের সংবাদপত্র-সেবী, এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভারতের সংবাদপত্র-সেবী ভারতের বাইরে খুব কমই আছেন। যাঁরা আছেন তাঁরা রথও দেখেন কলাও বেচেন। যা হ'ক আমার কাছে এক পল্টন জাপানী সংবাদপত্রসেবী এসে বুঝাতে লাগল, এরা বিদ্রোহী তো বটেই, উপরন্তু এরা অনেক শিশু ও স্ত্রীলোক হত্যা করেছে বলে গুলী করে মারা হবে। আমিও তাদের কথা বাঙ্গলাতে লিখে নিলাম। তারপর দল বেঁধে আসা হ'ল স্বদেশসেবীদের বধ্যভূমিতে। কেউ মাথা নত করে নাই। মনে হ'ল প্রত্যেকটী যুবক মৃত্যুকে জয় করেছে। একদল সেনা তাদেরে গুলী করে মারল! কুকুর-বেরালের মত বেঁচে থেকে জাতিকে বাঁচান যায় না, বাঁচান যায় মরে এবং মেরে—চীনাদের এই মনোভাব জাপানীরা বুঝেছে, তাই পরোক্ষ শাসন-ভার দিয়েছে, নতুবা সরাসরি কোরিয়ার মত একেও দখল করে নিত। চীনাদের বলিদান দেখে নতমুখে আবার শহরের দিকে ফিরলাম। ভারতের সংবাদপত্রসেবীই বটে। সঙ্গের চীনা ভদ্রলোক জাপানীদের আগমনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। বাইরে এসে কি করে কিতাইস্কি রোডে ফিরে যাব তাই ভাবছি। ট্রাম কোনদিকে নিয়ে যাবে তা জানি না। একজন রাশিয়ান এসে কি বলল তা বুঝলাম না। আমি শুধু বলতে লাগ্‌লাম কিতাইস্কি রোড। বেচারী আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে দিল এবং কন্‌ডাক্‌টরকে বলে দিল পথ দেখিয়ে দিতে। কন্‌ডাক্‌টর একস্থানে নামিয়ে দিয়ে অন্য কন্‌ডাক্‌টরের কাছে আমাকে সঁপে দিল। দ্বিতীয় কন্‌ডাক্‌টর আমাকে কিতাইস্কি রোডের কাছে এনে নামিয়ে দিল। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কিতাইস্কি রোড ধরে হোটেলে ফিরলাম।

বিকালে সিন্ধী ভায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি বল্‌লেন, কয়েকজন হিন্দু আজ আসবেন। আপনি বসুন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে দেব। আধ ঘণ্টার মধ্যে সাতজন হিন্দু এলেন। সাতজনাই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী। সিন্ধী ভায়া হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, এদের ভিতর ছিলেন একজনা রাশিয়ান নারী। যে লোকটির ছেলে চুরি গেছে, তাঁর বাড়ী পাঞ্জাবে, ধর্ম্মে তিনি ইসলাম, বিবাহ করেছেন এই সাঁদা রাশিয়ান নারীকে। যারা ছেলে চুরি করেছে তারা

দাবী করেছে নয় হাজার ডলার। প্রত্যেক হিন্দুর প্রতি (সাতজন ইসলাম, একজন শিখ আর বাকি একজন আমাদের সিন্ধী ভায়া) এক এক হাজার জরিমানা। শিখ আসেন নাই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না, তবে অনুমান হচ্ছে তিনি ছেলেটির খোঁজেই গিয়েছেন। ছেলের মা রাশিয়ান, সিন্ধী ভায়ার পায়ে পড়ে রোদন করতে লাগলেন, কারণ উপস্থিত এই আট জনার মধ্যে তিনি একাই ইচ্ছা করলে নয় হাজার ডলার দিতে পারেন। সভায় ঠিক হ'ল, যদি অদ্য রাত্রিতেও শিখ ফিরে না আসেন, তবে বৃটিশ কন্‌সালকে তাঁর সম্বন্ধেও সংবাদ দেওয়া হবে এবং ডাকাতদের সঙ্গে রফা করা হবে! যদি কমে না রাজি হয় তবে নয় হাজার ডলারই আপাততঃ সিন্ধী ভায়া দিবেন, পরে বাকি আট জনা হিন্দু চার হাজার ডলার চাঁদা করে তাঁকে ফেরত দিবে, সিন্ধী ভায়া তাঁর চাঁদা পাঁচ হাজার দিবেন বলে প্রকাশ করলেন। সাতজনা পাঞ্জাবী মুসলমান "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করে বিদায় নিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। এখানে ভারতবাসীর সঙ্গে ভারতবাসীর দেখা হলে "বন্দেমাতরমজী" বলে অভিবাদন করা হয় দেখলাম। আমিও তাই করলাম।

সন্ধ্যার পর একটা রাশিয়ান হোটেলে খেতে গেলাম। হোটেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু মেজের উপর সবুজ ঘাস বিছান রয়েছে। এরূপ করে কচি ঘাস কেন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক বল্‌লেন, "এটা হ'ল রাশিয়ান নিয়ম। বর্ষা শেষ হয়ে মাটি ফুটে যখন সবুজ ঘাস বের হয়, তখনই আসে প্রকৃত বসন্ত। মধু বসন্ত অনুভব করতে হলে চাই কচি কিসলয়, এটা তারই ব্যবস্থা।" বক্তা আরও বল্‌লেন, "সবুজ দিয়েই সংসার, এই সবুজ গড়ে, ভাঙ্গে, ধ্বংস করে। সংসারের উপর সবুজ একটা অবুঝ চঞ্চলতার নেশা ছুটিয়ে দিয়ে যায়।" দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা শুনতে বেশ লাগ্‌ল। পরে হোটেলে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

আমার অভ্যাস, কোন ইংরেজী সংবাদপত্র পেলেই কিনি। এখানে ডাইরেন হতে একখানা সংবাদপত্র আসে। তার নাম মনে নাই। প্রাতেই কাগজখানার একস্থানে দেখলাম লেখা আছে, "হারবিনে রাশিয়ান এরোপ্লেন এসে বোমা ফেলে গেছে। তবে পাল্টা-জবাব জাপানী এরোপ্লেনও দিয়েছে।"

কথাটা বুঝতে পারলাম না। শহরটা তো দেখেছি ঘুরে, কোথাও একটা বোমা ফাটার লক্ষণ দেখি নাই। সাংহাই যে জাপানীরা ধ্বংস করেছে তা দেখেছি। কোথায় বোমার ধ্বংস-লীলা? তবে এই মিথ্যার অবতারণা কেন? জগতকে জানানো জাপানী আর রুশ সরকারে ঝগড়া আছে! ঝগড়া বা সংঘর্ষের সংবাদ অন্ততঃ হারবিনে কেউ জানে না। বাহ্যতঃ কোন শত্রুতাই নাই। যে-সব সাদা রাশিয়ান ভগবানকে ভালবেসে, স্বর্ণ ও রৌপ্যকে ভালবেসে পালিয়ে আসে জাপানে, তাদেরে জাপানী ছাড়ে না, রুশ কনসালের হাতে সমর্পণ করে। তবে মাঞ্চুরিয়া নিয়ে যা গোল বেধেছে। রুশ সে গোলে মোটেই থাকত না, যদি এইটুকু রেলপথ ওদের চীনের ভিতর না থাকত। ব্লাডিভষ্টক বন্দর রুশের হাতে আছে, জাপানকে কাবু করবার পক্ষে তাই প্রচুর। তবে কেন এই মিথ্যা প্রচার?

সংবাদপত্র পাঠ করে সিন্ধী ভায়ার বাড়ী গেলাম। শুনলাম শিখ ভায়া ফিরে এসেছেন পাঠানের ছেলেকে উদ্ধার করে। কত আনন্দ সেদিন। মাংস, দই, দুধ ও রকম বে-রকমের অন্যান্য খাবার বারজনার জন্য যোগাড় হ'ল। অনেকের আবার পরিবার আছে। তারা সবাই পেট ভরে খেল, তারপর নৃত্য হ'ল রাশিয়ান ধরণে। সকলের শেষে বলা হ'ল "বন্দেমাতরম্"।

করজোড় করাই যেন মানুষের শেষের নিবেদন বলে মনে হয়। নতুবা রুশ রমণী সন্তান ফিরে পাওয়ার পর এরূপভাবে সকলের কাছে করজোড় করবে কেন? মানুষ যত উন্নতি-মার্গেই উঠুক, তাদের অভ্যন্তরে পুরাতন ভাব জেগে ওঠে যখনই সুযোগ পায়, নতুবা "লাল" হিন্দুরা সমভাবে করজোড় করবে কেন? মানুষ যতই প্রগতির দিকে এগিয়ে যাক, পিছন দিকে তার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করেই। আমি দর্শকমাত্র; দেখে চলেছি, আর ভাবছি, যা দেখছি তা ভাষার মারফতে প্রকাশ করতে পারছি তো? "লাল" হিন্দুদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল বটে, কিন্তু এ উৎসবে কথা হ'ল না। কথা থাকল আগামীকল্য প্রাতে গিয়ে দেখা করব ও তাদের কথা শুনব। পরদিন চললাম "লাল" হিন্দুদের বাড়ীতে।

অপরিষ্কার একটা ঘর। তার চারিদিকে অপরিষ্কার কাপড়, বাসন, দোয়াত কলম ছড়ান, দেখলেই মনে হয়, লক্ষ্মী অন্তর্হিতা। যাঁর বাড়ীতে

গিয়েছিলাম তিনি একজন শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন পাঞ্জাবী শিখ। দেখেই তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ঘরের আশে-পাশে চাইতেই বললেন, "দেখুন আমরা পুরুষ, গুছিয়ে রাখা আমাদের কাজ নয়, তবে এইমাত্র একজন মহিলা আসবেন, তিনি আমাকে এ-সব কাজে সাহায্য করেন, আমি তাঁকে শক্ত কাজে সাহায্য করি। দেখতে দেখতেই ভদ্রমহিলা এক টুকরা রুটি এবং একগ্লাস দুধ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের কি কথা হ'ল কিছুই বুঝলাম না। তারপর দুজনায় মিলে খেতে বসা গেল। আমার সঙ্গে মহিলাটির পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু রুশ ভাষা জানি না বলে কোন কথাই হ'ল না। খেতে বসে অনেক কথা হ'ল বটে. কিন্তু কথার মাঝে তাঁদের কাজের কথাই ছিল বেশী। ভদ্রমহিলা খাবার খেয়ে চলে গেলেন। বসে রইলাম আমরা দুজনা। সর্ব্বপ্রথমেই শিখ মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। অন্য কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "জগৎ যেমন উন্নতির দিকে চলেছে, রুশের আইন-কানুনও উন্নতির দিকেই চল্‌ছে। কেতাবে লেখা হয়ে গেছে বলে তার পরিবর্ত্তন যে হবে না, তার কোনই মানে নাই। ভালর জন্যই সব তৈরী হবে, খারাপ যদি ফলে, তবে নিশ্চয়ই তার পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু তাতে থাকবে না কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ।"

ভাবতাম কবে হাতের টাকাগুলি ফেলে দিয়ে গেরুয়া পরে আত্ম-খোঁজে বের হয়ে যাব। তাও দেখছি ব্যক্তিগত লাভ। যাতে ব্যক্তিগত লাভই আবদ্ধ তা মোটেই করণীয় নয়, এতে এসে যায় মাৎসর্য্য। তা কি পরিত্যাগ করা উচিত নয়, জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, "যার ঘর পরিষ্কার নয়, শরীরে শক্তির অভাব, তার দ্বারা কোনও বিশেষ কাজ হতে পারে না।" বেশীক্ষণ কথা হয় নাই, কারণ আমাকে আর কয়টি দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে যেতে হয়েছিল। তাঁরও সময় ছিল না, কারণ কাজ করতে হয়। শনি এবং রবি এ দু'দিন ছুটি। এ দু'দিন বিশ্রামও করা যায়, মানসিক উন্নতিও করা যায়। বাকী পাঁচদিন কাজ করতে হয় নিজেদের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য, তার বিনিময়ে পেতে হয় যা দরকারী। তাঁর কর্ম্ম এবং মনের পরিবর্ত্তন দেখে মনে হ'ল, ভারতের শিখ এবং অন্যান্য ধর্ম্মের লোক লাল্ রাশিয়ান প্রথা মেনে নিতে সক্ষম হবে। বিকালে যাতে স্নানাগারে উভয়ের দেখা হয়,

সেজন্য একই স্নানাগারে স্নান করতে যাব ঠিক হ'ল.. কারণ হারবিনে অনেক স্নানাগার আছে।

সাধারণতঃ কন্‌সালেরা দান ধ্যান করে থাকেন। আমি হ'লাম ফকির, আমার জন্য সকল দরজাই খোলা। অতএব কয়েকটি কন্‌সালের বাড়ী বেড়ান এবং তাঁদের কাছ হতে চাঁদা আদায় করাই হ'ল সে দিনে আমার কাজ। ব্রিটিশ কন্‌সাল দান-ধ্যান করুন না করুন, তবুও আমায় অন্ততঃ একবার যেতে হবে সেখানে আমার আগমনী জানাতে। দেখা সাক্ষাৎ হ'ল। হুজুরে হাজিরা দেওয়া হয়ে গেল, অন্যান্য কন্‌সালদের বাড়ী চললাম। যাঁদের সঙ্গে ইংরেজের সদভাব আছে, তাঁরা বেশ আদর-যত্ন করতে লাগলেন। যাঁদের সঙ্গে ইংরেজের ভাব নাই, তাঁরাই মহাত্মা গান্ধীর শরীর কেমন আছে, তাঁর কথা লোকে মানে তো, এই সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। সর্ব্বশেষে রুশ কন্‌সালের বাড়ীতে পৌছলাম।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ী, বোধ হয়, হারবিনে এত বড় বাড়ী আর নাই। সদর দরজায় দ্বারোয়ান নাই। কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। একজন মহিলা একখানা বড় রুটি আর কতকগুলি পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে একজন পুরুষ, সে দরজার একদিক খুলে দিতেই যেই মহিলা বার হয়ে এলেন, অমনি প্রবেশ করলাম। গজেন্দ্রগমনে বড় বাড়ীটার বারান্দায় উঠতেই একজন লোক আমার কাছে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দেশে আমার বাড়ী। ইংরেজী কথা দ্বারাই বুঝলেন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান, ফরাসী ইণ্ডিয়ান নই। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন, বল্‌লাম ভিক্ষা চাই। ভিক্ষার কথা আর তার সঙ্গে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান শুনেই যেন লোকটির মুখের ভাব বদলে গেল। এরা ভিক্ষা দিতে রাজি, কিন্তু কোন মতে যদি কথাটা প্রকাশ পায় তবেই বিপদে পড়ব বল্‌লেন। তিনি আরও বল্‌লেন, "সাহায্য করে থাকি আমরা, কিন্তু আপনাকে নয়। চলে যান আমাদের গেটের বাইরে, নতুবা আপনারই বিপদ আসবে, হয় তো দেশে ফিরে যেতে পারবেন না এ জীবনে।" কথাটা প্রাণে লাগল। মাথা নত করে ফিরে এলাম। ভাবতে লাগলাম এর মানে কি।

কিতাইস্কি রোডে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলে ফিরে এলাম;

কিন্তু মন এতই খারাপ হয়ে রয়েছিল, শান্তি যেন পাচ্ছি না। হোটেলের মালিক এসে ভাড়া চাইল। তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিলাম, তারপর চীনা শহরের দিকে চল্‌লাম। চীনা শহরটাও কম নয়, মস্ত বড়। কিন্তু এদিকে চীনারা বড় আসে না। এদিকের চাল-চলন এবং দৃশ্যাবলীর দিকে চাইলেই মনে হয়, রাশিয়ার কোন শহরে বিচরণ করছি। চীনা শহরে গিয়ে একটা খাবারের দোকানেই বসতে হ'ল। সারাদিন তো চলতে পারা যায় না? কিন্তু কি দেখব? যেরূপভাবে এরা মাথা নত করে আছে, তাতে মনে হয়, এরা কারও সঙ্গে কথা বলতে রাজী নয়। রুশদের নিজের দেশে স্থান দিয়েছিল, এই ভেবে যদি দরকার হয় তবে সাহায্য পাবে, কিন্তু তারও শেষ হয়েছে। এখন অন্যান্য বিদেশীর প্রতি তাদের নজর বড় কম।

স্নানাগার

বিকালে নির্দ্ধারিত স্নানাগারে গিয়ে দেখি, পুরুষের দল উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে বাক্সপূর্ণ একটা ঘরে। কেউ সিগারেট ফুঁকছে, কেউ চা খাচ্ছে, কারও শরীর মর্দ্দন চলছে। এই নতুন দৃশ্য দেখ্‌তে ভাল লাগে নাই, কিন্তু এরই মাঝে তিনজনা "লাল" হিন্দুকে বসা দেখে আমার চমক লাগল। তাঁরা বল্‌লেন, এইরূপেই চীনদেশে স্নান করতে হয়। আমার সঙ্গে একখানা গামছা সব সময়ই থাকে। স্নানে যাবার বেলা গামছাখানা সঙ্গে করে নিতে ভুলি নাই। গামছাখানা পরে পোযাক সামনেই একটা ডালাতে রাখলাম। তারপর স্নানের পালা স্নুরু হ'ল। ব্যাঙ্কের চেক হ'তে আরম্ভ করে শেষ পাইটি পর্য্যন্ত পকেটে রাখা রয়েছে। এই শেষ সম্বল ছেড়ে কোথা যাই। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে হিন্দু তিনজনা একসঙ্গে হেসে উঠলেন, বল্‌লেন, "ভারতে এমন কম সাধুই আছেন, যাঁরা টাকার মায়া ছাড়তে পারেন, কিন্তু আমরা পেরেছি বলেই সাধুদের বহু উর্দ্ধে উঠেছি। যদি দেশে ফিরে যাই তবে আমরা হব পূজ্য, বিশেষ করে সাধুদের।" শেষ সম্বল ভাগ্যের উপর ছেড়ে স্নানাগারে চল্‌লাম। স্নান করছি আর ভাবছি ফিরে গিয়ে টাকা এবং কাপড় পাব কি-না। তাড়াতাড়ি স্নান করে ফিরে এসে দেখি তিনজনা হিন্দুই চলে গেছেন। কাপড় পরা হ'ল, পকেট পরীক্ষা হ'ল, কিছু যায় নাই।

আমার কাপড় পরার পর বসে রইলাম তাঁদের অপেক্ষায়। তাঁরা হাসতে হাসতে এসে উপস্থিত, "টাকাকড়ি আছে তো ঠিক ঠিক"? ওঁরা তিনখানা কার্ড ফেলে দিলেন। আমি স্নানের দাম দিলাম পঁয়ষট্টি পয়সা। ওদের কাগজের আর আমার রূপার পয়সার দাম একই দেখে আরও চমক লাগল। ওঁরা হাসতে হাসতে স্নানাগার হতে বের হলেন। আমায় বল্‌লেন, "বন্ধু বেড়িয়ে যাও তুনিয়ায়, আমাদের দ্বারা আর তা হবে না, আমাদের কাজ করতে হয়, অতএব বিদায়।" ওঁরা চলে গেলেন, আর আমি হাঁ করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এখানে আর থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। ইচ্ছা হ'ল ফিরে চলি কোরিয়ার দিকে, কিন্তু গাড়ী তো পাব না, পায়ে হাঁটাও সম্ভব নয় এই আইন-কানুনহীন দেশে। তাই সিঙ্গরী নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত দেখতে। কয়টি সাদা রাশিয়ান ছেলে বসে কি কথা বলছিল। ডেকে আনলাম তাদের আমার কাছে বস্‌তে। তারা দেখছিল আমার কালোমুখ, আর আমি দেখছিলাম একখানি স্বর্ণ-থালা ধীরে ধীরে চলেছে আমারই দেশের দিকে।

হারবিন দেখে আমার ইচ্ছা হয়েছিল একবার রুশ দেশে যাই। দেখে আসি বিনা ভগবানে এরা দিন কাটায় কি করে। কিন্তু যাবার উপায় নাই। পাসপোর্টে সোভিয়েট রাশিয়ার নাম নাই। যদি তা লেখাতে হয় তবে বৃটিশ-কনসালের কাছে যেতে হবে। যদিও বা যাই তবু নিশ্চয়ই তিনি তাতে রাজি হবেন না, এর চেয়ে না যাওয়াই ভাল। তারপর আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের অনেক লোক আছেন যাঁরা যেতে চান রুশদেশে শুধু খারাপ দিকটা দেখবার জন্যই, এজন্য রুশরাও বিদেশীকে আপন দেশে বেশী ঘুরতে ফিরতে দেয় না, বিশেষ করে আমাদের মত লোককে—আমরা একটা জাতির অন্তরও অনেকটা দেখতে পারি। মঁশিয়ে পারেয়ারী বলে এক ফরাসী পর্য্যটক আমার সঙ্গে সাইগনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি দেশভ্রমণ করে আনন্দ পেতে হয় তো রুশদেশে। এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায় ফরাসী সরকার তাঁর উপর রেগে যান এবং সাইগন্ হতে বার না হবার ফাঁদ পাতেন। কিন্তু পর্য্যটক হ'ল এক শ্রেণীর বেদে। সে শৃঙ্খলার

বন্ধন সহ্য করতে পারে না, তাই তিনি রুশদেশ সম্বন্ধে কিছু বলবেন না বলে রেহাই পান। পর্য্যটক কোন সরকারের দ্রোহী হয় না, কিন্তু সুযোগ পেলেই সত্য বলতেও ছাড়ে না। আজ এই হারবিন শহর থেকে বিদায়ের বেলা তাঁরই কথা মনে হ'ল।

চাং চুং

হারবিন হতে চাংচুংএর দিকে গাড়ীতে রওনা হলাম। রাশিয়ান ড্রাইভার, রাশিয়ান টিকেট চেকার। এদের আচার-ব্যবহার ভাল। লক্ষ্য করে দেখলাম লাল রাশিয়ানরা ভয়ানক কষ্টসহিষ্ণু। যারা কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তারা জগতে কিছুই করতে পারে না। গাড়ী প্রবলবেগে চলেছে। যাত্রী নানা জাতীয়। তবে ভারতীয় যাত্রী একমাত্র আমিই। অনেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু ভাষার অভাবে পেরে ওঠেন নাই। যাঁরা কথা বলতে পেরেছিলেন তাঁদের ইংরেজী বলতে হয়েছিল। ইংরেজী ভাষার প্রচার আমার মারফতে অনেক হচ্ছিল। গাড়ীতে বসে কি চিন্তা করেছিলাম, কি দৃশ্য দেখেছিলাম তা বলে কি দরকার? নদ নদী, বৃক্ষ পর্ব্বত, বন উপবন—এসব অনেক ছিল। পরদিন প্রাতে নয়টার সময় গাড়ী এসে থামল চাংচুং শহরে। গাড়ী হতে নেমে একটা চীনা হোটেলে গেলাম। হোটেলের মালিক আমাকে অল্প ভাড়ায় থাকতে দিয়েছিল। টাকার অভাব জানাতেই এরূপ সুবিধা পেয়েছিলাম। মালিক আমাকে ইঙ্গিতে জানাল যে, সেখানে অনেক গুপ্ত-পুলিশ আছে, যেন চুপচাপ থাকি। কথাটা শুনে আমার হাসি পেল। কার সঙ্গে কথা বলব? কি কথা বলব?

স্নানের বন্দোবস্ত নীচে। তাই কাপড় নিয়ে স্নান করতে চলেছি, পথে দেখা হ'ল জাপানী গোয়ালার সঙ্গে। তার কাছ হতে ছয় বোতল দুধ কিনলাম। প্রত্যেক বোতলের দাম পাঁচ "সেন" (sen) এক শত সেনে এক ইয়েন হয়। এরই মধ্যে জাপানী মুদ্রার প্রচলন চাংচুং-এ আরম্ভ হয়ে গেছে দেখলাম। জাপানী আমার দুগ্ধ পান দেখে ইঙ্গিতে বললে তার সঙ্গে যেতে। দরজা বন্ধ করে তার সঙ্গে চললাম। একটা এক ঘোড়ার গাড়ী। তাতে দুজনায় গিয়ে বসলাম। গাড়ীটা হাঁকালে খুব করে, পথে অনেক চীনাপল্লী

পড়ল। পল্লীর লোক অনেকে আমার দিকে তাকালো। হয় তো ভেবেছিল আমিও জাপানী। প্রায় এক মাইল পথ গিয়ে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ীর সামনে গাড়ীটা দাঁড়াল। গোয়ালা আমাকে নেমে আসতে বল্‌ল, আমরা নামলাম, ঘোড়াটাকে কতকগুলি ঘাস দিয়ে গোয়ালা এবং আমি যেই আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছি, অমনি "পটাং" করে একটা শব্দ হ'ল। একটি আট বৎসরের ছেলে একটা খড়ম ছুড়ে মেরেছে, খড়মটা পড়েছে ছোট ছেলেটার (তারই বোধ হয় ছোট ভাই হবে) মাথার উপর। মাথা ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। আমি এবং গোয়ালা দাঁড়ালাম। একটু পরই ছোট ছেলেটা খড়মটা হাতে নিয়ে বড় ছেলেটাকে লক্ষ্য করে মারল। বড় ছেলেটার মাথায় লাগল না খড়মটা, তবে শরীরে লাগল। এই দৃশ্য দেখে আমার মনে হয়েছিল, এরাই একদিন বীর হবে। গোয়ালা দেখল সে দৃশ্য, কিন্তু কিছুই বলল না ছেলে দুটিকে। আঙ্গিনায় প্রবেশ করে গোয়ালা ছোট ছেলেটির ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিয়ে পটি বেঁধে দিল মাত্র। এতে বড় ছেলেটিও সাহায্য করেছিল। আমার মনে হয়, এরা ইচ্ছা করেই বোধ হয় এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আর এতে বড়দেরও কোন মানা ছিল না।

ঘরের বারান্দায় বাঙ্গালী ধরণে একটা জলচৌকী ছিল। তাতেই আমাকে বসতে বলা হ'ল। গোয়ালা ঘর হ'তে এক বোতল ঘোলের এসেন্স বের করে একটা গ্লাস ও জল এনে আমারই সামনে ঘোল তৈরী করে দিল। কিরূপে এরূপ ঘোলের এসেন্স হয় তা জাপানে দেখেছিলাম। ঘোল খাবার পর জাপানী গোয়ালা আমাকে বস্‌তে বলেই আরও কয়েক বোতল দুধ দিয়ে চলে গেল। আমি খালি বাড়ীটাতে দুটি শিশুর সঙ্গে বসে রইলাম। বিদেশে চলতে হ'লে কোন কিছুতেই আগ্রহ দেখাতে নাই। আমি নির্ব্বিকারভাবে বসেই ডায়েরীতে লিখতে স্থরু করে দিলাম। কতকক্ষণ পর একটি রমণী ও একটি পুরুষ এলেন। ব্যবহারে বুঝলাম এঁরা স্বামী স্ত্রী। ছেলে দুটীও তাঁদেরই সন্তান। খাবার রাখলেন একখানা বড় জলচৌকীর উপর। তারপর ছেলে দুটিকে এক পাশে ও আমাকে অন্য পাশে বসিয়ে তাঁরা দুজনা দুপাশে বসলেন। তাঁদের জন্য ভাত, মাছ এবং সব্‌জি ছিল, আমার জন্য দুধ, ঘোল এবং পাঁউ-রুটি ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা গেল মাছ ভাত খেতে। আঙ্গুল দিয়ে

দেখিয়ে জানালাম মাছ ভাত খেতে চাই। তৎক্ষণাৎ একটা পেয়ালায় আমাকে মাছ ভাত দিলেন। আমার হাতে খাওয়া দেখে তাঁদের প্রথমটা কেমন লাগলেও কিন্তু আনন্দ অনুভব করেছিলেন তা দেখে। খাবার পর আমার অটোগ্রাফ বই দেখালাম। অটোগ্রাফ বই দেখে আমার প্রতি তাঁদের দয়া হ'ল এবং লোকটি না আসা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকতে বললেন।

বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে হ'ল না। লোকটি এল এবং ভাত খেয়ে নিল। আমারই সামনে লোকটিকে স্বামী-স্ত্রী মিলে কি বল্লেন। তাঁদের কথার অর্থ ছিল, "এই লোকটিকে এমন লোকের কাছে নিয়ে পৌছে দেও যারা এর জন্য কিছু করতে পারে। দুজনায় মিলে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ী চল্ল গলি পথে। অনেক দূর যাবার পর একটা রুদ্ধ দরজার সাম্নে দাঁড়াল। চটপট কেউ দরজা খুলে দিল না, আমাদের দাঁড়াতে হ'ল। প্রায় পনর মিনিট পরে একটা লোক দরজা খুলে দিল—সে তখন চোখ রগ্‌ড়াচ্ছিল। লোকটির মুখ দেখেই মনে হ'ল ঘুমিয়েছিল। প্রাঙ্গণের মাঝে আরও কয়েকজন যুবক শুয়েছিল। আমার যাবার পরই সকলে উঠে দাঁড়াল। তাদের মাঝে দু'একজনা চলনসই ইংরেজী অবগত ছিল। যে কয়জনা ইংরেজীতে কথা বল্ল, তাদের ইংরেজী বল্‌বার ক্ষমতা তেমন না থাকলেও ইংরেজী কথা বুঝবার বেশ ক্ষমতা আছে। মাঝে মাঝে বড় বড় শব্দও এরা ব্যবহার করছিল। গোয়ালা আমাকে নিয়ে আসার কারণ বুঝিয়ে দিল এবং আমাকে গোয়ালা ইঙ্গিতে বল্ল, "এরাই আমায় সাহায্য করবে"। বেশীক্ষণ ওদের সঙ্গে বসলাম না। এদেরই একজন আমাকে হোটেল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল এবং বলে গেল এখানে যেটি সব চেয়ে বড় হোটেল আজ তাতে যেন বিকালে খেতে যাই। হোটেলে আসার পরই জাপানী লোকটির সঙ্গে একটি চীনা লোকের দেখা হ'ল। চীনা লোকটি এক পাশে সরে দাঁড়াল। তার সন্ত্রস্ত ব্যবহারে মনে হ'ল, সে নিশ্চয়ই দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীদের মুখ কসাইয়ের মুখ হ'তেও কুৎসিত। সে যত হাস্‌তে চেষ্টা করুক, হাসতে পারবে না, আনন্দ প্রকাশ ক'রতে চেষ্টা করুক পারবে না; তবে তার আনন্দ হয় পরপীড়নে, কাপুরুষতার ভিতর দিয়ে। দেখা যাক লোকটির কাজকর্ম্ম কোন দিকে গড়ায়।

গোপন-সন্ধানী

বিকালে রাজবাড়ীর কাছেই একটা হোটেলে খেতে গেলাম। একদল লোক খেতে বসেছে, সবাই গুপ্ত-পুলিশ। ওরা হাস্‌ছে, আনন্দ করছে। আমাকে পেয়েই যেন একটা বড় শিকার পেয়ে গেল বলে মনে হ'ল। বেশ করে পেট ভরে খেয়ে নিলাম। এবার আমি হেনরী পুই-এর দেখা পেতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করলাম। এখানে কি কথা হয়েছিল তা না বলে এক কথায় সেরে নেই। পূর্ব্বে শুনতাম হেনরী পুই একজন "পুতুল সম্রাট"। কিন্তু এখন বুঝতে বাকি রইল না, হেনরী পুই শুধু পুতুল নন, বন্দীও। এখন তাঁর ইচ্ছামত রাজবাড়ী হতে বেরও হতে পারেন না। লোকমুখে শুধু নয় কোন কোন চীনা সংবাদপত্রও লিখেছে, হেনরী পুই মরতে পারলে বাঁচেন, কারণ তাঁরই দস্তখতে তাঁরই দেশীয় লোক মরে। যার মাঝে একটু মনুষ্যত্ব আছে, সে-ই এরূপ কাজে নারাজ হয়, কিন্তু হেনরী এখন পিঞ্জরাবদ্ধ। বাস্তবিক যখনই এ সব কথা শুনতাম, তখনই মনে হ'ত এরূপ রাজত্ব করা কি কঠিন সাজা!

রাতে ফিরে এসে দেখি আমার কাগজপত্র কে এলোমেলো করে রেখে গেছে। অটোগ্রাফ বইটাতে যেখানে বৃটিশ কনসালের দস্তখত আছে তাও যেন জলে ভিজিয়ে রেখে গেছে। বুঝতে বাকী রইল না এরূপ হয়েছে কেন। পাশের ঘরের চীনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে দেখেছে কি না, কে আমার দরজা খুলেছে। সে বল্‌লে, সারাটি বিকাল সে ঘরেই ছিল কিন্তু আমার দরজা খুলতে কাউকে দেখে নাই। তার সঙ্গে নানা বিষয় আলাপও হ'ল।

প্রাতে তখনও আমার ঘুম ভাঙ্গেনি, দরজায় করাঘাত শুনে দরজা খুলে দিলাম। একটী জাপানী অনুমান ৩৫ বৎসরের হবে, ঘরে প্রবেশ করে ইংরেজী কায়দায় 'সুপ্রভাত' জানাল। তাকে বসতে বলে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েই তার সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম। পথে আমাকে বললে যে, আমাকে প্রধান মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবে এবং টাকা পাইয়ে দিবে।—তাতে আমার আপত্তি কি? আমরা সর্ব্বপ্রথম একজন সংবাদপত্রসেবীর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে নানা প্রশ্ন করলেন। সর্ব্বপ্রথম প্রশ্নেই ছিল, মাঞ্চুকো কেমন লাগছে? আমার জবাব সবই "ভাল"। বিদেশে ভ্রমণ করতে হলে খারাপ কিছুই বলতে নাই

কিন্তু তাতেও কি রক্ষা পাওয়া যায় ? মাঝে মাঝে কিছু খারাপও বলতে হয়। খারাপের মধ্যে বললাম, এখনও মাঞ্চুকোতে চোর-ডাকাত বেশী রয়েছে। দুপাটি দাঁত বের করে সংবাদপত্রসেবী বললেন, "এই তো সেদিন মাঞ্চুকো জন্মেছে, এরই মাঝে আমরা কত কিছুই করেছি, চোর-ডাকাত দমন করতে আরও কয়েক সপ্তাহ লাগবে! জবাব শুনে মনে হ'ল, যতদিন মাঞ্চুদের ধমনীতে রক্ত বইবে ততদিন চোর-ডাকাতের চিন্তা এদের করতেই হবে। বড় সুন্দর কথা তৈরী হয়েছে! যা'রা দেশের সেবা করবে তারা হবে ডাকাত, আর যারা উড়ে এসে জুড়ে বসবে—তারা হ'ল ভালমানুষ। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন—আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? একটি তৈরী জবাব আমার আছে, "আচার-ব্যবহার দেখা"। সংবাদপত্রসেবী আমাকে যা'ই ভাবুন না কেন, আমি তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবেছিলাম। সংবাদপত্রসেবীরা যে নিজের জাতের টান টানে তার মূর্ত্তিমন্ত দৃষ্টান্ত তিনি একজনা।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সঙ্গীটীর কি কথা হ'ল জানি না। তিনি একখানা তাঁর নামের কার্ড দিলেন আমার সঙ্গীটিকে, আমরা তাঁর বাড়ী হতে বের হয়ে এসেই গাড়ীতে বসলাম। গাড়ী চলল প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে। সঙ্গে রাজবংশীয় লোক দেখে চীনা প্রহরীরা আমাদেরকে বিনা বাধায় ছেড়ে দিল। যদি আমার কিম্বা কোন চীনার এই প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে যেতে হ'ত তবে হয় তো ধন্না দিতে হ'ত ক'দিন। আমরা যেতেই, আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমি ভদ্রভাবে জানালাম যে, আমি একজন ভারতীয় পর্য্যটক। তিনি আমার বইটা আগাগোড়া দেখে একশত ইয়েনের একখানা নোট দিলেন এবং নিজের নাম লিখে দিলেন। আমরা ফিরে এলাম। এত টাকা পেয়েছি দেখে, লোকটার হিংসা হয়েছিল। শেষটায় আমার কাছে প্রকাশ্যে তার এই পরিশ্রমের মজুরী দিতে বলল। আমি দ্বিধা না করে' পাঁচখানা দশ ইয়েনের নোট দিয়ে দিলাম। টাকাগুলি পেয়ে লোকটার মন পরিবর্ত্তন হ'ল এবং আমাকে হোটেল পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল।

হোটেলে এসে বসেছি, অমনি গুপ্ত-পুলিশটা এসে জিজ্ঞাসা করল, প্রধান মন্ত্রী আমাকে কত দিয়েছেন। তাকে বললাম, কত পেয়েছি তা তার জেনে দরকার নাই, তবে তার একমাসের মজুরির মত পেয়েছি। সে আমাকে

জিজ্ঞাসা করল, কি করে আমি বুঝতে পারলাম—সে কত মজুরি পায়। আমার রাগও হয়েছিল, ঘৃণাও হয়েছিল, তাকে বলে দিলাম যে, তাকে দেখেই মনে হয়—সে একজন চীনা গুপ্ত-পুলিশ। তারপর, যারা আপন ভাইবোনদের সর্ব্বনাশ করে' টাকা জমায়—তাদের লক্ষণ পূর্ণভাবে তার মুখে ফুটে উঠেছে। লোকটা বেশীক্ষণ আর বসল না, হন্ হন্ করে নীচে নেমে গেল। আমি নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লাম।

বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছিলাম। দরজায় ফের করাঘাত। দরজা খুলে দেখি আমার অর্থপ্রাপ্তির সাহায্যকারী আমার সামনে রক্তচক্ষু করে দাঁড়িয়ে। কি হয়েছে তার—জিজ্ঞাসা করলাম। সে গুপ্ত-পুলিশটাকে আমার সামনে এনে বল্‌লে, একে যা বলেছি তার জন্য প্রাণদণ্ডও হতে পারে। কিন্তু সেরূপ কিছুর ব্যবস্থা হবে না, শুধু আমি যেন আজই বিকালের ট্রেনে অন্যত্র চলে যাই। এতবড় আমার একজন বন্ধু, যার অনুগ্রহে পঞ্চাশ ইয়েন পেয়েছি, তাকে সুখী করতে শহর ছাড়তে পারব না এটা কেমন কথা?

গাড়ী বিকাল সাতটায় ছাড়ে। আমার সামান্য কম্বলখানা ঝোলাটার ভিতর রেখে, দরাজাটা বন্ধ করে বের হচ্ছি, এমন সময় হোটেলের মালিক বললে—"যাবেন না বাইরে, আপনাকে আমি গিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে আসব।" তার কথা না শুনে রেল-ষ্টেশনে গেলাম এবং গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটা গাড়ী এল, তাতে পল্টন ভর্ত্তি। তাদের গাড়ী হতে নামা, তাদের একসঙ্গে পা ফেলে ষ্টেশন হতে বের হওয়া—এসব দেখতে দেখতে অনেক সময় কাটল। তারপর নীরবে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

গাড়ীর সময় হয় নাই, তবুও ষ্টেশনে এসে হাজির। ষ্টেশনে এমন কিছু নাই যে দেখে সময় কাটাই। সৈনিকরা দম্ভভরে শুধু পায়চারী করছিল। মাঞ্চুকো সৈনিকরা চীনাদের উপর বেশ মারধর করছিল। ষ্টেশনে একজন জেনারেল আড্ডা নিয়েছেন কি না, তাই এরূপ মারধরের ব্যবস্থা চল্‌ছে। কিন্তু চীনা যুবকরা দূর থেকে সে অত্যাচার দেখছে আর দাঁত কিড়মিড় করছে। প্রতিশোধ একদিন নিবেই—ছাড়বে না।

মাঞ্চুকো ত্যাগ

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী এল। যে সব যাত্রী নামল, প্রায় সবই সামরিক কর্ম্মচারী। কয়জন মাত্র সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানদের ভিতর জাপানীই বেশী। যে কয়জন চীনা ছিল, তাদের টিকেট, পকেট, ঝুড়ি, বাক্স, সবই পরীক্ষা হ'ল। এ পরীক্ষা করল মাঞ্চুকো সৈনিক। যদি জাপানী এই কাজটি করত তবে তা আমার কাছে দৃষ্টিকটু হ'ত না। আমার এমন কিছু ছিল না, যা'র তল্লাস করা দরকার। তবুও একজন আমার দিকে ছুটে এল—কর্ত্তব্য পালন করতে। কিন্তু কে যেন ইঙ্গিত করল তাকে, সে অমনি পিছনে ফিরে গেল। গম্ভীরভাবে আমি একটা সিটে গিয়ে বস্‌লাম। কতকক্ষণ পরে দু'জন লোক আমার আগের এবং পিছনের সিট্ দখল করল—দেখে আমার আনন্দই হ'ল—দু'টী 'বডিগার্ড' পাওয়া গেল। গাড়ী ছাড়বার পরই তাদের সঙ্গে কথা বল্‌লাম, কিন্তু ওরা জবাব দিল না। চুপ করে থাক্‌তে হ'ল অনেকক্ষণ। চতুর্থ কেউ গাড়ীতে ছিল না। গভীর রাত্রিতে গাড়ী এল মুকদেনে। সিন্ধী ভায়ার বাড়ীতে উঠলাম।

এবার আমাকে কোরিয়া যেতে হবে। একটা প্রদেশ আমার পথে, তা পাড়ি দিতে কতদিন লাগবে, কোন পথে যাব ইত্যাদি নিয়ে দু'দিন ব্যস্ত ছিলাম। জাপানীদের কাছে পথের সন্ধান চাইতাম, কিন্তু তারা হাসত। হাসির অনেক অর্থ আছে। যখনই আমি কোথাও যেতাম, আমার পিছনে লোক থাক্‌ত বলে মনে হ'ত। কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায়। কিন্তু আমার ভয় হ'ল—পাছে সিন্ধী ভায়া জানতে পারে, জাপানী পুলিশ আমার পিছনে। পৃথিবীতে যে-সব লোক অন্য রাজ্যে বাস করে, তাদের সমাজ আছে, সমাজের আদেশ মেনে চল্‌বার ক্ষমতাও আছে, কিন্তু ভারতবাসী যত স্থানে দেখেছি, তাদের সমাজ আছে বটে, কিন্তু সমাজের আদেশ মেনে চল্‌বার ক্ষমতা কারও নাই। তার একমাত্র কারণ হ'ল দেশাত্মবোধের অভাব। এখানেও তাই। এই লোকটি টাকার কথাই ভাবে বেশী। যদি শোনে যে, জাপানীরা আমার উপর বিষ নজর দিচ্ছে, অমনি আমাকে তাড়াবে। এজন্য আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছিল। কিন্তু হ'ল না, আমার সাইকেলখানা চুরি গেল।

সিন্ধী ভায়ার বাড়ী যে রাস্তায়, সেখানে একটী চীনারও বসতি নাই। দূর দূরান্ত হতে চীনারা ভারতীয় সিল্ক (যাতে ছাপ রয়েছে "Made in India") কিনবার জন্য আসত। ভারতীয় পণ্যকে সাহায্য করা, ভারতবর্ষকে আন্তরিক সহানুভূতি জানান, চীনাদের একটা জন্মগত অভ্যাস বললেও চলে। কিন্তু আমার সিন্ধী ভায়া জাপানী সিল্কের উপর ভারতের নাম লিখে বিক্রি করে' বেশ দু'পয়সা রোজগার করছে। পণ্য-ক্রেতা চীনারা সন্ধ্যার পরে কখনও আসত না, কারণ তারা অবগত ছিল—সন্ধ্যার পর বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়। সন্ধ্যার পর যখন আমার সিন্ধী ভায়া হিসাব দেখছিলেন তখন আমি কোরিয়ান গান শুনতে সাইকেল নিয়ে বের হলাম।

সাইকেল চুরি

পথে দেখা হ'ল দুজন জাপানী যুবকের সঙ্গে। তারা আমার সঙ্গ নিলে এবং পুরাতন কথার উত্থাপন করলে—আমি 'কমিউনিষ্ট' কিনা? তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি 'কমিউনিষ্ট' ভাব পোষণ করে? জবাব যা' দিয়েছিল, তা পরে জাপান ভ্রমণ-কথার সময় বলব। অনেকক্ষণ এদের সঙ্গে বেড়ালাম, তারপর তাদেরই অনুরোধে একটা দোকানে সরবৎ খেতে বসলাম। কিন্তু তারা বললে, নিকটে অন্য একটা বাড়ীতে বসে সরবৎ খাওয়া ভাল হবে। তাতে আমি রাজী হলাম এবং একটা বাড়ীর দ্বিতলে বসে সরবৎ খেতে লাগলাম। এরই নীচে সিল্কের দোকান। যতই সরবৎ খাচ্ছিলাম ততই জিহ্বা শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং আরও খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল! রাত কত হয়েছে তার ধারণাই ছিল না। শেষটায় জিহ্বা অসাড় হবার উপক্রম, কথা বার হচ্ছে না, অথচ কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল। উঠবার ক্ষমতা ছিল না, মাথা ঘুরছিল, পা ঠিক পড়ছিল না। আমার যখন এরূপ অবস্থা তখন আমার সিন্ধী ভায়া এসে উপস্থিত। তিনি যে কেমন করে আমার এমন স্থানে আসার সন্ধান পেলেন তিনিই জানেন। নীচে এসে সাইকেল পাওয়া গেল না। আমারও এমন অবস্থা ছিল না যে বলি—এরাই এই অনর্থের মূল। সিন্ধী ভায়া আমাকে ঘরে এনে শুইয়ে দিল। আমি শুয়ে শুয়ে কত ভাবনাই ভাবছিলাম—তার ঠিক নাই। পরদিন তেঁতুল খেয়ে শরীর অনেকটা ঠিক

হয়েছিল বটে, কিন্তু দুদিন পর্য্যন্ত আমার মাথাঘোরা ছিল। বুঝতে বাকি রইল না যে, এই সরবতে কি ছিল।

চুরির কথা কন্‌সালকে বলেছিলাম। কন্‌সাল বল্‌লেন, "আপনাকে যে চুরি করে নেয় নাই তাই যথেষ্ট, এবার দয়া করে' মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে কোরিয়ায় যান, এতে আমার অনেক শান্তি হবে। দু'জন ইংরেজ কোথায় গেছেন তার পাত্তা এখনও করতে পারি নাই, কখনও যে তা করে উঠতে পারব—তারও ঠিক নাই। আবার যদি আপনাকে নিয়ে যায় তবে মহাঝঞ্ঝাটে পড়ব, অতএব আপনি দয়া করে মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে চলে যান।" সাইকেলের কথা বলতেই তিনি বললেন যে, এর বন্দোবস্ত হয়ে যাবে যদি আমি মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে চলে যাই। এই বলেই বিষয়ের ইতি করলেন।

কন্‌সালের বাড়ী হতে এসে একখানা সাইকেলের জন্য ডানলপ কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে গেলাম। তিনি প্রথম বললেন—দিবেন, তারপরই মত বদ্‌লালেন—আমার মুখখানা দেখে। কিন্তু শেষটায় যখন শুন্‌লেন কন্‌সাল আমার সাইকেলের বন্দোবস্ত করবেন, অমনি আবার মত বদলালেন। কতকগুলি চীনা কেরানীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাইকেল একখানা ফিট করা যেতে পারে কিনা। তারা বল্‌লে, তিনদিনের ভিতর হতে পারে। আমাকে তিনদিন অপেক্ষা করতে হ'ল। ভেবে ঠিক করলাম যদি আমার সিন্ধী ভায়া অবগত হন যে, জাপানী আমার পিছনে লেগেছে এবং তাড়িয়ে দেন, তবে হোটেলেই যাব। কিন্তু সেরূপ কিছু হ'ল না। তিনটা দিন আমার আরামেই কেটে গেল। পথের খবর নিবার জন্য এবার চীনাপাড়ায় প্রবেশ করলাম।

জীবনে অনেক সুক্ষণ এবং কুক্ষণ আসে। যে সময়ে চিন্তা করতে হয় বসে বসে, সে সময়টাকেই কুক্ষণ বলে মনে হয়। চীনাদের শহরে অনেক ঘুরলাম, কিন্তু কেউ পথের সন্ধান দিল না। যুবকরা তো যেন মুখ লুকিয়ে রাখতে পারলেই ভাল মনে করে। প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে বাইরে আসে, তাদের মুখ দেখলে মনে হয়—যেন প্রত্যেকেই শোকাতুর; এই অপ্রত্যাশিত বিপদের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। এজন্যই আজ সবাই চিন্তা করছে, তাদের কি হয়ে গেছে! আমার চিন্তা ছিল—পথের সন্ধান। তার কোন মীমাংসা হ'ল না। আমার মাথা নত হয়ে এসেছিল, সাইকেল পর্য্যটক

হয়ে কি করে গাড়ীতে বসে ভ্রমণ করি? যে লোকটি যে ভাবে কাজ করবে বলে প্রকাশ করে, সে যদি সেই কাজ সেই ভাবে না করতে পারে তবে তার দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। আপন দেশে মিথ্যা কথা বলা চলে, কিন্তু বিদেশে যদি কোনরূপ বদনাম অর্জ্জন করা যায়, তবে সে বদনামের ভাগীদার হয় দেশের সর্ব্বলোক। আমি স্বদেশের মঙ্গলার্থে কোন সৎকর্ম্ম করি নাই, উপরন্তু বদনাম কিনে স্বদেশের অমর্য্যাদাই করছি—এটা ভেবে বড়ই অস্বস্তি লাগল। কিন্তু উপায় নাই! যদি সাইকেল পাওয়াও যায় তবু যেতে হবে রেলগাড়ীতে। আমি ভাবছিলাম—একটু দূর গিয়েই গাড়ী হতে নেমে পড়ব, কিন্তু তাও হবার যো নাই, পথ নাই সামনে। ডান্‌লপ কোম্পানীর ম্যানেজার তৃতীয় দিন বিকালবেলা আমাকে ডাকলেন এবং আনন্দের সহিত আমাকে সাইকেলখানা দান করলেন। এই দান করে ধন্য হ'ত জাপানীরা,—কিন্তু পারে নাই। যত ব্যবসায়ী, যত সেপাই, যত ধর্ম্মযাজক, সকলেরই যেন এক মত, এক পথ। যখন জাপানে গিয়েছিলাম, সেখানকার লোকের আচার-ব্যবহার দেখে মনে হয়েছিল —যেন জাপানের অসৎ লোক বেছে বেছে মাঞ্চুরিয়ায় পাঠিয়েছে নির্ব্বাসনে। কন্‌সাল মহাশয়ের অনুগ্রহে আন্তং পর্য্যন্ত যেতে আমার গাড়ী-ভাড়া দিতে হয় নাই। চতুর্থ দিন প্রাতে নতুন সাইকেল সঙ্গে করে জাপানী গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। মনে মোটেই আনন্দ ছিল না, কারণ আমি ভাবছিলাম এরূপভাবে গাড়ীতে বসা আমার অন্যায়।

গাড়ীতে যাত্রী ভর্ত্তি ছিল। জাপানী এবং কোরিয়ানই বেশী। মাঝে মাঝে দু-একজন মাত্র চীনা ছিল। আমার পাশের যাত্রী ছিলেন কোরিয়ান। তিনি আমার সঙ্গে মোটেই কথা বলেন নাই। অন্যান্য যাত্রীরাও প্রায়ই নীরব ছিল। গাড়ীটার সামনে দু'টী কলের কামান, মাঝে একটা, পিছনে দুটী। এরূপ করে গাড়ী চালান বড় সোজা কাজ নয়! টিকেট কালেক্টর হতে আরম্ভ করে গাড়ীতে এবং ষ্টেশনে যত লোক সবাই পল্টনী পোষাক পরিহিত। বুঝতে পারলাম—নব বিজিত দেশ এখনও সায়েস্তা হয় নাই। প্রত্যেক ষ্টেশনে টিকেট চেক্ হচ্ছিল। প্রত্যেকের ছাড়-পত্র এবং প্রশংসা-পত্র দেখা হচ্ছিল। এতে জাপানীরাও বাদ পড়ছিল না। সারাটা দিন চলে আমাদের গাড়ী গিয়ে পৌছল আন্তং ষ্টেশনে। এই ষ্টেশনই চীনের বর্ত্তমান শেষ সীমা।

চীন-কোরিয়া সীমান্ত

আন্তং

ষ্টেশন হতে নেমেই শহরটাতে টহল দিতে লাগলাম এবং থাকবার স্থান খুঁজতে লাগলাম। একটা দোকানের সামনে লেখা ছিল "Turkish Eye-specialist।" শহরটা ছোট থাকায় এই দোকানটার সামনে দিয়ে অন্ততঃ পাঁচবার গিয়েছিলাম। তুর্কির ঔষধের দোকানে প্রবেশ করার কোন অজুহাত ছিল না। কিন্তু শেষবার যখন সেদিকে যাচ্ছিলাম তখন একটি যুবক উপর হতে নেমে এল এবং সাইকেল শুদ্ধ আমাকে তাদের দোকানে প্রবেশ করাল। সর্ব্বপ্রথম আমিই বলেছিলাম, 'ভাই, জান্‌তাম না, আপন-লোক এখানে আছে! আচ্ছা, তুর্কি কেন লেখা হয়েছে এখানে?' একজন বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি বললেন, 'ভারত তো আর স্বাধীন নয় যে, আমাদের কেউ মানুষ মনে করবে, সেজন্য তুর্কি লিখেছি; এতে দোষ নাই।' তিনদিন এদের বাড়ীতে ছিলাম। এরা আমাকে আপন জনের মতই ব্যবহার করেছিল।

দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে দেখলাম, একজন জাপানী পর্য্যটক। তার ছবি তোলা হচ্ছে। পর্য্যটক বিদেশী ভাষা আদৌ অবগত নয়। কিন্তু তার জন্যে জাপান কোরিয়া এবং বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়াতে যত হোটেল আছে, সর্ব্বত্র আদেশ জারি হয়েছে যে, এই লোকটি যখন যে অবস্থায় যে হোটেলে পৌঁছবে, তাকে যেন খাবার এবং থাকবার স্থান বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। আদেশ শুনে আমার তাক লেগে গেল। আমাদের দেশের লোক তো লাভ-লোকসান নিয়েই ব্যস্ত। এরা এরূপ করে না কেন?

আন্তং ছোট শহর। তার পাশ দিয়ে সিঙ্গরী নদী বয়ে চলেছে। নদীর পূর্ব্বপাড় কোরিয়া, পশ্চীম তীর মাঞ্চুরিয়া। নদীর মাঝে একটা সেতু। সেতুটা—আমার মনে হয়, হাওড়ার পুলের দ্বিগুণ হবে। দেখবার জিনিষ বটে। কোরিয়ানরা অপর তীর হতে আসে, দেখে—চীনের অবস্থা কি হয়েছে। পশ্চিম তীরে একটা কাষ্টম অফিস, তাতে একজন ইংরেজ কাজ করেন।

তাঁর প্রতি জাপানীদের সুদৃষ্টি নাই। প্রশ্ন উঠেছে, চীনের ঋণের জন্য মাঞ্চুরিয়া দায়ী কিনা? 'লীগ অব নেশুন' রায় দিয়েছেন—মাঞ্চুরিয়াও সেজন্য দায়ী, কিন্তু জাপানী তাতে রাজী নয়। কয়েকজন চীনা কেরানী সঙ্গোপনে সেখানে বসে থাকে ইংরেজ অফিসারকে ঘিরে। এত ভীত অবস্থায় কোন কেরানীকে এজীবনে দেখি নাই। কাষ্টম হাউসে যেতাম এবং কেরানীদের সঙ্গে কথা বলতাম। এটা যেন অনেকের পক্ষে দৃষ্টিকটু হ'ত। তবু আমি যেতাম। আমেরিকা হতে ফিরে আসার পর, কাষ্টম কেরানীর সঙ্গে সাংহাই নগরীতে দেখা হয়েছিল। কেরানী বলেছিল, "জাপানীরা জোর করে কাষ্টম অফিস দখল করে এবং কেরানী শুদ্ধ ইংরেজ অফিসারকে তাড়িয়ে দেয়।"

কোরিয়ানদের পুরাতন পোষাকে আবৃত দেখে—চীনারা ঘৃণা করে বলে মনে হ'ল। কোরিয়ানরা অনেকে এখনও পুরাতন পোষাক পরে' এদিকে বসতি করতে আসে। আন্তং শহরের আশেপাশে ছোট ছোট বৃক্ষ দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পূর্ব্বে কি এই শহরের আশেপাশে বৃক্ষ ছিল না? জাপানীরা আসার পর বৃক্ষ রোপণ আরম্ভ হয়েছে শুনলাম। চীনের শেষ শহর ছেড়ে কোরিয়ার দিকে যাবার জন্য আমার অন্তরে একটা প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। তাই সাইকেলটা আবার দেখে নিয়ে, কাপড়চোপড় নতুন করে তৈরী করান হ'ল। এসব কাজ আমাকে মোটেই করতে হয় নাই। মিঃ আল্লাদিত্যা নিজেই আমার হয়ে সব করেছিলেন। বাইসাইকেলের পিছনে একটা বাক্স রাখতাম, তা তিনি নিজে বসে তৈরী করেছিলেন। মিঃ আল্লাদিত্যা বল্‌তেন, "যৌবন আমার চলে গেছে, বৃদ্ধাবস্থায় জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছে, মন চলতে চায়, কিন্তু শরীর চলতে চায় না। অতএব ভাই, হিন্দুস্থানের যা'তে সুনাম হয় তার জন্যে যদি এক কণিকামাত্র খাটতে পারি তবেই শান্তি হয়।" বৃদ্ধের দেশ-ভক্তি দেখে মনে হ'ত—এক ভারত-ভূমি ছাড়া তাঁর পূজ্য কিছুই নাই।

দ্বিতীয় দিন বিকালে মিঃ আল্লাদিত্যা আমাকে নদীতে নিয়ে যান। তীরে বসে বলতে লাগলেন, "দেখ, এই নদীতে কুমীর আছে, যদি কেউ বলে এই নদীতে পড়ে কুমীরের হাতে মরলে আমার দেশের লাভ হবে, তাতেও আমি রাজী—এই বৃদ্ধ বয়সে। আচ্ছা, যাও তো সাঁতার কেটে এস এই নদীতে।" বৃদ্ধ আমার সাহস পরীক্ষা করছিলেন। নদীতে যে সব কুমীর

আছে তা ছোট ছোট; একটাতে ধরলেও ছাড়িয়ে আসতে পারব ভেবে, নদীতে স্নান করতে নামলাম। প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা থাকবার পরও যখন কোন কুমীর আমাকে টেনে নিল না, তখন আল্লাদিত্যা ডাকলেন, "চলে এস বাবু।" আমার যৎসামান্য সাহস দেখে বললেন, "তোমার মত লোক কত আছে ভারতে?" বৃদ্ধ এ বিষয়ে খুব সন্দিহান, তাই দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাড়ী চলে এলেন।

বিদায়ের দিন প্রাতে উঠেই আমাকে বললেন, "বাটুয়া (মনিব্যাগ) নিয়ে এস। অতি সামান্য নোট ছিল তাতে। পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, "হিন্দুস্থানের বদনাম যাতে কোরিয়াতে না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিব।" বেলা সাতটার সময় আমরা চারজনে সিঙ্গরী নদীর তীরে এলাম। আল্লাদিত্যা বললেন, "হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে আমেরিকান মিশনারীরা জোর প্রচার করছে, যদি তার প্রতিকার করবে বলে প্রতিজ্ঞা কর তবে আমি সুখী হব।" বৃদ্ধের কথায় রাজী হলাম এবং আমাদের মাতৃভূমির নামে শপথ করলাম, "সূচের ছিদ্র পেলেই কুড়ুল বসিয়ে দিব।" আমাকে আলিঙ্গন করে আমার হাতে মনিব্যাগটা দিয়ে বললেন "আমরা তিন ভাইয়ের পক্ষ হতে তিনশত ইয়েন তোমায় দিলাম, কোরিয়াতে গিয়ে হিন্দুস্থানের হয়ে জোর প্রচার করবার জন্যে।" তিনটি ভাইকে একে একে আলিঙ্গন করে সিঙ্গরী নদীর বিশাল সেতু ধীরে ধীরে পার হতে লাগলাম।

চীন হতে বিদায়—চিরতরে কিনা বলতে পারি না; তবে চীনের লোকের সাহায্য প্রচুর পেয়েছি, অত্যাচারিত হয়েছি, চীনকে ভালবেসেছি,—বুঝতে পেরেছি—পৃথিবীতে যদি কেউ ভারতের মিত্র থাকে তবে এই চীন চীন চিরদিনই ভারতের মিত্র থাকবে। চীন হতে বিদায়—শ্লথ পদ, ভারাক্রান্ত মন, একমাত্র সান্ত্বনা চীনের প্রতিবেশী মুল্লুকেই চলেছি!

শেষ